কাকাবাবু সমগ্র ২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু সমগ্র ২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৩
চতুর্দশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১২

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7215-258-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

KAKABABU SAMAGRA: Volume II
[Adventure]
by
Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

বুকুনকে

(যার আর একটা শক্ত নাম আছে, দেবত্রী)

এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
আগুন পাখির রহস্য
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা রহস্য
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ
কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু আর বাঘের গল্প
কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী
কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া
কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু
কাকাবাবু ও বজ্র লামা
কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার
কাকাবাবু ও মরণফাঁদ
কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল
কাকাবাবু ও সিন্দুক-রহস্য
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি
কাকাবাবু সমগ্র (১-৫)
কাকাবাবু হেরে গেলেন
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান
কাকাবাবুর চোখে জল
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
জোজো অদৃশ্য
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
দশটি কিশোর উপন্যাস
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মা, আমার মা
মিশর রহস্য
রাজবাড়ির রহস্য
সন্তু কোথায় কাকাবাবু কোথায়
সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

ভূমিকা

কাকাবাবু আর সন্তু রহস্যের সন্ধানে ভারতের নানা অঞ্চলে চলে যায়। কখনো দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়, কখনো গভীর জঙ্গলে, কখনো সমুদ্রের দ্বীপে। এবারে ওরা একটি অভিযানে গেছে ভারতের বাইরে, আফ্রিকার কেনিয়ায়। সেরিংগেটি অরণ্যে হোটেলের তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে শোনা যায় সিংহের গর্জন, রাত্তির বেলা খুব কাছ দিয়ে চলে যায় জলহস্তী আর হাতির পাল। কাকাবাবুরা যে তাঁবুতে ছিলেন, কিছুদিন পর ঠিক সেই তাঁবুতে আমি থেকে এসেছি কয়েকদিন। কাকাবাবুর কথা সেখানকার অনেকেই মনে রেখেছে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডেও স্থান পেয়েছে ছ'টি অভিযান কাহিনী।

সূচী

ভূপাল রহস্য

॥ এক ॥

কাকাবাবু দারুণ চটে গেলেন নিপুদার ওপর।

নিপুদা মানুষটি খুব আমুদে ধরনের, সব সময় বেশ একটা হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভালবাসেন, আর কথাও বলেন জোরে-জোরে।

নিপুদা আমার জামাইবাবুর ছোট ভাই। গত বছর আমার ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। ছোড়দি আর জামাইবাবুরা এখন থাকে মধ্যপ্রদেশের ভূপাল শহরে। নিপুদাও ভূপালেই পড়াশুনা করেছে, চাকরিও করে সেখানে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস।

অফিসের কাজে নিপুদাকে প্রায়ই আসতে হয় কলকাতায়। এসেই চার-পাঁচ দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছটা বাংলা সিনেমা-থিয়েটার দেখে ফেলে। আমাদের খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রীটের ভাল ভাল হোটেলে। নিপুদা এলে আমাদের সময়টা বেশ ভালই কাটে।

কিন্তু নিপুদার কথা শুনে যে কাকাবাবু প্রথমেই এতটা চটে যাবেন, তা আমিও বুঝতে পারিনি।

কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পুরনো দলিল পরীক্ষা করছিলেন। আর অন্যমনস্কভাবে পাকাচ্ছিলেন বাঁ দিকের গোঁফ। নিপুদা সে-ঘরে ঢুকেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আরে, আরে ও কী, না, না, দরকার নেই।'

কাকাবাবু পছন্দ করেন না কেউ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করুক। কাকাবাবুর একটা পা অকেজো বলেই বোধহয় তাঁর বেশি সঙ্কোচ। নিপুদা তবু জোর করে প্রণাম সেরে নিয়ে বসল। তারপর বলল, 'কাকাবাবু, কেমন আছেন? ওঃ, নেপালে তো আপনারা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করে এলেন, পুরো একটা গুপ্তচর-চক্রকেই ধরে ফেললেন। ভূপালের কাগজেও খবরটা খুব বড় করে বেরিয়েছিল। আমরা অবশ্য ওখানে বোম্বের খবরের কাগজও পাই…প্রথমে ওরা খবর দিয়েছিল, আপনি বুঝি সেই অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান,

ইয়েতি যাকে বলে···তাই আবিষ্কার করে ফেলেছেন ! আচ্ছা কাকাবাবু, ইয়েতি বলে সত্যিই কি কিছু আছে ?'

কাকাবাবু মুখখানা একটু হাসি-হাসি করে বললেন, 'কী জানি !'

নিপুদা আবার বলল, 'আর ঐ যে লোকটা, কেইন শিপ্‌টন, ও কি পালিয়েই গেল ? ওকে আর ধরা গেল না ?'

কাকাবাবু 'দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না !'

আমি বুঝতে পারলুম কাকাবাবু নিজের কোনও একটা চিন্তা নিয়ে মগ্ন আছেন, কথা বলার মুডে নেই।

নিপুদা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, আপনি কখনও ভূপাল গেছেন ? একবার চলুন না, দারুণ জায়গা, আপনার খুব ভাল লাগবে !'

কাকাবাবু বললেন, 'ভূপাল আমি গেছি। দুবার বোধহয়। না, তিনবার।'

নিপুদা তবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আর একবার চলুন। এবারেই আমার সঙ্গে চলুন, একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে !'

'এখন তো আমার যাওয়া হবে না। অন্য কাজে ব্যস্ত আছি।'

'জানেন, ভূপালে গত এক মাসের মধ্যে তিনটে সাঙ্ঘাতিক খুন হয়েছে। পুলিশ কিচ্ছু করতে পারছে না।'

এবার কাকাবাবু মুখ তুলে সোজা তাকালেন নিপুদার দিকে।

নিপুদা বলল, 'ওখানকার পুলিশগুলো কোনও কম্মের না ! আপনি গেলে ঠিক খুনিকে খুঁজে বার করতে পারবেন। ওখানকার একজন পুলিশ অফিসারকে আমি বলেছি, তুমি মিঃ রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ, তাঁকে ডেকে তাঁর বুদ্ধি নাও···।'

কাকাবাবুর চোখ দুটি স্থির, মুখখানা লাল হয়ে গেছে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, কাকাবাবু বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর অত রাগের কারণটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম পরে। কাকাবাবু সাধারণ ডিটেকটিভ নন, খুনের তদন্ত করাও তাঁর পেশা নয়। কোনও বড় শিল্পীকে যদি সিনেমার পোস্টার আঁকতে বলা হয়, তা হলে তিনিও কাকাবাবুর মতনই চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

রেগে গেলে কাকাবাবু বকাবকি, চ্যাঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু তাঁর মুখখানা কী রকম চৌকো মতন হয়ে যায়।

কাকাবাবু চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর নিপুদার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবরটবর ভাল তো ? রুমি ভাল আছে নিশ্চয়ই ?'

নিপুদা তাও মহা উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, 'প্রথম খুনটার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় খুন···ডেড বডিটা পাওয়া গেল আরেরা কলোনিতে. একটা পার্কের মধ্যে···'

কাকাবাবু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিপু, তুমি এখন ভেতরে

যাও, অন্যদের সঙ্গে কথা-টথা বলো—'

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে পেছনের একটা দেয়াল-আলমারি খুলে বই ঘাঁটতে লাগলেন খুব মনোযোগ দিয়ে।

নিপুদা বলল, 'তারপর শুনুন, কাকাবাবু, থার্ড খুনটা...'

আমি এবার চুপিচুপি নিপুদাকে বললুম, 'চলো নিপুদা, আমরা ভেতরে যাই।'

নিপুদা কী রকম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কী ব্যাপার, উনি আমার কথা শুনলেনই না!'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছেন অন্য কিছু নিয়ে।'

'কিন্তু পরপর তিনটে নৃ-নৃ-নৃ, মানে ঐ যে কী যে বলে লোমহর্য খুন...হ্যাঁগো, সন্তু, এই লোমহর্য কথাটার মানে কী গো? হর্য মানে তো আনন্দ!'

আমি বললুম, 'লোমহর্য না, রোমহর্ষক। যা শুনলে ভয়ে সারা গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে।'

নিপুদা বলল, 'হ্যাঁ, সেই রকম ঘটনাই বটে। কাকাবাবু যদি কেসটা হাতে নেন, আমাদের মধ্যপ্রদেশে ওঁর খুব নাম হয়ে যাবে।'

'আমি কাকাবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আগে তো আমায় বলতে হবে কেসটা। আমি যদি মনে করি নেওয়া যেতে পারে, তা হলে কাকাবাবুকে রাজি করাব।'

কিন্তু কাকাবাবুর সহকারী হিসেবে নিপুদা আমায় বিশেষ পাত্তা দিল না। ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী বুঝবে! এমন নৃ-নৃপুংসক ব্যাপার!'

'নৃপুংসক? ওঃ হো, নৃশংস! আমি কত সাঙ্ঘাতিক নৃশংস ব্যাপার দেখেছি, তুমি ধারণাই করতে পারবে না! জানো, আন্দামানে কী হয়েছিল!'

নিপুদা বলল, 'চল, তা হলে আজ সন্ধেবেলা 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমাটা দেখে আসি।'

'তা তো যাব। খুন তিনটের কথা বলবে না?'

নিপুদা আমাদের বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও কে! তোমরা বাড়িতে নেপালি দারোয়ান রাখলে কবে?'

আমি বললুম, 'নেপালি দারোয়ান না তো! ও তো মিংমা, আমাদের বন্ধু। ওর জন্য কাকাবাবু আর আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। ও ক'দিন আগে নেপাল থেকে বেড়াতে এসেছে আমাদের এখানে।'

'তাই বলো। কী সুন্দর চেহারা ছেলেটির। খুব স্মার্ট, নয়?'

'মিংমা দু'বার এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল।'

'ও, শেরপা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন শেরপার নামও কাগজে বেরিয়েছিল বটে। এই-ই সেই? এ তো তা হলে খুব বিখ্যাত!'

মিংমা গেটের কাছে আমার কুকুরটাকে নিয়ে খেলছিল। এই প্রথমবার

কলকাতায় এসেছে মিংমা। কলকাতার রাস্তায় ও একা-একা বেরুতে ভয় পায়। তাই আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ির বাইরে বিশেষ কোথাও যায় না। আমার কুকুরটার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। বেশ বাংলাও শিখে গেছে এর মধ্যে। শিস্ দিয়ে ডাকছে, 'র-কু-কু ! ইধার এসো ! দৌড়কে এসো।'

মিংমাকে ডেকে আমি আলাপ করিয়ে দিলুম নিপুদার সঙ্গে।

নিপুদা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুম তো নেপালকা আদমি হ্যায়, ভূপাল কভি দেখা ? ভূপাল নেপালসে ভি আচ্ছা !'

মিংমা ভূপাল জায়গাটার নামই শোনেনি। সে অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে।

নিপুদা মিংমার বুকে টোকা মেরে বলল, 'তুম নেপালি, হাম ভূপালি ! তুম্ ভি হামলোগকা সাথ সিনেমা চলো।'

সন্ধেবেলা সিনেমা দেখার পরই অবশ্য আমাদের বাড়ি ফিরে আসতে হল, বাইরের হোটেলে আর খাওয়া হল না। কারণ মা আজকে তিন রকম মাছ রান্না করেছেন মিংমার জন্য। মিংমা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষত ইলিশ আর চিংড়ি।

খাবার টেবিলে নানারকম গল্প-গুজব হচ্ছে, হঠাৎ নিপুদা দুম্ করে কাকাবাবুকে বলল, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে গেলে খুব ভাল হত। আমি ধীরেনদাকে প্রায় কথাই দিয়ে ফেলেছি যে, আপনাকে এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে অকারণেই একবার বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটা মুছে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নিপু, আমি জানি না ধীরেনদাটি কে ? আর আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার সম্পর্কে কারুকে কথা দেওয়ার অভ্যেসটিও মোটেই ভাল নয়।'

এমন কী, মা পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেলেন যে, কাকাবাবু খুবই রেগে গেছেন নিপুদার ঐ রকম কথা শুনে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, 'নিপু, তুমি আর একটা ইলিশ মাছ নাও। একটা পেটি নাও, তোমাদের ওখানে তো ইলিশ পাওয়া যায় না ! তোমরা চিংড়ি মাছ পাও ?'

নিপুদা মায়ের কথা গ্রাহ্য না করে আবার বলল, 'বুঝলেন না, তিন-তিনটে খুন, তিনজনই শিক্ষিত লোক, তাদের একেবারে গলা কেটে ফেলেছে। একটা ডেড বডি তো আমি নিজেই দেখেছি, ওঃ কী রক্ত !'

কাকাবাবু বললেন, 'খাওয়ার সময় ওসব রক্তারক্তির কথা বলতে নেই, তাতে হজমের গণ্ডগোল হয়। মন দিয়ে খেয়ে নাও বরং, বৌদি খুব সুন্দর রান্না করেছেন।'

কাকাবাবু নিজে আর বিশেষ কিছু খেলেন না। প্রায় তক্ষুনি উঠে পড়লেন। আমি শুনতে পেলাম কাকাবাবু ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে

াদচ্ছেন। অর্থাৎ এর পরেও যেন নিপুদা গিয়ে ওকে বিরক্ত করতে না পারে।

অবশ্য নিপুদার মুখে খুনের কথা শুনে আর সবাই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

বাবা বললেন, 'তোমাদের ওখানেও খুন-জখম শুরু হয়ে গেছে নাকি ?'

মা বললেন, 'কোথাও আজকাল আর একটুও শান্তি নেই। খালি খুন আর খুন। তুমি নিজের চোখে দেখলে নিপু ? কী রকম দেখলে, গলা কাটা ?'

নিপুদা বলল, 'খুন তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু এই খুনগুলো একদম অন্যরকম। তিন জনই নিরীহ ভদ্রলোক, লেখা-পড়ার চর্চা নিয়ে থাকতেন। একজন তো আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম অর্জুন শ্রীবাস্তব, আমি কতদিন দেখেছি মাঝরাতের পরেও ওঁর ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। সারারাতও নাকি জেগে কাটাতেন মাঝে মাঝে। যেদিন ঘটনাটা ঘটল সেদিনও রাত দুটোর সময় নাকি পাড়ার একটি ছেলে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আর ভোরবেলা দেখা গেল, পার্কে একটা বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে ওঁর দেহটা, আর মুণ্ডুটা গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর।'

মা বললেন, 'উফ ! মানুষ, এত নিষ্ঠুর হয় !'

নিপুদা বলল, শ্রীবাস্তবজী অতি শান্তশিষ্ট মানুষ, পাড়ার কারুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাবও ছিল না, ঝগড়াও ছিল না, নিজের মনে থাকতেন। এ রকম লোককে কে যে মারবে··· ।'

আমি বললুম, 'নিপুদা, তুমি বারবার শুধু দ্বিতীয় খুনটার কথা বলছ কেন। প্রথম খুনটা কীভাবে হয়েছিল ?'

'দ্বিতীয় খুনটার পরই প্রথম খুনটার কথা ভালভাবে জানা গেল। খবরের কাগজে লিখল যে, অর্জুন শ্রীবাস্তবের মতনই ভূপাল মিউজিয়ামের কিউরেটর সুন্দরলাল বাজপেয়ীকেও কেউ ঐ রকমভাবে গলা কেটে খুন করেছে মাসখানেক আগে। তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল একটা কবরখানায়। সুন্দরলাল বাজপেয়ী অনেকদিন বিলেতে ছিলেন, খুব সাহেব ধরনের মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল বিশাল, ঐ রকম একজন তাগড়া লোকের গলা কেটে খুন করাও তো সহজ কথা নয়।'

'আর তৃতীয়টা ?'

'তৃতীয় ঘটনাটা একটু অন্যরকম। সেটা তো ঘটল আমি আসবার মাত্র চার দিন আগে। এঁর নাম মনোমোহন ঝাঁ। বেশ বয়স্ক লোক, চাকরি থেকে কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন। ইনি থাকতেন একা একটি ফ্ল্যাটে। সঙ্গে একজন চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খোলা। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কেউ মনোমোহন ঝাঁকে খুন করে গেছে। তাঁর মুখের ওপর তখনও বালিশটা চাপা দেওয়া রয়েছে।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সেই চাকরটা ?'

নিপুদা বলল, 'সবারই প্রথমে চাকরটার কথাই মনে হয়েছিল। পুলিশও ভেবেছিল, চাকরটাই খুন করে পালিয়েছে। যদিও ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি, আর ঐ চাকরটিও নাকি মনোমোহন ঝাঁ-র কাছে কাজ করেছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে। পরদিন চাকরটাকে পাওয়া গেল ভূপাল থেকে দশ মাইল দূরে এক মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়, তার জিভটা কাটা।'

মা বললেন, 'অ্যাঁ ?'

'কেউ তার জিভটা কেটে নিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বুঝলেন না, একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার! চাকরটার চিকিৎসা হচ্ছে হাসপাতালে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ!'

'তারপর কী হল ?'

'তারপর পুলিশ ভূপাল শহর একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছে। কিন্তু কে বা কারা যে এমন খুন করে চলেছে, তার কোনও হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'রুমিরা বেশি রাত্তির করে আবার বেড়াতে-টেড়াতে যায় না তো ?'

নিপুদা বলল, 'থার্ড খুনটা হওয়ার পর অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে গেছে। একটু রাত্তির হলেই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন, যে তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কারুর বাড়ি থেকেই কোনও জিনিসপত্র বা টাকাকড়ি খোয়া যায়নি। মনে হয় কোনও পাগলের কাণ্ড!'

বাবা বললেন, 'সাধারণ পাগল হলে কি আর এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে ? পাগল-টাগল নয়, তোমাদের মধ্যপ্রদেশে তো অনেক বড় বড় ডাকাতের গ্যাং আছে।'

নিপুদা বলল, 'ডাকাতরা নিরীহ সাধারণ লোকদের মারে না, আর তারা শহরেও আসে না। এই খুনের উদ্দেশ্যটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।'

মা বললেন, 'হাত শুকনো হয়ে যাচ্ছে, এবার তোমরা উঠে পড়ো। হাত ধুয়ে নাও।'

নিপুদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'চল সন্তু, আমার সঙ্গে ভূপাল যাবি নাকি ?'

নিপুদা জিজ্ঞেস করার আগেই আমি সব ঠিক করে ফেলেছি অনেকটা। আমার এখন ছুটি। অনায়াসেই ছোড়দির বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসতে পারি। খালি একটা ব্যাপার আছে। আমি জানি, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য সমাধান করার জন্য যে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন বসেছে, তাতে কাকাবাবুকে সদস্য করা হয়েছে। সানফ্রানসিসকো আর বারমুডার মাঝখানে সমুদ্রের একটা জায়গায় বড় বড় জাহাজ হঠাৎ ডুবে যায়। এমন কী, আকাশ থেকে অনেক এরোপ্লেনকেও যেন চুম্বকের মতো টেনে নেয়। কত যে এইভাবে ডুবেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই তদন্ত কমিশনের কাজ শুরু করার জন্য কাকাবাবু নেমন্তন্ন

পেয়েছেন আমেরিকা থেকে। কিন্তু কাকাবাবু লিখে জানিয়েছেন যে, তিনি কমিশনের সদস্য হতে আগ্রহী নন। তাঁকে যদি কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে তিনি একাই ঐ রহস্য সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে পারেন।

কাকাবাবুর এই চিঠির উত্তর এখনও আসেনি। যদি ওরা রাজি হয়, তাহলে কাকাবাবু তো আর একদম একা যাবেন না, নিশ্চয়ই আমাকেও নিয়ে যাবেন। ভূপাল গেলে যদি সেটা ফস্কে যায় ?

অবশ্য আমেরিকা যেতে হলেও তো কাকাবাবু এক্ষুনি যাচ্ছেন না। অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এখানে। এর মধ্যে আট-দশ দিনের জন্য আমি ভূপাল থেকে ঘুরে আসতে পারি। নিশ্চয়ই কাকাবাবু আমাকে ফেলে চলে যাবেন না। এর আগে সব কটি অভিযানে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে গেছি।

নিপুদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, যাব !'

মিংমা এতক্ষণ মুখ নিচু করে মাছের কাঁটা বেছে খেয়ে যাচ্ছিল, এবার মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললুম, 'মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওর বেশ বেড়ানো হবে।'

মা বললেন, 'না, না, এখন ভূপাল যেতে হবে না। খুনে গুণ্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে !'

নিপুদা হা-হা করে হেসে উঠে বলল, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি ? আমরা তো রয়েছি। আমাদের বাড়িতে লাইসেন্সড্ বন্দুক আছে, আজেবাজে লোক আমাদের বাড়ির ধার ঘেঁষতে সাহস করে না।'

বাবা বললেন, 'যাক্ না, ঘুরে আসুক না, এখন তো ছুটি রয়েছে।'

পরদিন সকালে আমি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, আমি কি নিপুদার সঙ্গে ভূপাল যাব ক'দিনের জন্য ? খুব করে বলছেন…'

কাকাবাবু আজও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস নিয়ে পুরনো কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও, ঘুরে এসো ! কবে যাচ্ছ ? আজই ?'

মনে হল, যেন আমরা আজকে গেলেই কাকাবাবু খুশি হন। তাহলে নিপুদা আর ওঁকে বিরক্ত করতে পারবে না।

'হ্যাঁ, আজকেই রাত্তিরের ট্রেনে। মিংমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব ?'

এবার একটু ভেবে কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। মিংমাও ঘুরে আসুক। তবে ঐসব খুন-টুনের ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না !'

॥ দুই ॥

মধ্যপ্রদেশের নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে শুধু জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়ের কথা। এছাড়া যেন ওখানে আর কিছু নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় যে সাদা বাঘ, তাও তো প্রথম এসেছিল ঐ মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে।

কিন্তু ভূপাল রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে খানিকটা আসবার পর আমি অবাক। এমন সুন্দর শহর আছে এই মধ্যপ্রদেশে! দারুণ দারুণ চওড়া রাস্তা, পরিষ্কার ঝকঝকে। দু পাশে নতুন ডিজাইনের নানা রকম বাড়ি। শহরের মাঝখানে একটা বিশাল লেক, তার ওপাশে পুরনো শহর। একটা মস্ত বড় মসজিদের চূড়া দেখতে পাওয়া যায় অনেক দূর থেকে। নিপুদার মুখে শুনলাম, বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় নবাব পতৌদির বাড়ি আছে ওখানে। ঠিক করলুম, একদিন পতৌদির সঙ্গে দেখা করে ওঁর অটোগ্রাফ নিতে হবে।

শহরটা ঠিক সমতল নয়, রাস্তাগুলো উঁচুনিচু। পাহাড় কেটে যে শহরটা বানানো হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। এক এক জায়গায় বাড়িগুলো বেশ উঁচুতে। যেদিকেই তাকাই, চোখে বেশ আরাম লাগে।

ট্যাক্সিটা প্রায় সারা শহরটা পেরিয়ে এসে ঢুকল আরেরা কলোনিতে। এখানকার বাড়িঘরগুলো যেন আরও বেশি কায়দার যেন কার বাড়ি কত সুন্দর হবে এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই একটা করে বাগান। ইংরেজি সিনেমায় যে রকম বাড়ি-টাড়ি দেখি, সে তো এই রকমই।

একটা পার্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিপুদা বলল, 'এই পার্কেই পাওয়া গিয়েছিল সেকেণ্ড ডেড বডিটা।'

ডান দিকে হাত তুলে একটা হালকা নীল রঙের তিনতলা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'আর ঐ বাড়িতে থাকতেন অর্জুন শ্রীবাস্তব। ঐ যে ছাদের ঘরটা দেখতে পাচ্ছিস, ঐটাই ছিল ওঁর পড়ার ঘর।'

এর পর ট্যাক্সিটা ডান দিকে ঘুরতেই আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলুম।

ছোড়দি তো আমায় দেখে অবাক! আগে থেকে আমরা কোনও খবরও দিইনি। আমায় জড়িয়ে ধরে ছোড়দি বলল, 'খুব ভাল সময়ে এসেছিস রে সন্তু! আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি যাবার প্ল্যান করেছি। দেখবি, দারুণ ভাল লাগবে।'

আমি মিংমার সঙ্গে ছোড়দির আলাপ করিয়ে দিলুম। মিংমা এমনিতেই কম কথা বলে, নতুন জায়গায় এসে একদম চুপ।

ছোড়দি মিংমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বা, ছেলেটির চেহারা খুব সুন্দর তো!'

আমি বললুম, 'ছেলেটা বলছ কী। ওর বয়েস একত্রিশ বছর, তোমার চেয়েও বয়েসে বড়। আর ও বাংলা বোঝে!'

ছোড়দি বলল, 'চট করে হাত মুখ ধুয়ে নে। তোদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

সত্যিই বেশ খিদে পেয়েছে। ভূপালে কলকাতা থেকে একটানা ট্রেনে আসা যায় না। নাগপুর থেকে বদল করতে হয়। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর ফুরোচ্ছে না।

প্রথমে টপাটপ মিষ্টি খেয়ে ফেললুম কয়েকটা। তারপর ছোড়দি প্লেটে করে লুচি এনে দিল।

এ বাড়িটা দোতলা। ওপরে বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানেই বসে গল্প করতে লাগলুম। বিকেল পেরিয়ে সবে মাত্র সন্ধে হব-হব সময়। আকাশে ঘুরছে কালো কালো মেঘ। রত্নেশদা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। নিপুদাও আমাদের পৌঁছে দিয়েই ছুটেছে নিজের অফিসের দিকে।

ছোড়দিদের বাড়ির সামনেও একটা বেশ সাজানো বাগান। সেখানে লাফালাফি করছে মোটকা-সোটকা খুব লোমওয়ালা একটা কুকুর। একটু দূরে আর একটা বাড়িতে একটা কুকুর অনবরত ডেকে চলেছে। আমরা আসার পর থেকেই ঐ কুকুরটার ঐ রকম একটানা ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ছোড়দিই এক সময় বলল, 'ইশ্, ধীরেনদাদের কী অবস্থা! সর্বক্ষণ ঐ রকম কুকুরের ডাক সহ্য করা...'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কুকুরটার কী হয়েছে? পাগল হয়ে গেছে নাকি?'

'না। ঐ কুকুরটা ছিল অর্জুন শ্রীবাস্তব নামে এক ভদ্রলোকের। তিনি হঠাৎ মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তারপর থেকেই কুকুরটা ঐ রকম ডেকে চলেছে। মনিবের জন্য ও কাঁদে।'

'কিন্তু অর্জুন শ্রীবাস্তবের বাড়ি তো এই ডানদিকে, আর কুকুরটা ডাকছে এদিকের একটা বাড়ি থেকে!'

ছোড়দি একটু অবাক হয়ে তাকাল, আমার দিকে। তারপর বলল, 'ও, নিপু বুঝি এর মধ্যেই তোদের সব বলেছে? শ্রীবাস্তবজী মারা যাবার পর কুকুরটাকে দেখাশুনো করবার কেউ ছিল না, উনি তো একলাই কুকুরটাকে নিয়ে থাকতেন— সেই জন্য ধীরেনদা নিজের বাড়িতে কুকুরটাকে নিয়ে এসেছেন।'

'ধীরেনদা কে?'

'নিপু তোদের ধীরেনদার কথা কিছু বলেনি?'

'নামটা শুনেছি একবার।'

'সন্ধেবেলা তোদের নিয়ে যাব ধীরেনদাদের বাড়িতে।'

কুকুরটা তখনও ডেকেই চলেছে। কী রকম যেন অদ্ভুত করুণ সুর। আমার মনে পড়ল, সেই নেপালের অভিযানে কেইন শিপ্‌টনেরও একটা সাদা লোমওয়ালা সুন্দর কুকুর ছিল। কেইন শিপটন পালাবার পর সেই কুকুরটাও এরকম একা-একা কাঁদত। কেউ খাবার দিলে খেতে চাইত না। শেষ পর্যন্ত কুকুরটা যে কার কাছে রইল কে জানে!

সন্ধেবেলা সবাই মিলে যাওয়া হল ধীরেনদার বাড়িতে। ধীরেনদা মানে ধীরেন চক্রবর্তী, একটা বিদেশি কোম্পানির বিরাট একটা কারখানার উনি ম্যানেজার। মানুষটি কিন্তু খুব হাসিখুশি। এখানকার অনেক বাঙালিই আসে এঁর বাড়িতে আড্ডা দিতে। সবাই ওঁকে ডাকে ধীরেনদা আর ওঁর স্ত্রীকে বলে

রিনাদি।

ছোড়দি আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর ধীরেনদা বললেন, 'আরে, তাই নাকি ? এই তাহলে 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্কের' সেই হীরো সন্তু, আর এই সেই মিংমা ? আজ তো দু'জন খুব বিখ্যাত মানুষ এসেছে আমাদের বাড়িতে। কাকাবাবু এলেন না ? ইশ, কাকাবাবুকে একবার দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল !'

ধীরেনদাদের দুটি ছেলে, দীপু আর আলো। এদের মধ্যে দীপু প্রায় আমারই বয়েসি !

রিনাদি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সন্তু, তোমরা যে সিয়াংবোচিতে ছিলে, এভারেস্টের অত কাছে, সেখানে তোমাদের নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, প্রথম-প্রথম দু' একদিন হয়েছিল, আমাদের সঙ্গে অক্সিজেন মাস্ক-ও ছিল, কিন্তু পরে সেগুলোর দরকার হয়নি, এমনিই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।'

ধীরেনদা বললেন, 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্কের হীরোরা এসেছে, আজ ওদের মাগুর মাছ খাওয়াব !'

কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলুম। মাগুর মাছ খাওয়ার মধ্যে আবার এমন কী বিশেষত্ব আছে ?

ধীরেনদা বললেন, 'দীপু, আলো, চলো আমরা এখন মাছ ধরব।'

সবাই মিলে চলে এলুম বাগানে। প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও পুকুরে বুঝি মাছ ধরতে যাওয়া হবে। তা নয়। বাগানের এক কোণে রয়েছে একটা বেশ বড় চৌবাচ্চার মতন। পাশাপাশি চারখানা ক্যারাম বোর্ড সাজিয়ে রাখলে যত বড় হয়, ততখানি। কালো মিশমিশে জল, ওপরে ভাসছে পদ্মপাতা, দুটো পদ্মফুলও ফুটে আছে।

দুটো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটের মতন হাত-জাল নিয়ে ধীরেনদা আর দীপু সেই জলের মধ্যে মাছ খুঁজতে লাগল। এক সময় দীপুর জাল থেকে একটা কী যেন লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে।

প্রথমে চমকে উঠে আমি ভেবেছিলাম ওটা বুঝি সাপ ! এত বড় মাগুর মাছ কখনও দেখিনি, প্রায় এক হাত লম্বা আর অ্যাত্ত বড় মাথা !

ছোড়দি ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'ধীরেনদা এই মাগুর মাছ সহজে তুলতে চান না। এখানে তো মাগুর মাছ পাওয়া যায় না। তোদের বেশি খাতির করার জন্যই ধরলেন।

চৌবাচ্চাটায় নিশ্চয়ই অনেক মাছ কিলবিল করছে, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ধীরেনদা আর দীপু সাত-আটটা মাছ তুলে ফেলল।

রিনাদি বললেন, 'আর দরকার নেই, সাতটা মাছ থাক, একটাকে জলে ছেড়ে দাও।'

বাগানের অন্যদিকে অর্জুন শ্রীবাস্তবের কুকুরটা ডেকেই চলেছে। একটা

খুঁটির সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা। মিংমা মাছ ধরা না দেখে সেই কুকুরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধীরেনদা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওর গায়ে হাত মাত দেও। কামড়ে দিতে পারে।'

কুকুরটা খয়েরি, খুব বেশি বড় নয়, কিন্তু গলার আওয়াজ বেশ জোরালো। মিংমা কুকুর খুব ভালবাসে। কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে লক্ষ করল একটুক্ষণ। তারপর খপ্ করে এমন কায়দায় ওর ঘাড়টা এক হাতে চেপে ধরল যে কুকুরটার কামড়াবার কোনও সাধ্য রইল না।

অন্য হাত দিয়ে মিংমা কুকুরটার লোমের ভেতর থেকে পোকা বাছতে লাগল। বড় বড় এঁটুলি।

কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিয়েছে। মনে হল যেন বেশ আরাম পাচ্ছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এই মিংমার তো বেশ এলেম আছে। কুকুরটাকে এ পর্যন্ত কেউ সামলাতে সাহস পায়নি।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা ধীরেনদা, অর্জুন শ্রীবাস্তবের ঘরটা একবার দেখতে পারি ? ঘরটা কি বন্ধ আছে ?"

ধীরেনদা বললেন, 'কেন, তুমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করবে নাকি ? বেশ তো !'

ছোড়দি বলল, 'না, না, সন্তুর ও-সবে মাথা গলাবার দরকার নেই। মা আমাকে চিঠি লিখে বারণ করে দিয়েছেন। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলেও না হয় আলাদা কথা ছিল !'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু নেই বটে, কিন্তু আমরা তো আছি। সন্তুর অভিজ্ঞতা আছে, সেই সঙ্গে যদি আমরাও সাহায্য করি, তা হলে হয়তো খুনিকে ধরে ফেলা যেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের সরকার এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।'

আমার অবশ্য খুনের তদন্ত করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। কাকাবাবুর সঙ্গে আমি যে-সব অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, তা আরও অনেক বড় ব্যাপার। তবু চুপ করে রইলুম।

ধীরেনদা বললেন, 'চাবি আমার কাছেই আছে। চলো, এখুনি ঘুরে আসি !'

ধীরেনদা, আমি, দীপু আর মিংমা বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। মিংমা কুকুরটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। তিনতলার ওপর শুধু দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট আর ছাদ। অর্জুন শ্রীবাস্তব সেখানে একাই থাকতেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য চমকপ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। দুখানা ঘরেই ঠাসা বইপত্র, প্রায় সব বইই ইতিহাস বিষয়ে। মনে হয় যেন বই ছাড়া অর্জুন শ্রীবাস্তবের আর কোনও সম্পত্তি ছিল না। কোথাও মারামারি, ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই নেই। দুটো বাক্স আর একটা আলমারি আছে, সেগুলোরও তালা ভাঙা হয়নি। চাবিও

পাওয়া গিয়েছিল, পুলিশ এসে খুলে দেখেছিল যে, ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি কেউ।

ধীরেনদা বললেন, 'পার্কে অর্জুন শ্রীবাস্তবের দেহ যদিও পাওয়া গিয়েছিল ভোরবেলা, কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে যে, তাঁকে খুন করা হয়েছিল রাত একটা দেড়টার সময়।'

অত রাতে শ্রীবাস্তবজি কি নিজেই পার্কে গিয়েছিলেন ? না চেনা কেউ তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

কুকুরটা এখানে এসেই আবার চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। ও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা বুঝি না !

শার্লক হোম্‌সের মতন একটা পোড়া দেশলাই-কাঠি কিংবা এক টুক্‌রো কাপড়ের মতন কোনও সূত্রই চোখে পড়ল না। তবু আমি উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলুম খাটের তলা-টলা।

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, সন্তু, কিছু বুঝতে পারলে ?'

আমি চুপ করে রইলুম। অনেক বইতেই পড়েছি, বড়-বড় ডিটেকটিভরা কোনও সূত্র বা প্রমাণ পেলেও প্রথম দিকটায় কিছুই বলতে চান না।

আমার একবার মনে হল, কাকাবাবু এখানে উপস্থিত থাকলে কী করতেন ? তিনি কোন্ কোন্ জিনিস পরীক্ষা করতেন আগে ? হয়তো তিনি এই বইগুলোই পড়তে শুরু করে দিতেন !

অর্জুন শ্রীবাস্তবের বিছানাটা এখনও একইরকমভাবে পাতা আছে। চাদরে কোনও ভাঁজ নেই, মনে হয় রাতে শ্রীবাস্তবজি শুতেই যাননি। বিছানাটার দিকে তাকাতেই আমার গা শিরশির করছে। এই বিছানায় কয়েকদিন আগেও একজন মানুষ শুয়েছে, আজ সে বেঁচে নেই !

ধীরেনদা বললেন, 'শ্রীবাস্তবজি ছিলেন আমার বন্ধু। অতি নিরীহ, শান্ত মানুষ, তাঁকে যে কেউ ওরকম ভয়ঙ্করভাবে খুন করতে পারে বিশ্বাসই করা যায় না।'

খানিক বাদে আমরা চলে এলুম সেখান থেকে।

তারপর ধীরেনদার বাড়িতে থাকা হল অনেক রাত পর্যন্ত। গল্প হল অনেক রকম। আমরা এই শনিবারই পাঁচমারি বেড়াতে যাচ্ছি শুনে ধীরেনদা বললেন, 'ইশ্, আমরাও আর একটা গাড়ি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গেলে পারতুম। কিন্তু শনিবার তো হবে না, সেদিনই আমাদের কোম্পানির এক সাহেব আসছে আমেরিকা থেকে।'

ছোড়দি বলল, 'একটু চেষ্টা করে দেখুন না, ধীরেনদা, কোনও রকমে ম্যানেজ করতে পারেন না ? আপনি গেলে খুবই ভাল হত !'

ধীরেনদা বললেন, 'কোনও উপায় নেই ! ঠিক আছে, তোমরা পাঁচমারি থেকে ঘুরে এসো, তারপর আমি তোমাদের আর একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

ছোড়দি বলল, 'কোথায় ? সাঁচি ?'

'সাঁচি তো আছেই। সেখানে যে-কোনও দিন যাওয়া যেতে পারে। আমি তোমাদের নিয়ে যাব ভীমবেঠকায়।'

'ভীমবেঠকায় ? সেটা আবার কোন্ জায়গা ?'

'নাম শোনোনি তো ? যারা ভূপাল বেড়াতে আসে, তারা সবাই সাঁচি স্তূপ দেখে কিংবা পাঁচমারি যায়। কিন্তু আমার মতে ভীমবেঠকাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জায়গা। তোমাদের মতন যারা ভূপালে এসে বেশ কিছুদিন আছে, তারাও ঐ জায়গাটার নাম শোনেনি !'

রিনাদি বললেন, 'ঐ ভীমবেঠকা তোদের ধীরেনদার খুব ফেভারিট জায়গা। অবশ্য গেলে তোদেরও খুব ভাল লাগবে। ঐ অর্জুন শ্রীবাস্তবই আমাদের প্রথম ভীমবেঠকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার আগে আমরাও নাম জানতুম না।'

ভীমবেঠকা নামটা শুনে আমারও কী রকম অদ্ভুত লাগল। ঐ রকম কোনও জায়গার নাম শুনলেই যেতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, আগে তো পাঁচমারি ঘুরে আসা যাক।

পরের দিন নিপুদা আমাদের গাড়ি করে ভূপালের বিখ্যাত লেক দেখিয়ে আনল। নবাব পতৌদির বাড়িতেও গেলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলুম, পতৌদি এখন ভূপালে নেই, অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা দেখতে গেছেন।

শনিবার সকালে পাঁচমারি যাবার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি। রত্নেশদা একটা বড় স্টেশন ওয়াগান জোগাড় করে এনেছেন, আমরা সবাই তো যাবই, ধীরেনদার ছেলে দীপুও যাবে আমাদের সঙ্গে। এর মধ্যে দীপুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

একে-একে সব জিনিস-পত্র তোলা হচ্ছে। পাঁচমারিতে নাকি রাত্রে খুব শীত পড়ে, তাই নিতে হচ্ছে কম্বল-টম্বল। রত্নেশদা সঙ্গে নিলেন একটা শট্‌গান্, যদি শিকার-টিকার কিছু করা যায়। আগেই শুনেছিলুম, পাঁচমারি যাবার পথে বাঘ দেখা যেতে পারে।

নিপুদা একটা ছোট্ট রেডিও এনে বলল, 'এটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই, কী বলো ? ওখানে গিয়ে গান-টান শোনা যাবে।'

রেডিওর ব্যাটারি ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য নিপুদা একবার ওটা চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পেলুম একটা দারুণ দুঃসংবাদ !

রেডিওতে তখন স্থানীয় খবর শোনাচ্ছে। তাতে জানা গেল যে, বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ভূপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনাকে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোড়দি বলল, 'অ্যাঁ ? কী সর্বনাশ !'

রত্নেশদা বলল, 'চুপ করো ! আগে শুনতে দাও পুরো খবরটা !'

আরও জানা গেল যে, ডঃ শাকসেনা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পরশু রাত্রে ফিরেছেন ভূপালে। রাত্রে তিনি যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন, সকালবেলা থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে তিনি কিছু বলে যাননি, এমনভাবে তাঁর হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার কোনও কারণই নেই। এর আগে যে তিনটি বীভৎস হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার জের টেনে ডঃ শাকসেনা সম্পর্কেও চরম আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ সারা মধ্যপ্রদেশ জুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে এবং দিল্লিতে সি বি আই-কেও জানানো হয়েছে।

নিপুদা বলল, 'এই রে, আর দেখতে হবে না ! ওঁকেও মেরেছে।'

ছোড়দি বলল, 'চুপ করো ! আগে থেকেই এরকম বলতে শুরু কোরো না। এখনও তো কিছু পাওয়া যায়নি।'

নিপুদা বলল, 'ওঁর মতন একজন শিক্ষিত, বয়স্ক লোক কারুকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে চলে যাবেন, এ কি হয় ? এ নিশ্চয়ই গুম খুনের কেস।'

রত্নেশ বলল, 'আমাদের অফিসের ঐ যে বিজয় শাকসেনা, তার তো আপন কাকা হন ইনি। একদিন বিজয়ের বাড়িতে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এমন সৌম্য চেহারা যে, দেখলেই ভক্তি হয়। ঐ রকম মানুষের যে কোনও শত্রু থাকতে পারে, তাই তো বিশ্বাস করা যায় না।'

নিপুদা বলল, 'এখন হোল্ ইণ্ডিয়াতে ডঃ শাকসেনার মতন ইতিহাসের এত বড় পণ্ডিত আর কেউ নেই। এত জায়গা থেকে ওঁকে চাকরি দেবার জন্য সেধেছে ! কিন্তু উনি ভূপাল ছেড়ে কোথাও যেতে চান না।'

এই সময় এসে পড়ল খবরের কাগজ। তাতেও প্রথম পাতাতে ডঃ শাকসেনার ছবি দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

ছোড়দি আর নিপুদা কাগজটা আগে পড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। রত্নেশদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, এখন নয়, আগে গাড়িতে উঠে পড়ো, যেতে-যেতে পড়বে ! অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদেই আমাদের গাড়ি ছুটল পাঁচমারির দিকে।

॥ তিন ॥

পাঁচমারি যে এতটা দূরে, তা আগে বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, তার মধ্যে কত রকম জায়গা যে পেরিয়ে এলুম তার ঠিক নেই। ধুধু-করা মাঠ, ছোট ছোট শহর, কোথাও ঘন জঙ্গল। এক জায়গায় তো গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সবাইকে হাঁটতে হল, সেখানে একটা নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কিছুটা জায়গা বালির ওপর দিয়ে যেতে হয়, ভর্তি গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, খালি গাড়িটা কোনওরকমে হেলেদুলে গিয়ে উঠল ব্রিজে।

শেষের দিকে বেশ খানিকটা একেবারে পাহাড়ি রাস্তা। গাড়িটা উঠতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। এক পাশে ঘন বন, আর একদিকে বহুদূর ছড়ানো উপত্যকা। অনেকটা আমাদের দার্জিলিং-এর মতন। গাড়ি চালাচ্ছে নিপুদা, আর রত্নেশদা রাইফেলটা ধরে বসে আছে জানলার ধারে। খুব আশা করেছিলুম দু-একটা বাঘ-ভালুক দেখতে পাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা লুকিয়েই থেকে গেল।

পাঁচমারি শহরটা প্রথম দেখে এমন কিছু নতুন মনে হয় না। মনে হয়, এমনিই পাহাড়ের ওপর একটা ছোট্ট শহর। কিন্তু কিছুক্ষণ থাকবার পর বোঝা যায়, এ-রকম জায়গা আমাদের দেশে বিশেষ নেই। ঠিক যেন ছবির বইতে কিংবা সিনেমায় দেখা ইওরোপের কোনও গ্রাম। সাহেবরাই এই পাহাড়ের ওপর জায়গাটা পরিষ্কার করে এক-সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছিল। সাহেবি ধরনের সব বাড়ি, সেই রকম ছোট্ট গির্জা। আমাদের দার্জিলিংও সাহেবদের তৈরি, কিন্তু এখন সেখানে অনেক নতুন বাড়ি-ঘর উঠেছে। কিন্তু সাহেবরা চলে যাবার পর পাঁচমারিতে আর তেমন নতুন বাড়িঘর বানাতে দেওয়া হয়নি, তাই শহরটাকে দেখতে ঠিক আগেকার মতনই আছে।

আমাদের হোটেলটা একটা টিলার ওপরে। এটাও আগে ছিল আগেকার এক সাহেবের। প্রত্যেক ঘরে ফায়ারপ্লেস। এখানকার বারান্দায় দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। ডানদিকে একটা উঁচু পাহাড়ে মন্দির। পাহাড়টা একেবারে খাড়া। ঐ মন্দিরে মানুষ যায় কী করে কে জানে!

পাহাড়ি জায়গায় এসে মিংমা খুব খুশি। ও কথা খুব কম বলে, কিন্তু মুখচোখ দেখলেই বোঝা যায়, এখানে এসে ওর খুব আনন্দ হয়েছে। হোটেলের পেছন দিকটায় একটা আমলকী গাছ, মিংমা সেটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে অনেক আমলকী পেড়ে ফেলল। প্রায় দু' কিলো হবে! আমলকী খাবার পর জল খেলে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু এত আমলকী কে খাবে?

হোটেলে সব গুছিয়ে রাখার পর আমরা আবার বেরিয়ে পড়লুম। পাঁচমারিতে অনেক কিছু দেখবার আছে। মনে হয়, এই জায়গাটা শিবঠাকুরের খুব পছন্দ। এক জায়গায় পাথরের গায়ে এমনি-এমনি ফুটে উঠেছে ত্রিশূলধারী শিবের ছবি। পাঁচমারি থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে রয়েছে একটা শিবলিঙ্গ, সেটা ওখানে কেউ বসায়নি। তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে।

আর-একটা ছোট টিলার ওপরে রয়েছে পাশাপাশি কয়েকটা গুহা। দেখলে মনে হয়, বহুকাল আগে কেউ ওখানে একটা বাংলো বানিয়েছিল। আমরা ওপরে উঠে দেখলুম, গুহাগুলো ঠিক ঘরের মতন। একজন গাইড বলল, এটা পঞ্চ-পাণ্ডবের গুহা। বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী এখানে কিছুদিন ছিলেন।

এই পাণ্ডবগুহার আবার ছাদ আছে। সেখানে এসে দেখলুম, একজন মানুষ পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক ধারে। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, লোকটি চেয়ে আছে সেদিকে।

রত্নেশদা বলে উঠল, 'আরে, বিজয় !'

লোকটি চমকে আমাদের দিকে ফিরল। নাকের নীচে পাকানো গোঁফ, ভালমানুষের মতন চেহারা। কিন্তু মুখখানা গম্ভীর।

রত্নেশদা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হচ্ছে বিজয় শাকসেনা, আমার অফিসের কলিগ।'

ছোড়দি বিজয় শাকসেনাকে আগে থেকেই চেনে, সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে এসেছেন ?'

বিজয় শাকসেনা হিন্দিতে উত্তর দিল, 'আজই দুপুরে। চীফ মিনিস্টার কয়েকদিন পর এখানে মীটিং করতে আসবেন, সেই ব্যবস্থা করতে এসেছি।'

রত্নেশদা বলল, 'হঠাৎ ঠিক হল বুঝি ! কিসে এলে ? আমাদের বললে পারতে, আমাদের গাড়িতে অনেক জায়গা ছিল—'

বিজয় শাকসেনা বলল, 'একটা জিপ পেয়ে গেলাম। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

নিপুদা বলল, 'আপনার আংক্‌ল ডক্টর শাকসেনার কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে ?'

বিজয় অবাক হয়ে বলল, 'কেন, একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? আমার কাকা তো বিদেশে !'

'সে কী, আপনি শোনেননি ! উনি ফিরে এসেছেন, তারপরই আবার উধাও হয়ে গেছেন, ওঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ সকালে রেডিওতে বলেছে, কাগজেও বড় করে বেরিয়েছে···'

'ও, আমি ভোর চারটেয় বেরিয়েছি। রেডিও শুনিনি, কাগজও দেখিনি। কী বলছেন, উনি হারিয়ে গেছেন ?'

'হ্যাঁ, উনি রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।'

'বাড়ি থেকে ?'

'হ্যাঁ। উনি শুতে গিয়েছিলেন···'

'অসম্ভব ! বাড়ি থেকে কে ওঁকে নিয়ে যাবে ? উনি খেয়ালি লোক, হঠাৎ মাথায় কিছু এসেছে, নিজেই কোথাও চলে গেছেন। আমার কাকিমা কী বলেন জানেন ? উনি বললেন যে, ওঁর বয়েস যদি এক হাজার বছর হত, তা হলে ভাল হত। কারণ অন্তত এক হাজার বছরের পুরনো না হলে···কোনও কিছু সম্পর্কে আমার কাকার কোনও আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই এখন উনি কোনও ধ্বংসস্তূপের

মধ্যে বসে আছেন !'

'না, মানে, সবাই ভয় পাচ্ছে, ভূপালে হঠাৎ যে-সব খুন-টুন হতে শুরু করেছে...'

'আমার কাকাকে কে খুন করবে ? কেন খুন করবে ? না, না, না, আপনারা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। চলুন নীচে যাওয়া যাক। এরপর অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নীচে নামার পর বিজয় শাকসেনা আর বিশেষ কিছু না বলে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।

রত্নেশদা বলল, 'চলো সবাই, এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে হবে। পাঁচমারির ব্যাপার জানো তো, একটু রাত হলে আর বাইরে থাকা যায় না।'

আমি ভাবলুম, রাত্তিরবেলা বোধহয় এখানে বাঘ বেরোয়।

তা নয়, বাঘের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক এখানকার শীত। এটাই পাঁচমারির বিশেষত্ব। দিনের বেলা এখানে গরম জামা গায়ে দিতেই হয় না। কিন্তু যেই সন্ধের পর অন্ধকার নামতে শুরু করে, অমনি আরম্ভ হয় শীত। সে কী সাঙ্ঘাতিক শীত ! হোটেলে ফিরতে না-ফিরতেই আমরা কাঁপতে লাগলুম ঠকঠক করে।

তাড়াতাড়ি রাত্তিরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা সবাই মিলে একটা ঘরে বসলুম আড্ডা দিতে। অনেক কাঠ এনে ফায়ারপ্লেস জ্বালানো হয়েছে, তবু শীত যায় না। আমরা আগুনের কাছে এসে মাঝে-মাঝে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি। আমরা যে কম্বল এনেছি, তাতে কুলোবে না, হোটেল থেকে আরও কম্বল দিয়েছে। একজন বেয়ারা বলেছে যে, প্রত্যেকের অন্তত তিনটে করে কম্বল লাগবে।

নিপুদা একসময় রত্নেশদাকে বলল, 'আচ্ছা, দাদা, তোমার অফিসের ঐ বিজয় শাকসেনার ব্যবহারটা কেমন একটু অস্বাভাবিক লাগল না ?'

ছোড়দি বলল, 'আমার মনে হল, ভদ্রলোক আমাদের দেখে যেন একটু চমকে উঠলেন। আমরা যে এই শনিবার পাঁচমারিতে আসব, তুমি অফিসে জানাওনি ?'

রত্নেশদা বলল, 'হ্যাঁ, জানাব না কেন ? বিজয়কেও তো বলেছিলাম। বিজয়ও যে এখানে আসবে, সেটা জানতুম না। অবশ্য চীফ মিনিস্টারের এখানে আসবার কথা আছে ঠিকই।'

আমি বললুম, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার নিরুদ্দেশ হবার কথা উনি আমাদের কাছে প্রথম শুনলেন ?'

রত্নেশদা বলল, 'ও যে বলল আজ খুব ভোরে বেরিয়েছে। রেডিও শোনেনি, কাগজও পড়েনি। তাহলে জানবে কী করে ?'

আমি বললুম, 'রেড়িওতে আজ সকালে জানালেও ডক্টর শাকসেনাকে

পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে। কাল সারা দিনে উনি কোনও খবর পাননি ? ওঁরা এক বাড়িতে থাকেন না বুঝি ?'

রত্নেশদা বলল, 'তা অবশ্য ঠিক। এক বাড়িতে না থাকলেও খুব কাছাকাছি বাড়ি। বিজয়ের কাকার বাড়ি থেকে দেখা যায়। ও-বাড়িতে কিছু হলে বিজয় নিশ্চয়ই জানবে !'

নিপুদা বলল, 'আমাদের মুখে খবরটা শুনেও ওকে খুব একটা ব্যস্ত হতে দেখলুম না। ওদের কাকা-ভাইপোতে ঝগড়া নাকি ?'

রত্নেশদা বলল, 'আরে না, না। বিজয় ওর কাকাকে একেবারে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করে। তা ছাড়া বিজয় মানুষটা খুব ভাল। কারুর সঙ্গেই ওর ঝগড়াঝাঁটি নেই।'

দীপু বলল, 'আমি একটা কথা বলব ? আমার কী মনে হচ্ছে জানেন ? চিরঞ্জীব শাকসেনাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে, তা ঐ বিজয়বাবু জানেন ! তারা বিজয়বাবুকে ভয় দেখিয়েছে যে, মুখ খুললেই মেরে ফেলবে। সেইজন্যই উনি পাঁচমারিতে পালিয়ে এসেছেন।

ছোড়দি বলল, 'দীপু ঠিকই বলেছে, আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।'

রত্নেশদা বলল, 'ওর কাকার এত বড় বিপদ হলে বিজয় নিজের প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকবে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ও হয়তো সত্যিই খবরটা জানত না। কাল সারাদিন বোধহয় ব্যস্ত ছিল···আরে তাই তো, বিজয় তো গতকাল অফিসেও আসেনি।'

নিপুদা বলল, 'উনি পাঁচমারিতে কোথায় উঠেছেন, সে-কথাও তো আমাদের বললেন না। হঠাৎ চলে গেলেন।'

রত্নেশদা বলল, 'পাঁচমারি ছোট জায়গা, সবার সঙ্গে সবার রোজ দেখা হয়। বিজয় নিশ্চয়ই সার্কিট হাউসে উঠেছে। কাল সকালেই আবার দেখা হবে।'

একটু বাদেই পরপর দুবার দুড়ুম দুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল ! আমরা চমকে উঠলুম !

জায়গাটা এমনই শান্ত আর নিস্তব্ধ যে, সেই আওয়াজ যেন কামানের গর্জনের মতন শোনাল।

শীত অগ্রাহ্য করেও আমরা চলে এলুম বারান্দায়। এই টিলার ওপর থেকে পাঁচমারির অন্য বাড়িগুলোর আলো একটু-একটু দেখা যায়। যেন ছড়ানো-ছেটানো অনেকগুলো তারা। দূরে কোথাও সামান্য গোলমালের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। এত রাতে কে বন্দুক ছুঁড়বে ? জঙ্গলে কেউ শিকার করতে গেছে ? এই শীতের মধ্যেও যদি কেউ শিকারে যায়, তবে তার শখকে ধন্য বলতে হবে !

আর বেশিক্ষণ আমাদের গল্প জমল না। সকলের মন টানছিল বিছানার দিকে। শোওয়ামাত্র ঘুম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন ন'টা বেজে গেছে। চারদিকে ঝলমল করছে রোদ। শীতও অনেক কম।

হোটেলের লম্বা টানা বারান্দায় অনেকগুলো বেতের চেয়ার আর টেবিল। আমরা এক জায়গায় গোল হয়ে বসে চা খেতে লাগলুম। মিংমা চা খেল পরপর চার কাপ। ছোড়দির এই শীতে সর্দি লেগে গেছে, 'হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো' করছে বারবার।

কয়েকজন বেয়ারা এক কোণে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতকাল রাত্রের সেই গুলির আওয়াজের কথা। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'রত্নেশদা, কালকের সেই গুলি—'

রত্নেশদা বলল, 'ও হ্যাঁ, তাই তো!'

একজন বেয়ারাকে ডেকে রত্নেশদা জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাত্রে কিসের শব্দ হয়েছিল? তোমরা শুনেছ?'

বেয়ারাটি বলল, 'সাব, এমন কাণ্ড এখানে কোনওদিন হয়নি। পাঁচমারিতে বেশি লোক আসে না, যারা আসে তারা সব বাছাই-বাছাই মানুষ। এখানে কোনওদিন কোনও হাঙ্গামা-হুজ্জোত হয় না। এই প্রথম এখানে এমন একটা খারাপ ব্যাপার হল—'

'কী হয়েছে, আগে তাই বলো না!'

'সার্কিট হাউসে কারা এসে কাল এক বাবুকে গুলি করেছে।'

রত্নেশদা চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? সার্কিট হাউসে? কে গুলি করেছে? কাকে করেছে? কেউ মারা গেছে?'

বেয়ারাটি অত খবর জানে না। সে সব শুনেছে অন্য লোকের মুখে। একদল ডাকাত নাকি এসেছিল, একজন না দুজন মরে গেছে। ডাকাতরা অনেক কিছু নিয়ে গেছে।

ব্রেকফাস্ট না খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম তক্ষুনি। ছোড়দি আর মিংমাকে রেখে যাওয়া হল।

সার্কিট হাউসের সামনে তখনও কুড়ি-পঁচিশ জন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমরা পৌঁছে বুঝলুম, আমাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। একটুর জন্য দেখা হল না।

কাল রাত্রে কেউ এসে গুলি ছুঁড়েছে ঠিকই। কেন ছুঁড়েছে বা কে ছুঁড়েছে তা বোঝা যায়নি। গুলির শব্দ শুনে সার্কিট হাউসের অন্য বাসিন্দারা উঠে এসে দেখে যে, বারান্দায় একজন লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখনও মরেনি, অজ্ঞান। এখানকার হেল্‌থ সেণ্টারে একজন মাত্র ডাক্তার, তিনি আবার কাল বিকেলেই চলে গেছেন জব্বলপুরে। তখন অন্যরা কোনও রকমে আহত লোকটিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। গুলি লেগেছে উরুতে। আজ সকালে এই পাঁচ মিনিট আগে লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল শহরের হাসপাতালে। সঙ্গে

সার্কিট হাউস থেকেও দুজন গেছেন।

একটু খোঁজ করতেই জানা গেল, আহত লোকটির নাম বিজয় শাকসেনা।

॥ চার ॥

পাঁচমারিতে আমাদের থাকার কথা ছিল চার-পাঁচ দিন। কিন্তু আমরা ফিরে এলুম দু' দিনের মধ্যেই। এত ভাল জায়গা, তবু আমাদের মন টিকছিল না। সেই গুলি চলবার পর টুরিস্টরা অনেকেই ফিরে গেল। জায়গাটা এমনিতেই ফাঁকা, এখন যেন একেবারে শুন্‌শান। আমরা অবশ্য সেজন্য কিংবা ভয় পেয়ে ফিরিনি। ফিরতে হল ছোড়দির জন্য। ছোড়দির সর্দিটা খুব বেড়ে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ফিরে এসেই রত্নেশদা খবর নিল। বিজয় শাকসেনা এখানকার কোনও হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। অফিসেও কোনও খবর আসেনি।

আর ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা এখনও নিরুদ্দেশ। অবশ্য তাঁর মৃতদেহের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

রত্নেশদা বলল, 'ভূপাল অনেক দূর। পাঁচমারি থেকে কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে নিশ্চয়ই। অফিস থেকে তার খোঁজে চারদিকে খবর পাঠানো হয়েছে।'

এর পর আরও তিনদিন কেটে গেল, এর মধ্যে আর নতুন কোনও খবর নেই। আমি এখানে এসেই কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, তার কোনও জবাব পাইনি। কিন্তু মা'র কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে, মা লিখেছেন তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে যেতে। কাকাবাবুর আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হল কি না তা জানা গেল না।

এর মধ্যে একদিন ধীরেনদা এসে বললেন, 'চলো সন্তুবাবু, এবারে তোমাদের একদিন ভীমবেঠ্‌কা দেখিয়ে নিয়ে আসি ! সাঁচিও তো দেখোনি ! চলো, চলো, কালকেই ভীমবেঠ্‌কা ঘুরে আসি। তারপর একদিন সাঁচি দেখে নিও।'

দীপু বলল, 'বাবা, আমরা বেশ খাবার-দাবার নিয়ে যাব। ভীমবেঠ্‌কায় পিকনিক করা যাবে।'

আমি দীপুকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি ভীমবেঠ্‌কায় গেছ ?'

দীপু বলল, 'হ্যাঁ, দু'বার !'

'কী আছে সেখানে ?'

দীপু কিছু বলার আগেই ধীরেনদা বললেন, 'এখন বলিস না রে, দীপু ! ওটা সারপ্রাইজ থাক !'

রত্নেশদা আর নিপুদার অসুখ, ওরা যেতে পারবে না।

ছোড়দিরও সর্দি। সুতরাং রিনাদি আর ধীরেনদা, দীপু আর আলো, আমি আর মিংমা, এই ক'জন গেলুম পরদিন। বেরিয়ে পড়লুম সকাল দশটার

মধ্যে।

প্রথমে পাঁচমারির দিকেই খানিকটা যাবার পর এক জায়গায় আমরা বেঁকে গেলুম ডান দিকে। তারপর রাস্তাটা ক্রমশ একটু-একটু উঁচুতে উঠতে লাগল। অথচ সামনের দিকে ঠিক যে কোনও পাহাড় আছে, তা বোঝা যায় না। আরও খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ল, রাস্তার এক পাশে রয়েছে অনেক বড়-বড় পাথরের চাঁই। কিছুক্ষণ চলার পর ধীরেনদা একটা গাছের তলায় গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'এই হল ভীমবেঠ্‌কা!'

আমি ধীরেনদা আর রিনাদির মুখের দিকে তাকালুম। সারপ্রাইজ দেবার নাম করে কি আমাকে ঠকাতে নিয়ে এলেন এখানে? এ আবার কী জায়গা? একটা টিলার ওপরে কতকগুলো দোতলা-তিনতলার সমান পাথর পড়ে আছে। জায়গাটা সুন্দর নয়, তা বলছি না, বেশ নিরিবিলি, পিকনিক করার পক্ষে ভালই। কিন্তু যে-কোনও পাহাড়ি জায়গাতেই তো একরকম দেখা যায়। দূরে কোথাও যাবার সময় রাস্তার ধারে এরকম কত জায়গা চোখে পড়ে। আমি হিমালয়ের কত চূড়া দেখেছি, এভারেস্টের কাছাকাছি থেকে এসেছি, আমাকে ধীরেনদা এই কয়েকটা পাথর দেখিয়ে অবাক করতে চান?

ধীরেনদা বললেন, 'ভীমবেঠ্‌কার আসল নাম কী জানো? ভীমবৈঠ্‌ক। মহাভারতের ভীম নাকি এখানে বসে আড্ডা দিতেন। বোধহয় হিড়িম্বার সঙ্গে!'

পেল্লায় আকারের পাথরের চাঁইগুলোর চেহারায় খানিকটা ভীম-ভীম ভাব আছে বটে। কিন্তু এরকম গল্পও তো আগে অনেক জায়গায় গিয়ে শুনেছি।

ধীরেনদা আবার বললেন, 'এখন জায়গাটা অবশ্য ভীমের জন্য বিখ্যাত নয়। শোনো, সন্তু, এরকম জায়গা কিন্তু সারা পৃথিবীতেই খুব কম আছে। তোমার কাকাবাবু এলে এ জায়গাটা খুবই পছন্দ করতেন।'

সারা পৃথিবীতে খুব কম আছে? ধীরেনদা এখনও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন? এরকম ছোট পাহাড়ি জায়গা আমি নিজেই অন্তত একশোটা দেখেছি! রিনাদি আর দীপুরা মিটিমিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

ধীরেনদা বললেন, 'বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, মনে হয় খুব সাধারণ জায়গা, তাই না? সেটাই এর মজা। একটু ভেতরে ঢুকলেই বুঝতে পারবে আসল ব্যাপার। চলো!'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, সামনের দিকে একটা বড় পাথরের গায়ে একটি আশ্রম। সেখানে দু' তিনজন এমনি লোক, একজন সাধু, একটা গোরু আর একটা কুকুর রয়েছে, আর এই দিনের বেলাতেও ধুনির আগুন জ্বলছে। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন কোনও পাহাড় নেই, যার চূড়ায় কোনও মন্দির বা সাধুর আশ্রম নেই।

ধীরেনদা চুপি-চুপি বললেন, 'যখনই এই সাধুর আশ্রমটা দেখি, তখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বুঝলে, একটা বেশ বড় গুহার মুখটি জুড়ে ঐ

আশ্রম। ঐ গুহার মধ্যে যে কী অমূল্য সম্পদ ঐ সাধুবাবাটি নষ্ট করছেন, তা উনি নিজেই জানেন না ! চলো, আমরা ডান দিকে যাব।'

বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে এক-একটা আলাদা পাহাড় বলেও মনে করা যায়, আর সেগুলোর মাঝখান দিয়ে বেশ গলির মতন যাতায়াতের জায়গাও রয়েছে। একটা সেইরকম পাথরের সামনে এসে ধীরেনদা থামলেন। এই পাথরটার গড়নটা একটু অদ্ভুত। মাঝখান থেকে অনেকটা যেন কেউ কেটে নিয়ে একটা বারান্দার মতন বানিয়েছে। মাথার ওপর ছাউনি-দেয়া বারান্দা, ভেতরে গিয়ে বসাও যায়। কেউ বানায়নি অবশ্য, এমনিই পাথরটা ঐ রকম।

ধীরেনদা বললেন, 'ধরো, এখন যদি খুব বৃষ্টি নামে, তাহলে আমরা সবাই মিলে এখানে আশ্রয় নিতে পারি, তাই তো ? এক লক্ষ বছর আগেও আমাদেরই মতন কোনও মানুষ ঐ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।'

'এক লক্ষ বছর আগে ?'

'প্রমাণ চাও ? ঐ দ্যাখো !'

ধীরেনদা আঙুল দিয়ে পাথরের দেয়ালে একটা জায়গায় কী যেন দেখাতে চাইলেন। প্রথমে আমার চোখেই পড়ল না। তারপর দেখলুম দেয়ালের গায়ে একটা হাতির ছবি। ছ' সাত বছরের বাচ্চারা যে-রকম আঁকে। অনেকটা এই ছবির মতন।

ধীরেনদা বললেন, 'এই ছবিটা অন্তত পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছরের আগেকার আঁকা।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনি আমাকে বড্ড বেশি ছেলেমানুষ ভাবছেন ! আমি জানি, ঐ ছবিটা আপনি নিজেই আগে একদিন এসে এঁকে রেখে গেছেন !'

ধীরেনদা, রিনাদি সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

রিনাদি বললেন, 'আগেরবার সমরেশদা এসেও প্রথমে এই কথা বলেছিলেন না ?'

ধীরেনদা বললেন, 'এই রকম জায়গাকে বলে রক শেলটার। সত্যিই আদিমকালের মানুষরা এখানে ছিল। এরকম একটা নয়, অন্তত একশো কুড়ি-তিরিশটা রক শেলটার আছে এই জায়গায়। চলো তোমায় দেখাব, আদিম মানুষের আঁকা এরকম হাজার-হাজার ছবি আছে। একসঙ্গে এত রক শেলটার, বললুম না, সারা পৃথিবীতে এরকম জায়গা খুব কম আছে !'

'কিন্তু এই ছবিটা যে অত পুরনো, তা বুঝব কী করে ?'

'বড়-বড় ঐতিহাসিকরা এইসব ছবি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। রেডিও কার্বন টেস্টে যে-কোনও জিনিসের বয়েস বার করা যায়। দীপু, তুই যা তো, সন্তুকে এবার বোর্ডটা পড়িয়ে নিয়ে আয়। আগে ইচ্ছে করে তোমায় ওটা দেখাইনি।'

দীপু আমাকে আবার নিয়ে এল রাস্তার ধারে। সেখানে একটা বড় নীল

রঙের বোর্ড রয়েছে, তাতে সাদা অক্ষরে অনেক কথা লেখা। আমাদের দেশে সব ঐতিহাসিক জায়গাতেই পুরাতত্ত্ববিভাগ এরকম বোর্ড লাগিয়ে রাখে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, ধীরেনদা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না। সেই বোর্ডে লেখা আছে যে, ১৯৫৮ সালে ভি এস ওয়াকানকার নামে একজন ঐতিহাসিক এই জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। বেশিদিন আগের তো কথা নয়। তার আগে এই জায়গাটার কথা কেউ জানতই না? বোর্ডে আরও লিখেছে যে, এত বেশি প্রাগৈতিহাসিক ছবি ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। এখানে প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক থেকে (অর্থাৎ ১০০,০০০ বছর আগে) প্রস্তর যুগের শেষ পর্যন্ত (১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগে) একটানা মনুষ্য-বসবাসের চিহ্ন আছে তাদের তৈরি পাথরের কুঠার আর অন্যান্য জিনিসপত্তরও (মাইক্রোলিথিক টুলস) পাওয়া গেছে। আরও কী সব মেসোলিথিক, চালকোলিথিক যুগের কথা লেখা, তার মানে আমি বুঝতে পারলুম না, কাকাবাবু থাকলে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

এখানকার এইসব গুহাতে সম্রাট অশোক কিংবা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্তও মানুষ ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর এই জায়গাটার কথা সবাই ভুলে যায়। এখন আবার এক সাধুবাবাজি একটা গুহায় থাকছেন। সুতরাং এখনও এখানে সেই আদিম মানুষদের বংশধর রয়ে গেছে, তা বলা যায়!

বোর্ডটা পড়বার পর খানিকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে রইলুম। এক লক্ষ বছর! আমি যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এইখানে এক লক্ষ বছর আগে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে? লোহার মতন শক্ত তাদের শরীর, হাতে পাথরের হাতুড়ি, তারা দাঁতালো হাতি আর অতিকায় বাঘ-ভাল্লুক-গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই করেছে।

দীপু বলল, 'এমন-এমন সব গুহা আছে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মনে হবে সব তৈরি করা। কিন্তু কোনওটাই তৈরি করা নয়। চলো, আগে তোমায় থিয়েটার হলটা দেখাই।'

গিয়ে দেখলুম, ধীরেনদারা সেখানেই বসে আছেন। সত্যিই জায়গাটা ছোট-খাটো একটা থিয়েটার হলের মতন। বেশ চওড়া, চৌকামতন জায়গা, ওপরটা ঢাকা, একদিকে বেদীর মতন। দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, কোনও মানুষ এটা তৈরি করেনি, প্রাকৃতির হাতে গড়া।

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেরা থিয়েটার করতে জানত কি না তা অবশ্য আমরা জানি না। কিন্তু অনেকে নিশ্চয়ই এখানে ঘুমোত। কী চমৎকার জায়গা বলো তো, বাইরে যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক, গায়ে লাগবে না! বাইরের দিকটায় নিশ্চয়ই কয়েকজন সারা রাত জেগে পাহারা দিত, যাতে হিংস্র কোনও জন্তু এসে ঢুকে না পড়ে। আমার ইচ্ছে করে, বাড়িঘর ছেড়ে আমিও এরকম

জায়গায় থাকি !'

রিনাদি বললেন, 'থাকলেই পারো। বেশ চাকরি-বাকরি করতে হবে না, কোনও চিন্তা থাকবে না।'

আলো বলল, 'বেশ পড়াশুনোও করতে হবে না ! ইস্কুলে যেতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু খাব কী ? সেই সময়কার লোকেরা হরিণ, শুয়োর, খরগোশ এই সব মেরে খেত। এখন তো আর সেসব পাওয়া যায় না। এখনকার দিনে গুহায় থাকতে হলে সাধু সাজতে হয়।'

দীপু বলল, "বাবা, এখনও এখানে হরিণ আছে। আমি আগের বার এসে নীচের দিকের গুহাগুলোর কাছে হরিণের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। টাট্‌কা।'

রিনাদি বললেন, 'হরিণ না ছাই ! নিশ্চয়ই ছাগলের পায়ের ছাপ। নীচের গ্রাম থেকে এখানে রাখালরা গোরু-ছাগল চরাতে আসে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার দেয়ালের গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। সেইজন্যই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এখানেও ছবি আছে। চলো, অন্য গুহায় যাই, পরিষ্কার ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।'

এর পরের গুহাটা আবার অন্যরকম। সামনের দিকটা ছোট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়, কিন্তু ভেতরটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। ধীরেনদা টর্চ জ্বেলে বললেন, 'এই দ্যাখো।'

এবার দেখলুম, মাথার ওপরের পাথরে এক সারি মানুষ আঁকা। এই রকম :

ছবিগুলির রং গেরুয়া ধরনের। ঐ রঙের কোনও পাথর ঘষে ঘষে আঁকা।

রিনাদি বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, সব ছবি এক রকম নয়।...এরই মধ্যে দু' একজন যেন নাচছে মনে হচ্ছে, তাই না ? ওরা নিশ্চয়ই নাচতেও জানত।'

দীপু বলল, 'নাচতে তো সবাই জানে, মা ! ধেই-ধেই করে লাফালেই নাচ হয়।'

আলো মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, ওরা এরকম বাচ্চাদের মতন ছবি আঁকত কেন ?'

রিনাদি বললেন, 'এক লক্ষ বছর আগেকার মানুষ। তারা তো মনের দিক থেকে বাচ্চাই ছিল। ছবি আঁকার কথা যে চিন্তা করেছে, এটাই যথেষ্ট নয় ?'

ধীরেনদা বললেন, 'আমরা প্রথমবার যেবার এসেছিলাম, সে-কথা মনে আছে, রিনা ? কী ভয় পেয়েছিলুম ! এই গুহাটাতেই তো, না ?'

রিনাদি বললেন, 'হ্যাঁ, এটাতেই। সেবার কী হয়েছিল জানো, সন্তু ? সেবার দীপু আর আলো আসেনি। আমি আর তোমাদের ধীরেনদা গুঁড়ি মেরে এই গুহাটাতে ঢুকে টর্চ জ্বেলেছি, দেখি যে এক কোণে একটা মানুষ বসে। আমি তো ভয় পেয়ে এমন চিৎকার করে উঠেছিলুম।'

ধীরেনদা হাসতে-হাসতে বললেন, 'শুধু চিৎকার ! তুমি এমন লাফিয়ে উঠলে

যে, ছাদে তোমার মাথা ঠুকে গেল।'

রিনাদি বললেন, 'আহা, তুমি ভয় পাওনি ?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও একটু-একটু ভয় পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু চ্যাঁচাইনি। তারপর সেই মানুষটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। সে কে জানো ? ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা ! উনি এই সব ছবির ফটোগ্রাফ তুলছিলেন, সেই সময় ওঁর ক্যামেরার ফ্লাশটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

রিনাদি বললেন, 'ডক্টর শাকসেনা তো এখানে বোধহয় প্রত্যেকদিন আসতেন। আমরা যতবার এসেছি, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ডক্টর শাকসেনাকে পাওয়া যাচ্ছে না···উনি এরকম কোনও গুহার মধ্যে লুকিয়ে নেই তো ?'

ধীরেনদা বললেন, 'ওঁর এখানকার সব ছবি তোলা হয়ে গেছে। চলো, এখান থেকে বাইরে যাই।'

এরপর কয়েকটা গুহায় আমরা ঐরকম একই ছবি দেখলুম। তারপরের একটা গুহায় দেখা গেল হরিণের ছবি।

ধীরেনদা বললেন, 'জানো তো, ঐতিহাসিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, একই দেয়ালে এক যুগের মানুষের আঁকা ছবির ওপর অন্য যুগের মানুষরা ছবি এঁকেছে। খুব বড় ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আনলে বোঝা যায়। চলো, পাশের গুহাটায় চলো, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি।'

সেই গুহাটা অনেকটা খোলামেলা। খানিকটা উঁচুতেও বটে। মুখটা প্রকাণ্ড, ভেতরটা সরু। একটা ডিমের আধখানা খোলার মতন। পাশের একটা পাথরের ওপর উঠে সেটাতে ঢোকা যায়। সেই গুহার ছাদে আঁকা একসার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ একেবারে আলাদা। সেই মানুষটা একটা ঘোড়ায় চড়ে বর্শার মতন একটা জিনিস দিয়ে একটা হরিণকে মারছে।

ধীরেনদা বললেন, 'এটাকে দেখছ ? এই ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ কিন্তু অনেক পরের যুগে আঁকা। মানুষ বেশিদিন ঘোড়ায় চাপতে শেখেনি। এমন কী, রামায়ণ-মহাভারতের সময়েও ছিল না।'

দীপু আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে বললুম, 'রামায়ণ-মহাভারতে ঘোড়া নেই ?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। ঘোড়ায় রথ টেনেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে কেউ চেপেছে কি ? রাম-লক্ষ্মণ কিংবা অর্জুনের মতন বীর কখনও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছে ? তা কিন্তু করেনি !'

'মহাভারতের যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না ?'

'ছিল কি না তা জানি না। কিন্তু সেরকম যুদ্ধের কোনও বর্ণনা নেই। হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে, শল্য এসেছিলেন হাতিতে চেপে, কিন্তু ঘোড়ায় চেপে কে এসেছিলেন বলো ?'

রিনাদি হেসে বললেন, 'তোমাদের ধীরেনদা আগে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, এখন হয়ে উঠছেন ইতিহাসের পণ্ডিত !'

ধীরেনদা রিনাদির ঠাট্টাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আরও একটা ব্যাপার কী জানো ! এই সব ছবির মধ্যে কিছু-কিছু আছে একদম ভেজাল। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই তো এর কোনও মূল্য বোঝে না। সাহেবদের দেশে এরকম এতকালের পুরনো কোনও ব্যাপার পাওয়া গেলে কত যত্ন করে ঘিরে-টিরে রাখত, পাহারাদার থাকত। কিন্তু এখানে যে-যখন খুশি আসতে পারে, ইচ্ছে মতন এসব ছবি নষ্টও করতে পারে। ভাগ্যিস বেশি লোক এই জায়গাটার খোঁজ রাখে না। তবু কিছু লোক এখানে কোনও কোনও গুহার ছবির পাশে ইয়ার্কি করে নিজেরা ছবি এঁকে গেছে। সেগুলো অবশ্য দেখলেই চেনা যায়।'

রিনাদি বললেন, 'যাই বলো বাপু, জায়গাটা বড্ড নির্জন। আমার তো বেশিক্ষণ থাকলে গা ছম্‌ছম্‌ করে। এখানে যদি কেউ কোনও মানুষকে খুন করে রেখে যায়, অনেক দিনের মধ্যে তা কেউ টেরও পাবে না।'

দীপু বলল, 'মনোমোহন ঝাঁর চাকরকে জিভ-কাটা অবস্থায় এখানেই কোথায় পাওয়া গিয়েছিল না ?'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, এই পাহাড়ের নীচে। দু'দিন ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। তারপর এখানকার সাধুজি ওকে দেখতে পেয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা গাড়ি থামিয়ে খবর দেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সেই লোকটি বেঁচে আছে ?'

'হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে। লোকটি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। হয়তো মনোমোহন ঝাঁ'র খুনিকেও ও দেখেছে। মুখ দিয়ে শব্দ করে ও কিছু বলতে চায়, কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা নেই। ও লেখাপড়াও জানে না ! তা হলে লিখে বোঝাতে পারত।'

আর দু' তিনটে গুহা ঘোরার পর রিনাদি বললেন, 'আমি বাপু আর পারছি না। আমরা ওপরে বসি। এবার দীপু দেখিয়ে আনুক সন্তুকে।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই যাক। অবশ্য একশো তিরিশটা গুহার সব ওরা দেখতে পারবে না একদিনে। যতগুলো ইচ্ছে হয় দেখে আসুক।'

গুহাগুলো ক্রমশই নেমে গেছে পাহাড়ের নীচের দিকে। মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম একটার-পর-একটা গুহা।

ছবি অবশ্য বেশির ভাগ গুহাতেই এক রকম। মানুষের ছবিই বেশি। একটাতে দেখতে পেলুম কয়েকটা রথের মতন জিনিসের ছবি।

মিংমা সব সময় আমাদের পেছন-পেছনে ছায়ার মতন আসছে। এখানকার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারেনি, আমি যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

এক-একটা গুহার মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে ছোট-ছোট ছবি খুঁজে বার করার ব্যাপারে ও নিজেই বেশ মজা পেয়েছে। যেগুলো আমরা দেখতে পাই না সেগুলো ও দেখায়।

একটা গুহা বিরাট বড়। এটাকে ঠিক গুহা হয়তো বলা যায় না, নীচে বেশ সিমেন্টের মেঝের মতন মসৃণ পাথর আর তার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথর যেন ঝুলছে। অবশ্য সেই পাথরটা পড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, হয়তো ঐ অবস্থাতেই রয়েছে কয়েক লক্ষ বছর। মাঝখানের জায়গাটিতে অন্তত পঞ্চাশ যাশ জন লোক শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এত বড় একটা গুহাতে কিন্তু আমরা কোনও ছবি খুঁজে পেলুম না। এক-এক জায়গায় মনে হল যেন ছবি আঁকা ছিল, কেউ ঘষে-ঘষে মুছে দিয়েছে।

আমরা মন দিয়ে সেই গুহার মধ্যে ছবি খুঁজছি, এমন সময় হঠাৎ এমন বিকট একটা আওয়াজ হল যে, দীপু আর আমি দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলুম। আমরা ভয় পাওয়ার চেয়েও চমকে গেছি বেশি। কোনও মানুষ না জন্তু ঐ আওয়াজ করল, তা বুঝতে পারলুম না।

তক্ষুনি আবার সেই আওয়াজটা হল। এবার বুঝলাম, কোনও জন্তু এরকম শব্দ করতে পারে না। মানুষেরই মতন গলা, যেন কেউ কোনও হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে শব্দ করছে হী-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ ! এমনই ভয়ঙ্কর সেই শব্দ যে শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে।

গুহাটার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, আমরা দাঁড়িয়েছিলুম ঘাড় বেঁকিয়ে। সেই অবস্থাতেই মিংমা শাঁ করে ছুটে গেল বাইরে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিংমার গলার একটা কাতর আওয়াজ পাওয়া গেল, আঃ !

এবার আমি আর দীপুও বাইরে চলে এলুম। এসে যা 'দেখলুম, তা ভাবলে এখনও যেন গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

মিংমা গুহার বাইরে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষই বটে ! সারা মুখ দাঁড়ি-গোঁফে ঢাকা, মাথায় জট-পাকানো চুল, গা-ভর্তি বড় বড় লোম আর দৈত্যের মতন চেহারা। একটা পুরো কলাপাতা তার কোমরে জড়ানো, সেইটাই তার পোশাক, হাতে একটা পাথরের মুগুর। ঠিক ছবিতে দেখা গুহামানব যেন একটি।

লোকটি আগুনের ঢেলার মতন চোখে কট্‌মট্‌ করে তাকাল আমাদের দিকে। ঠিক যেন বলতে চায় ; আমার গুহায় তোমরা ঢুকেছ কেন ?

ঐ পাথরের হাতুড়ি দিয়ে মারলে আমার আর দীপুর মাথা তক্ষুনি ছাতু হয়ে যেত। কিন্তু কোনও কারণে আমাদের ওপর দয়া করে মারল না, চট করে সরে গেল পাথরের আড়ালে।

দীপু আর আমি পাথরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলুম। একটুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলুম না। সত্যিই এক লক্ষ বছরের কোনও গুহামানবের বংশধর

এখনও এখানে রয়ে গেছে ?

মিংমা আবার 'আঃ' শব্দ করতেই আমাদের দু'জনের বিস্ময়ের ঘোর ভাঙল। দু'জনে কোনও আলোচনা না-করেই মিংমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে ছুট লাগালুম। বারবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, সেই মানুষটা তাড়া করে আসছে কি না !

মিংমার বাঁ কানের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুগুরের আঘাতটা ওর মাথায় লাগেনি, লেগেছে ঘাড়ে। তাতে ও একটুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই জ্ঞান ফেরায় ও বলল, 'ছোড় দোও, আভি ছোড় দোও !'

বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে আমরা মিংমাকে শুইয়ে দিলুম এক জায়গায়। মিংমা উঠে বসে হাত দিয়ে কানের রক্ত মুছল, মাথাটা ঝাঁকাল। দু' তিনবার। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করল। একটা বড় পাথর টপ্ করে তুলে নিয়ে ও তরতর করে ছুটে গেল সেই গুহাটির দিকে। আমাদের বাধা দেবার কোনও সুযোগই দিল না। মিংমা পাহাড়ি জায়গার মানুষ, কেউ আঘাত করলে ওরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ে না।

দীপুকে বললুম, 'চলো, আমরাও যাই।'

দীপু আর আমিও তুলে নিলুম দুটো পাথর। তারপর অনুসরণ করলুম মিংমাকে। সেই বড় গুহাটার বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে দেখা হল ভাল করে। সেখানে ঐ লোকটা ঢোকেনি। মিংমা এদিক-ওদিকেও খানিকটা খুঁজে এসে বলল, 'ভাগ গয়া !'

এখানে কেউ যদি লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। একটা এইরকম ছোট পাহাড়ে এতগুলো গুহা, বোধহয় আর কোথাও নেই।

দীপু বলল, 'চলো, ওপরে গিয়ে বাবাকে বলি !'

ওপরে উঠতে-উঠতে আমি ভাবতে লাগলুম, ব্যাপারটা কী হল ? আজকের দিনে কোনও আদিম গুহামানব কি টিকে থাকতে পারে ? তাও ভূপাল শহরের এত কাছে ? না, অসম্ভব ! এ-কথা শুনলে যে-কেউ হাসবে। তা হলে কেউ আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। কেন ? কেউ কি চায় যে, আমরা আর ঐ গুহাগুলোর মধ্যে না ঢুকি ? একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম মানুষদের আঁকা ছবি দেখব, এতে কার কী আপত্তি থাকতে পারে ? এই পাহাড়টা নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি।

হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হল, যাকে একটু আগে দেখলুম, মাথায় চুলের জটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল···ও-রকম চেহারা তো কোনও সাধুরও হতে পারে। ওপরে একটা গুহায় একজন সাধুবাবা যে মন্দির বানিয়েছেন, তিনিই আমাদের ভয় দেখাতে আসেননি তো ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই ! সাধুবাবা চান যাতে এখানে বাইরের লোকজন না আসে।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। দীপু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে যখন ধীরেনদাকে সব ঘটনাটা বলল, তখন ধীরেনদা হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'দীপু যখন-তখন গল্প বানায়, ভাবে যে আমরা বিশ্বাস করব।'

রিনাদি বললেন, 'তুই মোটেই লেখক হতে পারবি না দীপু, তোর গল্পগুলো বড্ড গাঁজাখুরি হয়। যা, যথেষ্ট হয়েছে, গাড়ি থেকে টিফিন কেরিয়ারগুলো নিয়ে আয়, এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

দীপু বলল, 'তোমরা বিশ্বাস করলে না? সন্তুকে জিজ্ঞেস করো! আর ঐ দ্যাখো মিংমার কানের পাশ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!'

রিনাদি বললেন, 'সন্তু আর কী বলবে, ওকে তো আগে থেকেই শিখিয়ে এনেছিস। মিংমা নিশ্চয়ই আছাড়-টাছাড় খেয়ে পড়েছে কোথাও!'

ধীরেনদা বললেন, 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরিতে গুহামানব, অ্যাঁ? দু' একটা থাকলে মন্দ হত না! কেয়া হুয়া মিংমা? আছাড় খাকে গির্ গিয়া, তাই না?'

মিংমা বলল, 'একঠো আদমি, বহুত তাগড়া জোয়ান পাঠ্যে, হাঁতে পাথরের লাঠি, খুব জোরসে হামায় মারল!'

ধীরেনদার ধারণা হল, মিংমা বোধহয় মিথ্যে কথা বলছে না। তিনি একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'সত্যিই মেরেছে? তাহলে কোনও পাগল-টাগল হবে বোধহয়!'

রিনাদি বললেন, 'দেখি, কতটা লেগেছে?'

পরীক্ষা করে দেখা গেল, মিংমার শার্টের নীচে কাঁধেও খানিকটা থেঁতলে গেছে। বেশ জোরেই আঘাত করেছে, মিংমার আরও বেশি ক্ষতি হত, যদি মাথায় লাগত।

ধীরেনদা বললেন, 'চলো তো, সাধুবাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোনও পাগল টাগল ঘুরে বেড়ায় কিনা। উনি নিশ্চয়ই জানবেন।'

আমিও তাই চাই। সাধুবাবাকে একবার দেখা দরকার। আমি বললুম, 'চলুন ধীরেনদা, সাধুবাবার কাছে চলুন।'

গুহাগুলোর পাশ দিয়ে যে গলি-গলি মতন রয়েছে, ধীরেনদা সেই পথ খুব ভাল চেনেন। বেশ শর্টকাটে উনি আমাদের চট্ করে নিয়ে এলেন সাধুবাবার আশ্রমের কাছে।

সেখানে জ্বলন্ত ধুনির পাশে একটা খাটিয়ায় একজন মানুষ আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আশ্রমের দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে সেই চেহারা দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। পেছন থেকে কাঁধের ভঙ্গিটাই যে খুব চেনা মনে হচ্ছে। আমরা একটু কাছে যেতেই আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সেই মানুষটি মুখ ফেরাল আমাদের দিকে।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'কাকাবাবু!'

॥ পাঁচ ॥

ধীরেনদা, রিনাদিরাও কাকাবাবুকে দেখে যেমন চমকে উঠলেন, তেমনই খুশি হলেন।

মিংমাও 'আংক্‌ল সাব' বলে লম্বা একটা সেলাম দিল।

কাকাবাবু অবশ্য আমাদের দেখে একটুও অবাক হলেন না। বরং তাঁর মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিংমা, তুম্‌হারা কান্‌সে খুন গিরতা। কেয়া হুয়া?'

এবার দীপুর বদলে আমিই সবিস্তারে ঘটনাটা জানালুম।

কাকাবাবু এতেও বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মিংমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুছে ফেলো! আর ঐ যে গাঁদাফুলের গাছ দেখছ, ওর কয়েকটা পাতা হাত দিয়ে চিপে সেই রসটা কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও!'

ধীরেনদা বললেন, 'কাকাবাবু, আপনি ভূপালে এসেছেন, সেটা আমাদের বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু...আপনি এ জায়গায় কী করে রাস্তা চিনে এলেন? আপনি ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে জানতেন?'

কাকাবাবু কোনও উত্তর দেবার আগেই আশ্রমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক সাধু। গেরুয়া কাপড় পরা, রোগা লম্বা চেহারা, থুতনিতে একটু-একটু দাড়ি, মাথায় চুলও কম।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্তে, সাধুজি! আচ্ছা হ্যায় তো?

সাধুজি চোখ কুঁচকে কাকাবাবুকে ভাল করে দেখে তারপর বললেন, 'কওন? আরে, ইয়ে তো রায়চৌধুরীবাবু! রাম, রাম! ভগবান আপ্‌কা ভালা করে!'

বুঝলুম, কাকাবাবু যে শুধু ভীমবেঠ্‌কার কথা আগে থেকে শুনেছেন তাই নয়। তিনি এখানকার সাধুজিকেও চেনেন!

আরও দু' একটা কথা বলার পর কাকাবাবু সাধুজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, সাধুজি, আপনার এখানে কোনও পাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায়? এরা একজনকে দেখেছে বলল—'

সাধুজি হিন্দিতে বললেন, 'হাঁ, পাগল তো এক আমিই আছি। আর কোন্ পাগল এখানে থাকবে?'

একটু থেমে সাধুজি আবার বললেন, 'তবে কী জানেন, রায়চৌধুরীবাবু, রাত্তিরের দিকে কারা যেন এখানে আসে! আমি শব্দ পাই। আগে, জানেন তো, ভূত-প্রেতের ভয়ে সাঁঝের পর এখানে মানুষজন আসত না। কাছাকাছি গাঁয়ের লোক তো এ-জায়গার নাম শুনলেই ভয় পায়। আমি ভূতপ্রেত মানি না। আমি জানি ওসব কিছু নেই। কিন্তু এখন রাত্তিরে কারা আসে তা আমি জানি না!'

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম।'

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ্ বগলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'সাধুজি, আমি একটু পরে ঘুরে আসছি। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'চলো!'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কখন পৌঁছলেন ভূপালে?'

কাকাবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এই, এগারোটার সময়। রুমি বলল, যে, সন্তুরা সবাই ভীমবেঠ্‌কায় গেছে। তাই আমিও একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে এলুম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে খাবার আছে, আসুন আমরা খেয়ে নিই।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো!'

গাড়ি থেকে আমরা টিফিন কেরিয়ারগুলো আর জলের বোতল নামিয়ে নিলুম। তারপর গিয়ে বসলুম একটা বিরাট পাথরের ছায়ায়।

রিনাদি যে কতরকম খাবার এনেছেন তার ঠিক নেই। হ্যাম স্যাণ্ডুইচ, সসেজ, স্যালামি, চিকেন রোস্ট, রাশিয়ান স্যালাড, আরও কত কী!

খাওয়া শুরু করার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু আপনি হঠাৎ ভূপালে এলেন কেন? তখন না বলেছিলেন...'

কাকাবাবু বললেন, 'আসতে হল বাধ্য হয়ে। ঐ যে নিপু, ও একটা গাধা! কলকাতায় গিয়ে বারবার বলছিল, ভূপালে তিনটে খুন হয়েছে! খুনি ধরা কি আমার কাজ? কিন্তু নিপু একবারও বলেনি, যে তিনজন খুন হয়েছেন, তাঁরা তিনজনই পরস্পরকে চিনতেন, তিনজনেই গবেষণা করতেন ইতিহাস নিয়ে।'

ধীরেনদা বললেন, 'হ্যাঁ, অর্জুন শ্রীবাস্তবকে সব সময় ইতিহাসের বই-ই পড়তে দেখেছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী, মনোমোহন ঝাঁ—এঁরা তিনজনেই ইতিহাসের নাম-করা পণ্ডিত। সুন্দরলাল বাজপেয়ীর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল, একবার ভূপালে এসে আমি সুন্দরলালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম।'

রিনাদি বললেন, 'তা হলে তো ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাও...'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঐতিহাসিক হিসেবে ওঁর ভারতজোড়া নাম। চিরঞ্জীব আমার বিশেষ বন্ধু। একবার আফগানিস্তানে আমরা দু'জনে একসঙ্গে এক্সকাভেশানে গিয়েছিলাম। সেবারেই একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন শুনেই আপনি ভূপালে এসেছেন তা হলে?'

কাকাবাবু বললেন, 'অর্জুন শ্রীবাস্তব, সুন্দরলাল বাজপেয়ী আর মনোমোহন

ঝাঁ-র মৃত্যুর খবর কলকাতার কাগজে বেরোয়নি। নিপু যদি এঁদের নাম বলত, তা হলে আমি তখুনি বুঝতে পারতুম। যাই হোক, চিরঞ্জীব শাকসেনার উধাও হয়ে যাবার খবর সব কাগজেই বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে আগের তিনটে খুনের খবর। তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এগুলো সাধারণ খুন নয়। কেউ একজন বেছে-বেছে ঐতিহাসিকদের মারছে কেন ? এর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে। এদের সরিয়ে দেওয়ায় কার কী স্বার্থ থাকতে পারে, সেটাই আগে দেখা দরকার। সেইজন্যই আমি এসেছি।'

ধীরেনদা বললেন, 'আশ্চর্য ! বেছে-বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের মেরে কার কী লাভ ? কেউ কি কোনও ইতিহাস মুছে দিতে চায় ?'

কাকাবাবু বললেন, 'সেই জন্যই রুমির কাছে শোনামাত্র চলে এলুম এখানে। মনে হল, তোমাদের এখানে কোনও বিপদ হতে পারে।'

আমি আর ধীরেনদা দু' জনেই একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'এখানে, কেন !'

কাকাবাবু বললেন, 'ছোটখাটো একটা বিপদ যে ঘটেই গেছে, তা তো দেখাই যাচ্ছে !'

তারপর মিংমার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'মিংমা, তুমি চিন্তা কোরো না। তোমায় যে আঘাত করেছে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। আমার হাত থেকে সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

মিংমা বলল, 'ও আদমি আভিতক্ ইধার উধার হ্যায় !'

কাকাবাবু বললেন, 'রয়নে দেও। ধরা সে পড়বেই !'

রিনাদি বললেন, 'তোমরা কাকাবাবুকে পাঁচমারির ঘটনাটা বলো !'

ধীরেনদা তখন ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার ভাই বিজয় শাকসেনার সঙ্গে পাঁচমারিতে দেখা হয়ে যাওয়া এবং তার পরের ঘটনা জানালেন কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললেন, 'তিনজন খুন হয়েছে, আর একজন নিরুদ্দেশ, প্রত্যেকেই ইতিহাসের পণ্ডিত। এমনও হতে পারে, ইতিহাসের কোনও একটা বিষয় নিয়েই এঁরা চারজন গবেষণা করছিলেন। চিরঞ্জীব শাকসেনা এই ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন গত মাসে। সেইজন্য আমার সন্দেহ হচ্ছে, সমস্ত রহস্য আছে এই ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ের গুহাগুলোর মধ্যেই। খাওয়া শেষ তো, এবার ওঠা যাক, অনেক কাজ বাকি আছে। ধীরেনবাবু, আপনার ওপর দু'একটা দায়িত্ব দেব।'

ধীরেনদা বললেন, 'আমাকে 'বাবু' আর 'আপনি' বলবেন না। শুধু ধীরেন বলুন।'

কাকাবাবু বললেন, 'বেশ তো ধীরেন, তুমি এখন মিংমাকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও, ওর চোটের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দেবে। তারপর ফোলডিং খাট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়, সেরকম দুটো খাটও জোগাড় করা দরকার।

আজ সন্ধের পর থেকে মিংমা আর আমি এখানে থাকব।'

ধীরেনদা অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে থাকবেন ? রাত্তিরবেলা ?'

'হ্যাঁ। আমি আগেও তো এখানে থেকেছি। ১৯৫৮ সালে এই গুহাগুলো আবিষ্কার হবার ঠিক পরের বছরই চিরঞ্জীব আর আমি এখানে এসে দু'রাত্তির ছিলাম। তখন গুহাগুলোর মার্কিং হচ্ছিল।'

আমি বললুম, 'তাহলে তিনটে খাট লাগবে। আমিও থাকব।'

ধীরেনদা রিনাদির দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি যদি বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি সামলাতে পারো, তা হলে আমিও কাকাবাবুর সঙ্গে এখানে থেকে যাই। যদি কাকাবাবুর সঙ্গে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হতে পারি—'

রিনাদি বললেন, 'সে তোমার ইচ্ছে হলে থাকো না ! আমি বাড়িতে ঠিক ম্যানেজ করতে পারব।'

কাকাবাবু বললেন, 'অত লোক থাকলে কোনও লাভ হবে না। ধীরেন তোমাকে শহরে থেকেই কিছু কাজ করতে হবে। সন্তুরও থাকবার দরকার নেই। মিংমা তো থাকছেই আমার সঙ্গে।'

মিংমা বলল, 'নেহি, সন্তু সাব্‌ভি রহেগা। আচ্ছা হোগা !'

কাকাবাবু বললেন, 'তবে তাই হোক। চলো, এখন আমাকেও একবার শহরে যেতে হবে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, কিছু কেনাকাটিও আছে।'

কাকাবাবু যে গাড়িটা এনেছিলেন, সেটা এখনও রয়েছে। মিংমা ধীরেনদাদের গাড়িতে উঠল, আমি রইলুম কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক হল যে, বিকেল পাঁচটার সময় আমরা ধীরেনদার বাড়িতে আবার মীট করব।

গাড়িতে ওঠার সময় কাকাবাবু বললেন, 'ধীরেন, তোমরা একটু সাবধানে থেকো। হঠাৎ কোনও বিপদ হতে পারে। রাত্তিরবেলা বাড়ির দরজা-জানলা সব ভালভাবে বন্ধ করে রাখবে।'

ধীরেনদা হেসে বললেন, 'বারে ! আমরা থাকব নিজেদের বাড়িতে, আর আপনারা থাকবেন পাহাড়ের ওপর খোলা জায়গায়। আপনি আমাদের বলছেন সাবধানে থাকতে ?'

'আমাদের তো অভ্যেস আছে। আমরা আগে থেকে বিপদের গন্ধ পাই। কিন্তু তোমরা যে আজ ভীমবেঠকায় এসেছ, আমার সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছে, এতে তোমাদের ওপর শত্রুপক্ষের নজর পড়তে পারে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কোনও সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর দল এর পেছনে আছে। যারা এইরকম বীভৎসভাবে খুন করতে পারে—'

'আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন ?'

'তার কোনও ঠিক নেই। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।'

'তা হলে আমি কিন্তু একটা রাত অন্তত আপনাদের সঙ্গে এখানে কাটাব।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে। তা হলে বিকেল পাঁচটায় ?'

দুটো গাড়িই ছাড়ল একসঙ্গে। কাকাবাবু কয়েকটা জায়গায় থামলেন। আমাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে উনি যেন কার কার সঙ্গে দেখা করে এলেন। দেখা যাচ্ছে কাকাবাবু ভূপালের অনেককেই চেনেন।

তারপর আর-একটা বাড়ির সামনে এসে বললেন, 'সন্তু এবার তুই চল আমার সঙ্গে।'

সেই বাড়ির গেটের পাশে নেম প্লেটে লেখা ডঃ চিরঞ্জীব শাকসেনার নাম।

বেশ বড় তিনতলা বাড়ি, সামনে-পেছনে অনেকখানি বাগান। বড়-বড় ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে সেই বাগানে। কয়েকটা পাথরের মূর্তিও দেখতে পেলাম। এক জায়গায় একটা বেঞ্চে বসে আছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ।

এত বড় বাড়িটা কিন্তু একদম চুপচাপ। কোনও লোকজনের শব্দ নেই। আমরা গেট ঠেলে ঢুকতেই একজন পুলিশ এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

কাকাবাবু জানালেন, যে তিনি ডক্টর শাকসেনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

পুলিশটি বলল যে, তিনি কারুর সঙ্গেই দেখা করছেন না। খবরের কাগজ থেকে অনেক লোক এসেছিল, সবাই ফিরে গেছে। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা নিরুদ্দেশ হয়েছেন প্রায় আটদিন আগে, এই ক'দিনে তাঁর স্ত্রী একবারও তিনতলা থেকে নীচে নামেননি।

কাকাবাবু নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'এটা ভেতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। উনি আমার সঙ্গে ঠিকই দেখা করবেন।'

একটু বাদেই বাড়ির ভেতর থেকে বুড়োমতন একজন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ডেকে বলল, 'আপলোগ আইয়ে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রীর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং একদম মেমসাহেবের মতন। একটা চওড়া হলুদপাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন। এঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। পরে জানলুম, ইনি গুজরাটের মেয়ে হলেও একটানা আট বছর ছিলেন শান্তিনিকেতনে।

বসবার ঘরে ঢুকেই উনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী, আপনি কবে এসেছেন?'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বসুন, ভাবিজি, বসুন। আজই এসেছি, দাদার খবরটা শুনেই চলে এলুম। ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো!'

ভদ্রমহিলা বেশ শক্ত আছেন, শোকে-দুঃখে ভেঙে পড়েননি। এই আট দিনের মধ্যেও যে চিরঞ্জীব শাকসেনার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি, এক হিসেবে সেটাই ভাল খবর। তার মানে ওঁকে এখনও মেরে ফেলা হয়নি। কোনও এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি বললেন, 'আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না তো আপনাকে কী বলব। উনি আগের দিন বিদেশ থেকে ফিরলেন, খুব ক্লান্ত ছিলেন, ভাল করে

কথাই বলতে পারিনি···পরদিন থেকেই নিখোঁজ। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, কার সঙ্গে গেলেন, কিছুই জানি না।'

'এর মধ্যে অন্য কেউ কোনও চিঠি বা খবর পাঠায়নি?'

'না। এই ছেলেটি কে?'

'ও আমার ভাইপো, ওর নাম সন্তু। আচ্ছা ভাবিজি, একটা কথা মনে করে বলুন তো, অর্জুন শ্রীবাস্তব, মনোমোহন ঝাঁ আর সুন্দরলাল বাজপেয়ী—এঁরা শেষ কবে আপনার বাড়িতে এসেছিলেন? এঁদের আপনি চেনেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ চিনি। এঁরা তো প্রায়ই আসতেন।'

'শেষ কবে এসেছিলেন?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, ভেবে দেখি, হ্যাঁ, উনি বিদেশ যাবার ঠিক আগের সন্ধেবেলাতেই তো এসেছিলেন সবাই। আরও অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ওঁরা ছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত।'

'কী কথা হয়েছিল বলতে পারেন?'

'তা তো জানি না। ওঁরা তো প্রায়ই দরজা বন্ধ করে কী সব আলোচনা করতেন। সেদিন ওঁরা চার-পাঁচজন মিলে খুব চিল্লাচিল্লি করেছিলেন বটে।'

'চার-পাঁচজন? ঠিক ক'জন ছিলেন?'

'তা তো জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে ওরা সবাই তো খুব চায়ের ভক্ত, কয়েকবার করে চা পাঠাতে হয়েছে। প্রত্যেকবার পাঁচ কাপ করে।'

'তার মানে অন্তত পাঁচজন। আমরা চারজনের হিসেব পাচ্ছি, আর একজন কে?'

'তা জানি না। ওরা চারজনই বেশি আলোচনা করতেন, হয়তো সেদিন আরও কেউ একজন ছিলেন। অনেকেই তো আসতেন নানা কাজে।'

'চিরঞ্জীবদাদা বিদেশে থাকার সময় ওঁর যে তিনজন বন্ধু এখানে খুন হয়েছেন, সে-কথা উনি জেনেছিলেন?'

'যেদিন ফিরলেন, সেদিনই আমি বলিনি। ভেবেছিলাম কী, পরে এক সময় বলব। আসার সঙ্গে-সঙ্গেই এমন একটা আঘাত···'

'অন্য কেউ বলে দিতে পারে?'

'আমি বিজয়কেও নিষেধ করে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা। ভাবিজি, বিজয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'সে তো হোসাঙ্গাবাদ হাসপাতালে আছে। পাঁচমারিতে ডাকাতরা তাকে গুলি করেছিল। তবে জখম বেশি হয়নি, দু' চারদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।'

'চিরঞ্জীবদাদার যে একজন খুব বিশ্বাসী লোক ছিল, সব সময় সঙ্গে থাকত, কী নাম যেন···ও হ্যাঁ, ভিখু সিং, সে কোথায়?'

'উনি বিদেশে যাবার সময় যে ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিল। ওর বাড়ি বিলাসপুর। এতদিনে তার ফিরে আসার কথা। কিন্তু সে আসেনি।'

'হুঁ! ঠিক আছে, ভাবিজি, আমরা এবার যাব। বেশি চিন্তা করবেন না। আজ বা কাল যদি দৈবাৎ চিরঞ্জীবদাদা ফিরে আসেন, তবে বলবেন যে, আমি ভীমবেঠ্‌কায় আছি।'

এতক্ষণ বাদে চমকে উঠলেন চিরঞ্জীব শাকসেনার স্ত্রী বীণা দেবী। তিনি বললেন, 'ভীমবেঠ্‌কায়? কেন? আপনি ওখানে থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? ভীমবেঠ্‌কায় তো থাকার জায়গা নেই, রাত্তিরবেলা কোনও বিপদ হতে পারে...মানে, আপনার দু' পা ঠিক নেই...না, না, ও-কাজ করবেন না!'

'ভাবিজি, কিছুদিন ধরে চিরঞ্জীবদাদা ঐ ভীমবেঠ্‌কা নিয়ে খুব চিন্তা করছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওখানে যে ব্রাহ্মী লিপি আছে, তার নাকি পাঠোদ্ধার অনেকখানি করেছেন, এরকম তো শুনছিলাম।'

'অনেকখানি করেছেন? পুরোটা পারেননি?'

'সেই রকমই তো জানি।'

'বুঝলাম। এবার তা হলে আমরা উঠি।'

বীণাদেবী ব্যাকুলভাবে বললেন, 'আপনি রাতে ঐ নিরালা জায়গায় থাকবেন এটা আমার মনে ভাল লাগছে না। দিনকাল ভাল না, কখন কী হয়...।'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার সঙ্গে অন্য আরও লোক থাকবে। তা ছাড়া আমি তো চিরঞ্জীবদাদার মতন ভালমানুষ নই, আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে।'

বীণাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলুম ধীরেনদার বাড়িতে।

মীংমাকে ডাক্তার ইঞ্জেকশান আর ওষুধ দিয়েছেন। একটা ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা খুলে ফেলেছে মিংমা। ও বলেছে, ব্যাণ্ডেজের কোনও দরকার নেই।

সে-কথা শুনে কাকাবাবু বললেন, 'ও ঠিক আছে।'

তিনখানা ফোলডিং-খাট, কম্বল, নানারকম খাবার্-দাবার গুছিয়ে রাখা হয়েছে এর মধ্যেই। ছোড়দিরাও এখানে এসে জড়ো হয়েছে। আমরা তিনজন ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে থাকব শুনে ধীরেনদার মতন নিপুদা আর রত্নেশদা যেতে চাইল সঙ্গে। কিন্তু কাকাবাবু আর কারুকে নেবেন না।

ছোড়দি আমায় কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। কাকাবাবুকে তো আর কেউ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ভূপালে এসে আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তবে সেটা যেন ছোড়দিরই দায়িত্ব।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'বাবা আমায় কী বলে দিয়েছেন জানিস না? কাকাবাবু যখন যেখানে থাকবেন, সব সময় আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে হবে।'

আর দেরি করলে পাহাড়ে উঠতে বেশি রাত হয়ে যাবে। সেইজন্য কাকাবাবু

বললেন, 'চলো, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

ধীরেনদা বললেন, 'কিন্তু আপনাদের খবর পাব কী করে? কাল সকালে কি আমরা কেউ যাব?'

কাকাবাবু বললেন, 'না, তোমাদের যাবার দরকার নেই। আমরা দু'দিনের মতন খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে একজন কেউ কিছু খাবার পৌঁছে দিয়ে এসো।'

'কিন্তু আপনার ভাড়া-করা গাড়িটা তো ওখানে দু'দিন থাকবে না, পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। হঠাৎ যদি আপনাদের ভূপালে আসার দরকার হয়, তা হলে আসবেন কী করে?'

'সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকই, তোমাদের যাতে বেশি চিন্তা না হয়, সেই জন্য এটা তোমাদের দেখিয়ে রাখছি।'

কাকাবাবু তাঁর কিট ব্যাগ খুলে রেডিওর মতন যন্ত্র দেখালেন। ওটা একটা শক্তিশালী ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশান সেট। বহু দূরে খবর পাঠানো যায়।

আমি জানি, কাকাবাবু কলকাতার বাইরে কোথাও গেলেই ঐ যন্ত্রটা সব সময় সঙ্গে রাখেন।

মিংমা আর আমি ড্রাইভারের পাশে বসলুম। কাকাবাবু পেছনের সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'পৌঁছতে অন্তত দেড়-দু' ঘণ্টা লাগবে, ততক্ষণ আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

॥ ছয় ॥

সন্ধে হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি আলো মিলিয়ে যায়নি। দূর থেকে ভীমবেঠ্কা পাহাড়টা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় যেন একটা সাধারণ উঁচু টিলা। এর ভেতরে যে অতগুলো গুহা আছে, তা কল্পনা করাই শক্ত। আসলে পাহাড়টা একটা মৌচাকের মতন, রক শেলটার বা গুহাতেই ভর্তি।

কাকাবাবু নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন। ওপরে পৌঁছবার পর আমরা ওঁকে জাগিয়ে দিলুম। মালপত্রগুলো সব বয়ে নিয়ে যাওয়া হল সাধুবাবার আশ্রমের কাছে। তারপর গাড়িটা ফিরে গেল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝুপ করে নামল অন্ধকার। সেই অন্ধকার এমন কুচকুচে কালো যে পাশের লোককেও দেখা যায় না। শুধু দূরে দেখা যায় ধুনির আগুন।

সাধুবাবা সত্যিকারের সাহসী লোক। রাত্তিরে এখানে উনি একা থাকেন। যে দু তিনজন লোককে দিনের বেলা ওঁর আশ্রমে দেখছিলুম, তারা পাহাড়ের নীচের গ্রামের লোক। সন্ধেবেলা ফিরে যায়।

ধুনির আগুনের কাছাকাছি আমাদের খাটগুলো পেতে ফেলা হল। রাত্তিরে

মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিঁচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব ।'

জায়গাটা যে কী অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গলও দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে-মাঝে একটা দুটো বড় গাছ, তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন আরও নীচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, এ ছাড়াও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকলে পারতুম না ?'

কাকাবাবু বললেন, 'হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া, আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারিদিকে নজর রাখতে পারব না।'

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখেছিস, সাধুজি কী চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে এতখানি পরিষ্কার জায়গা, তিন দিকে যেন ঠিক পাথরের উঁচু দেয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।'

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এরকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোনও ধ্যানমগ্ন সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি ?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতেই চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে

ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয় পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হিহি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন ? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

আর অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'বোম্ ভোলা-মহাদেও-শঙ্করজি !'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে না দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেই জন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, 'সাধুজি, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।'

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ, হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন। কোই বাত নেই। এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড়, সমুন্দর, জঙ্গল— এ সবই ভগবানকা, যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখন কোনও না কোনও গভর্নমেন্টের। আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা, আমাদের সরকার এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজি, আপনি যে বলছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ ? মানুষের চলাফেরার ?'

'হাঁ, হাঁ।'

'একজন মানুষ, না অনেক ?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান ? তারা গাড়িতে আসে ?'

মিংমা আমাদের জন্য রান্না করবে। মিংমা দারুণ খিঁচুড়ি রাঁধে।

সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন, ওঁর সঙ্গে কোনও কথা বলা গেল না। কাকাবাবু ঘড়ির ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'সাড়ে সাতটা বাজে, রাত দশটা আন্দাজ চাঁদ উঠবে, তখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুব।'

জায়গাটা যে কী অসম্ভব নিস্তব্ধ, তা বলা যায় না। এখানে ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত নেই। সেরকম একটা জঙ্গলও দেখিনি এই পাহাড়ে। মাঝে-মাঝে একটা দুটো বড় গাছ, তবে ছোট গাছই বেশি। অবশ্য দুপুরবেলা গুহাগুলো দেখতে যখন পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন আরও নীচের দিকে জঙ্গলের মতন দেখেছি। আমরা ঘুরেছিলাম মাত্র চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা গুহায়, এ ছাড়াও কত গুহা না-দেখা রয়ে গেছে।

দিনের বেলায় ধীরেনদার সেই কথাটা মনে পড়ল। তাই আমি কাকাবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই ক'দিন একটা বেশ ভালমতন গুহার মধ্যে থাকলে পারতুম না?'

কাকাবাবু বললেন, 'হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেকালের মানুষের পক্ষে গুহায় থাকাই সবচেয়ে সুবিধের ছিল। কিন্তু একালে মানুষই সবচেয়ে হিংস্র। আমাদের যদি কেউ মারতে চায়, তাহলে গুহার বাইরে থেকে গুলি চালিয়ে খুব সহজেই মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া, আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রইলে চারিদিকে নজর রাখতে পারব না।'

তারপর সাধুবাবার আশ্রমের দিকে হাত তুলে বললেন, 'দেখেছিস, সাধুজি কী চমৎকার জায়গা বেছেছেন। সামনে এতখানি পরিষ্কার জায়গা, তিন দিকে যেন ঠিক পাথরের উঁচু দেয়াল। সবাইকে এখানে সামনে দিয়েই আসতে হবে। এখানে বসে থাকলে গাড়ির রাস্তা পর্যন্ত দেখা যায়।'

সাধুবাবা একটা হরিণের ছালের ওপর জোড়াসনে শিরদাঁড়া একদম সোজা করে বসে আছেন। চোখ দুটো বোজা। আমরা যে নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, তাতেও উনি একবারও চোখ খোলেননি।

মিংমা মুগ্ধ হয়ে সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই হিমালয় পাহাড়ে এরকম আরও সাধু দেখেছে, তাই ওর চেনা লাগছে। আমি গল্পের বইয়ের ছবিতে ছাড়া এরকম কোনও ধ্যানমগ্ন সাধুকে দেখিনি। উনি কি সারারাতই এইভাবে থাকবেন নাকি?

কাকাবাবু আমায় বললেন, 'খাওয়া হয়ে গেলে তুই আর মিংমা যখন ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়তে পারিস। আমি রাত আড়াইটে পর্যন্ত জাগব। তারপর মিংমাকে তুলে দেব।'

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা মোটে। সময় যেন কাটতেই চায় না।

একটু বাদে মিংমা স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপিয়ে দিল। আমি ওর পাশে বসে

ব্যগ্রভাবে চেয়ে রইলুম। রান্না দেখা ছাড়া আর তো কোনও কাজ নেই।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনে আমি চমকে ভয় পেয়ে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ছিলুম আর একটু হলে। মিংমা হিহি করে হেসে উঠল। আসলে আওয়াজটা মোটেই বিকট কিংবা অদ্ভুত নয়। আমি অন্যমনস্ক ছিলুম বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল, দুপুরবেলা শোনা গুহার বাইরে সেই শব্দের কথা।

আগে লক্ষ্য করিনি, আশ্রমের সামনের চাতালের এক কোণে একটি গোরু শুয়ে আছে। দুপুরে বরং এখানে একটি কুকুর দেখেছিলুম, সেটা এখন নেই। বোধহয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে নীচে নেমে গেছে।

কিন্তু গোরুটা হঠাৎ ডেকে উঠল কেন ? আমি টর্চ নিয়ে গেলুম গোরুটার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে গোরুর চোখে টর্চের আলো পড়লে ঠিক আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করে। মনে হয় কোনও হিংস্র প্রাণী।

গোরুটা আর একবার ডাকল, হা-ম-বা।

আর অমনি সাধুবাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'বোম্ ভোলা-মহাদেও-শঙ্করজি !'

এবার সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গ হল। মনে হল, গোরুটাই যেন সাধুবাবার ঘড়ির কাজ করে। সাধুবাবা যাতে ধ্যান করতে করতে সারা রাত কাটিয়ে না দেন কিংবা ঘুমিয়ে না পড়েন, সেই জন্য গোরুটা রোজ এই সময় ওঁর ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে বললেন, 'সাধুজি, আমরা আপনার অতিথি হয়ে এসেছি। এখানে থাকব।'

সাধুবাবা বললেন, 'হাঁ, হাঁ, থাকুন। আরামসে থাকুন। কোই বাত নেই। এ-পাহাড় তো আমার নয়। পাহাড়, সমুন্দর, জঙ্গল— এ সবই ভগবানকা, যে-কোনও মানুষ থাকতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি ঠিক বললেন না, সাধুবাবা। দিন কাল বদলে গেছে। ভগবানের আর অত বেশি সম্পত্তি এখন নেই। পৃথিবীর সব পাহাড় আর জঙ্গলই এখন কোনও না কোনও গভর্নমেন্টের। আমি যদি এই পাহাড়ে বাড়ি বানিয়ে থাকতে যাই, অমনি সরকারের লোক এসে আমাদের ধরবে। সমুদ্রের কিছুটা জায়গা এখনও খালি আছে বটে।'

সাধুবাবা বললেন, 'আমি তো এখানে আছি বহোত দিন।'

'আপনাদের কথা আলাদা। আপনি সাধুবাবা, আমাদের সরকার এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কিছু বলে না। আচ্ছা সাধুজি, আপনি যে বলছিলেন, রাত্রে এখানে শব্দ শুনতে পান, তা কিসের শব্দ ? মানুষের চলাফেরার ?'

'হাঁ, হাঁ।'

'একজন মানুষ, না অনেক ?'

'দো-তিন আদমি আসে মনে হয়।'

'আপনি কোনও গাড়ির শব্দ পান ? তারা গাড়িতে আসে ?'

'না, গাড়ির আওয়াজ পেয়েছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কী খাবেন? আমাদের হাতের রান্না আপনি খাবেন কি?'

সাধুজি জানালেন, না, উনি রাত্রে শুধু এক বাটি দুধ ছাড়া আর কিছু খান না। উনি ঘুমোনও খুব তাড়াতাড়ি। ধুনির আগুনে মাঝে-মাঝে কাঠ ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে উনি একটু বাদেই চলে গেলেন আশ্রম-গুহার মধ্যে।

মিংমা রান্না সেরে ফেলার পর আমরাও খেয়ে নিলুম।

কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। সাড়ে নটা বাজবার পর পাশের পাহাড়ের আড়াল থেকে একটু-একটু করে উঠতে দেখা গেল চাঁদের মুখ। আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারটা পাতলা হয়ে একটু আলো ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, 'চলো, সবাই মিলে একটু ঘুরে আসা যাক। খাওয়ার পর একটু হাঁটাও হবে।'

খানিকক্ষণ হেঁটে আমরা প্রথম সারির গুহাগুলোর কাছে দাঁড়ালুম। টর্চ নিভিয়ে দিতেই গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল। এ রকম অদ্ভুত অনুভূতি আমার আর কোনও জায়গায় গিয়ে হয়নি। মনে হল, আমরা যেন পঞ্চাশ হাজার কিংবা এক লক্ষ বছর আগেকার সময়ে ফিরে গেছি। আদিম গুহাবাসী মানুষরা এখানে থাকে। এক্ষুনি তাদের কারুকে দেখতে পাব। আবছা আলোয় একটু দূরের পাথরের চাঁইগুলোকে মনে হচ্ছে কালো কালো হাতির পাল।

আর থাকতে না পেরে আমি টর্চ জ্বেলে ফেললুম।

তারপরই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, 'ও কী!'

টর্চের আলোটা সোজা যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটা পাথরের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে একজন মানুষ।

কাকাবাবুও দেখতে পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, 'হু ইজ দেয়ার? উধার কৌন হ্যায়?'

লোকটি তাতেও নড়ল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, 'দো হাত উপর উঠাকে সামনে চলা আও। নেহি তো গোলি চালায় গা!'

লোকটি এবার আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ধুতি আর শার্ট পরা, গ্রাম্য লোকের মতন চেহারা। কিন্তু মুখে একটা হিংস্র ভাব। আমাদের দিকে কয়েক পলক চেয়ে রইল, তারপর সামনে এগিয়ে আসার বদলে চট্ করে লুকিয়ে পড়ল একটা পাথরের আড়ালে।

সেইটুকু সময়ের মধ্যেই কাকাবাবু ওকে গুলি করতে পারতেন বটে, কিন্তু মারলেন না।

চাপা গলায় আমায় বললেন, 'সন্তু, টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে চট্ করে শুয়ে পড় মাটিতে।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বড় পাথরের টুকরো গিয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। ঐ পাথরটা মাথায় লাগলে আর দেখতে হত না।

তারপরই মিংমার গলার আওয়াজ পেলুম, 'আংকেল সাব, পাকাড় গ্যয়া।'

মিংমা বুদ্ধি করে এরই মধ্যে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পেছন দিক দিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলেছে। আমি টর্চ জ্বেলে ছুটে গেলুম সেই পাথরটার কাছে।

মিংমা সেই লোকটার দুটো হাত পেছন দিকে মুচড়ে ধরে আছে। ছোটখাটো চেহারা হলেও মিংমার শরীরে দারুণ শক্তি। এ লোকটা ওর সঙ্গে জোরে পারবে কেন!

ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবুর এসে পৌঁছতে একটু দেরি হল। তিনি বললেন, 'সন্তু, এর মুখে ভাল করে আলো ফেলে দ্যাখ তো, এই লোকটাই দুপুরে তোদের ভয় দেখিয়েছিল কিনা!'

আমি সঙ্গে-সঙ্গেই বললুম 'না।'

মিংমাও মাথা ঝাঁকাল। কারণ, এই লোকটা বেশ রোগা আর মুখখানা লম্বাটে। বয়েসও যথেষ্ট, প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পরচুলা আর নকল দাড়ি লাগিয়েও ওর পক্ষে আদিম গুহাবাসীর ছদ্মবেশ ধরা সম্ভব নয়।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে এ-লোকটা এখানে একা বসে আছে কেন? সন্তু, দ্যাখ তো ওর জামার পকেটে কী আছে? মিংমা, ভাল করে ধরে থাকো ওকে।'

জামার পকেটে একটা বিড়ির কৌটো, দেশলাই আর কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। কাগজপত্র কিছু নেই। কিন্তু লোকটির কোমরের কাছে কী যেন একটা শক্ত, উঁচু জিনিস হাতে লাগল। জামাটা তুলে দেখলুম, একটা বেশ বড় ভোজালি ওর কোমরে গোঁজা।

কাকাবাবু বললেন, 'হুঁ! সঙ্গে এত বড় ছুরি, আবার পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল, তা হলে তো উনি সাধারণ কোনও লোক নন। এই, তুম্ কৌন্ হ্যায়?'

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

'তুম কাঁহে পাথ্থর ফেকা? হামলোগ তুম্‌হারা দুশ্‌মন হ্যায়?'

লোকটা তবুও চুপ।

'ইত্‌না রাতমে কাঁহে ইধার বৈঠা থা? তুম্‌হারা মতলোব কেয়া হ্যায় ঠিক বাত্ বাতাও!'

লোকটা তবু কোনও সাড়া-শব্দ করে না।

কাকাবাবু এবার মিংমাকে বললেন, 'আর একটু জোরে চাপ দাও তো! দেখি ও কথা বলে কি না!'

মিংমা লোকটার হাত দুটো বেশি করে মুচড়ে দিতে লাগল। একটু একটু

করে লোকটার মুখে ফুটে উঠল ব্যথার চিহ্ন। তারপর এক সময় সে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাঁ, অ্যাঁ—'।

ঠিক বোবা মানুষদের মতন আওয়াজ!

টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটার মুখের মধ্যে জিভ নেই। জিভ ছাড়া কোনও মানুষের মুখ তো আমি আগে দেখিনি! মুখের ভেতরটা অদ্ভুত গোল, দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

আমি উত্তেজিতভাবে বললুম, 'কাকাবাবু!'

কাকাবাবু বললেন, 'তুই বুঝতে পেরেছিস, সন্তু? এ লোকটা নিশ্চয়ই মনোমোহন ঝাঁর সেই চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে।'

আমি বললুম, 'ওকে জিভ-কাটা অবস্থায় এই পাহাড়ের কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখানকার পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমার আরও সন্দেহ হয়েছিল, এই পাহাড়টা ঘিরেই সব রহস্য আছে।'

'এই লোকটা কথা বলতে পারবে না। আর লিখতে-পড়তেও জানে না···।'

'কিন্তু জায়গা চেনার ক্ষমতা ওর আছে। খুঁজে-খুঁজে এখানে আবার এসেছে নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য।'

কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, লোকটিকে ছেড়ে দিতে। তারপর ওকে বললেন, 'শুনো, হামলোগ তুম্‌হারা মনিব মনোমোহন ঝাঁ-জিকা দুশমন নেহি! হামলোগ তুম্‌হারা ভি দোস্ত্ হ্যায়। খুনিকো হামলোগ পাকাড়নে চাতা হ্যায়।'

লোকটি কাকাবাবুর কথা কতটা বুঝতে পারল কে জানে। তবে মনোমোহন ঝাঁ'র নামটা শুনে একটু বোধহয় ভাবান্তর দেখা গেল।

কাকাবাবু আবার হিন্দিতে বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা এখানে থাকছি, তুমিও সঙ্গে থাকবে।'

লোকটিকে আমাদের সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত করে কাকাবাবু চলতে শুরু করলেন। লোকটা কয়েক পা এল পেছন-পেছন। তারপরই হঠাৎ দৌড় লাগাল।

মিংমা আর আমি দু'জনেই দৌড়লাম ওকে ধরবার জন্য। কিন্তু লোকটা যেন অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলুম কাকাবাবুর কাছে। দিনের বেলায়ই কেউ এখানে লুকোতে চাইলে তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল, আর রাত্তিরবেলা তো অসম্ভব।

কাকাবাবু আফসোস করে বললেন, 'রাগে-দুঃখে লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে আমাদের কথা শুনল না কেন? ও একা একা কী করে প্রতিশোধ নেবে? শত্রুপক্ষ যে অতি ভয়ংকর, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। চল্, আমরা এবার শুয়ে পড়ি।'

আমরা আবার ফিরে এলুম আশ্রমের কাছে। শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম ঐ জিভ-কাটা মানুষটির কথা ! ইশ্, মানুষ এত নিষ্ঠুরও হয় যে, অন্য একজন মানুষের জিভ কেটে দিতে পারে ! ওরা তো আরও তিনজন নিরীহ ঐতিহাসিককে খুন করেছে। মনোমোহন ঝাঁ'র এই সঙ্গীটিকে তো ওরা খুন করতে পারত, তার বদলে শুধু জিভ কেটে দিল কেন ? আরও বেশি অত্যাচার করবার জন্য ?

সহজে ঘুম আসতে চায় না। চিৎ হয়ে শুলেই ওপরে দেখা যায় আকাশ। এখন কয়েকটা তারাও ফুটেছে। বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। দু' একটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার খরখর শব্দ শুনতে পাচ্ছি এক-একবার। তারপর দূরে এক জায়গায় যেন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেলাম। কাকাবাবু বললেন, 'ও কিছু না।'

তারপর কখন যেন চোখ বুজে এসেছিল। আর-একবার একটা শব্দ পেয়ে আবার জেগে উঠলুম।

কাকাবাবু ধুনির আগুনে কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কাকাবাবুর হাতে একটা কাপ। এর মধ্যে কখন যেন নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিয়েছেন। রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। পাশের খাটে মিংমা ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

এক সময়ে চোখে আলো পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। ওমা, সকাল হয়ে গেছে দেখছি ! তাহলে সারা রাত কিছুই ঘটেনি ?

কাকাবাবু আর মিংমা সাধুবাবার সঙ্গে চা-খেতে-খেতে গল্প করছেন। তা হলে আমাদের তৈরি চা খেতে আপত্তি নেই সাধুবাবার।

তড়াক করে নেমে পড়লুম খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, 'বিছানা তুলে খাটটা ফোল্ড করে ফ্যাল, সন্তু ! খাটগুলো সব আশ্রমের পিছন দিকে লুকিয়ে রাখতে হবে। দিনের বেলা এখানে কিছু-কিছু লোক আসতে পারে। আমরা যে এখানে থাকি, তা তাদের জানানোর দরকার নেই।'

এখানে জলের বেশ সমস্যা আছে। আমরা দুটো বড় ফ্ল্যাস্ক ভর্তি জল এনেছিলাম, সে তো মুখ হাত ধুতেই ফুরিয়ে যাবে। সারাদিন আমাদের অনেক জলের দরকার হবে।

সাধুবাবা জানালেন যে, পাহাড়ের নীচে নেমে খানিকটা দক্ষিণে গেলে যে গ্রামটা আছে, সেখানকার কুয়ো থেকে জল আনা যায়। অথবা, পাকা রাস্তা ধরে নেমে গেলে মাইল দু'এক দূরে যে লেভেল ক্রসিং আছে একটা, সেখানকার গুমটি-ঘরের পাশে টিউবওয়েল আছে।

আমরা জলের ব্যবস্থার কথা আগে চিন্তা করিনি। ঠিক হল যে, আমি আর মিংমা নীচে যাব জলের সন্ধানে। সাধুবাবার শিষ্যরা তাঁর জন্য দু'তিন দিন চলার মতন জল একেবারে এনে দেয়।

আমরা পাঁউরুটি আর জেলি খেয়ে নিলুম। তারপর কাকাবাবুকে রেখে মিংমা আর আমি বেরিয়ে পড়লুম জলের জন্য।

কাল রাত্তিরবেলা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পাহাড়টাকে কী রকম ভয়ের জায়গা বলে মনে হচ্ছিল। এখন দিনের আলোয় সব কিছুই সুন্দর। সেই জিভকাটা লোকটা কি এখনও লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের মধ্যে ? তাহলে সে খাবে কী ? আর সেই লোকটা, যে গুহা-মানব সেজে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল ?

দিনের আলোয় ভয় থাকে না, তবু আমরা এগোতে লাগলুম সাবধানে। গুহাগুলো সবই পাহাড়ের এক দিকে, অন্য দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের উপত্যকায়। আমরা হাঁটতে লাগলুম সেই ফাঁকা দিকটা ঘেঁষে।

কিছুক্ষণ নামবার পর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মিংমাকে নিয়ে আমি লুকোলুম একটা গাছের আড়ালে। গাড়িটা এই পাহাড়ের ওপরেই আসছে।

গাড়িটা হুশ করে আমাদের পেরিয়ে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আরেঃ ! এই, থামো, থামো !'

চ্যাঁচামেচি শুনে গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আবার ব্যাক করে এল। গাড়িতে ধীরেনদা আর রত্নেশদা। ওঁরা বোধহয় আর থাকতে পারেননি, ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের খোঁজ নিতে।

ধীরেনদা বললেন, 'কী, তোমরা সব ঠিকঠাক আছ তো ?'

আমরা গাড়িতে উঠে পড়ে বললুম, 'গাড়ি ঘোরান, আমাদের জল আনতে যেতে হবে। আপনারা এসে পড়েছেন, বেশ ভালই হল, হাঁটতে হবে না।'

ধীরেনদা বললেন, 'তাই তো, এখানে যে জল নেই, সেটা আমারও খেয়াল হয়নি।'

'যখন এক সময় মানুষ থাকত, তখন তারা জল পেত কোথায় ?'

ধীরেনদা বললেন, 'তখনকার লোকেদের তো কোনও কাজ ছিল না, তারা পাহাড়ের তলা থেকে রোজ জল নিয়ে আসত। কিংবা তখন হয়তো, কোনও ঝরনা ছিল এই পাহাড়ে। এখন শুকিয়ে গেছে। এক লক্ষ বছর আগে কী ছিল, তা তো বলা যায় না !

আমরা ফ্ল্যাস্ক দুটো এনেছিলাম, কিন্তু ঐটুকু জলে তো চলবে না। তাই ধীরেনদা আমাদের নিয়ে গেলেন কাছাকাছি একটা ছোট শহরে। জায়গাটার নাম ওবায়দুল্লাগঞ্জ। সেখান থেকে কেনা হল বড়-বড় তিনটে কলসি। এক দোকান থেকে বেশ গরম-গরম জিলিপি আর কচুরি খেয়ে নিলাম পেট ভরে। কাকাবাবুর জন্যও নিয়ে যাওয়া হল কিছু।

ফেরার পথে কলসির জল ছলাত ছলাত করে পড়তে লাগল গাড়িতে। আমি আর মিংমা ধরে বসে আছি।

রত্নেশদা বলল, 'কাল সকালেও তো আবার জল আনতে যেতে হবে। আবার আসতে হবে আমাদের।'

ধীরেনদা বললেন, 'ভাবছি, একজন ড্রাইভারসুদ্ধু একটা গাড়ি জোগাড় করে আজ বিকেলে এখানে পাঠিয়ে দেব। যে-কদিন দরকার, সে এখানে থাকবে।'

আমি বললুম, 'না, না, গাড়ির দরকার নেই। যেমনভাবে আগেকার গুহাবাসীরা নীচে থেকে জল আনত, সেইরকমভাবে কাল থেকে আমি আর মিংমা জল বয়ে আনব।'

পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে আশ্রমের সামনে কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম না। সাধুবাবাও নেই।

গুহাগুলোর দিকে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই অবশ্য কাকাবাবুকে পাওয়া গেল। যে বড় গুহাটার নাম অডিটোরিয়াম অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ, সেটার সামনে একটা বড় পাথরের ওপর বসে কাকাবাবু একটা কাগজে সেটার ছবি আঁকছেন।

ধীরেনদাদের দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, তোমরা কেমন আছ? রাত্তিরে কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?'

ধীরেনদা হেসে ফেলে বললেন, 'না, কিছু হয়নি। আপনারাও তো ভালই আছেন দেখছি!'

কিছুক্ষণ গল্প করার পর ধীরেনদারা চলে গেলেন। তার একটু পরেই আবার শুনতে পেলুম একটা গাড়ির আওয়াজ।

॥ সাত ॥

দ্বিতীয়বার গাড়ির আওয়াজ শুনে কাকাবাবু বললেন, 'হয়তো কোনও ভিজিটর আসছে। আমি এখানে বসে ছবি আঁকব, তোরা দু'জনে দু'দিকে চলে যা। বাইরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

মিংমা চলে গেল আশ্রমের দিকে। আমি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে এলুম রাস্তার ধারে একটা গুহার কাছে। এ দিকের কয়েকটা গুহা আমাদের দেখা হয়নি।

এখানে রয়েছে একটা দোতলা গুহা। একটা ছোট গুহার অনেক ওপরে আর একটা। প্রকৃতিই নিজের খেয়ালে এরকম বানিয়েছে। ওপরের গুহাটায় ওঠা খুব সহজ নয়, পাশের একটা বড় পাথর বেয়ে-বেয়ে উঠতে হয়। খানিকটা ওপরে ওঠার পর পরিষ্কার দেখতে পেলুম রাস্তাটা।

একটা কালো রঙের গাড়ি এসে বড় নিমগাছটার তলায় থামল। তারপর গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি কোনও ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা সাহেব। বেশ লম্বা, ধপধপে ফর্সা রং, মাথার চুল একদম সাদা। বেশ রাশভারী চেহারা।

লোকটি গাড়ি থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাল।

এরপর নামল আরও দু'জন গাঁট্টাগোঁট্টা গুণ্ডার মতন চেহারার লোক।

একজনের হাতে লম্বা একটা বাক্স। বেশ সন্দেহজনক চরিত্র। এদের ইতিহাসে কোনও আগ্রহ আছে কিংবা গুহার মধ্যে আঁকা ছবি দেখবার জন্য এতদূর আসবে, তা ঠিক মনে হয় না। তাছাড়া এরা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এই জায়গাটা ওদের বেশ চেনা।

গাড়ি থেকে নেমেই ওরা কাকে যেন খুঁজছে মনে হল। চারিদিকটা দেখবার পর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু বলে ওরা এগোল আশ্রমের দিকে।

আমার মনে হল, কাকাবাবুকে বোধহয় সাবধান করে দেওয়া উচিত। নামবার জন্য পা বাড়াতেই আর একটু হলে আমি খতম হয়ে যেতাম। একটা আলগা পাথরে পা দিতেই সেটা গড়াতে-গড়াতে দারুণ শব্দ করে পড়ল নীচে। আমি কোনও রকমে ঝুঁকে একটা পাথরের দেয়াল ধরে সামলে নিলুম।

পাথরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে লোক তিনটি থেমে গেল, দু'জন ছুটে এল এদিকে। আমার তখন তাড়াতাড়ি নামবার উপায় নেই, এক যদি ওপরের গুহাটার মধ্যে লুকনো যায়। কিন্তু একটা পাথর সরে যাওয়ায় অনেকখানি উঁচুতে পা দিতে হবে। আমি ওপরে ওঠবার আগেই ওরা এসে পৌঁছে গেল। আমি আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। ফর্সা-লম্বা লোকটি এসে পড়ে আমাকে ভাল করে দেখল। তারপর আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে ভাঙা-বাংলায় বলল, 'এ খোঁকা, তোমার চাচাজি কোথায় আছে ?'

এই লোকটা আমায় চেনে ? কাকাবাবুর কথা জানে ? কিংবা শত্রুপক্ষের লোক, খবর পেয়ে আমাদের ধরতে এসেছে।

আমি কোনও উত্তর দিলুম না বলে লোকটি এবার হুকুমের সুরে বলল, 'নীচে উতারকে এসো।'

পালাবার উপায় নেই, নামতেই হবে। আমি বসে পড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নীচে নামতে লাগলুম। ওদের একজন লোক একটু উঠে এসে আমার কোমর ধরে মাটিতে নামাল!

ফর্সা-লম্বা লোকটির চোখের মণি নীল রঙের। যথেষ্ট বয়েস হলেও বোঝা যায় গায়ে বেশ শক্তি আছে। আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় তোমার চাচাজি ? চলো।'

আমি খুব জোরে চেঁচিয়ে বললুম, 'কা-কা-বা-বু! আপনাকে খুঁজতে এ-সে-ছে!'

ফর্সা লম্বা লোকটি এবার হেসে বলল, 'হুঁ! ছোকরা বিলকুল তৈয়ার! তার মানে তোমার কাকাবাবু কাছাকাছিই আছে। চলো, চলো।'

ওর গুণ্ডামতন একজন সঙ্গী আমার হাত ধরল। আমি হাঁটতে লাগলুম অডিটোরিয়াম গুহার দিকে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দিয়েছি, এবার যা ব্যবস্থা করার উনিই করবেন।

যা ভেবেছি ঠিক তাই। একটু আগে তিনি যেখানে বসে ছবি আঁকছিলেন,

এখন সেখানে নেই। নিশ্চয়ই আমার চিৎকার শুনতে পেয়ে লুকিয়েছেন।

ফর্সা-লম্বা লোকটি গুহার মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখে বলল, 'এখানে ছিল ? নেই তো, কাঁহা গেল ?'

তারপর আমাকে আরও সাঙ্ঘাতিক অবাক করে দিয়ে সেই লোকটি চেঁচিয়ে ডাকল, 'রাজা ! রাজা ! এদিকে এসো !'

কাকাবাবুর ডাকনাম রাজা। একমাত্র আমার বাবা ছাড়া আর কারুকে ঐ নাম ধরে ডাকতে শুনিনি। এই লোকটি সেই নাম জানল কী করে ?

এবার একটা গুহার আড়াল থেকে রিভল্‌ভার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। রিভলভারটা পকেটে ভরতে-ভরতে হেসে বললেন, চিরঞ্জীবদাদা !'

বুঝতে বাকি রইল না যে, ইনিই ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনা।

ডক্টর শাকসেনা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর খানিকটা স্নেহের সুরে বকুনি দিয়ে বললেন, 'রাজা, তুমি কি পাগল বনে গেছ ? এই খোঁকাকে সাথ্ নিয়ে তুমি এখানে রাত কাটাচ্ছ ? কত্ত রকম বিপদ হতে পারে।'

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, আপনি ভাবিকে দিয়ে অতগুলো মিথ্যে কথা বলালেন, ভাবির খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওঁর তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।'

'তুমি বুঝতে পারলে ? তাজ্জব কথা !'

'হ্যাঁ, ভাবির সঙ্গে একটুক্ষণ কথা বলেই আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, উনি জানেন, আপনি কোথায় আছেন। তার মানে, আপনি নিরুদ্দেশ হননি, ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছেন।'

'তোমাকে ফাঁকি দেবার উপায় কী আছে। বীণার বোঝা উচিত ছিল, তোমাকে সত্যি কথা বলতেই পারত।'

'আপনি বলে গিয়েছিলেন, যেন কেউ জানতে না পারে।'

'কী করি বলো। বিদেশ থেকে ফিরতে না-ফিরতেই যদি শুনলাম কী যে অর্জুন, সুন্দরলাল আর মনোমোহন মার্ডার হয়ে গিয়েছে, অমনি সামঝে নিলাম কী মাই লাইফ আল্‌সো ইজ ইন ডেইনজার।'

'তখন আপনি আপনার ভাইপো বিজয়কে নিয়ে পাঁচমারি গিয়ে লুকোলেন।'

'পাঁচমারি খুব লোন্‌লি জায়গা। ভাবলাম কী, ওখানে কেউ খোঁজ পাবে না, আমারও বিশ্রাম হবে। কিন্তু ওরা ঠিক হাজির হল।'

'চিরঞ্জীবদাদা, ওরা মানে কারা ? সেটা বুঝেছেন ?'

'না। এখনও জানি না। বাট দে আর আ ডেঞ্জারাস লট্। পাঁচমারিতেও হঠাৎ আমার সামনে একটা লোক এসে গোলি চালিয়ে দিল। খত্‌মই হয়ে যেতাম, বুঝলে, রাজা, ঝটাক্‌সে বিজয় এসে পড়ল মাঝখানে। আমার বদলে সে-ই জীবন দিতে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, সে আপনাকে খুব ভক্তি করে। যাক, সে বেঁচে গেছে শুনেছি।'

'আমিই তাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে জিম্মা করে দিয়েছি।'

পাশের লোক দুটিকে দেখিয়ে ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এঁরা দু'জন পুলিশ অফিসার। তারপর থেকে এঁদের প্রটেকশান নিতে বাধ্য হয়েছি। ঠিক আছে, আপলোগ গাড়িমে যাকে আরাম করিয়ে।'

পুলিশ দু'জন চলে যাবার পর ডক্টর শাকসেনা আর কাকাবাবু পাশাপাশি বসলেন একটা পাথরে। মিংমাও আমাদের কথাবার্তা শুনে এসে হাজির হয়েছে এর মধ্যে। কাকাবাবু মিংমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ডক্টর শাকসেনার। আমরাও দু'জনে বসলুম সামনের একটা গুহার মুখে বেদীর মতন জায়গায়।

চিরঞ্জীব শাকসেনা পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বার করে ধরালেন। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এবার বলো তো, রাজা, এই ভীমবেঠকায় রাত-পাহারা দেবার মতন বে-পট্ ভাবনা তোমার মাথায় এল কী করে?'

কাকাবাবু বললেন, 'তাতে আমি ভুল করিনি নিশ্চয়ই। ভীমবেঠকা সম্পর্কে আপনারা নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি?'

'নতুন আর কী হবে?'

'নির্ঘাত নতুন-কিছু পেয়েছেন?'

'শোনো, আউডিয়াটা প্রথমে আসে মনোমোহনের মাথায়। সে একদিন বলল কী, এখানে যে এত গুহার মধ্যে ছবি আছে, তার সব ছবি সির্ফ ছবি নয়। সেগুলো ভাষা। তার মানে চিত্রভাষা। মিশরে পিরামিডের মধ্যে যেমন হিয়েরোগ্লিফিকস্, অর্থাৎ ছবির মধ্যে ভাষা আছে, সেই রকম!'

'আমিও সেই রকমই আন্দাজ করেছিলুম দাদা।'

'তুমি তো জানো রাজা, ঐ মনোমোহন ছিল, অ্যামেচার হিস্টোরিয়ান। তার কথা প্রথমে আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। আহা বেচারা বড় ভাল-মানুষ ছিল। হার্ট অফ গোল্ড যাকে বলে। কে ওকে মারল?'

'সেইটাই তো কথা, ওঁকে মারল কে?'

'এ জরুর কোনও ম্যানিয়াকের কাজ। নইলে কী এমন বীভৎস ভাবে গলা কাটে?'

'কোনও ম্যানিয়াক বেছে-বেছে শুধু ইতিহাসের পণ্ডিতদের খুন করবে কেন? যাই হোক, সে-কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি বলুন, মনোমোহন এই গুহার চিত্রলিপি সম্পর্কে কী জেনেছিলেন?'

'শুনলে ওয়াইল্ড আইডিয়া বলে মনে হবে। সে বলল, কিছু-কিছু ছবির মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে। সেই ছবি দিয়ে যেন কিছু বলা হচ্ছে। মনোমোহন সেই ভাষা পড়বার জন্য খুব মেতে উঠল আর আমরা হাসলুম।'

'মনোমোহনজি কিছু প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ?'

'হাঁ। বড় তাজ্জবের কথা। এক গুহার ছবি দেখে মনোমোহন বলল, এতে লেখা আছে, 'মহান বীর ভোমা তাঁর নিজের বাসগুহাতেই শুয়ে রইলেন।'

'এর তো একটাই মানে হয়।'

'ঠিক বলেছ। আমরা আধা বিশ্বাস আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখলাম কী, যে-গুহাতে এই ছবি আছে, সেই গুহার জমিন খুব প্লেন, আর সেখানে পাথরের সঙ্গে মিশে আছে মাটি। জায়গাটা খোঁড়া হল। সেখানে পাওয়া গেল এক কঙ্কাল। বহুত পুরনো—'

'কোন্ পীরিয়ড ?'

'চালকোলিথিক হবে মনে হয়। আমরা তো অ্যাসটাউণ্ডেড। সেই কঙ্কালের সঙ্গে পাওয়া গেল কয়েকটা দামি জহরত। টারকোয়াজ ! তার দাম তুমি জানো। এখন মনোমোহন তো আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে একটা কঙ্কাল আর দামি জহরত পুঁতে রাখেনি।'

'এটা কতদিন আগের কথা ?'

'পাঁচ মাস।'

'এ আবিষ্কারের কথা তো কোনও কাগজে বেরোয়নি দাদা ?'

'ইচ্ছে করেই গোপন রেখেছি। ঠিক প্রমাণ দাখিল না করলে সবার কাছে লাফিং স্টক হয়ে যাব না ? চিত্রভাষার অ্যালফাবেট তো বুঝাতে হবে ? সেই কঙ্কাল আর জহরত জমা রেখেছিলাম এখানকার মিউজিয়ামে।'

'অর্থাৎ সুন্দরলাল বাজপেয়ীর কাছে। সে-ও জেনেছিল।'

'সুন্দরলালেরই তো বেশি উৎসাহ হল। মনোমোহনকে নিয়ে সেও এখানে আসতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু মুশকিল বাধল, ঐ যে ছবির প্যাটার্ন, তা কিন্তু সব গুহাতে নেই। অধিক সংখ্যার গুহাতেই সাধারণ ছবি, বিচ্ছিরি ছবি। আদিম মানুষদের মধ্যে দু'একজন থাকত শিল্পী স্বভাবের, তারা ইচ্ছামতন এঁকেছে। সেখানে চিত্রভাষা নেই। এর মধ্যে অর্জুন শ্রীবাস্তব আবার প্রমাণ করে দিলে যে, এত্তগুলো রক শেল্টারের মধ্যে পাঁচ জায়গার ছবি সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন জাতের। সেই ছবি খুব পুরনো দেখতে লাগলেও আসলে নতুন, করিব এক দেড় হাজার বছরের বেশি বয়েস না !'

'তার থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়া গেল ?'

'মনোমোহন বলল, এই যে পাঁচটা রক শেলটারের ছবি, এর মধ্যেও চিত্রভাষা আছে। তখন তো পুরোদমে লিপি চলছে, তবু কেউ ইচ্ছা করে ছবির মধ্যে সাঙ্কেতিক কিছু লিখে রেখে গেছে।'

'এখানে তো ব্রাহ্মী লিপিও আছে, আপনি তা পড়ে ফেলেছেন ?'

তার মধ্যে এমন কিছু নেই। শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু আমাদের মনোমোহন আবার একটা চিত্রভাষা পাঠ করে ফেলল। আমার বিদেশ যাবার

ঠিক চার-পাঁচ দিন আগে।'

'কী সেটা ?'

'বুঝলে রাজা, আমার তো ধারণা সেটা গল্প। কেউ চিত্রভাষায় একটা গল্প লিখে গেছে। যদি অবশ্য ঐ ভাষা সত্যি হয়।'

'তবু বলুন, দাদা, কী লেখা আছে সেই গুহায় ?'

'সেটা পড়ে মনে হয়, মধ্যযুগে কোনও এক রাজা তার রাজ্য হারিয়ে শত্রুর তাড়া খেয়ে এখানে কোনও গুহায় লুকিয়ে ছিল। তারপর এখানেই তার মৃত্যু হয়। গুহার দেয়ালে ছবিতে লেখা আছে যে, অক্ষম, বৃদ্ধ, পরাজিত এক রাজা বড় অতৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে। তবু এখানেই রইল তার সব কিছু। চল্লিশ মানুষ দূরে রইল চল্লিশ। কোনও বংশধর একদিন পেলে নতুন রাজ্য পত্তন করবে।'

'চিরঞ্জীবদাদা, এ তো শুনে মনে হচ্ছে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত।'

'আবার গাঁজাখুরি গল্পও হতে পারে। লোভী লোকদের জন্য কেউ ভাঁওতা দিয়েছে। এর মধ্যে সঙ্কেত কোথায় ? চল্লিশ মানুষ দূরে চল্লিশ, তার মানে কে বুঝবে বলো ?'

'একমাত্র আপনিই বুঝতে পারবেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্কেত ও হেঁয়ালি, এই বিষয়ে আপনার থিসিস আছে, আমি জানি।'

'কিন্তু আমি মাথা ঘামাবার সময় পেলাম কোথায় ! চলে তো গেলাম দেশের বাইরে !'

'দাদা এমনও তো হতে পারে যে, আপনি যখন বিদেশে ছিলেন, তখন মনোমোহন বা সুন্দরলাল বা অর্জুন শ্রীবাস্তব এরা কেউ এই সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে। অর্থাৎ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।'

'তা অসম্ভব কিছু নয়।'

'আপনার বাড়িতে যখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হত, তখন আর কে উপস্থিত ছিল ?'

'আর কে ছিল, কেউ না !'

'আপনারা পাঁচজন ছিলেন। বীণা ভাবিজি পাঁচ কাপ করে চা পাঠিয়েছেন।'

'পাঁচজন ? অর্জুন, সুন্দরলাল, মনোমোহন, আমি আর হাঁ হাঁ, তুমি ঠিক বলেছ তো, প্রেমকিশোর ছিল এক দু'দিন।'

'এই প্রেমকিশোর গুপ্তধনের কথা শুনেছে।'

'তা শুনেছে।'

'তা হলে তো ঐ প্রেমকিশোরের ওপরেই সন্দেহ পড়ে। সে কোথায় ? তিনজন খুন হয়েছে ? আপনাকেও মারার চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ আপনারা চারজন এই পৃথিবী থেকে সরে গেলে শুধু প্রেমকিশোরই ঐ গুপ্তধনের কথা জানবে। এই সব ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই সে আছে।'

চিরঞ্জীব শাকসেনা হেসে বললেন, 'প্রেমকিশোর কে তা তুমি জানো না ? সে তো সুন্দরলালের ছেলে। সতেরো-আঠারো বছর মাত্র বয়েস, দিল্লিতে কলেজে পড়ে। কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে এসেছিল।'

কাকাবাবু একটুখানি চুপ করে গেলেন। আমি ওঁদের কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলছিলুম এতক্ষণ। আমারও মনে হয়েছিল পঞ্চম ব্যক্তিই এ-সব কিছুর জন্য দায়ী। কিন্তু প্রেমকিশোরের এত কম বয়েস ? তা ছাড়া, সে তো আর তার বাবাকেও খুন করবে না।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমকিশোর এখন কোথায় তা জানেন ?'

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'দিল্লিতেই আছে নিশ্চয়ই। আমি তো ফিরে এসে আর কোনও খবর পাইনি !'

'এক্ষুনি তার খোঁজ নেওয়া দরকার। তারও তো কোনও বিপদ হতে পারে। এখন আমারও মনে পড়ছে বটে, সুন্দরলালের বাড়িতে তার ছেলেকে দেখেছিলুম, তখন সে খুবই ছোট। সুন্দরলাল খুবই ভালবাসত তার ছেলেকে।'

'তা ঠিক।'

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, দাদা !'

'তাই চলো, ফিরে যাওয়া যাক !'

'না, আমি ফিরে যাবার কথা বলিনি। যে গুহাটায় আপনারা ঐ গুপ্তধনের সঙ্কেতলিপি পেয়েছেন, আমি সেই গুহাটা দেখতে চাই।'

'সেটা অনেক নীচে। খুবই দুর্গম জায়গায়, তুমি সেখানে যেতে পারবে না।'

'ঠিক পারব।'

'তুমি ক্রাচ্ বগলে নিয়ে অতখানি নামবে ? তোমার খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া, রাজা, তুমি এই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছ কেন ? আমি পুলিশকে সব জানিয়েছি···'

'চিরঞ্জীবদাদা, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। আর বিপদের মধ্যে না জড়ালে বিপদকে জয় করা যাবে কীভাবে ?'

'রাজা, তুমি এখনও এই কথা বলতে পারো ! কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি, থকে গেছি, আমি এখন ক্লান্ত। আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই···তবু চলো, তুমি যখন বলছ···'

॥ আট ॥

সরু রাস্তা দিয়ে পাথরের ওপর পা দিয়ে-দিয়ে নীচে নামা সত্যিই বড় কষ্টকর। একটানা নীচে নামা নয়, মাঝে-মাঝে আবার ওপরেও উঠতে হয়। ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনাই একটু পরে হাঁপিয়ে গেলেন। অথচ কাকাবাবুর মুখে

কোনও পরিশ্রমের চিহ্ন নেই। অন্য কেউ নিষেধ করলেও কাকাবাবু শুনছেন না, আবার নিজের কোনও রকম অসুবিধে হলেও কারুকে জানাবেন না।

যে বড় গুহাটার সামনে মিংমাকে একজন মেরেছিল, সেখানে পৌঁছে আমি বললুম, 'কাকাবাবু, ঠিক এই জায়গায় সেই লোকটা—'

কাকাবাবু ডক্টর শাকসেনাকে ঘটনাটা শোনালেন।

উনি তো খুবই অবাক। আদিম গুহা-মানবের ছদ্মবেশ ? এ রকম উদ্ভট চিন্তা কার মাথায় আসতে পারে ?

কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে উনি বললেন, 'আর বোধহয় যাওয়া উচিত নয় আমাদের। অন্তত পুলিশ দু'জনকেও সঙ্গে আনলে হত !'

কাকাবাবু বললেন, 'এতখানি যখন নেমেছি, তখন সেই গুহাটা আমি একবার দেখে আসতে চাই।'

'শোনো রাজা, এখানে যদি কয়েকজন খুনে-গুণ্ডা লুকিয়ে থাকে, আমাদের পক্ষে তা বোঝার উপায় নেই। যদি হঠাৎ তারা আক্রমণ করে···আমি আর যেতে চাই না···তুমি আমাকে ভিতু ভাবতে পারো, কিন্তু আমার ওপর ওরা তাক্ করে আছে, পাঁচমারিতে একবার খুন করতে এসেছিল···'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনি ওপরে উঠে যান, সন্তু আর মিংমা আপনাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। সেই গুহাটা এখান থেকে কোন্ দিকে হবে আমায় বলে দিন, আর কত নম্বর, আমি একাই সেখানে যাব।'

'তুমি দেখছি আচ্ছা পাগল। চলো, এসেছি যখন সবাই যাই !'

আমরা পাহাড়ের অনেকখানি নীচের দিকে নেমে এসেছি। এখান থেকে ওঠবার সময় আমার আর মিংমার তেমন অসুবিধে না হলেও কাকাবাবু আর শাকসেনার তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এর থেকে তো পাহাড়ের উলটো দিকে ঘুরে এসে নীচে থেকে ওপরে ওঠা সোজা ছিল।

ডক্টর শাকসেনা বললেন, 'এসে গেছি, ঐ যে ডাহিনা দিকে গাছের আড়ালে—'

সেদিকে কয়েক পা এগোতেই আমরা একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেলুম। একজন মানুষ যেন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় উঁ উঁ করছে।

মিংমাই প্রথম দৌড়ে গেল সেদিকে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল, 'সন্তু সাব্, ইধার আও।'

সেখানে গিয়ে আমি প্রায় আঁতকে উঠলুম। একটা বড় পাথরের নীচে আধখানা চাপা পড়ে আছে একজন মানুষ। সেই গুহামানব। মাটিতে অনেকখানি রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। লোকটা ওখানে গেল কী করে ? নিশ্চয়ই কেউ ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে ফেলে ওকে চাপা দিয়েছে। কিংবা এমনি-এমনিও পাথরটা পড়তে পারে।

মিংমা আর আমি ঠেলে পাথরটা সরাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেটা দারুণ

ভারী। এর মধ্যে কাকাবাবু আর শাকসেনাও পৌঁছে গিয়ে হাত লাগালেন। অনেক কষ্টে পাথরটাকে একটু মোটে নাড়ানো গেল, সেই অবস্থায় মিংমা লোকটির হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে।

এবার ভাল করে দেখেও মনে হল, লোকটি যেন সত্যিই একজন আদ্যিকালের গুহামানব।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হাঁটু মুড়ে লোকটির পাশে বসে পড়ে প্রথমে নাকে হাত দিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেঁচে আছে। এখনও চিকিৎসা করলে বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি এখানে এসে না পড়তুম কেউ দেখতে পেত না ওকে, এই অবস্থায় মরে যেত।'

কাকাবাবু বললেন, 'কিন্তু লোকটা কে ? ওর গোঁফ-দাড়ি আর মাথার চুল টেনে দেখুন তো ? মনে হচ্ছে নকল।'

সত্যিই তাই। মিংমা ওর চুল ধরে টান দিতেই সবসুদ্ধু উঠে এল। দাড়ি-গোঁফেরও সেই অবস্থা।

চিরঞ্জীব শাকসেনা দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'তাজ্জব না তাজ্জব ! এও কি বিশ্বাস করা যায় ? এ যে ভিখু সিং !'

কাকাবাবু বললেন, 'ভিখু সিং ? যে সব সময় আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত ?'

'হ্যাঁ। ছুট্টি নিয়ে দেশে গিয়েছিল। সে এখানে কী করছে ?'

'বুঝতে পারছেন না, ও এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে। নিশ্চয়ই আপনাদের আলোচনা লুকিয়ে-চুরিয়ে শুনেছে !'

মাটিতে বসে পড়ে চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'হা ভগওয়ান, গুপ্তধনের এত লোভ ? এত বিশ্বাসী নোকর ভিখু সিং ! হাঁ, ও আমাদের কথাবার্তা তো শুনতেই পারে। আমার সঙ্গে ও ভীমবেঠ্‌কাতেও এসেছে কতবার।'

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার। ওর কাছ থেকে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওকে এতখানি ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে কী করে ? বেশি নড়াচড়া করা উচিতও না !'

ভিখু সিংয়ের এখনও জ্ঞান ফেরেনি, আধা-অজ্ঞান অবস্থায় মাঝে-মাঝে আঃ আঃ শব্দ করছে। ওর একটা হাত আর পা প্রায় থেঁতলে গেছে মনে হয়। মাথাতেও চোট লেগেছে।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটাকে যদি ঘুরিয়ে এই পাহাড়ের নীচে আনা যায়, তা হলে ওকে এখান থেকে সহজে নামিয়ে দেওয়া যাবে।'

ঠিক হল মিংমা ওপরে গিয়ে শাকসেনার লোকদের খবর দেবে। মিংমা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না বলে শাকসেনা একটা কাগজে লিখে দিলেন কয়েক লাইন, মিংমা সেটা নিয়ে চলে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকাবাবু, ও এরকম সেজেছে কেন ?'

কাকাবাবু বললেন, 'ইতিহাসের পণ্ডিতের চাকর তো, শুনে-শুনে ও নিজেও ইতিহাসের অনেক কিছু জেনে গেছে। অনেক বইতে ছবি-টবিও দেখেছে নিশ্চয়ই। ভেবেছে গুহামানব সেজে থাকলে কেউ ওকে দেখলেই ভয়ে পালাবে।'

শাকসেনা বললেন, 'ঠিক বলেছ, ব্যাটা তাই ভেবেছিল নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় ও এখানে কিছু খোঁড়াখুঁড়িও করেছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'এর মধ্যেই একটা বেশ বড় গর্ত আমার চোখে পড়েছে। সেটা ওর একার পক্ষে খোঁড়া সম্ভব নয়। হয় ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল, কিংবা যে বা যারা ওকে মেরেছে, তারাও গর্ত খুঁড়েছে।'

আমি বললুম, 'কাকাবাবু, বোধহয় ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে, তাই ওকে ভাগ না দেবার জন্য ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

কাকাবাবু বললেন, 'কথাটা কিন্তু সন্তু একেবারে মন্দ বলেনি, দাদা? এখানে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু পাওয়া গেছে। নইলে, শুধু গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে, এই উড়ো কথাতেই তিনজন মানুষ খুন হয়ে গেল? কিছু পাবার পরে লোভ বেড়েছে, এমনও হতে পারে। সন্তু, দ্যাখ্ তো এদিকে এরকম গর্ত ক'টা আছে?'

আমি খানিকটা ঘুরে বেশ বড়-বড় পাঁচটা গর্ত দেখতে পেলুম। সবগুলোই এক-মানুষ, দু'মানুষ গভীর। একটা গর্তের মুখে বারুদের দাগ দেখে মনে হল, সেটা ডিনামাইট দিয়ে ওড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে দু-একটা গর্ত বেশ নতুন। একটাকে তো মনে হয় কালকেই খোঁড়া হয়েছে।

ফিরে এসে সে-কথা জানাতে কাকাবাবু বললেন, 'দেখলেন তো!'

শাকসেনা বললেন, 'কিন্তু ওরা সঙ্কেতের অর্থ জানবে কেমন করে? তা তো জানতে পারে না। যদি মনোমোহন কারুকে না বলে।'

'মনোমোহন তা হলে জানত?'

'মনোমোহন আমাকে পীড়াপীড়ি করেছিল ওর একটা অর্থ উদ্ধার করে দিতে, আমি স্টাডি করার তত সময় পাইনি তো, তবু একটা আন্দাজ করেছিলুম। মনোমোহন বলল, তাহলে সেই অনুযায়ী এক্সকাভেশান করা হোক। আমি বললুম, যদি গুপ্তধনের বেওপার হয়, তবে আগে সরকারকে সব জানাতে হবে। গুপ্তধন সাধারণত সরকারের সম্পত্তি হয়, অন্য কেউ নিতে পারে না। সরকারকে জানিয়ে কাজ শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, তাই বলেছিলাম, আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে।'

'নিশ্চয়ই মনোমোহন সেই কথা চেপে রাখতে পারেনি। অর্জুন শ্রীবাস্তব আর সুন্দরলালকেও বলেছিল কোনও এক সময়। সুন্দরলাল বলেছে তার ছেলেকে। আপনি বিদেশে ছিলেন, এই চারজনের কোনও একজনের কাছ থেকে শুনে ফেলেছে বাইরের কোনও লোক। তারপরই শুরু হয়েছে

গণ্ডগোল। আপনাকে বলা হয়নি, এই পাহাড়ে আরও একজন ঘুরছিল কাল রাত্রে, আমরা দেখেছি। সে হল মনোমোহনের চাকর, যার জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম ও এসেছিল প্রতিশোধের জন্য, কিন্তু এমনও হতে পারে, ও-ও এসেছে গুপ্তধনের লোভে।'

'বাপ রে, বাপ। আর বলো না, আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মানুষের এত লোভ ! ভিখু সিং, আমার এত বিশ্বাসের লোক ছিল···সে বেওকুফটা পর্যন্ত এখানে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে···'

কাকাবাবু বললেন, 'চলুন দাদা, ততক্ষণ গুহাটার ভেতরে একটু দেখে আসি।'

এই গুহাতেও একটু উঁচুতে, কয়েকটা পাথরের ওপর পা দিয়ে সিঁড়ির মতন উঠতে হয়। কাকাবাবু কারুর সাহায্য না নিয়ে উঠে পড়লেন ওপরে।

গুহাটা চৌকো ধরনের, প্রায় একটা ঘরের মতন। খাট-বিছানা পেতে এখানে বেশ ভালভাবেই থাকা যায়। কোনও পলাতক রাজার পক্ষে এখানে আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে সব দেয়ালগুলো দেখতে লাগলেন। কোনও দেয়ালেই কোনও ছবি নেই। ছবি দেখতে পাওয়া গেল ছাদে। পাশাপাশি নানা ভঙ্গির অনেকগুলো মানুষ। অন্য গুহাগুলোরই মতন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দমের মতন চেহারার মানুষ। আমি সংখ্যা গুনতে লাগলুম।

চিরঞ্জীব শাকসেনা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ইস্ ছি ছি ছি ছি ছি ! কী অন্যায় ! কী অন্যায় ! ভ্যাণ্ডাল্স ! এদের ফাঁসি হওয়া উচিত।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে ?'

'ঐ দ্যাখো ! দেখছ, ভাঙা জায়গা ? ছেনি কিংবা বাটালি দিয়ে কেউ ওখানে পাথর ভেঙে নিয়েছে।'

'ওখানে ছবি ছিল ?'

'আলবাত !'

'কেউ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে তারপর আসল ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যাতে আর কেউ এখান থেকে কোনও সূত্র না পায়।'

'ছি ছি ছি, এরকম মূল্যবান ছবি ! দেশের সম্পদ !'

আমি ততক্ষণে গুনে ফেলেছি। এখন ছবি আছে মোট সাতাশটা মানুষের। তার পাশে পাথরের চলটা উঠে গেছে অনেকখানি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আগে কি এখানে মোট চল্লিশ জন মানুষের ছবি ছিল ?'

চিরঞ্জীব শাকসেনা বললেন, 'না। সেইটাই তো মজা। সাঙ্কেতিক ভাষায় চল্লিশজন মানুষের উল্লেখ থাকলেও এখানে ছবি ছিল মোট একশো পঁয়তাল্লিশটা। আমরা খুব শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনেও দেখেছি, তার

পাশে আরও ছবি মুছে যাওয়ার চিহ্ন ছিল।'

'আচ্ছা দাদা, কতগুলো এরকম মানুষের ছবি দেখে কী করে একটা ভাষা পড়া যায়?'

'ওটা ছিল মনোমোহনের ব্যাপার। তবে দেখছ তো, প্রত্যেকটা ছবির হাত-পায়ের ভঙ্গি আলাদা? ঐ হাত-পায়ের ওঠা-নামার মধ্যেই একটা ভাষা থাকতে পারে। অনেকটা সিমাফোর-এর মতন। তুমি নিশ্চয়ই সিমাফোর কী তা জানো, আমি এই বাচ্চাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'শুনো সন্তু বেটা, সিমাফোর হচ্ছে একটা কথা-না-বলা ভাষা। অনেকটা তোমার টেলিগ্রাফের টরেটক্কার মতন। তুমি এখানে পোস্ট অফিসে বসে টরেটক্কা করো, বহুত দূরে আর একজন সেই ভাষা বুঝে যাবে। এই টরেটক্কাকে বলে মর্স কোড। আর সিমাফোর তারও আগের। মনে করো, তুমি একটা দ্বীপে একা বিপদে পড়ে আছ, দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে। তুমি চিৎকার করলেও তো সমুদ্রের আওয়াজের জন্য তোমার গলা কেউ শুনতে পাবে না। তখন যদি তুমি সিমাফোর কোড জানো, তাহলে একটা পতাকা কিংবা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঠিক-ঠাক নাড়লে জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পেরে যাবে। সামনের দিকে দু'বার নাড়লে বুঝবে খাদ্য, আর মাথার ওপর দু'বার ঘোরালে বুঝবে হিংস্র প্রাণী, এই রকম, বুঝলে তো?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এই গুহাবাসীরা সিমাফোর জানত?'

'সিমাফোর ঠিক নয়, ওরা নিজস্ব অন্য একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। মনোমোহন তার পাঠ উদ্ধার করেছে।'

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মূল ছবিগুলোর সব ছবি তোলা আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই, তবে মনোমোহনের কাছে অনেক রকম এই ছবি তোলা ছিল।'

'সবাই জানে, যে-তিনজন খুন হয়েছে, তাদের কিছু চুরি যায়নি। কিন্তু মনোমোহনের ঘর থেকে এই ছবিগুলো উধাও হয়ে গেছে কি না পুলিশ নিশ্চয়ই সে খোঁজ নেয়নি?'

'ঠিক বলেছ! পুলিশের একথা মাথাতেই আসবে না।'

'চলুন। এখানে আর কিছু দেখবার নেই। বাইরে যাই।'

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ভিখু সিং চোখ মেলেছে, কোনও রকমে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। চিরঞ্জীব শাকসেনাকে দেখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাদা, ওকে জিজ্ঞেস করুন, ওকে যে মেরেছে তাকে ও দেখতে পেয়েছিল কি না?'

কিন্তু ভিখু সিং কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু কেঁদেই চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর্। তোর ভয়

নেই, তোকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

কাকাবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা ঘটেছে নিশ্চয়ই কাল রাত্তিরে। ওপরে বসে পাহারা দিয়ে কোনও লাভ হল না। ওপরের গাড়ির রাস্তা দিয়ে না এসে যে-কেউ পাহাড়ের নীচে দিয়ে এদিকে আসতে পারে।'

একটু পরেই তলা থেকে মিংমার গলা পেলাম, 'আংক্‌ল সাব! আংক্‌ল সাব।'

বুঝলাম, গাড়ি এসে গেছে এদিকে।

মিংমা আর পুলিশ দু'জন ওপরে উঠে এল জঙ্গল ঠেলে। তারা তিনজনে ধরাধরি করে ভিখু সিংকে নামিয়ে নিয়ে চলল।

চিরঞ্জীব শাকসেনা কাকাবাবুকে বললেন, 'রাজা, তুমিও চলো আমার সঙ্গে। এখানে থেকে আর কী করবে।'

ভেবেছিলুম কাকাবাবু সে-কথা শুনবেন না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কাকাবাবু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন। এখানে আর থেকে কী হবে। এখানে সত্যিই যদি গুপ্তধন থাকে, তবে তা উদ্ধার বা রক্ষা করবার দায়িত্ব সরকারের, আমাদের তো নয়।'

॥ নয় ॥

আমাদের খাটিয়া আর সব জিনিসপত্তর পড়ে রইল পাহাড়ের ওপরে, সাধুবাবার আশ্রমে। আমরা ফিরে এলুম ডক্টর চিরঞ্জীব শাকসেনার গাড়িতে।

মিংমা আর আমি নেমে গেলুম আরেরা কলোনির কাছে। কাকাবাবু যাবেন ভিখু সিংকে নিয়ে হাসপাতালে।

ছোড়দি তো আমাদের ফিরতে দেখে অবাক। এত তাড়াতাড়ি আমাদের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমিও বেশ একটু নিরাশ বোধ করছি। ভেবেছিলুম ভীমবেঠ্‌কা পাহাড়ে অন্তত দিন সাতেক থাকা হবে। জলের কলসি-টলসি কেনা হল, কোনও কাজে লাগল না। বেশ লাগছিল কিন্তু ওখানে থাকতে।

তাছাড়া খুনিরাও তো ধরা পড়ল না!

রত্নেশদা, ধীরেনদা, নিপুদারা সবাই অফিসে। দীপু আর আলোও স্কুলে গেছে। দুপুরে কিছু করার নেই, আমি তাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমোলুম। মিংমা ঘুমোয় না, ও সারা দুপুর খেলা করল কুকুরটাকে নিয়ে।

কাকাবাবু ফিরলেন বিকেলে। উশকো-খুশকো চুল, ক্লান্ত চেহারা। মনে হয় সারাদিন কিছুই খাননি। সঙ্গে একটা বিরাট ব্যাগ ভর্তি অনেক রকম কাগজ আর বইপত্তর।

ছোড়দিকে বললেন, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরি করো তো, আমি স্নানটা করে আসি।'

বিকেলের দিকে খবর পেয়ে ধীরেনদা ছুটে এলেন কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, কাকাবাবু, খুনি ধরা পড়ল না ?'

কাকাবাবু বললেন, 'খুনি ধরা তো আমার কাজ নয়। ভীমবেঠ্কার সঙ্গে যে ঐ তিনটে খুনের সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন পুলিশ খুনিদের খুঁজে বার করবে। খুনের মোটিভ বা কারণটা জানা গেলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।'

ধীরেনদা বললেন, 'যাঃ। আমরা খুব আশা করেছিলুম আপনিই ওদের শাস্তি দেবেন।'

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'নাঃ, এবারে আর তা হল না। এক হিসেবে ধরতে পারো, এবারে আমার হার হল। ঐ সব সাংঘাতিক খুনির সঙ্গে আমি পারব কেন! পুলিশই পারতে পারে।'

ধীরেনদা বললেন, 'এখানকার পুলিশ…আমার অত বিশ্বাস নেই।'

'কাল থেকে ভীমবেঠ্কার ঐ গুহাগুলোও পুলিশ পাহারায় থাকবে, যাতে ওখানে কেউ আর খোঁড়াখুঁড়ি করতে না পারে। সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

'কাল থেকে ? যদি আজ রাত্তিরেই ওরা এসে কিছু করে যায় ?'

'সেটাও সরকারের দায়িত্ব। তবে…'

কাকাবাবু কথা বলতে-বলতে থেমে চুপ করে রইলেন। একটু ভেবে আবার বললেন, 'তবে এমনও হতে পারে, কাল থেকে পুলিশ হয়তো পুরো ভীমবেঠ্কা পাহাড়ই ঘিরে রাখবে, কোনও লোককেই যেতে দেবে না। আমাদের জিনিসপত্রের কী হবে ? সেগুলো আনব কী করে ? বিশেষত আমার ট্রান্সমিশান সেট্টাও ওখানে পড়ে আছে।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই যেতে দেবে। তা কখনও হয় ?'

'বলা তো যায় না! বরং এক কাজ করা যাক, এই তো সবে সন্ধে হচ্ছে, এখনই গিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে আসা যাক। আমার ট্রান্সমিশান সেট্টা হারালে খুব মুশকিল হবে!'

'সেটা এমনি ফেলে এসেছেন ?'

'সাধুবাবার কাছে জমা দিয়ে এসেছি। ধীরেন, তোমার গাড়ির ড্রাইভার আছে না ?'

'আমিই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না, না, তার দরকার নেই। তোমাকে যেতে হবে না। ড্রাইভার থাকলেই হবে, আমরা যাব আর আসব।'

'তা হয় না, কাকাবাবু, এই রাত্তিরে আপনাকে আমরা একলা যেতে দেব না। আমি যাবই আপনার সঙ্গে।'

'ধীরেন, তুমি জানো না। ঐ সন্তুকে জিগ্যেস করো, আমি একবার না বললে

আর হ্যাঁ হয় না। আমি বলছি, তোমার যাবার দরকার নেই।'

'আপনি কেন একথা বলছেন, আমি জানি। আপনি ভাবছেন, আমার যদি কোনও বিপদ হয়, তাহলে আমার স্ত্রী আর ছেলেরা আপনাকে দোষ দেবে! যে ড্রাইভার বেচারা যাবে, তারও স্ত্রী আছে, দুটো বাচ্চা আছে। তার বিপদ হলেও সেই একই ব্যাপার। তা ছাড়া আপনি না থাকলেও আমি মাঝে-মাঝে এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি নিই। চলুন, আর দেরি করে লাভ নেই, বেরিয়ে পড়া যাক।'

'তুমি যাবেই বলছ? বেশ! তুমি ফায়ার আর্মস চালাতে পারো? তোমার আছে কিছু?'

'এক কালে আমার শিকারের শখ ছিল। কিন্তু এখন তো বন্দুক পিস্তল কিছু নেই আমার। একটা বড় ছুরি আছে। ওঃ হ্যাঁ, রত্নেশের তো রাইফেল আছে, সেটা নিতে পারি?'

'তাই নাও। একটা কিছু হাতিয়ার সঙ্গে রাখা ভাল।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবু কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন একটা ব্যাগ। ভীমবেঠ্‌কায় পৌঁছবার আগেই নেমে এল অন্ধকার। এখানকার রাস্তা অবশ্য অন্য অনেক পাহাড়ি রাস্তার মতন তেমন বিপজ্জনক নয়। হেডলাইট জ্বেলে ধীরেনদা সাবধানে চালাতে লাগলেন গাড়ি।

কালকের মতন আজও সাধুবাবা চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, 'এখন ওঁকে ডাকা ঠিক হবে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

আশ্রমের পেছন দিকে আমাদের গোটানো খাটগুলো পেয়ে গেলুম। কিন্তু স্টোভ আর অন্যান্য জিনিসপত্র কিছু নেই। সেগুলো হয়তো সাধুবাবা আশ্রমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সাধুবাবার অনুমতি না নিয়ে আশ্রমের মধ্যে ঢোকা উচিত নয়।

আমরা সকালে চলে যাওয়ার সময় সাধুবাবাকে একটা খবরও দিয়ে যেতে পারিনি। উনি কী ভেবেছেন, কে জানে!

নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম এদিক ওদিক। আজ আর তেমন অন্ধকার নয়, আকাশ বেশ পরিষ্কার।

ধীরেনদা চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন, 'সাধুজির ধ্যান কখন ভাঙবে? যদি সারারাত উনি ঐরকম বসে থাকেন?'

ধীরেনদা এই কথা বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কালকের মতন গোরুটা দু'বার ডেকে উঠল, হাম্‌বা! হাম্‌বা!

তারপরই সাধুবাবা বললেন, 'ব্যোম্ ভোলা, মহাদেও, শঙ্করজি!'

আশ্চর্য! সত্যিই তো দেখা যাচ্ছে, এই গোরুটা একদম ঠিক ঘড়ির মতন।

কাকাবাবু বললেন, 'নমস্কার, সাধুজি!'

সাধুজি বললেন, 'রায়চৌধুরীবাবু, আপলোগ অচানক চলে গ্যয়ে ম্যায় শোচ্‌তা হুঁ...'

কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়েছিলুম, তাই আপনাকে আর খবর দিতে পারিনি। আমার জিনিসপত্র...'

সাধুবাবা জানালেন যে, সেগুলো আশ্রমের মধ্যে আছে। ভেতরে ঢুকে তিনি একে-একে সবই এনে দিলেন।

কাকাবাবু সাধুবাবাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাধুজি, আমরা চলে যাবার পর আর কেউ এসেছিল ? আপনার নজরে কিছু পড়েছে ?'

উনি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

'জানেন, সাধুজি, এই পাহাড়ে গুপ্তধনের হদিস পাওয়া গেছে ?'

সাধুবাবা হিন্দিতে বললেন যে, গুপ্তধন ? তা বেশ তো ! তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁর তো কোনও জিনিসে প্রয়োজন নেই।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার, সাধুজি। আবার পরে এলে দেখা হবে।'

মালপত্রগুলো সব নিয়ে আসা হল গাড়ির কাছে। ওপরের কেরিয়ারে বাঁধা হল খাটগুলো। আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি, কাকাবাবু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। উনি যেন শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন পাহাড়টাকে। কিন্তু আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখবার নেই অবশ্য। অন্ধকার গুহাগুলোর দিকে তাকিয়ে আজও আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে।

কাকাবাবু বললেন, 'এত দূর এলুম যখন, একবার গুপ্তধনের খোঁজ করে যাব না ?'

ধীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকাবাবু, আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, এখানে গুপ্তধন আছে ? আমি কিন্তু এখনও ঠিক...'

'তোমাকে কেন আনতে চাইনি জানো ধীরেন ? গুপ্তধন পেলে তোমাকেও ভাগ দিতে হবে, সেই জন্য !'

আমি আর ধীরেনদা দুজনেই অবাক। কাকাবাবুর মুখে এরকম কথা আমি কখনও শুনিনি। উনি গুপ্তধনের জন্য লোভ করবেন, তা হতেই পারে না।

কাকাবাবু বললেন, 'মিংমা, চলো তো আমরা একবার নীচের সেই গুহাটা থেকে ঘুরে আসি। ধীরেন আর সন্তু এখানে অপেক্ষা করুক।'

ধীরেনদা বললেন, 'আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে এতখানি নীচে নামবেন ? এ যে অসম্ভব ব্যাপার।'

'অসম্ভব বলে আবার কিছু আছে নাকি ? ছবির ভাষার যে সঙ্কেত তা আমি বুঝতে পেরে গেছি। সেটা সত্যি কিনা আজই আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল থেকে পুলিশ পাহারা দেবে...তোমরা দুজনে এখানে

অপেক্ষা করো বরং...'

ধীরেনদা কাকাবাবুকে থামাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাকাবাবু যাবেনই গুপ্তধনের সন্ধানে। তাহলে ধীরেনদা আর আমারও এখানে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

এবার আমার সত্যিকারের ভয় করতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়া কিংবা নীচে গড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তো আছেই। তা ছাড়া কে কোথায় লুকিয়ে আছে, ঠিক নেই। যে-কেউ পাথর ছুঁড়ে কিংবা গুলি করে আমাদের মেরে ফেলতে পারে।

ঠিক হল সবাই যাব, একসঙ্গে, পরস্পরকে ছুঁয়ে থেকে। আমার আর মিংমার হাতে টর্চ, সামনে রাইফেল হাতে ধীরেনদা, একদম পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু!

নামতে নামতে এক-একবার কোনও শব্দ শুনেই চমকে উঠছি আমরা। হয়তো আমাদেরই পায়ের শব্দ কিংবা পায়ের ধাক্কায় ছিটকে-যাওয়া কোনও নুড়ি। মাথার ওপর দিয়ে শান্-শান্ করে উড়ে গেল একদল বাদুড়। এই অন্ধকারের মধ্যে ক্রাচে ভর দিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে নামা যে কত শক্ত, তা আমরা বুঝব কী করে! দু'পায়ে ভর দেওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই হড়কে যাচ্ছে আমাদের পা, কাকাবাবু কিন্তু একবারও পিছলে গেলেন না।

বেশি নীচে নামতে হল না। মাঝামাঝি এসে এক জায়গায় কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'দ্যাখ তো, সন্তু, সামনের গুহাটার নম্বর কত ?'

কোনও-কোনও গুহার বাইরে আলকাতরা দিয়ে নম্বর লেখা আছে বটে। এখানে একটা গুহার বাইরে লেখা 'আর এস্ ফিফ্‌টি টু'।

কাকাবাবু বললেন, 'তা হলে দ্যাখ আর এস্ ফিফটি ফোরটা কাছাকাছি হবে।'

টর্চের আলো ঘোরাতেই এক জায়গায় দুটো আগুনের মতন চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

আমি চমকে উঠতেই ধীরেনদা বললেন, ওটা নিশ্চয়ই কোনও পাখি। হ্যাঁ, এই তো প্যাঁচাটা এত আলো দেখেও নড়ে-চড়েনি। একদৃষ্টে চেয়েছিল আমাদের দিকে। আমি আর মিংমা হুস্-হাস্ করতে অনিচ্ছার সঙ্গে উড়ে গেল। গুহাটার মধ্যে খুব ভাল করে দেখলুম যে, আর কিছু নেই। তারপর ঢুকে পড়লুম সেটার মধ্যে।

এক দিকের দেয়ালে দেখলুম, পর পর কয়েকটা মানুষের ছবি, আর দুটো জন্তুর, খুব সম্ভবত মোষের।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু, ছবি আছে।'

'ক'টা মানুষ ?'

'তেরোটা।'

'অন্য দেয়াল দ্যাখ।'

আরেকটি দেয়ালেও এক সার মানুষ রয়েছে। এখানে আছে পাঁচটা। পেছন দিকের দেয়ালে নটা।

সে-কথা কাকাবাবুকে জানাতে উনি বললেন, ভাল করে ছাদটাও দেখতে।

'হ্যাঁ, ছাদেও ছবি আছে অনেকগুলো। এখানেও তেরোটা।'

কাকাবাবু বললেন, 'তাহলে কত হল?: চল্লিশ না? ঠিক আছে এবারে বেরিয়ে আয়।'

শরীরটা একবার কেঁপে উঠল আমার। চল্লিশ মানুষ! গুপ্তধনের সংকেতে চল্লিশজনের উল্লেখ আছে। তা হলে কি এখানেই আছে সেই গুপ্তধন?

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টর্চের আলোয় দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মিলেছে। আমি দুপুরে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি, কোন্ গুহায় কত ছবি আছে, তার লিস্ট আছে সেখানে। দুটো মোষের ছবিও দেখিসনি?'

'হ্যাঁ। দেখেছি, কাকাবাবু!'

'এবার দ্যাখ তো, পাশের গুহাটায় কী আছে?'

সে-গুহাটায় ঢুকে দেখলুম, সেখানে আর কোনও ছবি নেই, শুধু দুটো মোষের ছবি।

কাকাবাবু নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা শাবল বার করে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আর একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না! এই দুটো গুহার মাঝখানেই আছে সেই গুপ্তধন। চটপট গর্ত করে দেখতে হবে।'

প্রথমে ধীরেনদা চেষ্টা করলেন শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়বার। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কিছু মাটিমেশানো জায়গাও আছে। সেখানে ছাড়া অন্য জায়গায় শুধু শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়া প্রায় অসম্ভব। ধীরেনদা খানিকটা খুঁড়বার পর মিংমা ওঁর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে জোরে-জোরে গর্ত খুঁড়তে লাগল। বেশ কিছুটা গর্ত করার পর ঠং-ঠং শব্দ হতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।'

তিনি গর্তটার পাশে বসে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। কিছুই নেই, শুধু কঠিন পাথর।

কাকাবাবু দ্বিতীয়টাও পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'আর-একটা খুঁড়ে দ্যাখো, কিছু এখানে থাকতে বাধ্য।'

তৃতীয় গর্তটা অনেকখানি গভীর হল। এক সময় কাকাবাবু মিংমাকে বললেন, 'ব্যস, আর না। সরে এসো, আমি ভেতরটা খুঁজে দেখছি। সবাই টর্চ নিভিয়ে দাও তো একবার, কিসের যেন শব্দ পেলাম।'

বড়-বড় পাথরের ফাঁকে আকাশের আলো আসে না, টর্চ নেভাতেই আমরা ডুবে গেলাম ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে। সবাই কান খাড়া করে রইলাম।

দূরে যেন শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ হল। কেউ যেন হাঁটছে। তবে আওয়াজটা এত ক্ষীণ যে, মনে হয়, যে-ই হাঁটুক, সে আছে বেশ দূরে, কিংবা শেয়াল-টেয়ালের মতন ছোট কোনও প্রাণী।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু ফিসফিসিয়ে বললেন, 'একটু টর্চ জ্বালো একবার। মনে হয় কী যেন পেয়েছি!'

কাকাবাবু হাতটা তুললেন, তাতে একটা ধাতুর মূর্তি। প্রায় এক-হাত লম্বা একটা মানুষের মতন।

কাকাবাবু দারুণ উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'এই তো, সোনার মূর্তি। আমার ধারণা এরকম চল্লিশটা মূর্তি এখানে পোঁতা আছে। এর এক-একটার দাম কত হবে বলো তো, ধীরেন?'

ধীরেনদা এত অবাক হয়ে গেছেন যে, কথাই বলতে পারছেন না। সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি আমরা। এই তো দেখা যাচ্ছে একটা কত বড় সোনার মূর্তি। টর্চের আলোয় গা'টা ঝকঝক করছে।

কাকাবাবু বললেন,'অন্তত লাখ দু'এক টাকা এই একটারই দাম হবে। যথেষ্ট হয়েছে, চলো এবার। বেশি লোভ করা ভাল নয়। আমরা বে-আইনি কাজ করছি। তা ছাড়া যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।'

মিংমাকে তিনি বললেন চটপট গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে। তারপর আমরা ফেরার পথ ধরলুম। এত জোরে উঠতে লাগলুম যেন কেউ আমাদের তাড়া করে আসছে। গুপ্তধন নিয়ে পালাচ্ছি বলে ধক্‌ধক্‌ করছে বুকের মধ্যে।

বিনা বিপদেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওপরের রাস্তার দিকটায়। কাছে আসবার পর ভয় কেটে গেল। অন্ধকার গুহাগুলোর আশেপাশে যে-কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা, আমাদের কাছে একটা রাইফেল আর রিভলভার আছে।

গাড়িটাতে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলুম খানিকক্ষণ। তারপর কাকাবাবুর কাছ থেকে মূর্তিটা নিয়ে সবাই দেখলুম ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। মূর্তিটা বেশ ভারী। এতকাল মাটির তলায় ছিল, কিন্তু একটুও ভাঙেনি, শুধু রংটা একটু কালো হয়ে গেছে। তবু বোঝা যায় জিনিসটা সোনার।

ধীরেনদা বললেন, 'এবার তা হলে কেটে পড়ি আমরা?'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমাদের খিদে পায়নি? এত পরিশ্রম হল? আমার তো খিদেয় পেট জ্বলছে।'

ধীরেনদা বললেন, 'ওবায়দুল্লাগঞ্জে হোটেল খোলা থাকতে পারে। চলুন, সেখানে খেয়ে নেবেন।'

গাড়ির সামনের ঘাসের ওপর বসে পড়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'ভাবছি পথে কোনও বিপদ হবে কি না!

পাহাড় থেকে নামবার পথে যদি কেউ আমাদের গাড়ি আটকায় ? একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয় ? পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলের আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে থাকে··· আমাদের সঙ্গে এত দামি জিনিস··· । তার চেয়ে এক কাজ করলে তো হয়, রাত্তিরটা আমরা এখানেই থেকে যাই, সঙ্গে তো স্টোভ আর চাল-ডাল আছেই, মিংমা খিঁচুড়ি রাঁধবে ।'

ধীরেনদা বললেন, 'সারা রাত এখানে থাকবেন ?'

'কেন, অসুবিধের কী আছে ?'

'আমি যদি খুব জোর গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাই ?'

'তাতে বিপদ আরও বাড়বে । রাস্তার মাঝখানে পাথর ফেলে রাখলে আমাদের গাড়ি উলটে যাবে ! তার চেয়ে বরং এখানে সারা রাত জেগে পাহারা দেব । সেই তো ভাল !'

'বাড়িতে কিছু বলে আসিনি । ওরা চিন্তা করবে । ভেবেছিলুম, রাত দশটার মধ্যে ফিরব !'

'এখনই তো দশটা বেজে গেছে । তোমাদের বাড়িতে খবর দেবার ব্যবস্থা আমি করছি । থানায় খবর দিচ্ছি, ওরা তোমার বাড়িতে জানিয়ে দেবে ।'

কাকাবাবু ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশান সেটটা খুললেন । সেটাতে কড়কড় শব্দ হতেই উনি বললেন, 'রায়চৌধুরী স্পীকিং, ফ্রম দা ভীমবেঠ্‌কা হিলস···রায়চৌধুরী···'

মিংমা এই সব কথাবার্তা শুনে গাড়ি থেকে স্টোভটা বার করে জ্বেলে ফেলেছে । কাকাবাবু বললেন, 'আগে একটু চা করো । তারপর খিঁচুড়ি-টিচুড়ি হবে ।'

জলের কলসিগুলো কিন্তু সাধুবাবার আশ্রমের কাছে রয়ে গেছে ।

ধীরেনদা বললেন, 'চলো সন্তু, তুমি আর আমি ধরাধরি করে একটা কলসি এখানে নিয়ে আসি । দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে, আমাদের মুনলিট পিকনিক হবে ।'

আমি বললুম, 'ধীরেনদা, আপনার একবারও বুক কাঁপেনি ? আমার তো এখনও বুকের মধ্যে দুম্-দুম্ হচ্ছে । গুপ্তধনের জন্য গর্ত খোঁড়ার সময় সব সময় মনে হচ্ছিল, কারা যেন লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের দেখছে । এই বুঝি গুলি চালাল ।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছিল ? আমার এখন কী মনে হচ্ছে জানো ? রাত্তিরে যখন থেকেই যাওয়া হল, তখন আর-একবার ওখানে গেলে হয় না ?'

'আবার যেতে চান ?'

'আরও কত জিনিস আছে দেখতুম ! সত্যি, গুপ্তধনের একটা সাঙ্ঘাতিক নেশা আছে ।'

'যারা গুপ্তধন খুঁজতে যায়, তারা কেউ সাধারণত প্রাণে বাঁচে না ।'

'এর মধ্যে তিনজন খুন হয়েছে। কে জানে, তারাও আলাদাভাবে এখানে গুপ্তধনের জন্য এসেছিল কি না! এসে হয়তো কিছু পেয়েওছিল, খুন হয়েছে সেই জন্য!'

'তবু আপনি বলছেন, আবার যাব!'

'তবু ইচ্ছে করছে যেতে। তা হলেই বুঝে দ্যাখো কী রকম নেশা!'

জলের কল্‌সিগুলো বাইরেই পড়ে আছে। সাধুবাবা ঘুমোতে গেছেন। আমি আর ধীরেনদা একটা কল্‌সি দু'জনে ধরে তুললাম।

সেটাকে ধরাধরি করে কিছুটা নিয়ে এসেছি, এমন সময় কোথায় যেন প্রচণ্ড জোরে দুম্-দুম্ করে দুটো শব্দ হল। ঠিক যেন কামানের আওয়াজ কিংবা বোমা ফাটার মতন।

দু'জনে এতই চমকে গিয়েছিলুম যে, হাত থেকে পড়ে গেল কল্‌সিটা। দু'জনেরই মনে হল, কাকাবাবুর কোনও বিপদ হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলুম গাড়ির দিকে।

কাকাবাবুও আমাদের চিন্তায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এসে পৌঁছবার পর কাকাবাবু বললেন, 'যাক, তোমরা এসেছ, নিশ্চিন্ত! মিংমা, তোমার আর খিঁচুড়ি রাঁধতে হবে না, আমরা একটু বাদে ফিরে যাব।'

হাতের সোনার মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এটারও আর কোনও দরকার নেই।'

ধীরেনদা বললেন, 'কী হল ব্যাপারটা?'

কাকাবাবু হেসে বললেন, 'ওটা সোনার মূর্তি নয়। সাধারণ লোহার মূর্তির ওপর পেতলের পাত মোড়া!'

ধীরেনদা চোখ একেবারে কপালে তুলে বললেন, 'আপনি ঐ গুপ্তধনের জায়গায় এই লোহার মূর্তি পেয়েছেন? গর্তের মধ্যে?'

কাকাবাবু হাসলেন।

'মূর্তিটা গর্তে ছিল না। ছিল আমার ঝোলায়। অন্ধকারের মধ্যে গর্তে লুকিয়ে তারপর তোমাদের তুলে দেখিয়েছি। ওটা গুপ্তধনের জায়গাও না, ওখানে আমি দুটো ফাঁদ পেতে রাখতে গিয়েছিলাম। আমার কায়দাটা কাজে লেগে গেছে দেখছি। এক্ষুনি দেখতে পাবে। ওরে মিংমা, চা-টা অন্তত তৈরি করে ফ্যাল্।'

মিংমা ফ্লাস্কের জল নিয়ে সস্‌প্যানে চাপিয়ে দিল।

ধীরেনদা মাটি থেকে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমার আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি সে-রকম কথা একবার ভাবিওনি। গর্তের মধ্য থেকে বেরুল···কাকাবাবু, আমি কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও। বোমা ফাটল কোথায়? কারা ফাটাল?'

'আমি ফাটালাম!'

'আপনি ?'

'বোসো, বলছি। আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম যে, যারা গুপ্তধনের লোভে মানুষ খুন করেছে, তারা আজ রাতেই কিছু একটা হেস্তনেস্ত করার চেষ্টা করবে। কাল থেকে পুলিশ-পাহারা বসবে। আজ রাতে, অন্ধকারের মধ্যে যদি ঐ গুহা আর জঙ্গলে আট-দশটা লোকও লুকিয়ে থাকে, তাহলেও তাদের ধরা সম্ভব নয়। অন্ধকারে খুঁজে পাবে কী করে ? তাই আমি একটা ফাঁদ পাতলুম। অনেক চেষ্টা করে আজ দুপুরে এখানকার আর্মির কাছ থেকে আমি দুটো মিথেন বোমা জোগাড় করেছি। কোনও লোহার জিনিস দিয়ে ছুঁলেই এই বোমা ফেটে যায়। তখন দুশো ফুটের মধ্যে যত মানুষ থাকবে সবাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। যেখানে আমরা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলাম, ওখানে গুপ্তধন থাকার কোনও কথাই নয়। তবু ওখানে গর্ত খুঁড়িয়ে একটাতে এই রকম আর-একটা পেতলের মূর্তি, আর দুটোতে দুটো বোমা আমি লুকিয়ে রেখে এসেছি তখন। জানতুম, আড়াল থেকে কেউ-না-কেউ আমাদের লক্ষ করবেই। ঠিক সেটাই হয়েছে। ঐ শোনো !'

এবার জঙ্গলে শোনা গেল অনেক হুইশেলের শব্দ, মানুষের গলার আওয়াজ। আর বড়-বড় ফ্লাশলাইটের আলো ঝলসে উঠল। কৌতূহল সামলাতে না-পেরে আমরাও এগিয়ে গেলুম খানিকটা।

প্রায় কুড়িজন পুলিশ মিলে বয়ে নিয়ে এল আটজন ঘুমন্ত বন্দীকে। আমি চমকে উঠলুম তাদের মধ্যে প্রথমেই সাধুবাবাকে দেখে।

ধীরেনদা বললেন, 'ইশ, সাধুবাবা পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারেননি !'

কাকাবাবু বললেন, 'ইনি আসল সাধুবাবা নন। আগের বার এসে দেখেছিলাম দু'জন সাধুকে। ও ছিল চেলা। আসল বড় সাধুবাবা কাশীতে তীর্থ করতে গেছেন।'

পুলিশের অফিসার বললেন, 'আরও তিনজনকে চিনতে পারা গেছে। একজন মিউজিয়ামের দারোয়ান, একজন পুলিশের লোক, আর এই যে গোঁফওয়ালাটিকে দেখছেন, এ সেই কুখ্যাত ডাকাত রামকুমার পাধি, খুনগুলো সম্ভবত এ-ই করেছে। ভোজালি দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেলা এর স্টাইল। ওর নামে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে।'

কাকাবাবু বললেন, 'আর সবাইকেও চিনতে পারবেন ঠিকই। সবই এক জাতের পাখি। এদের একটু চাপ দিলেই জানতে পারবেন, কোথায় এরা সুন্দরলালের ছেলে প্রেমকিশোরকে আটকে রেখেছে। সম্ভবত প্রেমকিশোরের মুখ থেকেই এরা প্রথমে ব্যাপারটা জানতে পারে। তার কী সাঙ্ঘাতিক পরিণতি !'

পুলিশ অফিসারটি বললে, 'স্যার, আপনি যে অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে এরকমভাবে ওদের ধরতে আমাদের সাহায্য করবেন...'

কাকাবাবু সে-কথা না-শুনে মিংমার দিকে ফিরে বললেন, ‘কই রে, তৈরি হল না এখনও ? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এখন ভাল করে এক কাপ চা খেতে চাই।’

জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল

সন্তুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই, তুই ঘুমোচ্ছিস ? দ্যাখ, দ্যাখ, আমরা এসে গেছি !"

সন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে একটুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনেই পড়ল না, সে কোথায় রয়েছে। সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল, একটা স্বপ্ন দেখছিল। সে যেন ফিরে গেছে আন্দামানে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছে একটা মোটর-বোটে, দু' পাশে গাঢ় নীল জল, মাঝে-মাঝে ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে উঠছে চড়াইপাখির মতন। উড়ুক্কু মাছ...পাশেই, একটা বড় দ্বীপ, ঘন জঙ্গলে ভরা, মোটর-বোটের আওয়াজ শুনে সেই জঙ্গল ভেদ করে ছুটে এল জারোয়ারা, হাতে তাদের তীরধনুক...তারা সন্তুকে চিনতে পেরেছে, শুধু তাই নয়, তারা বাংলাও শিখে গেছে, তারা সবাই মিলে হাত তুলে ডাকছে, 'সন্তু, এসো, এসো, কোনও ভয় নেই, এখানে এসো...'

দু' হাতে চোখ ঘষে ভাল করে তাকিয়ে সন্তু আবার দেখল, কোথায় আন্দামানের সমুদ্র ? সে বসে আছে একটা প্লেনে, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। পাশের সিটে বসে আছেন কাকাবাবু, তিনি কী যেন বলছেন, সন্তু ভাল শুনতে পাচ্ছে না।

কাকাবাবু এত কাছ থেকে কথা বলছেন, তবু সন্তু বুঝতে পারছে না কেন ? প্লেন চলার শব্দও তার কানে আসছে না। তার কানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেকখানি বাতাস।

কাকাবাবু তার অবস্থাটা বুঝতে পেরে হেসে ঝুঁকে এসে সন্তুর নাকটা চেপে ধরলেন, তারপর তার মাথায় মারলেন একটা চাপড়। তাতে ভুস্ করে তার কান থেকে যেন খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে গেল, অমনি সে শুনতে পেল প্লেনের গর্জন।

কাকাবাবু বললেন, "সিট-বেল্ট বেঁধে নে। একটু বাদেই আমরা পৌঁছে যাব !"

এতক্ষণে সন্তুর সব মনে পড়ে গেছে। সিট-বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে সে ঝুঁকে

পড়ল জানলার কাচের ওপর। ইশ, কতটা সময় সে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে কে জানে! কিন্তু একটা সময় কিছুই দেখার ছিল না, শুধু মেঘ আর মেঘ, ধপধপে সাদা দুধ-সমুদ্রের মতন মেঘ। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন আপনাআপনি চোখ বুজে এসেছে।

প্লেনটা বিমানবন্দরের ওপর দিয়ে ঘুরছে, গতি কমে এসেছে, এক্ষুনি ল্যান্ড করবে। সন্তু আনন্দমেলায় একটা লেখাতে পড়েছিল যে, একবার এই নাইরোবি এয়ারপোর্টেই দুটো সিংহ এসে ঢুকে বসে ছিল। তা হলে কাছেই নিশ্চয়ই ঘন জঙ্গল আছে। কিন্তু সন্তু জানলা দিয়ে কোনও জঙ্গল দেখতে পেল না, শহরের উঁচু-উঁচু বাড়ি, আর শহরের বাইরে বিশাল ধু-ধু করা মাঠ চোখে পড়ে, তার মধ্যে-মধ্যে ছোটখাটো ঝোপঝাড়। তা হলে এখানে সিংহ এসেছিল কোথা থেকে?

প্লেন যখন আকাশ দিয়ে চারশো-পাঁচশো মাইল স্পিডে যায় তখন গতিবেগটা কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু নামবার সময় যখন স্পিড অনেক কমে আসে তখন মনে হয় কী প্রচণ্ড জোরে ছুটছে! মাটিতে নামার পর এক মিনিটে অনেকখানি দৌড়ে গিয়ে হঠাৎ প্লেনটা শান্তশিষ্ট হয়ে যায়।

সিট-বেল্ট খুলে সবাই যখন নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন কাকাবাবু বললেন, "তোর হ্যান্ডব্যাগ থেকে সোয়েটারটা বার করে নে, সন্তু। বাইরে বেরোলে শীত করবে।"

আফ্রিকার নাম শুনলেই মনে হয় খুব গরম দেশ। তা ছাড়া এখন মে মাস। কিন্তু কাকাবাবু আগেই বলে রেখেছিলেন যে, কেনিয়া দেশটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মকালেও একটু বৃষ্টি হবার পরেই শীত করে।

সন্তুরা প্লেনে চেপেছে বম্বে থেকে। সেখানে অসহ্য গরম। মা যদিও সন্তুর সুটকেসে নতুন-বানানো একজোড়া প্যান্ট-কোট ভরে দিয়েছেন, কিন্তু বম্বেতে সেসব পরার প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর ধারণা ছিল, প্লেনে সবাই খুব সাজগোজ করে ওঠে, কিন্তু এই প্লেনে বিদেশিরা প্রায় সবাই পাতলা শার্ট গায়ে দিয়ে আছে, কেউ-কেউ পরে আছে স্রেফ গেঞ্জি। ভারতীয়রা যদিও অনেকেই বম্বে এয়ারপোর্টে সুট-টাই পরে ঘেমেছে। কাকাবাবুর কথায় সন্তু অবশ্য এমনি প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছে। একটা সোয়েটার রেখেছে সঙ্গের হ্যান্ডব্যাগে।

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্য সবাই না নেমে গেলে তাঁর পক্ষে যাওয়ার অসুবিধে। পেছন থেকে একজন যাত্রী এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি যান। আপনার ব্যাগটা আমাকে দিন।"

কাকাবাবু আপত্তি করার আগেই লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটি তুলে নিয়ে অন্য যাত্রীদের আটকে রাখল। এই সব অযাচিত সাহায্য কাকাবাবু পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন কথা বাড়াতে গেলে অন্যদের আরও দেরি হয়ে যাবে। তিনি চলতে শুরু করলেন।

সন্তু লক্ষ করল, লোকটির নিজের ব্যাগ আর কাকাবাবুর ব্যাগটা অবিকল একরকম। দুটোই কালো রঙের, একই সাইজের। কাকাবাবুর ব্যাগে অবশ্য তাঁর নাম লেখা আছে। তবু সন্তুর সন্দেহ হল, লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটা বদলে নেবে না তো ? লোকটি কাকাবাবুর ব্যাগটা বাঁ হাতে নিয়েছে, সে তীক্ষ্ণ নজর রাখল সেদিকে।

লোকটি বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, মাঝারি বয়েসি, একটা চকলেট রঙের সুট পরা। মাথার চুল এত বড় যে, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে।

প্লেন থেকে নেমে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।"

লোকটি বলল, "আমাকে আপনি চিনবেন কী করে ? তবে আপনাকে আমি চিনি। আমার নাম লোহিয়া, পি· আর· লোহিয়া, আমি এখানে ব্যবসা করি। আপনি বিশেষ কোনও কাজে এসেছেন নিশ্চয়ই ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এমনিই বেড়াতে এসেছি।"

লোকটি বলল, "বেড়াবার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা। তবে, আপনার মতন ব্যস্ত লোক তো কোথাও এমনি-এমনি বেড়াতে যায় না। আশা করি ওয়েদার ভাল পাবেন।"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "নাউ, ইউ হোল্ড দ্য ব্যাগ। আই মাস্ট হারি।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ।"

লোকটি বলল, "হয়তো আবার দেখা হয়ে যাবে। ছোট জায়গা তো !"

সন্তুর হাতে ব্যাগটা দিয়ে সে হনহন করে এগিয়ে ভিড়ে মিলে গেল।

সন্তু ব্যাগটা ভাল করে দেখল। কাকাবাবুর নাম লেখা আছে ঠিকই। নাঃ, শুধু-শুধু সব লোককে সন্দেহ করা তার একটা বাতিক হয়ে যাচ্ছে। লোকটি ভদ্র এবং পরোপকারী।

কাস্টমস্ চেকিং পার হতেই সন্তু দেখতে পেল দু'জন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা ওদেরই দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। তাদের একজনকেও সন্তু চেনে না। কাকাবাবুর মুখে সে শুনেছিল যে, এয়ারপোর্টে একজন লোক তাদের নিতে আসবে, সেই লোকটি কাকাবাবুর নাম লেখা একটা বোর্ড উঁচু করে ধরে থাকবে। সেইরকম অনেকেই নানান নাম লেখা বোর্ড হাতে তুলে আছে কিন্তু এই তিনজনের কাছে সে-রকম কিছু নেই।

গেটের কাছ থেকেই একজন জোরে বলে উঠল, "কাকাবাবু, সন্তু, ওয়েলকাম টু নাইরোবি !"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বল তো ! আজকাল বড্ড বেশি লোক আমাকে চিনে ফেলেছে ! এখানে আমাকে কেউ কাকাবাবু বলে ডাকবে, ভাবতেই পারিনি !"

সেই যুবকটি সন্তু আর কাকাবাবু দু'জনেরই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে বাংলায় বলল, "আমাকে দিন ! আমার নাম অমল, আর ওই যে আমার স্ত্রী মঞ্জু। আর ইনি মিঃ ধীরুভাই, ইনি আপনার এখানকার হোস্ট। ধীরুভাই আমাদের প্রতিবেশী, ওঁর মুখে যখন শুনলুম যে, আপনারা আসছেন, তখন আর এয়ারপোর্টে আসার লোভ সামলাতে পারলুম না। এখানে বাঙালি তো বিশেষ আসে না।"

ধীরুভাই বেশ বয়স্ক মানুষ, মাথার চুল কাঁচাপাকা; চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। প্যান্ট-শার্টের ওপর একটা জহরকোট পরে আছেন। তিনি কাকাবাবুর দিকে প্রথমে হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর আবার কাকাবাবুর একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "প্লেন একেবারে রাইট টাইমে এসেছে। আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি নিশ্চয়ই ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুমাত্র না।"

বাইরে ওদের সঙ্গে দু'খানা গাড়ি রয়েছে। দুটোই জাপানি গাড়ি। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, আকাশে এক ছিটে মেঘ নেই, একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, এখানে একটুও গরম নেই দেখছি।"

অমল বলল, "আপনাদের জন্য চমৎকার ওয়েদার ফিট করে রেখেছি, যাতে আপনাদের একটুও অসুবিধে না হয়।"

গোলাপি রঙের শাড়ি পরা মঞ্জু বলল, "আপনাদের জন্য তো হোটেল ঠিক করা আছে, কিন্তু আপনারা আমাদের বাড়িতে থাকবেন ? তা হলে আমরা খুব খুশি হব। আমরা আপনাদের ডাল-ভাত-মাছের ঝোল খাওয়াতে পারব, হোটেলে সেসব পাবেন না।"

ব্লু জিন্‌স আর হলদে গেঞ্জি পরা অমল বলল, "আপনারা এসেছেন, আমি অফিস থেকে ছুটি নেব। যেখানে যেতে চাইবেন আমি গাইড হয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "এঁরা যখন আমাকে নিয়ে এসেছেন, তখন আগে এঁদের হোটেলেই উঠি। পরে একসময় আপনাদের বাড়ি যাওয়া যাবে।"

অমল দু' হাত নেড়ে বলল, "ওসব 'আপনি-টাপনি' চলবে না। আমাদের 'তুমি' বলবেন !"

মঞ্জু বলল, "আমরা দু'জনেই আপনার খুব ভক্ত।"

অমল তার স্ত্রীকে বলল, "মঞ্জু, তুমি ক্যামেরা আনোনি ? তা হলে সন্তু আর কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের একটা ছবি তুলে রাখতুম।"

মঞ্জু বলল, "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, পরে ছবি তোলবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে..."

অমল সন্তুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "কাকাবাবু তো হোটেলে যেতে চাইছেন। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ? চলো না, অনেক গল্প শুনব তোমার কাছে।"

সন্তু বলল, "আমিও পরে যাব।"

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাকাবাবু আর সন্তু উঠে পড়ল ধীরুভাইয়ের গাড়িতে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমল আবার সন্তুকে বলল, "হোটেলে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নাও, আমরা একটু পরে আসছি। তারপর বেড়াতে বেরোব। আজই তোমাকে সিংহ দেখাব।"

নতুন দেশে এলে গলাটা কেমন শুকনো-শুকনো লাগে। অমল আর মঞ্জুর আপন-আপন ভাব আর বাংলা কথা শুনে ভাল লাগল তবু কিছুটা।

এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে, অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এসে ঢুকল নাইরোবি শহরে। বেশ চওড়া-চওড়া রাস্তা, পরিচ্ছন্ন আর উঁচু-উঁচু বাড়ি। সন্তুর মনে হল, সিনেমায় দেখা বিলিতি-বিলিতি শহরের মতন অনেকটা। রাস্তায় আলো, মানুষজন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অনেক ভারতীয়, শাড়ি-পরা মহিলাদের দূর থেকেই চেনা যায়, আবার বেশ কিছু সাহেব-মেমও রয়েছে।

গাড়ি এসে থামল হিলটন হোটেলের সামনে। গাড়ি চালাচ্ছিল একজন সাদা পোশাক পরা ড্রাইভার, সে তাড়াতাড়ি আগে নেমে দরজা খুলে দিল কাকাবাবুদের জন্য।

ধীরুভাই বললেন, "এই হোটেলে আমাদের একটা স্যুইট নেওয়া আছে পাকাপাকিভাবে। আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টাররা এসে থাকেন। তা ছাড়া সারা বছরই কোনও না কোনও অতিথি আসে। পাঁচ নম্বর ফ্লোরে পাঁচ নম্বর স্যুইট। আপনাদের আশা করি কোনও অসুবিধে হবে না। হোটেলে কোনও কিছুর জন্যই আপনারা পয়সা খরচ করবেন না। এমনকী ট্যাক্সি বা সিনেমার টিকিট চাইলেও হোটেল থেকে ব্যবস্থা করে দেবে। আপনারা শুধু বিলে সই করবেন। তা ছাড়া, আমি তো আছিই। যে-কোনও সময় দরকার হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন!"

একটি বেলবয় এসে ওদের সুটকেস দুটো তুলে নিতেই ধীরুভাই তাকে বললেন, "ফাইভ জিরো ফাইভ।"

বেলবয়টি মাথা নেড়ে একগাল হেসে বলল, "আই নো, আই নো!"

ভেতরে কাউন্টারে এসে খানিকটা কথা বলে ধীরুভাই বিদায় নিলেন। কাকাবাবু আর সন্তু লিফ্‌টে উঠে এল পাঁচ তলায়।

হোটেলের ঘর আর স্যুইটের মধ্যে যে কী তফাত তা সন্তু জানত না। ঘর তো হচ্ছে এমনিই একটা শোবার ঘর, আর স্যুইট মানে হল, দরজা খুলে ঢোকার পর জুতো-টুতো রাখার একটুখানি জায়গা, তারপর বসবার ঘর একটা, তাদের শোবার ঘর, পোশাক পালটাবার জন্য আর-একটা ছোট ঘর। বিরাট বাথরুম, বারান্দা সব মিলিয়ে যেন নিজস্ব একটা ফ্ল্যাটের মতন। টিভি, ফ্রিজ, কিছু ফল, কোল্ড ড্রিঙ্কস্‌ সবই সাজানো রয়েছে।

বেলবয়টি ওদের সুটকেস দুটো এনে গুছিয়ে রেখে, জানলার পর্দাগুলো খুলে

দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন কিছু চাই স্যার ?"

ছেলেটি প্রায় সন্তুরই বয়েসি। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো, দাঁতগুলো ধপধপে সাদা। তার মুখখানা হাসি-হাসি, দেখতে বেশ ভাল লাগে।

সন্তু তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী ?"

সে দু-তিনবার নাম বললেও সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। তারপর সে বানান করে বলল, "মাইকেল।"

কোথায় কবি মাইকেল আর কোথায় আফ্রিকার এক হোটেলের বেলবয়। দু'জনের একই নাম : সন্তু অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "এখানে অনেকেই ক্রিশ্চান। আর ক্রিশ্চানদের মধ্যে মাইকেল নাম খুব কমন। আজকাল শুধু মাইক বলে। ও প্রথমে ওর ডাকনামটাই বলছিল।"

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, "ইয়েস, ইয়েস, মাইক, মাইক !"

কাকাবাবু বললেন, "না মাইক, এখন কিছু লাগবে না। দরকার হলে ডাকব।"

সে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "টিপ্‌স, স্যার !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছে তোমাদের শিলিং নেই। পরে দেব।"

মাইক তবু বলল, "গিভ্ মি পাউন্ড, ডলার। নো ইন্ডিয়ান রুপিজ !"

কাকাবাবু তাকে একটি ব্রিটিশ পাউন্ড দিলেন, সে 'থ্যাং ইউ স্যার' বলে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "চালু ছেলে ! এখানকার টাকা হল শিলিং, বুঝলি, আমাদের কিছু টাকা ভাঙিয়ে শিলিং করে রাখতে হবে, নইলে ঠকাবে।"

সন্তু জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, "খুব সুন্দর জায়গা। আমি ভেবেছিলুম, জঙ্গল-টঙ্গলের মধ্যে ছোটখাটো একটা শহর হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গল আবার পাচ্ছিস কোথায় ? এখানে সেরকম জঙ্গল তো নেই।"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে জঙ্গল নেই ? তবে যে এখানে অনেক সিংহ আর অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে শুনেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "সিংহ তো জঙ্গলে থাকে না। সিংহ থাকে মরুভূমিতে কিংবা শুকনো জায়গায়, যেখানে কিছু ঘাস-টাস জন্মায়, যেখানকার মাটির রং সিংহের গায়ের মতন।"

সন্তু তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, "অনেক গল্পের বইটইতে ছবি আঁকা থাকে বটে যে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সিংহ হঠাৎ লাফিয়ে এসে মানুষকে আক্রমণ করছে ? আসলে সিংহ ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভালবাসে, আর চট করে মানুষকে আক্রমণও করে না। এখানে এসেছিস যখন, তখন তুই নিজের চোখেই সিংহ দেখতে পাবি, খুব

কাছে গিয়ে দেখবি !"

জামার বোতাম খুলতে খুলতে কাকাবাবু বললেন, "যাই, স্নানটা সেরে নিই। সন্তু তুই আগে যাবি নাকি ?"

সন্তু বলল, "না, তুমি করে নাও !"

বাথরুমের ভেতরটা একবার উঁকি মেরে আবার বেরিয়ে এসে কাকাবাবু বললেন, "কী দারুণ জায়গায় আমাদের রেখেছে রে, সন্তু। এত ভাল হোটেলে আমরা আগে কখনও থেকেছি ?"

সন্তু হাসি মুখে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

"আমরা এখানে বেশিদিন থাকব না, আর-একটা জায়গায় চলে যাব। সে-জায়গাটা নাকি আরও সুন্দর। ভুলাভাই তো সেই কথাই বলেছে। সেখানে তুই খানিকটা জঙ্গল পেতে পারিস। এবারে ডাকাত-গুণ্ডাদের পেছনে ছোটাছুটি করতে হবে না। কোনও রহস্যের সমাধান করতে হবে না। স্রেফ বেড়ানো আর বিশ্রাম। তোর খিদে পেয়েছে নাকি রে, সন্তু ?"

"না, প্লেনে তো অনেক খাবার দিয়েছিল।"

"আমি প্লেনের খাবার একদম খেতে পারি না। দাঁড়া, স্নান-টান করে নিই, তারপর বেরিয়ে দেখব, এখানে কী কী নতুন খাবার পাওয়া যায়। জেব্রার মাংসের রোস্ট, ফ্লেমিংগোর কাটলেট, জিরাফের ঝোল, এইসব চেখে দেখতে হবে !"

কাকাবাবু বাথরুমের দরজা বন্ধ করার পর সন্তু জানলার একটা কাচ খোলার চেষ্টা করতে লাগল। এয়ারকন্ডিশান্ড ঘর, এখানে বোধহয় কেউ জানলা খোলে না, তাই জানলাটা একেবারে টাইট হয়ে আটকে আছে। কিন্তু টাটকা হাওয়ায় নিশ্বাস না নিলে সন্তুর ভাল লাগে না।

জানলাটা খুলতে না পেরে সে বারান্দার দরজাটা খুলতে গেল। তক্ষুনি ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

এখানকার টেলিফোনটাও অন্যরকম দেখতে। ঘন দুধের সরের মতন রং। হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি নাকি ? রিসিভারটা বেশ ভারী।

রিসিভারটা তুলতেই চিবোনো-চিবোনো ইংরিজিতে খুব সরু গলায় একজন বলল, "রায়চৌড্রি ? রায়চৌড্রি ? ইজ দ্যাট র‍্যাজা রায়চৌড্রি ?"

সন্তু বলল, "রাজা রায়চৌধুরী বাথরুমে গেছেন। আপনি কে বলছেন ?"

"কল হিম ! কল হিম ! দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টান্ট !"

"আপনি কে বলছেন ?"

"ড্যাম ইট ! কল র‍্যাজা রায়চৌড্রি !"

সন্তু ভাবল রিসিভারটা রেখে দেবে। কোনও পাগল-টাগল নিশ্চয়ই। বিশেষ দরকার না হলে কাকাবাবু বাথরুমে ডাকাডাকি করা পছন্দ করেন না। এখানে সেরকম বিশেষ দরকার কী হতে পারে ? তা ছাড়া লোকটা এরকম

বিশ্রীভাবে কথা বলছে কেন ?"

সন্তু বলল, "আপনি কে এবং কী দরকার আগে বলুন। নইলে মিঃ রায়চৌধুরীকে এখন ডাকা যাবে না।"

"তুমি কে ? রায়চৌড্রির বেঁটে ভাইপোটা বুঝি ?"

এবার সন্তুর রাগ হয়ে গেল। সে বেঁটে ? এখনই তার হাইট পাঁচ সাড়ে পাঁচ, তার ক্লাসের কেউ তার চেয়ে বেশি লম্বা নয়, আর একটা কোথাকার পাগল তাকে বললে বেঁটে ?

সন্তু ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিল, তক্ষুনি অন্য একটা গলা শোনা গেল। এই গলার আওয়াজটা গম্ভীর। আগের পাগলাটিকে একটা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই গম্ভীর গলার লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী বাথরুমে ? তা হলে শোনো, তাকে এক্ষুনি একটা জরুরি খবর দিয়ে দিতে হবে। কাল সকালেই বম্বের একটা ফ্লাইট আছে, তাতে চার-পাঁচটা সিট এখনও খালি আছে। তুমি এবং তোমার আংক্‌ল কাল সকালেই সেই প্লেনে চলে যাবে এখান থেকে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, আমাদের কালই চলে যেতে হবে কেন ?"

"কারণ, এই দেশটা তোমাদের পক্ষে সেইফ নয়। রাজা রায়চৌধুরী যখন-তখন খুন হয়ে যেতে পারেন। আমি তোমাদের ভালর জন্যই এই কথা বলছি। আরও একটা কথা, আজ হোটেল থেকে বেরিও না, কাল সকালে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবে। রাজা রায়চৌধুরীকে এক্ষুনি এই কথা জানিয়ে দাও !"

এর পরেই লাইন কেটে গেল, সন্তু তবুও টেলিফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। এই সব কথার মানে কী ? হোটেলে পৌঁছবার পর আধ ঘণ্টাও কাটেনি, এর মধ্যেই কেউ টেলিফোনে তাদের ভয় দেখাচ্ছে ? যারা টেলিফোন করল, তারা কি কাকাবাবুকে সত্যি চেনে ? যদি চিনত তা হলে তারা ঠিকই জানত যে, এরকম বোকার মতন ভয় দেখিয়ে কাকাবাবুকে কোনও জায়গা থেকে সরানো যায় না।

সন্তুর ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। একটু আগেই কাকাবাবু বললেন, এখানে ডাকাত-গুণ্ডাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, এখানে স্রেফ বেড়ানো আর বিশ্রামের জন্য আসা। এ-কথা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারা যেন হুমকি দিল, এই দেশে কাকাবাবু যখন-তখন খুন হতে পারেন ! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, এরকম একটা কথা আছে না ?

২

বিকেল চারটের সময় অমল আর মঞ্জু এসে উপস্থিত। কাকাবাবু একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর সন্তু বসে-বসে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের গল্প পড়ছে, এখানে সে ওই একটা বই-ই সঙ্গে এনেছে।

দুপুরে ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে নিয়েছিল। জেব্রা-জিরাফের মাংস নয়, চিনে খাবার। তাদের হোটেলেই অনেক রকম খাবারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কাকাবাবু ছোটখাটো দোকানে বসে খেতে ভালবাসেন বলে বেরিয়েছিলেন। একটা ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি টাকা ভাঙালেন, পোস্ট অফিসে গিয়ে এ-দেশের কিছু স্ট্যাম্পও কিনলেন। খাওয়ার পর খানিকটা হাঁটা হল এদিক-ওদিক। রাস্তার দু'পাশে সাজানো দোকানপাট। সন্তুর আশ্চর্য লাগল দেখে যে, প্রায় সব দোকানই চালাচ্ছে ভারতীয়রা।

হোটেলে ফেরার পর রিসেপশান কাউন্টার থেকে কাকাবাবুকে একটা স্লিপ দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা আছে যে অশোক দেশাই নামে একজন লোক ফোন করেছিল, সে সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য হোটেলে আসবে।

তারপর নিজেদের স্যুইটে এসে কাকাবাবু বলেছিলেন, "তুই তো প্লেনে খুব ঘুম দিয়ে নিয়েছিস, সন্তু! আমার ঘুম হয়নি। আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নিই।"

অমল এসেই হইচই করে বলল, "এ কী, চুপচাপ বসে আছ? এমন চমৎকার দিনটা হোটেলে বসে কাটাবার কোনও মানে হয়? চলো, বেরোবে না? তৈরি হয়ে নাও!"

কাকাবাবুর খুব পাতলা ঘুম, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন।

মঞ্জু অমলকে মৃদু বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কাকাবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে তো? তুমি এত জোরে কথা বলো কেন?"

কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, "যা ঘুমিয়েছি, তাতেই যথেষ্ট হয়েছে। এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে।"

অমল বলল, "চলুন, সিংহ দেখতে যাবেন না? নাইরোবিতে এলে সবাই প্রথমে তো তাই-ই করে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কত দূরে যেতে হবে বলো তো? আমাকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে, একজন দেখা করতে আসবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মধ্যেই ফিরে আসা যাবে। বেশি দূর নয়।"

"এইটুকু সময়ের মধ্যে যাব আর সিংহ দেখে আসব? চিড়িয়াখানায় নাকি?"

অমল হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "মঞ্জু এবারে তুমি বলে দাও! গত বছর অনিলদা যখন এসেছিল, তাকে আমরা প্রথমদিনই সিংহ দেখিয়েছিলুম কি না!"

মঞ্জু বলল, "নাইরোবি শহরটাকেই বলতে পারেন চিড়িয়াখানা, মানুষরা এর মধ্যে থাকে। আর বাকি খোলা জায়গায় জন্তু-জানোয়াররা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি, বেরোলে দেখবেন, শহরের এক দিকটায় মাইলের পর মাইল লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। ওই জালের মধ্যে আমরা আছি, আর জন্তু-জানোয়াররা আছে বাইরে। মনে করুন, কলকাতা শহরটার একদিক জাল

দিয়ে আটকানো আর বেলেঘাটা, দমদম, ওইসব জায়গায় সিংহ, হাতি, গণ্ডার, এইসব ঘুরে বেড়াচ্ছে !"

অমল সন্তুকে জানলার কাছে টেনে এনে বলল, "ওই যে দূরে ফাঁকা জায়গা দেখতে পাচ্ছ, আমরা ওইখানটায় যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। সন্তু, রুম সার্ভিসে চার কাপ চা বলে দে তো !"

সন্তু টেলিফোন তুলে চায়ের অর্ডার দিল।

অমল জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, সন্ধেবেলা আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে আসবে জানতে পারি কি ?"

"অশোক দেশাই। তুমি চেনো ?"

"ওরে বাবা, তাকে কে না চেনে। সে তো বিরাট লোক।"

"বিরাট মানে ? খুব মোটা ?"

"না, বিরাট বড়লোক। জানেন তো, গুজরাটিরাই এখানকার অনেক ব্যবসা কন্ট্রোল করে। এই অশোক দেশাই তাদের মধ্যে আবার টপে। তবে, আজকালকার বড়লোকরা কিন্তু মোটা হয় না। বাড়িতে নিজস্ব সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে, টেনিস খেলে...এই অশোক দেশাই তো চালচলনে পাক্কা সাহেব।"

"এই অশোক দেশাইয়ের এক আত্মীয়, তার নাম ভুলাভাই দেশাই, সে থাকে আমেদাবাদে। কিছুদিন আগে তার আমি একটা উপকার করেছি বলে সে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।"

"নিশ্চয়ই কোনও কেস হাতে নিয়ে এসেছেন ? না, না, আমি আগে থেকে জানতে চাই না, আস্তে-আস্তে শুনব। কিন্তু এই নাইরোবি শহরটা এক হিসবে নিরামিষ জায়গা, এখানে চুরি-ডাকাতি অবশ্য রোজ লেগেই আছে, খুন-টুনও হয়, কিন্তু তার চেয়ে বড় কিছু ঘটে না। আপনি তো আর সাধারণ খুন বা ডাকাতির ব্যাপারে আসবেন না !"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আরে না, না, আমি কোনও কাজ নিয়ে আসিনি, শুধু বেড়াতে এসেছি। জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনারা পি· আর· লোহিয়া বলে কাউকে চেনেন ?"

অমল ভুরু কুঁচকে বলল, "পি· আর· লোহিয়া ? না, কে বলো তো ?

মঞ্জু বলল, "পি· আর· লোহিয়া মানে পুরুষোত্তম রতনদাস লোহিয়া। বিরাট উকিল। লন্ডনেও কেস লড়তে যান। কাগজে প্রায়ই নাম বেরোয়।"

অমল বলল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো অতি ধুরন্ধর লোক। সরকারের উঁচু মহলে খুব চেনাশুনো। প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি তার বন্ধু। ওই অশোক দেশাইয়ের সব কোম্পানিরও উনি বাঁধা ল-ইয়ার। তুমি তাকে চিনলে কী করে ?"

সন্তু বলল, "আসবার সময় প্লেনে দেখা হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "লোহিয়া আমাকে বলেছিল, সে এখানে ব্যবসা করে।"

মঞ্জু বলল, 'বোধহয় নিজের আসল পরিচয়টা জানাতে চায়নি।"

সন্তু একবার ভাবল, দুপুরবেলা টেলিফোনের হুমকির ব্যাপারটা অমলদের জানাবে কি না! বাথরুম থেকে বেরিয়ে সন্তুর মুখে ওই টেলিফোনের কথাটা শুনে কাকাবাবু কোনও গুরুত্বই দেননি। উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটা নিশ্চয়ই ওই ছেলেটি, এয়ারপোর্টে যার সঙ্গে আলাপ হল, সেই অমলের কাণ্ড। তোর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে।

সে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, কাকাবাবুর অনুমান সত্যি কি না! কিছুই বোঝা গেল না। সন্তুর অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস, টেলিফোন করেছিল অন্য লোক।

সন্তু অন্যদিকে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, "আমরা 'চাঁদের পাহাড়' দেখতে যেতে পারি না? বিভূতিভূষণের লেখায় যে পাহাড়টার কথা পড়েছি।"

মঞ্জু বলল, "হ্যাঁ, যেতে পারো, তবে সেটা কেনিয়ায় নয়, উগান্ডায়। পাশের দেশ।"

অমল বলল, "সেখানে এখন মিলিটারির রাজত্ব। যখন তখন রাস্তা থেকে লোক তুলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। অবশ্য কাকাবাবুকে কেউ মারতে পারবে না।"

এই সময় একজন এসে চা দিয়ে গেল। মঞ্জু চা ঢেলে দিল সবাইকে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "স্বাদটা অন্যরকম।"

অমল বলল, "এখানকার চা। এতে আমাদের দার্জিলিংয়ের ফ্লেভার তো পাবেন না। সেইজন্য আমি কফি খাই। এখানকার কফি খুব ভাল।"

সন্তু দু'চুমুক দিয়ে রেখে দিল। তার এমনিই চা খেতে ভাল লাগে না।

একটু পরেই ওরা নেমে এল নীচে। হোটেলের ফুটপাথে অনেক গাড়ি রয়েছে বলে অমল তার গাড়ি পার্ক করেছে একটু দূরে। রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে।

অমল বলল, "কাকাবাবু, আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই, চলো, আমরা গাড়ির কাছেই যাচ্ছি।"

অমল কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, "না! রাস্তা পার হতে আপনার অসুবিধে হবে, দেখছেন না, কত গাড়ি যাচ্ছে! আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট করে নিয়ে আসছি গাড়িটা!"

কাকাবাবুর কিছু-কিছু ছেলেমানুষি জেদ আছে। কেউ যদি তাঁকে কোনও অসুবিধের কথা বলে, তা হলে তিনি সেটা করবেনই। ক্রাচ নিয়ে তাঁর হাঁটতে

অসুবিধে হবে, এরকম অনেকেই মনে করে।

তিনি জোর দিয়ে বললেন, "কোনও অসুবিধে নেই, আমরা গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যাব।"

মঞ্জু বলল, "সেটাই সুবিধে হবে, গাড়িটা আনতে গেলে অনেকটা ঘুরে আসতে হবে।"

ওরা মাঝ-রাস্তায় আসতেই হঠাৎ একটা থেমে-থাকা স্টেশান ওয়াগন ইউ টার্ন নিয়ে ছুটে এল ওদের দিকে। সোজা ওদের ওপর দিয়ে চলে যাবে মনে হল। চোখের নিমেষে যে-যেদিকে পারল লাফ দিল, কে যেন হাত ধরে টান মারল সন্তুর।

তারপরেই সে ঘুরে দেখল স্টেশান ওয়াগনটা অন্য দুটো গাড়িকে ধাক্কা মারতে মারতে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো।

রাস্তার দু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা বিরাট দুর্ঘটনা হতে-হতে বেঁচে গেল। সন্তু দেখল, কাকাবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামার ধুলো ঝাড়ছেন। সন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "দরকারের সময় আমি এই খোঁড়া পায়েই প্রায় হনুমানের মতন লাফাতে পারি। দ্যাখ তো, আমার ক্রাচ দুটো ঠিক আছে কি না!"

মঞ্জু ছুটে এসে বলল, "আপনাদের লাগেনি তো?"

অমল মুখ ভেংচিয়ে বলল, "এখানকার কিছু-কিছু লোক এমন বিচ্ছিরি গাড়ি চালায়, ট্রাফিকের কোনও নিয়ম মানে না...নিশ্চয়ই ওই ড্রাইভারটা নেশা করেছিল, নইলে এমন ভিড়ের রাস্তায় কেউ অত জোরে ইউ টার্ন নেয়?"

সন্তুর মুখখানা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এটা সাধারণ কোনও অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার নয়। লোকটা ইচ্ছে করেই তাদের চাপা দিতে এসেছিল। এক ঝলকের জন্য সন্তু ড্রাইভারটার মুখ দেখতে পেয়েছিল। গাল-ভর্তি দাড়ি, চোখে কালো চশমা, মাথায় ফেল্টের টুপি। টেলিফোনে যে ভয় দেখিয়েছিল, সে বলেছিল হোটেল থেকে না বেরোতে। সে বলেছিল, কাকাবাবুর প্রাণের ভয় আছে।

অমল ক্রাচ দুটো কুড়িয়ে এনে বলল, "আপনার একটা ক্রাচ ড্যামেজ হয়ে গেছে। বদলাতে হবে। তার কোনও অসুবিধে নেই। ক্রাচ দুটো চট করে ছেড়ে দিয়ে আপনি ভাল করেছেন।"

মঞ্জু বলল, "ক্রাচ সঙ্গে নিয়ে তো লাফানো যায় না! ইশ, আর-একটু হলে কী কাণ্ড হয়ে যেত!"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, শেষ পর্যন্ত কারও তো কিছু হয়নি। সুতরাং এটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না। ওই গাড়ির নম্বর টুকে রাখলেও কোনও কাজে লাগত না।"

মঞ্জু বলল, "বাবাঃ, আমার এখনও বুক কাঁপছে।"

গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। অমল তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে। কাকাবাবু সামনের সিটে বসেছেন, ক্রাচ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে গাড়ি চালানো যাবে না।

অমল জিজ্ঞেস করল, "তা হলে কি আগে আপনার ক্রাচটা বদলে আনব ?'

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "নাঃ, তার দরকার হবে না। তার দিয়ে বেঁধে কাজ চালাতে হবে। আমার বিশেষ একটা চেনা দোকান ছাড়া আমি অন্য যে-কোনও জায়গার ক্রাচ ব্যবহার করি না।" তারপর, যেন একটা মজার কথা বলছেন, এইভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "লোকটা আনাড়ির মতন গাড়ি চালিয়ে আমার একটা ক্রাচের ক্ষতি করে দিয়েছে, এজন্য ওর কিছু একটা শাস্তি পাওয়া উচিত। কী বলো ?"

অমল বলল, "ওকে আর আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?"

মঞ্জু বলল, "তাড়াতাড়ি চলো, এরপর সন্ধে হয়ে যাবে!"

ওরা ঠিকই বলেছিল, ন্যাশনাল পার্কের গেটে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। সেই গেটে টিকিট কেটে নিয়ে নিজস্ব গাড়িতেই ভেতরে ঢুকে পড়া যায়। একটা পিচ-বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গেছে, একটু পরেই ডান-দিকে বাঁ-দিকে মেঠো পথ কিংবা ইচ্ছে করলে মাঠের মধ্যেও নেমে পড়া যায়।

মাঝে-মাঝে একটা-দুটো বড় গাছ। আর সবই প্রায় ঘাসজমি, কোথাও কোথাও পাথুরে শুকনো মাটি। আমাদের দেশের ন্যাশনাল পার্ক বলতে যে বিশাল-বিশাল গাছের ঘন জঙ্গল বোঝায়, তার সঙ্গে কোনও মিলই নেই।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই দেখা গেল এক ঝাঁক হরিণ।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "পোষা ?"

মঞ্জু বলল, "ধ্যাত ? এখানে কোনও কিছুই পোষা নয়। এরপর এত ঝাঁকে-ঝাঁকে হরিণ দেখবে যে, তুমি একসঙ্গে অত গোরু-ছাগলও কখনও দ্যাখোনি।"

সত্যি তা-ই, নানারকম হরিণের ঝাঁক চোখে পড়তে লাগল অনবরত। এক জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল দুটো উটপাখি, অমল দ্রুত গাড়ি চালিয়ে গেল সেদিকে, কিন্তু তার আগেই ধুলো উড়িয়ে ছুটে সেই বিশাল পাখি দুটো উধাও হয়ে গেল যেন কোথায়!

আধঘণ্টার মধ্যেই ধৈর্য হারিয়ে অমল জিজ্ঞেস করল, "সিংহ কোথায় ? এই মঞ্জু, সিংহ দেখা যাচ্ছে না কেন ?"

মঞ্জু বলল, "আমি কী করে বলব ? আমি কি আগে থেকে অর্ডার দিয়ে সিংহ রেডি করে রাখব ?"

অমল বলল, "কিন্তু সেবার যে অনিলদাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিংহ দেখানো হল ?"

"অনিলদার লাক ভাল ছিল! সিংহরা তো সব সময় এক তল্লাটে থাকে

না।”

“জানেন কাকাবাবু, মঞ্জু এখানে একা-একা চলে আসে। ও মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার দেখতে বেশি ভালবাসে। ও এলেই নাকি সিংহ দেখতে পায়।”

“হ্যাঁ। আমার সিংহ দেখতে ভাল লাগে। যতবার দেখি, ততবারই ভাল লাগে। সিংহ'র কত ছবি তুলে নিয়ে গেছি, তাতেও তোমার বিশ্বাস হয়নি ?”

“এখানকার সিংহরা এমন ট্রেইন্ড হয়ে গেছে যে, ক্যামেরার সামনে দিব্যি পোজ মেরে দাঁড়ায়।”

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “ওটা কী ? ওটা কী ?”

সবাই একসঙ্গে ডান দিকে তাকাল। একটু দূরে ঘাসজমির পাশে একটা মস্ত বড় হরিণ শুয়ে ছটফট করছে, তার পেটটা চিরে গেছে অনেকখানি, সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত।

অমল ফিসফিস করে বলল, “হরিণটাকে মেরেছে, তা হলে সিংহটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে।”

মঞ্জু বলল, “উহুঁ তা মনে হয় না। সিংহ তো এমনি-এমনি হরিণ মারে না। খিদে পেলেই মারে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করে। ফেলে রেখে তো চলে যায় না।”

কাকাবাবু বললেন, “আমি যতদূর জানি, সিংহর বদলে সিংহীই শিকার করে বেশি। সিংহরা অলস হয়।”

মঞ্জু বলল, “আপনি ঠিকই বলেছেন। সিংহ-পরিবারে বউরাই খাটাখাটনি করে বেশি। তারাই খাবার জোগাড় করে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে বোধহয় একটা সিংহী এইমাত্র হরিণটাকে মেরে রেখে তার ছানাপোনা আর অলস স্বামীকে ডাকতে গেছে।”

অমল জিজ্ঞেস করল, “মঞ্জু, এই হরিণটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা যায় না ? আমাদের গাড়িতে যদি তুলে নিই, গেটের সামনেই ওদের হাসপাতাল আছে।”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, চলুন, তুলে নিই !”

সন্তু গাড়ির দরজা খুলতে যেতেই মঞ্জু তার হাত চেপে ধরে বলল, “তোমরা কি পাগল হয়েছ ? এসব জায়গায় কক্ষনো গাড়ি থেকে নামতে নেই। গাড়ি থেকে নামলে যখন-তখন বিপদ হতে পারে। এই ঘাসবনে যদি কোনও লেপার্ড লুকিয়ে থাকে...ওরা কী রকম পাজি হয় তোমরা জানো না...”

কাকাবাবু বললেন, “সে-কথা ঠিক, গাড়ি থেকে নামাটা বিপজ্জনক। আইনেও বোধহয় নিষেধ আছে। তা ছাড়া, আমার তো মনে হয়, জঙ্গলের রাজত্বে জন্তু-জানোয়ারদের ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।”

সন্তু তবু ক্ষুণ্ণভাবে বলল, “এখানে সিংহ-টিংহ কিছু নেই। গাড়ির আওয়াজ শুনে পালিয়েছে। হরিণটা শুধু শুধু...”

মঞ্জু বলল, "আফ্রিকার সিংহ গাড়িটাড়ি দেখে ভয় পায় না, গ্রাহ্যই করে না !"

এই সময় আর-একটা গাড়ি এসে একটু দূরে দাঁড়াল। সন্তু অমনি উত্তেজিতভাবে বলল, "ওই তো, ওই তো, সেই গাড়িটা !"

অমল জিজ্ঞেস করল, "সেই গাড়িটা মানে ! ও হ্যাঁ, এটাও তো দেখছি একটা স্টেশন ওয়াগন, অনেকটা একই রকম দেখতে, তবে সেটার রং খয়েরি ছিল না ?"

সন্তু বলল, "না, মেরুন ছিল। এই গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে এসেছিল।"

অমল বলল, "এই একইরকম গাড়ি নাইরোবি শহরে অনেক আছে। আমাদের অফিসেও একটা আছে। মঞ্জু, তুমি সেই গাড়িটার নম্বরটা দেখে রেখেছিলে ?"

"না। এমন আচমকা এসে পড়েছিল যে, খেয়ালই করিনি। তবে ড্রাইভারটার চেহারা যেন দেখেছিলুম এক পলক।"

সন্তু বলল, "ড্রাইভার বদলে গেছে। তখন ড্রাইভারের দাড়ি-গোঁফ ছিল, এর কিছু নেই। এ অন্য লোক হতে পারে, কিন্তু এটাই সেই গাড়ি !"

অমল হেসে বলল, "এটা তুমি কী করে বলছ, সন্তু ? বললুম না, এই একই মডেল, একই রঙের অনেক স্টেশান ওয়াগন আছে নাইরোবি শহরে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "তোমরা অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করছ। ওই দ্যাখো, সিংহীটা এসে গেছে !"

সত্যিই এর মধ্যে একটি সিংহী এসে মুমূর্ষু হরিণটার পেটের কাছে কামড়ে ধরে টানাটানি করছে। হরিণটার গলা দিয়ে বেরোচ্ছে একটা বিকৃত আওয়াজ। সিংহীটার পেছনে রয়েছে দুটো বাচ্চা সিংহ।

কাকাবাবু বললেন, "সিংহীটার বোধহয় শিগগিরই ডিভোর্স হয়ে গেছে, তাই ওর স্বামী আসেনি, ছেলেমেয়েরা এসেছে।"

অমল লাফিয়ে উঠে বলল, "ক্যামেরা ! মঞ্জু, তোমার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বার করো।"

মঞ্জু কাঁচুমাচু মুখে বলল, "এই যাঃ ! ক্যামেরাটা আছে, কিন্তু আসবার সময় ফিল্ম কিনে আনব ভেবেছিলুম !"

অমল নিজের মাথার চুল চেপে ধরে বলল, "হোপলেস ! এরকম একখানা দৃশ্য..."

সন্তু আগে কখনও সিংহী দেখেনি। সিংহ বলতেই কেশর সমেত প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা পশুরাজের কথা মনে পড়ে। সেই তুলনায় সিংহীকে দেখতে এমন কিছুই না। প্রায় একটা খুব বড়সড় কুকুরের মতন।"

সিংহীটা একটা জ্যান্ত হরিণের পেট ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ-দৃশ্য সন্তুর দেখতে ইচ্ছে হল না। সে আবার স্টেশান ওয়াগনটির দিকে তাকাল। ড্রাইভার ছাড়া সে-গাড়িতে আর কোনও যাত্রী নেই। তা হলে শুধু-শুধু অতবড় গাড়ি নিয়ে একলা একটা লোক এখানে এসেছে কেন ? ড্রাইভারটাও সিংহীটার হরিণ-খাওয়া দেখছে না, যেন ও ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহই নেই। সে-ও তাকিয়ে আসে সন্তুদের গাড়ির দিকে। তার দাড়িগোঁফ নেই, মাথায় টুপি নেই কিন্তু চোখে কালো চশমা।

ওই লোকটা যদি তার বড় গাড়ি নিয়ে সন্তুদের গাড়িটা ধাক্কা মেরে উলটিয়ে দেয়, তা হলেও কেউ জানতে পারবে না এখানে। সন্তুর দৃঢ় ধারণা হল, ওই লোকটা সেই মতলবেই এসেছে। কাকাবাবুকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।

সন্তু কিছু বলবার আগেই আরও দুটি গাড়ি এসে থামল সেখানে। একটা জিপ, আর একটা স্টেশান ওয়াগন। এখানকার নিয়মই এই, কোথাও একটা-দুটো গাড়ি থামলেই অন্য গাড়িরা সেখানে এসে ভিড় করে কিছু দেখতে পাবার আশায়। দুটি গাড়িরই ছাদ খোলা ভর্তি আমেরিকান টুরিস্ট। তাদের কাছে নানা রকম ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরাই তিন চারটে।

দেখা গেল, এই সিংহীটার ছবি তোলার ব্যাপারে বেশ আপত্তি আছে। সে সবেমাত্র তার ছানা দুটোকে ডিনার খাওয়া শেখাচ্ছিল, ভিডিও ছবি তোলার আলো তার গায়ে এসে পড়ায় সে একবার বিরক্তভাবে এদিকে তাকাল, তারপর হরিণটার পেটে একটা বড় কামড় বসিয়ে টানতে টানতে ঘাসবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হরিণটা তখনও ডাকছে।

আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা হল, কিন্তু সিংহীটাকে আর দেখা গেল না।

অমল বলল, "তা হলে এবার ফেরা যাক ! দেখা তো হল !"

পরে যে গাড়ি দুটো এসেছিল, সে দুটোও স্টার্ট নিয়েছে। কিন্তু মেরুন রঙের স্টেশান ওয়াগনটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। কালো চশমা পরা ড্রাইভারটা তাকিয়ে আছে সন্তুদের দিকে।

সন্তু বলল, "আগে ওই গাড়িটা চলে যাক !"

অমল বলল, "কী ব্যাপার, সন্তু, ভয় পেয়ে গেলে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু যখন ভাবছে ওই গাড়িটা আমাদের চাপা দিতে এসেছিল, তখন একবার চেক্ করে দেখা উচিত। সন্তু তো সহজে ভুল করে না। অমল, তুমি গাড়িটা নিয়ে ওই গাড়িটার একেবারে কাছে চলো তো। ওই ড্রাইভারের সঙ্গে একবার কথা বলব।"

অমল বলল, "হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে।"

সে তার গাড়িটাকে ব্যাক করতে লাগল। একটু বেশি পেছনে চলে গিয়ে সেটা নেমে গেল রাস্তার নীচে। তার ফলে, গাড়িটা আবার তুলতে খানিকটা

সময় লাগল। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই স্টেশান ওয়াগনটা হুশ করে বেরিয়ে গেল উলটো দিকে।

অমল গাড়িটা সোজা করার পর জিজ্ঞেস করল, "ওকে ফলো করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, তার দরকার নেই। চলো, এবারে গেটের দিকে ফিরে চলো।"

মঞ্জু বলল, "আমার মনে হয়, তুমি ভুল করছ সন্তু। এই গাড়িটা নিরীহ, নির্দোষ।"

সন্তু আর কিছু বলল না।

অমল বলল, "আর-একটু ঘুরব ? এইভাবে হাতি-টাতি দেখতে পাওয়া যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, এখন ফেরা দরকার। তা ছাড়া, ওই তো আকাশে হাতি দেখা যাচ্ছে।"

সামনের আকাশে এমনভাবে মেঘ জমে আছে, ঠিক যেন মনে হয় দুটো ঐরাবত শুঁড় তুলে লড়াই করছে। এখানে আকাশ বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শেষ সূর্যের আলোয় অনেক রকম রং ঠিকরে পড়ছে। অপূর্ব দৃশ্য। সন্তু অনেকদিন একসঙ্গে এতখানি আকাশ দ্যাখেনি।

অমল বলল, "ফ্যান্টাস্টিক ! এখানে সবাই শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখতে আসে, অন্য কোনও দিকে তাকায়ই না। ডান পাশের গাছটায় দেখুন, কী রকম বড়-বড় জবাফুল ফুটে আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জবাফুলের এত বড় গাছ হয় ? এ তো বেশ শক্তপোক্ত গাছ দেখছি।"

অমল বলল, "হয়তো এ-ফুলের অন্য কোনও নাম আছে। কিন্তু ঠিক জবাফুলের মতন দেখতে না ?"

ফেরার পথে আরও অনেক হরিণ দেখা গেল। গোটা-পাঁচেক জেব্রা একেবারে রাস্তার ওপর এসে পড়ে ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল গাড়ির সামনে সামনেই।

অমল বলল, "জেব্রাগুলো একেবারে বোকা হয়। আসলে গাধা তো ! ওদের গুলি করে মারা কত সহজ দেখুন।"

মঞ্জু বলল, "এত সুন্দর প্রাণী, ওদের দেখে তোমার গুলি করে মারার কথা মনে এল ?"

অমল থতমত খেয়ে বলল, "আমি কি মারব নাকি ? বলছি যে, গুলি করে মারা সহজ। আগে সাহেবরা কত মেরেছে।"

মঞ্জু বলল, "এক সময় নাইরোবি শহরে জেব্রা-টানা গাড়ি চলত। আমি ছবিতে দেখেছি। আমাদের দেশে যেমন গোরুর গাড়ি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন বুঝি জেব্রা কমে গেছে।"

মঞ্জু বলল,"কমেছে কী, বেড়েছে ! এখন মারা নিষেধ তো। শহর ছেড়ে একটু বেরোলেই শত শত জেব্রা দেখা যায়।অনেক সময় জেব্রার জন্য গাড়ি আটকে যায়।"

অমল একবার জোরে হর্ন বাজাতেই জেব্রার দলটা আরও ভয় পেয়ে পাশের দিকে নেমে গেল হুড়মুড়িয়ে। এমনভাবে তারা লাফাল যে, দেখলে হাসি পায়।

অমল বলল, "আজ জিরাফ দেখা গেল না। জিরাফগুলো গাড়ির সামনে এসে পড়লে আরও মজা লাগে। একবার নাইভাসা লেক দেখতে যাবার সময় রাস্তায় কতগুলো জিরাফ এসে পড়েছিল, তোমার মনে আছে, মঞ্জু ?"

মঞ্জু বলল, "আমার জিরাফ দেখলে খুব মায়া হয়। অতবড় চেহারা, কিন্তু কী রকম ছোট্ট মুখখানা। এত জন্তু থাকতে ভগবান শুধু ওদেরই যে কেন বোবা করেছেন, তাই-ই বা কে জানে !"

অমল বলল, "আমার জিরাফ দেখলেই মনে হয় ইনকমপ্লিট। তোমাদের ভগবান যেন জিরাফকে গড়তে গড়তে হঠাৎ ভুলে গিয়ে অন্য কোনও কাজে মন দিয়ে ফেলেছেন।"

গল্প করতে করতে গেট পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া গেল। মঞ্জু বলল, "এখন আমাদের বাড়িতে একটু চা খেয়ে যাবেন ?"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরতে হবে, দেরি হয়ে যাবে। কাল যাব বরং। এখন আমাদের হোটেলে পৌঁছে দাও !"

সন্তুর আবার চোখ আটকে গেছে সামনের দিকে। একটু দূরে সেই স্টেশান ওয়াগনটা থেমে আছে।

সে বলল, "অমলদা, ওই যে দেখুন !"

অমল মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, "নাইরোবি শহরে ঠিক এই একই রঙের, একই মডেলের অন্তত একশোটা স্টেশান ওয়াগন আছে, এটা তার মধ্যে তৃতীয়টা।"

মঞ্জু বলল, "তা ছাড়া সেটা তো উলটো দিকে চলে গেল। আমাদের আগে ফিরবে কী করে ?"

অমল বলল, "তা অবশ্য পারে, ফেরার অনেকগুলো রাস্তা আছে। আমরা আস্তে আস্তে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "দ্বিতীয় গাড়িটার নম্বর আমি লক্ষ করেছিলুম। এটা সেটাই। চলো, ওর কাছে গিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করা যাক।"

অমল নিজের গাড়িটা সেই গাড়িটার সামনে নিয়ে পার্ক করে নেমে দাঁড়াল। কাকাবাবুও নামলেন। কিন্তু স্টেশান ওয়াগনটিতে এখন কোনও ড্রাইভার নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

৩

ঠিক সাড়ে ছ'টায় হোটেলের রিসেপশান থেকে ফোন এল। অশোক দেশাই দেখা করতে এসেছেন। তিনি ওপরে আসতে চান।

সন্তু দরজা খুলে দিল। সেই মাইক নামের ছেলেটি অশোক দেশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আরও একজন লোক রয়েছে অশোক দেশাইয়ের সঙ্গে। ইনি একজন আফ্রিকান, পাক্কা সাহেবি পোশাক পরা। অশোক দেশাইয়ের পোশাকও সেইরকম। তাঁর গায়ের রং এত ফর্সা যে, সাহেবদের মতনই দেখায়।

অশোক দেশাই দরজা দিয়ে ঢুকে কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "গুড ইভনিং মিঃ রায়চৌধুরি। আশা করি নাইরোবি আপনার ভাল লাগছে।"

কাকাবাবু সন্তুর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন।

অশোক দেশাই তাঁর সঙ্গীর দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "ইনি মিঃ শ্যাম নিন্‌জানে। ইনি এখানকার প্রেসিডেন্ট মই-এর আত্মীয়, এ-দেশের ফিনান্স সেক্রেটারি এবং আমার বিজনেস পার্টনার।"

অশোক দেশাই এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যাতে বোঝা গেল যে, তাঁর সঙ্গীটি একজন বিশেষ কেউ-কেটা লোক। প্রেসিডেন্টের আত্মীয় হওয়াটাই তো একটা বিরাট ব্যাপার।

মিঃ নিনজানে যে কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়েছেন তা তিনি লুকোবার সামান্য চেষ্টাও করলেন না। তিনি প্রায় হাঁ করে একবার কাকাবাবুকে দেখছেন, একবার অশোক দেশাইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন।

কাকাবাবু বললেন, "বসুন, আপনারা বসুন!"

মিঃ নিনজানে তবু দাঁড়িয়ে থেকেই অশোক দেশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "এই...এই ভদ্রলোকের কথাই আপনি বলেছিলেন? ইনি...একজন অ্যাডভেঞ্চারার? ইনি... মানে...ইনিই পৃথিবীর অনেক জায়গায়..."

অশোক দেশাই বললেন, "ইনিই মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। আমার আংক্‌ল এঁকে পাঠিয়েছেন।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আমার মতন একজন খোঁড়া মানুষকে দেখে অবাক হয়েছেন?"

মিঃ নিনজানে বললেন, "হ্যাঁ, মানে, আমি ফ্র্যাংকলি বলছি, আমি অশোকের মুখে গল্প শুনেছিলাম, আপনি নাকি হিমালয় পাহাড়ে একদল ক্রুককে ধরবার জন্য এগারো-বারো হাজার ফিট ওপরে উঠেছিলেন? সেটা কি অনেক দিন আগের কথা?"

কাকাবাবু বললেন, "না, খুব বেশিদিন আগে না, বছর পাঁচ-ছয় হবে। আমার একটা পা অবশ্য তার আগেই অকেজো হয়ে গেছে।"

"কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব ? এই পা নিয়ে আপনি হিমালয় পাহাড়ে উঠেছিলেন কী করে ?"

"বুঝিয়ে বলছি। বসুন আগে। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিং। তার মানে হল, ভগবানের কৃপা হলে আমার মতন কানা-খোঁড়া-পঙ্গুরাও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে। আপনি ভগবান মানেন ?"

"হ্যাঁ, অফ কোর্স ভগবান মানি। আমি একজন নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান।"

"আমি ভগবান বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি মানুষের অফুরন্ত মানসিক শক্তিকে। মনের জোর থাকলে মানুষ সব কিছু পারে। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে আমি পা পিছলে পড়ে মরে যেতেও পারি, তা বলে সেই ভয়ে আমি কোনওদিন পাহাড়ে উঠতে চাইব না, তা তো হয় না ! কত লোক তো শহরের রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েও মরে !"

"তা তো বটেই। তা তো বটেই !"

"আপনারা চা কিংবা কফি কী খাবেন বলুন। কিছু আনাব ?"

অশোক দেশাই এবারে বললেন, "মিঃ নিনজানে সন্ধের পর বিয়ার ছাড়া অন্য কিছু খান না। আমার কোনও রকম নেশা নেই। পানও খাই না। আমি মিঃ নিনজানের জন্য বিয়ার বলে দিচ্ছি।"

মিঃ নিনজানে হাত তুলে বললেন, "আমি যথেষ্ট বিয়ার পান করে এসেছি। রাত্তিরে আর-একটা জায়গায় নেমন্তন্ন আছে, সেখানে গিয়ে অনেক খেতে হবে। এখন কিছু খেতে চাই না। এখন কাজের কথা হোক।"

কাকাবাবু বললেন, "কাজের কথা কিছু আছে নাকি ? আমি তো তা জানতুম না। আমার ধারণ আমরা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি।"

অশোক দেশাই বললেন, "না, মানে, আপনার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম নিয়ে দু-চারটে কথা বলার ছিল..."

সন্তু ওঁদের কাছে না বসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। সে এক দৃষ্টিতে মিঃ নিনজানেকে লক্ষ করছে। ওঁকে অনেকটা বক্সার মহম্মদ আলির মতন দেখতে। কিন্তু ওঁর গলার আওয়াজটা কেমন যেন চেনা-চেনা। দুপুরে যারা ভয় দেখিয়ে টেলিফোন করেছিল, তাদের মধ্যে প্রথম যে-লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজি বলছিল, তার গলার আওয়াজটা ঠিক মিঃ নিনজানের মতন নয় ? কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? উনি কাকাবাবুকে ভয় দেখাতে যাবেন কেন ?

কাকাবাবু বললেন, "আমি মিঃ নিনজানেকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি ?"

মিঃ নিনজানে বললেন, "নিশ্চয়ই !"

"আপনার বয়েস কত ?"

"হঠাৎ এই প্রশ্ন ? মিঃ র‍্যাজা রায়চৌড্রি, আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করলেন

কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না তো !”

“এমনিই, কৌতূহল। আমি আফ্রিকানদের বয়েস বুঝতে পারি না। আপনার মুখের চামড়া একটু কুঁচকে গেছে, কিন্তু আপনার চুল কুচকুচে কালো...”

“আমার বয়েস আটান্ন !”

“তা হলে তো আপনি আমার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড়। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য আমার চেয়েও ভাল, আপনার মাথায় কত চুল...আমি আজ পর্যন্ত একজনও টাক-মাথা আফ্রিকান দেখিনি।”

মিঃ নিনজানে এবারে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। এতক্ষণ বাদে তাঁকে বেশ সহজ মনে হল। তিনি পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “চলবে ?”

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

মিঃ নিনজানে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “তা হলে একটা মজার গল্প বলি শুনুন ! আপনি ব্রাইট ক্রিম বলে চুলের একটা ক্রিম আছে, নাম শুনেছেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, শুনেছি, আমাদের দেশেও চলে।”

“একসময় আফ্রিকার কয়েকটা দেশে সেই ব্রাইট ক্রিমের খুব বিক্রি বেড়ে গেল। দোকানদাররা সাপ্লাই দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তখন যে বিলিতি কোম্পানি এই ক্রিম বানায়, তাদের টনক নড়ল। তারা বুঝতেই পারল না, হঠাৎ আফ্রিকায় তাদের চুলের ক্রিমের বিক্রি বাড়ল কেন ? আফ্রিকানদের তো এত পয়সা নেই। হেড-অফিস থেকে দুতিন জন সাহেব এল খোঁজ-খবর নিতে। তারা কিছুই বুঝতে পারল না। প্রত্যেক দোকানদার বলছে, 'সাহেব, আরও বেশি করে ব্রাইট ক্রিম পাঠাও ! খদ্দের ফিরে যাচ্ছে, আমরা গালাগালি খাচ্ছি !'

“তারপর আরও দু'জন বড়সাহেব এল মার্কেট রিসার্চ করতে। তাদের জিনিস বিক্রি হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কেন যে এত বেশি বিক্রি হচ্ছে, তা কিছুতেই ধরতে পারছে না। প্রত্যেক মাসে ডিমান্ড দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে !

“তখন কোম্পানি ঠিক করল, আফ্রিকার এই কয়েকটা দেশে এই সুযোগে আরও ব্রাইট বিলক্রিম পাঠাবে, বিক্রি আরও বাড়বে ! প্রত্যেক কাগজে বড়-বড় করে বিজ্ঞাপন দিল, 'ব্রাইট ক্রিম চুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চুল ভাল রাখতে হলে প্রত্যেক দিন ব্রাইট ক্রিম ব্যবহার করুন !'

“শুধু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন নয়, গ্রামে-গ্রামেও এই বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং টাঙানো হল। তার ফলে কী হল বলুন তো, এই বিজ্ঞাপন বেরোবার পর ব্রাইট ক্রিম বিক্রি একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর কেউ ওটা কেনে না !”

গল্প শেষ করে মিঃ নিনজানে বিরাট জোরে চেঁচিয়ে হাসতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, “আমি কিন্তু গল্পটার মর্ম ঠিক বুঝতে পারলুম না !”

অশোক দেশাই বললেন, "বাকিটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে ব্যাপার কী জানেন, আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির লোক ওই ক্রিম কিনত টোস্টে মাখিয়ে খাবার জন্য। জিনিসটার স্বাদও ভাল, দামেও মাখনের চেয়ে শস্তা। যখন তারা জানল ওটা চুলের ক্রিম, তখনই তারা কেনা বন্ধ করে দিল। চুলের যত্ন করার জন্য পয়সা দিয়ে কোনও চুলের ক্রিম কেনার কথা সাধারণ লোক কল্পনাই করতে পারে না।"

কাকাবাবুও হেসে বললেন, "ভাল গল্প। আশা করি এটা সত্যি।"

মিঃ নিনজানে বললেন, "মোটেই সত্যি নয়। নিছকই গল্প। তবে, আপনি আমাদের চুলের কথা তুললেন তো...। জানেন, আমাদের এখানে অনেকে আবার ভাবে, আমাদের তুলনায় ভারতীয়দের চুল বেশি সুন্দর।"

অশোক দেশাই বললেন, "এবারে আমার কথা সেরে নিই। সাড়ে সাতটার সময় আমার আর-একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মিঃ রায়চৌধুরী এখানে আপনার প্রোগ্রাম কী তা জানেন নিশ্চয়ই?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রোগ্রাম তো সে-রকম কিছু নেই। ভুলাভাই দেশাই আমাকে বলেছেন। এখানে দু-একদিন থাকার পর আমরা অন্য একটা জায়গায় চলে যাব। মাসাইমারা ফরেস্টে নাকি আপনারা একটা নতুন হোটেল খুলেছেন? সেখানে আমাদের থাকার কথা।"

অশোক দেশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "সেই ব্যাপারেই আপনাকে দু-একটা কথা বলতে এসেছি। আপনি এই হোটেলে যতদিন খুশি থাকতে পারেন। যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চান, ভিক্টোরিয়া লেক কিংবা কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ে, তারও সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু মাসাইমারা ফরেস্টে যে হোটেলে আপনাদের যাওয়ার কথা আমার কাকা আপনাদের বলে দিয়েছেন, সেখানে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না, তাতেই একটু সন্দেহ দেখা দিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সেখানে গেলে আপনাদের অসুবিধে হবে? তা হলে থাক, যাব না!"

অশোক দেশাই একটু জোরে বলে উঠলেন, "না, না, আমাদের অসুবিধে কিছু নেই। আপনি গেলে আমরা খুশিই হব। কিন্তু আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি, সেখানে গিয়ে যদি আপনার খারাপ লাগে, মানে..."

"কেন, সেখানে খারাপ লাগবে কেন! আপনার কাকা সে-জায়গাটার উচ্চ প্রশংসা করছিলেন। মাসাইমারা ফরেস্ট আমারও দেখার খুব ইচ্ছে আছে। বিশ্ববিখ্যাত ফরেস্ট, আমার ভাইপোকে নিয়ে এসেছি, ওরও খুব ভাল লাগবে এই আশা করে..."

"তা হলে পুরো ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলতে হয়।"

"বলুন।"

"মাসাইমারা গেইম রিজার্ভের একেবারে মাঝখানে কয়েকটা হোটেল আছে। তার মধ্যে একটা আমরা নিয়েছি। এখনও কিনিনি। আপাতত ম্যানেজমেন্টের ভার নিয়েছি। ছ' মাস দেখার পর পুরোপুরি কিনে নেব, এরকম কথা আছে। সেই হোটেলের নাম লিট্‌ল ভাইসরয়।"

"অদ্ভুত নাম তো। ভাইসরয় আবার লিট্‌ল?"

"এ-নামটারও একটা ইতিহাস আছে। আগে ওখানে শুধু ভাইসরয় নামে একটা হোটেল ছিল। তারপর খুব কাছাকাছিই আর-একটা হোটেল খোলা হল, তার নাম দেওয়া হল লিট্‌ল ভাইসরয়। আসলে কিন্তু দ্বিতীয় হোটেলটা, যেটা নতুন সেটাই বেশি বড়। ক্রমে এক সময় মূল ভাইসরয় হোটেল উঠে গেল, কিন্তু অন্য হোটেলের নাম লিট্‌ল ভাইসরয়ই রয়ে গেল। এই হোটেলটাই এখন আমাদের।"

"সেখানে আমি গেলে আপনাদের কি অসুবিধে হবে?"

"না না, আমাদের অসুবিধের কোনও প্রশ্নই নেই। বরং আপনার মতন একজন মানুষ গেলে আমাদের খুবই উপকার হতে পারে। আমার কাকা সেই কথা ভেবেই আপনাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভাল-মন্দ সব দিক আপনাকে আগে জানানো দরকার বলে আমি মনে করি। সেটাই আমার নীতি।"

"মন্দ দিক কিছু আছে বুঝি?"

"মিঃ রায়চৌধুরী, লিট্‌ল ভাইসরয় খুব দামি হোটেল। ওটা চালাবার খরচ অনেক। প্রধানত ইউরোপিয়ান ও আমেরিকানরাই ওখানে বেড়াতে যায়। কিন্তু গত তিন-চার মাস ধরে ওখানে ট্যুরিস্টের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। লোকে ভয়ে ওখানে যেতে চাইছে না। হোটেলের দু'জন বোর্ডার রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"খুঁজে পাওয়া যায়নি মানে হারিয়ে গেছে, না কোথাও কোনও জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়েছে?"

"প্রথমত ওখানে আমরা খুব সাবধানতা অবলম্বন করি। জন্তু-জানোয়ারের হাতে পড়ার প্রায় কোনও সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, কোনও জন্তু-জানোয়ারের মুখে যদি দৈবাৎ পড়েও যায়, কোনও জানোয়ারই তো মানুষের জামা-কাপড় সুদ্ধু খেয়ে ফেলে না। তাদের কোনওরকম চিহ্নই পাওয়া যায়নি!"

সন্তু ফশ্ করে বলল, "যদি কুমির কিংবা জলহস্তী জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়?"

অশোক দেশাই সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "দু'জন মানুষকে এক সঙ্গে জলের তলায় টেনে নেবে? এরকম ঘটনা এখানকার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। তা ছাড়া লোক দুটি তো বোকা নয়, দু'জনেই জার্মান ব্যবসায়ী।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ঘটনাটি রটে গেছে, তাই ট্যুরিস্ট যেতে চায় না?"

"শুধু সেই জন্যই নয়। এর পরেও যারা গেছে, তারা ফিরে এসে অভিযোগ

করেছে যে, রাত্তিরে তারা ঘুমোতে পারে না। কিসের যেন একটা অস্বস্তি হয়। যদিও আমাদের ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই...হোটেলটা চালাতে গিয়ে এখন আমাদের খুবই ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি ভেবে দেখুন সেখানে যাবেন কি না।"

মিঃ নিনজানে বললেন, "আপনার কোনও বিপদ হোক, তা আমরা কেউ চাই না।"

কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, হ্যারি ওটাংগো'র ঠিক কী হয়েছিল আপনারা জানেন ?"

দেশাই আর নিনজানে দু'জনেই যেন চমকে উঠল। এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। নিনজানে একটা রুমাল বার করে কপাল মুছল, অশোক দেশাই বলল, "আপনি...আপনি হ্যারি ওটাংগোর নাম জানলেন কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি বিখ্যাত লোক, সারা পৃথিবীর লোক ওঁর নাম জানে। উনি কয়েক মাস আগে অদ্ভুতভাবে মারা গেলেন, কাগজে পড়েছি।"

দেশাই বলল, "উনি কোনও হিংস্র জন্তুর সামনে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, এইটুকুই আমরা জানি।"

নিনজানে খানিকটা রুক্ষ গলায় বলল, "ওই ওটাংগো'র সঙ্গে আমাদের হোটেলের কী সম্পর্ক ? মাসাইমারায় গেলে আপনাদের যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে পারি। আমি সেজন্য ও-কথা জিজ্ঞেস করিনি।"

দেশাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আপনি বেড়াতে এসেছেন, মনের সুখে বেড়ান। এখানকার ঝঞ্ঝাট নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন ? সেজন্যই আপনাকে ওই হোটেলটায় পাঠাতে চাইছিলাম না। আবার পরের বছর আসনু না ! তখন হোটেলটা ঠিকমতন চালু হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু হাসিমুখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর বললেন, "আমাদাবাদের ভুলাভাই দেশাই অতি চালাক লোক। এখানে আমাদের পাঠাবার সময় এমনভাবে কথা বলল, যেন আমাকে কোনও কাজ করতে হবে না, মাথা খাটাতে হবে না, শুধু বেড়ানো আর বিশ্রাম। কিন্তু তার মনে একটা মতলব ছিল ঠিকই, এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে।"

অশোক দেশাই বললেন, "আপনি ওখানে না যেতে চাইলে আমরা মোটেই ইনসিস্ট করব না। আপনি যত দিন খুশি বিশ্রাম নিন, ইচ্ছে মতো বেড়ান, তারপর ফিরে যান।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বিপদের গন্ধ পেলে আমি যে সেখানে না গিয়ে পারি না। মাসাইমারা যেতেই হবে। কী বলিস, সন্তু ?"

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা আমাদের যাবার ব্যবস্থা করুন।"

"আরও দু-একদিন বরং ভেবে দেখুন, তারপর ঠিক করুন।"

"না, না, কালই যাব। দেরি করার কোনও মানে হয় না। ফেরার সময় না হয় নাইরোবি শহর ভাল করে দেখে যাব। এখান থেকে কী ভাবে যেতে হয়?"

"ছোট প্লেনে। আমাদের চার্টার্ড করা প্লেন আছে।"

"তা হলে কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। তার আগে দু-একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার। এই যে হোটেলটা আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের কোনও কমপিটিটর আছে?"

"কমপিটিটর মানে? মিঃ নিনজানে আর আমি একটা জয়েন্ট কোম্পানির মালিক। এই কোম্পানির নামেই কয়েক মাস বাদে পুরোপুরি হোটেলটা কিনে নেবার কথা। এক সুইস কোম্পানি ওই হোটেলটার মালিক ছিল। তারা বিক্রি করে দিতে চাইছে।"

"আর কোনও কোম্পানি কি ওটা কেনার ব্যাপারে আগ্রহী?"

"আর কে কিনবে? অনেক টাকার ব্যাপার। ওই হোটেলটা যে কত বড় আর জঙ্গলের মধ্যে ওই রকম হোটেল চালানো যে কী শক্ত ব্যাপার, তা আপনি গেলেই বুঝবেন।"

মিঃ নিনজানে বললেন, "আমি যে হোটেল কিনতে চাইছি, সেটা কিনতে এ-দেশে আর কোনও লোকের সাহস হবে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কাছাকাছি অন্য কোনও হোটেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই!"

অশোক দেশাই বললেন, "খুব কাছে অন্য কোনও হোটেল এখন আর নেই। সরকার থেকে আর কোনও হোটেল তৈরি করার অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না।"

"দু'জন লোক যে উধাও হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে পুলিশ থেকে খোঁজখবর নেয়নি?"

"আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়েছিলাম। নাইরোবি থেকে স্পেশাল ফোর্স নিয়ে সবরকম তদন্ত করেছে, কিন্তু তারাও কোনও হদিস পায়নি।"

"ঠিক আছে, তা হলে ব্যবস্থা করুন, আমি আর আমার ভাইপো ওখানে গিয়ে দিন-সাতেক থাকব।"

মিঃ নিনজানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যদি আপনি মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করতে পারেন, তা হলে আপনি পঁচিশ হাজার শিলিং পাবেন। আমরা আগে থেকেই ওই পুরস্কারটা ডিক্লেয়ার করে রেখেছি। গুড লাক্, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী।"

ওঁরা দু'জন বেরিয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "তা হলে দুপুরে টেলিফোনটা কে করেছিল? অমলই নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছিল তোর সঙ্গে?"

সন্তু বলল, "গলার আওয়াজটা কিন্তু ঠিক মিঃ নিনজানের মতন !"

"অমল অনেকদিন এ-দেশে আছে, ও আফ্রিকানদের গলার আওয়াজ নকল করতে পারবে। এতে আর আশ্চর্য কী আছে। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস ? মিঃ নিনজানের মাথার চুল ? উনি ব্রাইট ক্রিমের গল্প বললেন বটে। কিন্তু নিজে মাথায় কলপ মাখেন। এ-দেশের মানুষদেরও চুল খুব ঘন আর কোঁকড়া হয়, সহজে টাক পড়ে না, কিন্তু বয়েস বাড়লে সাদা হয় ঠিকই। মিঃ নিনজানের সব চুল কুচকুচে কালো। অশোক দেশাই সম্পর্কেও একটা ব্যাপার বুঝলাম না। অমল বলেছিল, ওঁর অনেকগুলো ব্যবসা, অনেক টাকা। কিন্তু উনি এই হোটেলটা নিয়ে খুব চিন্তিত। এই হোটেলটা নিয়ে যখন এত গণ্ডগোল, তখন উনি না কিনলেই তো পারেন। এখনও তো কেনা হয়নি। ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী ?"

সন্তু বলল, "একবার কিনবেন ঠিক করেছেন তো, তাই জেদ চেপে গেছে বোধহয়।"

"ঠিক বলেছিস, জেদের বশে মানুষ অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।"

"কাকাবাবু, আমরা রাত্তিরে কোথায় খাব ?"

"কেন, তোর খিদে পেয়ে গেছে নাকি ? রাত্তিরে আমরা এই হোটেলেই খেয়ে নেব। রুম সার্ভিসে বলে দিলেই হবে। রাত্তিরে রাস্তায় বেরোলে যদি কেউ আবার গাড়ি চাপা দিতে আসে সেই এক ঝামেলা।"

"বিকেলে সত্যিই ওই গাড়িটা যে আমাদের চাপা দিতে এসেছিল, তা তুমি বিশ্বাস করো না ?"

"চাপা দেবার চেষ্টা করলেও আমার মতন একটা খোঁড়া লোককে মারতে পারল না ? লোকটা খুবই আনাড়ি বলতে হবে। যাক, তুই কেনিয়ার ম্যাপটা বার কর তো ! আমি খাবার অর্ডার দিচ্ছি, খাবার আসতে আসতে ম্যাপটা দেখে নিই।"

সন্ধেবেলা ফেরার পথে ম্যাপটা কেনা হয়েছিল, সন্তু সেটা এনে টেবিলের ওপর খুলে দিল।

কাকাবাবু একটা পেনসিল তুলে বললেন, "এই যে নাইরোবি শহর, আর এই হচ্ছে নাইরোবি ন্যাশনাল পার্ক, এখানে আমরা গিয়েছিলাম। বেশ বড় জায়গা। লেক ভিকটোরিয়া দেখেছিস ? পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পানীয় জলের হ্রদ, এর তিন দিকে তিন দেশ, কেনিয়া, তানজানিয়া আর উগাণ্ডা। এখানে আরও অনেকগুলা হ্রদ আছে, সেগুলোও আমার দেখার ইচ্ছে আছে, সেসব হ্রদের নাম নাইভাসা, গিল্‌গিল, নুকুরু, বারিংগো এই সব। কেনিয়ার একটা নদীর নাম হিরামন, কী চমৎকার না ! কিন্তু সেটা অনেক দূরে, সেদিকে যাওয়া যাবে না। এবারে মাসাইমারা কোথায় তুই খুঁজে বার কর তো !"

সন্তু খুব মন দিয়ে খুঁজে খুঁজে একসময় আঙুল দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দ্যাখ, তানজানিয়ার বর্ডারের একেবারে কাছেই। তানজানিয়ার ওপাশটায় আছে বিশ্ববিখ্যাত সেরিংগেটি ফরেস্ট। এই অঞ্চলটা খুব ইন্টারেস্টিং, দু-একটা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে..."

ওরা দু'জনে ম্যাপ দেখতে দেখতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, এক সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ হল।

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, "দ্যাখ তো, খাবার এসে গেছে বোধহয়।"

সন্তু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, সেই মাইক নামে ছেলেটি হাতে একটা ট্রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রের ওপরে একটা লম্বা সাদা খাম।

মাইক সরল সাদা হাসি হেসে বলল, "তোমার আংকেলের জন্য একটা চিঠি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কে দিয়েছে ?"

মাইক বলল, "একজন জেন্টলম্যান দিয়ে বলল, এক্ষুনি পৌঁছে দিতে। দ্যাখো, আমি সঙ্গে-সঙ্গে এনেছি, একটুও দেরি করিনি কিন্তু !"

কাকাবাবু বললেন, "চিঠিটা নিয়ে আয়।"

সন্তু খামটা কাকাবাবুর হাতে দিলে তিনি সেটা ছিঁড়ে একটা কাগজ বার করলেন। তাতে মাত্র একটা লাইন লেখা আছে। সেটা পড়ে কাকাবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, তিনি কাগজটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

কাগজটাতে টাইপ করা অক্ষরে লেখা আছে :

Don't Go To Masai-Mara.

সন্তু বিবর্ণ মুখে বলল, "আমরা যে এখানে আছি, তা তো মাত্র দু'জন লোক ছাড়া এখনও আর কেউ জানে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "মাইক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কোটের পকেটে টাকা ভাঙানো আছে, তার থেকে ওকে দশটা শিলিং দিয়ে দে !"

৪

প্লেনটা বেশ ছোট। ফকার ফ্রেন্ডশিপ, কুড়ি-বাইশজন যাত্রীর বসবার ব্যবস্থা। এখন যাত্রী মাত্র পাঁচজন। সন্তু আর কাকাবাবু ছাড়া একজোড়া শ্বেতাঙ্গ দম্পতি, আর একজন বুড়োমতন সাহেব একেবারে সামনের দিকে বসে আছে। পাইলটের ঘরেও একজন মাত্র সঙ্গী, সেই লোকটিই একবার বেরিয়ে এসে সবাইকে একটা করে কোকাকোলার বোতল দিয়ে গেল।

প্লেনটা উড়ছে খুব নিচু দিয়ে, তলার সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। দেখবার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। নাইরোবি ছাড়বার পর প্রথম-প্রথম কিছু-কিছু ক্ষেত-জমি আর ছোট-ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছিল, তারপর থেকে শুধু পাথুরে ডাঙা। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট টিলা।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর প্লেনটা নামছে মনে হল। সন্তু ভাবল, ওরা বুঝি পৌঁছে গেছে। তা অবশ্য নয়, এটা একটা ছোট্ট শহর, এর নাম বাতিটাবু। এয়ারপোর্ট বলতে কিছু নেই, মাঠের মাঝখানে রানওয়ে আর একখানা মাত্র ঘর।

এখানে একগাদা মুরগি, আলুর বস্তা, কয়েকটা তরমুজ, আনারস—এইসব তোলা হল প্লেনে।

কাকাবাবু বললেন, "হোটেলের জন্য খাবার যাচ্ছে। জঙ্গলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না, রোজরোজ তা হলে এরকম প্লেনে করে খাবার নিয়ে যেতে হয়!"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই এই হোটেলে থাকার অনেক খরচ!"

"তোর আর আমার তো সেই চিন্তা নেই। আমরা মালিকের অতিথি।"

"আমরা যে যাচ্ছি তা কি ওখানকার হোটেলের লোকরা জানে?"

"নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।"

"কাকাবাবু, কাল রাত্তিরে ওই চিঠিটা কে পাঠাতে পারে?"

"আপাতত সে-চিন্তা আমি করছি না। যে-ই পাঠাক, তার আসল উদ্দেশ্যটা কী সেটা আগে জানা দরকার।"

এবার প্লেনটা আকাশে ওড়বার খানিক বাদে মাঝে-মাঝে একটু-একটু জঙ্গল দেখা যেতে লাগল। খুব ঘন নয়, দু'-চারটে বড় গাছ, আর ঝোপঝাড়। একটা নদীর ধারে একগাদা জন্তু দেখা গেল, কী জন্তু তা চেনা যাচ্ছে না। তার খানিকটা পরেই গোটা-পাঁচেক হাতি।

সন্তু কাকাবাবুকে ডেকে দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, "একজন সাহেব আমাকে একবার বলেছিল, ভারতবর্ষে যেমন সব জায়গায় পিলপিল করছে মানুষ, আফ্রিকায় সেইরকম জন্তু-জানোয়ার। এখানে মানুষের চেয়ে বন্যপ্রাণী অনেক বেশি।"

নীচে বুনো হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সন্তু প্লেনের জানলা দিয়ে তা-ই দেখছে, এতে তার খুব মজা লাগল।

এর থেকেও বেশি মজা পাওয়া গেল একটু পরে।

মাসাইমারার লিট্‌ল ভাইসরয় হোটেলের নিজস্ব রানওয়ের ওপরে পৌঁছেও প্লেনটা নামতে পারল না, গোল হয়ে চক্কর দিতে লাগল। রানওয়ের ওপর ছড়িয়ে আছে একগাদা জেব্রা, আর ঠিক মাঝখানে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি। ওগুলো থাকলে প্লেন নামবে কী করে।

জানলা দিয়ে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ দম্পতিটি খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "এটা দেখে আমার আর-একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার রাঁচি শহর থেকে আমার কলকাতায় প্লেনে ফেরার কথা ছিল, বুঝলি!

এয়ারপোর্টে এসে বসে আছি, পাটনা থেকে প্লেনটা এল, কিন্তু নামতে পারল না। এয়ারপোর্টের পাঁচিল ভাঙা, সেখান দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক গোরু রানওয়েতে ঢুকে পড়েছে, কয়েকটা ছেলে সেখানে আবার সাইকেল চালাচ্ছে। সেই সাইকেলওয়ালাদের সরানো গেলেও গোরুগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো গেল না, তাদের একদিকে তাড়া করলে অন্যদিকে চলে আসে। শেষ পর্যন্ত প্লেনটা নামলই না, বিরক্ত হয়ে চলে গেল !"

সন্তু বলল, "এখানে হাতি-জেব্রা কে সরাবে ?"

ককপিটের দরজা খুলে কো-পাইলট বেরিয়ে এসে বলল, "আপনারা চিন্তা করবেন না, এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনাদের ভাগ্য ভাল, দু'-চারটে সিংহ এসে বসে নেই, সিংহদের সরানো খুব শক্ত। আমাদের তেল বেশি নেই, বেশিক্ষণ ওপরে চক্কর দেওয়া যাবে না।"

এবারে দেখা গেল, গোটা তিনেক স্টেশান ওয়াগন আসছে একটু দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে। সেই গাড়িগুলো জেব্রাগুলোকে তেড়ে গেল। রাঁচি এয়ারপোর্টের গোরুদের মতন জেব্রাগুলোও একবার এদিকে আর একবার ওদিকে করতে লাগল, তারপর শেষ পর্যন্ত পালাল।

হাতি দুটো কিন্তু সহজে নড়েচড়ে না। তখন ফটফট করে ধোঁয়ার পটকা ফাটানো হল তাদের সামনে। তাতে তারা সামান্য একটু সরে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ঘাড় ফিরিয়ে।

প্লেনটা আর ওপরে থাকতে পারছে না, ওই অবস্থাতেই নেমে পড়ল ঝুঁকি নিয়ে।

সন্তু দেখল, তাদের জানলা থেকে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে হাতি দুটো দাঁড়িয়ে আছে। সন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানায় হাতি দেখেছে, আসামের জঙ্গলে বুনো হাতিও দেখেছে, কিন্তু এই হাতিদের আকার যেন তাদের দ্বিগুণ। যেমন প্রকাণ্ড মাথা, তেমনই বড়-বড় দাঁত।

সন্তু বলল, "আমরা নামতে গেলে যদি হাতি তেড়ে আসে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। বেশ রিস্কি ব্যাপার !"

প্লেনটা থামাবার পর পাইলট আর কো-পাইলট বেরিয়ে এল দুটো রাইফেল হাতে নিয়ে। গম্ভীরভাবে গটগট করে পেছন দিকে গিয়ে দরজা খুলে তারা দমাস-দমাস করে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

মেমসাহেবটি দু' কানে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'উ-ও-ও' করে।

হাতি দুটোকে অবশ্য মেরে ফেলার জন্য গুলি চালানো হয়নি। মোট সাতটা গুলি ওপরের দিকে ছুঁড়ে খরচ করার পর তারা গজেন্দ্রগমনে পেছন ফিরে চলে গেল।

সন্তু ভাবল, বাপ্‌স, এইভাবে লোকে এদিকে বেড়াতে আসে !

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে পাইলটদের সঙ্গে আলাপ করলেন ; ওরা একজন

শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ। দুজনেই বেশ আমুদে। প্লেনটি ওদের নিজস্ব কোম্পানির। প্রত্যেকদিনই এদিকে আসে, বিভিন্ন হোটেলের প্যাসেঞ্জার আনার জন্য ভাড়া খাটে।

কাকাবাবুর বগলে ক্রাচ দেখে শ্বেতাঙ্গটি বলল, "তুমি কিন্তু এদিকে কখনও একলা-একলা বেরিও না। যখন-তখন সিংহের সামনে পড়ে যেতে পারো, তখন পালাতে পারবে না।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বলল, "তুমি কি জাতে ব্রিটিশ ? জানো না, ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে লড়াই করে আমরা ভারতের স্বাধীনতা পেয়েছি !"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে কাকাবাবুর এমন ভাব হয়ে গেল যে, সে কাকাবাবুকে বিয়ার খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু হোটেলের লোকরা যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ দম্পতিটি আর সন্তু-কাকাবাবুকে তোলা হল একটা গাড়িতে। বুড়ো সাহেবটি অন্য একটি গাড়িতে রইলেন একা। এই গাড়িগুলো আলাদাভাবে তৈরি, মাটি থেকে অনেক উঁচু, দু' পাশে বড়-বড় কাচের জানলা থাকলেও তার বাইরে লোহার রড দেওয়া, গাড়ির ছাদ ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায়।

অল্প-বয়েসি সাহেব-মেম দুটি নিজেদের মধ্যে গল্প করছে আর অনবরত হাসছে। ধুধু করা মাঠের মধ্য দিয়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তা, মাঝে-মাঝে বড়-বড় ঘাস, একদল হরিণ রাস্তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে ছুটে চলে গেল। এক জায়গায় একটা বেশ লম্বা আর ডালপালা-ছড়ানো গাছ দেখে কাকাবাবু বললেন, "ওই দ্যাখ, ওটা বাওবাব গাছ।"

সন্তুর মনে পড়ে গেল, "বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'-এ সে এই গাছটার কথা পড়েছিল। সে গাছটাকে ভাল করে দেখতে যাচ্ছে, এমন সময় মেমসাহেবটি তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "হেই ! লুক ! লুক !"

বাওবাব গাছের ছায়ায় বসে আছেন এক পশুরাজ। কেশর-ভরা মস্ত বড় মাথা, দুটি পা সামনের দিকে ছড়ানো, এই গাড়ির দিকে ঘুম-ঘুম চোখে একবার তাকালেন।

প্রথম দেখায় একবার বুকটা কেঁপে উঠল সন্তুর। এত কাছে একটা সিংহ। তারপর দেখল, একটা নয়, অনেকগুলো। পশুরাজ একলা বসে আছেন, খানিক দূরে এক দঙ্গল। তার মধ্যে দুটি সিংহী, পাঁচটা নানা বয়েসের বাচ্চা। বাচ্চাগুলো ঠিক বেড়ালছানার মতন এ-ওকে কামড়ে খেলা করছে !

সাহেব-মেম দুটি চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে !

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি গাড়ি স্লো করছি, আপনারা দেখুন, তবে অনুগ্রহ করে বেশি জোরে কথা বলবেন না।"

গাড়ি থামল কি না-থামল তা গ্রাহ্যও করল না সিংহের দলটা। যেমন ছিল, তেমনিই রইল। ঠিক যেন মনে হয়, ওরা সপরিবারে বসে রোদ পোহাচ্ছে আর

খেলা করছে, শুধু বাড়ির কর্তা একটু দূরে বসে আছেন।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চলবার পর থামল একটা গাছপালা-ঘেরা জায়গায়। ড্রাইভার নেমে পড়ে বলল, "এবারে আপনাদের হেঁটে যেতে হবে। মালপত্র সব থাক, পরে অন্য লোক এসে নিয়ে যাবে, সেজন্য চিন্তা করবেন না। আসুন আমার সঙ্গে।"

গাছপালার মধ্য দিয়ে একটা সরু রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। খানিকটা যেতেই একটা নদী চোখে পড়ল। বেশি চওড়া নয়। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা নাইলনের দড়ি টাঙানো, এপারে বাঁধা রয়েছে একটা খেয়া-নৌকো। এই নৌকো বাইতে হয় না, দড়ি ধরে-ধরেই ওপারে চলে যাওয়া যায়।

নদীর জল বেশ পরিষ্কার, স্রোত আছে। ড্রাইভারটি বলল, "আপনারা এই নদীতে কেউ কখনও নামবার চেষ্টা করবেন না, এতে যথেষ্ট কুমির আছে। এই নৌকোতেও কক্ষনো একা পার হবার চেষ্টা করবেন না।"

নদীর ওপারে আর-একটা খাড়াই সরু পথ। তারপর খানিকটা ঘন জঙ্গল। বোঝা গেল, নদীর ওই দিকটা পর্যন্ত গাড়ি চলে। এপারে দু'জন লম্বা আফ্রিকান ছেলে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, বোধহয় গাড়ির আওয়াজ শুনে এসেছে। দু'জনের হাতেই রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "প্লিজ ডোন্‌ট অ্যালোন গো টু ফরেস্ট। ভেরি ডেঞ্জার! গ্রুপ কাম, গ্রুপ গো। ফলো মি!"

কয়েক পা যেতেই ছেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ্‌শ্‌শ্‌!"

মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাত দূর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে দুটি দাঁতাল শুয়োর। রাস্তার ধারে একটা বড় গাছের ডাল ধরে ঝুলছে কয়েকটা বেবুন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে সন্তুকে বললেন, "হোটেলে পৌঁছবার আগেই তো অনেক রকম জানোয়ার দেখা হয়ে গেল রে!"

কালো ছেলে দুটি হাতের রাইফেল তুলল না, কিছুই করল না, শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। তাতেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন একজন বলল, "কাম স্লো, নো রান!"

জঙ্গল একটু পাতলা হতেই সন্তু ভাবল, এইবার হোটেল-বিল্ডিংটা দেখা যাবে। কিন্তু কোথায় বিল্ডিং। আর একটুখানি যেতে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড, হোটেল লিটল ভাইসরয়। তার ওপাশে খানিকটা ব্যবধানে দুটো তাঁবু, একটা বেশ বড়, আর-একটা মাঝারি, সেটার গায়ে লেখা আছে 'অফিস'। এই নাকি হোটেল? এ কী হোটেলের ছিরি! তবে যে অশোক দেশাই বলেছিলেন বিরাট হোটেল?

ওরা সেই অফিস-তাঁবুর কাছে আসতেই একজন বেশ স্মার্ট চেহারার কালো

যুবক বেরিয়ে এসে হাসিমুখে বলল, "ওয়েলকাম ! ওয়েলকাম ! আজকের দিনটা খুব সুন্দর, তাই না ? দেখুন বৃষ্টি নেই, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, আপনারা সুন্দরভাবে বেড়াতে পারবেন। আগে খাতায় আপনাদের সবার নাম-ঠিকানা লিখুন, তারপর আমি আপনাদের থাকার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি !"

কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে এসে যুবকটি বলল, "আশা করি আপনিই মিঃ রায়চৌড্রি ? কাল রাত্তিরেই আপনাদের আসার খবর পেয়েছি। আমি চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে থাকি। আপনার যখন যা দরকার হয়, আমাকে বলবেন।"

খাতায় নাম-টাম লেখা হয়ে যাবার পর সেই ম্যানেজার সবাইকে নিয়ে সামনের দিকে এগোল। দেখা গেল, ওই বড় তাঁবুটা হল খাবার ঘর। তারপর ডান পাশে একটা জলাভূমি, বাঁ দিকে জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ফাঁকে-ফাঁকে খানিকটা দূরে দূরে ছড়ানো আরও অনেক তাঁবু, অন্তত গোটা চল্লিশেক তো হবেই।

এই তাঁবুগুলোই হোটেল-ঘর। সবুজ তাঁবুগুলো জঙ্গলের মধ্যে মিশে আছে, তাই জঙ্গলের সৌন্দর্য নষ্ট হয়নি। এখানে একটা সিমেন্ট-কংক্রিটের মস্ত বড় বাড়ি থাকলে বিচ্ছিরি দেখাত।

ডান পাশের জলাভূমিতে জল বেশি নেই, মাঝে-মাঝে ঘাস গজিয়েছে, সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো মোষ। মাঝখানে একটা দ্বীপের মতন জায়গায় একঝাঁক বেবুন ও বুনো শুয়োর, বেশ খানিকটা দূরে আবছা-আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা হাতি।

ম্যানেজারটি বলল, "আপনারা কেউ এই জলাভূমিতে নামবেন না। যে-কোনও জন্তু যখন-তখন এখানে এসে পড়তে পারে, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। সব জন্তুরই নিজস্ব খাদ্য এখানে প্রচুর আছে, সেইজন্য মানুষ ওদের ক্ষতি না করলে ওরাও মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। তবে, একটা ব্যাপারে খুব সাবধান, ওই যে মোষগুলো দেখছেন, আপাতত নিরীহ মনে হলেও ওরাই আফ্রিকার সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। ওদের কাছাকাছি খবরদার যাবেন না। ওরা অত্যন্ত বদরাগী, একমাত্র ওরাই বিনা কারণে মানুষ সামনে দেখলে ঢুঁসিয়ে পেট ফুটো করে দেয়। ওরা দল বেঁধে থাকলে সিংহ কাছে ঘেঁষে না।"

সন্তু শুনে অবাক হল। মোষগুলোকে তো আমাদের দেশের মোষের মতনই দেখতে প্রায়। তবে, এদের পায়ের কাছে একটু সাদা ছোপ, মনে হয় যেন সাদা মোজা পরা। জলাভূমি ছেড়ে এই মোষগুলো যদি তাঁবুর কাছে চলে আসে ?

অধিকাংশ তাঁবুই খালি। একটি-দুটি লোককে মাত্র দেখা গেল। সন্তুদের দেওয়া হল ৩৪ নম্বর তাঁবু, তার পেছন দিকটায় বাঁশবন, ডান পাশে, বাঁ পাশেও এমন ঝোপঝাড় যে, সেখান থেকে অন্য কোনও তাঁবু দেখতে পাওয়া যায় না।

ম্যানেজার বলল, "আপনারা একটু বিশ্রাম নিন, আপনাদের মালপত্র এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছে। সাড়ে বারোটার সময় লাঞ্চ দেওয়া হবে, প্রথম যে বড় তাঁবুটা

দেখেছিলেন, সেখানে চলে আসবেন।”

এই তাঁবু সাধারণ তাঁবু নয়, স্পেশালভাবে তৈরি। নাইলনের তৈরি এমন পুরু বনাত যে ছুরি দিয়েও কাটা যাবে না। ব্যবস্থা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন, “বাঃ! এরকম আশাই করিনি।”

তাঁবুর সামনেটায় একটা ছোট বারান্দায় বসবার জায়গা, সেখানে রয়েছে তিন-চারটে চেয়ার আর একটা নিচু টেবিল। তারপর ভেতরে ঢোকার দরজা। মাঝখানের একটা জিপার টেনে খুললেই দরজার দুটো পাল্লা হয়ে যায়। ভেতরে দু' পাশে দুটি খাট পাতা, তাতে ধপধপে সাদা বিছানা। ঠিক যেন কোনও ভাল হোটেলের ডাব্‌ল-বেড রুম। শিয়রের কাছে ছোট টেবিল, তার ওপরে বাইবেল ও কয়েকটা পত্রপত্রিকা, এমনকী দেওয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও টাঙানো আছে। দু'দিকে দুটি দুটি জানলা, তাতে তারের জাল। পেছন দিকে আবার জিপার টেনে দরজা খুললে একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তারপর আর-একটা ছোট তাঁবু। সেটা বাথরুম। সেই বাথরুমের ব্যবস্থা দেখলে হকচকিয়ে যেতে হয়। তাতে কমোড আছে, শাওয়ার আছে, বেসিন আছে। সেই বেসিনের দুটো কল, সন্তু খুলে দেখল, একটা দিয়ে ঠাণ্ডা আর-একটা দিয়ে গরম জল বেরোচ্ছে! সব-কিছু একেবারে নিখুঁত আর ঝকঝকে পরিষ্কার!

ওরা দু'জনে সামনের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। যদিও ঝকঝকে রোদ উঠেছে, তবু গরম নেই। প্রথম দশ-পনেরো মিনিট ওরা চুপ করে বসে রইল। সামনের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জলাভূমিতে নানা রকম প্রাণী আসছে, চলে যাচ্ছে, একদল হরিণ খেলছে আপনমনে, কিছু মানুষ যে ওদের দেখছে সেদিকে ওদের হুঁশই নেই। এই প্রথম সন্তু জিরাফ দেখতে পেল। এক জোড়া জিরাফ নাচের ভঙ্গিতে আস্তে-আস্তে ছুটে এসে আবার জলাভূমির ডান পাশের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। কাছাকাছি কী যেন একটা পাখি শিস দিচ্ছে, পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, “এখানে বসে-বসেই তো সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় রে!”

সন্তু বলল, “এখনও আমার চোখকে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না!”

কাকাবাবু বললেন, “এখানে যারা বেড়াতে আসে, তাদের পয়সা খরচ সার্থক হয়ে যায়। কিন্তু হোটেলটা তো সত্যি চলছে না দেখছি। এতগুলো তাঁবু খালি! এত বড় হোটেল যখন বানিয়েছে, তখন এক সময় নিশ্চয়ই প্রচুর লোক আসত।”

হঠাৎ ফ-র-র ফ-র-র শব্দ শুনে সন্তু চমকে উঠল। তাঁবুর খুব কাছেই একটা জেব্রা এসে নিশ্বাস ফেলছে। এই জেব্রাটা পেছনের বাঁশবনের দিক থেকে এসেছে। দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে অবাক চোখ মেলে সে এই মানুষ দুটিকে দেখছে।

এত কাছ থেকে সন্তু কখনও জেব্রা দ্যাখেনি। তার গায়ের চামড়া কী মসৃণ, ঠিক সিল্কের মতন। সাদা শরীরে কালো ডোরাগুলো যেন কোনও শিল্পীর আঁকা। মুখখানা কচি বাচ্চাদের মতন সরল।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, ওর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

কাকাবাবু বললেন, "জেব্রাগুলো তো এমনিতে খুব শান্ত হয় শুনেছি। তবে লাথি-টাথি ছোঁড়ে কি না তা জানি না। চেষ্টা করে দ্যাখ্।"

সন্তু বারান্দা থেকে নামতেই জেব্রাটা বিদ্যুৎ-গতিতে পেছন ফিরে পোঁপোঁ করে ছুট লাগাল।

এই সময় একটি আফ্রিকান ছেলে এল ওদের সুটকেস দুটো বয়ে নিয়ে। সে-দুটো বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, "ইউ নিড এনিথিং স্যার? টি, কফি, বিয়ার, ফ্রুটস্? নো? কোকাকোলা, সেভেন আপ? নোঃ? স্যান্ডউইচ, হ্যাম, সসেজ, পেস্ট্রি?"

কাকাবাবু বললেন, "নো, থ্যাংক ইউ। সাড়ে বারোটা বাজতে আর আধঘণ্টা দেরি আছে, তখন আমরা লাঞ্চ খেতে যাব।"

লোকটি নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "এই মরুভূমি আর জঙ্গলের মধ্যেও কত রকম জিনিস পাওয়া যায় দেখলি? আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি নেই। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, নদীর ধার থেকে যে-ছেলে দুটি বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল, তাদের সঙ্গে এই লোকটার চেহারার অনেক তফাত। এই লোকটা বেঁটে, ওরা দু'জন খুব লম্বা। এখানে তো অনেক উপজাতি আছে, তাদের ভাষা আলাদা, চেহারাও আলাদা, গায়ের রংও দেখবি সবার সমান কালো নয়। ওই লম্বা ছেলে দুটো খুব সম্ভবত মাসাই। এই মাসাইরা খুব সাহসী যোদ্ধা হয়। আর খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।"

সন্তু বলল, "ও, তা হলে এই উপজাতিদের নামেই জায়গাটির নাম মাসাইমারা? মারা মানে কী?"

"তা আমি জানি না। তবে মারা নামে এদিকে একটা নদী আছে।"

এই সময় একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ আস্তে-আস্তে হেঁটে এসে এই তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "গুড মর্নিং! তোমরা বুঝি আজকেই এলে?"

কাকাবাবু বললেন, "গুড মর্নিং। হ্যাঁ, আমরা নতুন এসেছি। আপনি কতদিন আছেন?"

লোকটি একটু কাছে এসে বলল, "আমি এসেছি...প্রায় দু' সপ্তাহ হয়ে গেল, আরও কিছুদিন থাকব।"

কাকাবাবু লোকটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তাঁকে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন। লোকটির নাম গুনার ওলেন, জাতে সুইডিশ। তিনি একজন নাট্যকার। নিরিবিলিতে এখানে একটি

নতুন নাটক লিখতে এসেছেন। দু' বছর আগে তিনি এখানে আর-একবার এসেছিলেন, সেবার যে নাটকটি লিখেছিলেন, সেটি সুইডেনে খুব জনপ্রিয় হয়েছে, ইংরেজিতেও অনুবাদ বেরিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের দেশের ইংগ্‌মার বার্গম্যানের অনেকগুলো ফিল্ম আমি দেখেছি, আমার খুব ভাল লেগেছে।"

গুনার ওলেন হেসে বললেন, "আমার সঙ্গে কোনও বিদেশির দেখা হলে ওই নামটাই সবাই বলে। হ্যাঁ, ইংগ্‌মার এখন আমাদের দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। আপনারা কি ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বেড়াতে!"

"হ্যাঁ, বেড়াতেই। আমি আপনার মতন লেখক নই। আপনি তো দু'বছর আগে এখানে এসেছিলেন বললেন। তখনকার থেকে এখন কোনও তফাত দেখছেন?"

"জায়গাটা একই রকম আছে। তবে দু'বছর আগে এই হোটেলটা ভর্তি দেখেছি। লোকজনে জমজমাট ছিল। এবার তো প্রায় ফাঁকা। গতকাল পর্যন্ত সাতজন ছিল মাত্র, তার মধ্যে পাঁচজন চলে গেল। আজ আপনারা ক'জন এলেন? কম লোক এলে হোটেলের ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ভাল। আমি নির্জনতা পছন্দ করি।"

"আচ্ছা, মিঃ ওলেন, আমরা তো নতুন এসেছি, আপনার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জেনে নিই। এখানে কোনও ভয়-টয় নেই তো? এই যে এত জন্তু-জানোয়ার কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়, রাত্রে কোনও হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করতে পারে না?"

"একটা কথা মনে রাখবেন, মিঃ রায়চৌধুরী। প্রকৃতির জগতে আপনি যদি কারও ক্ষতি না করেন, তা হলে অন্য কেউ সহজে আপনার ক্ষতি করতে চাইবে না! এক রাত্তিরে আমি একটা হাতির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভয় পাইনি। আমি জানি, মানুষ তো হাতির খাদ্য নয়। সে শুধু-শুধু আমাকে মারবে কেন? আমি হাতিটাকে নমস্কার করলুম, সে অন্যদিকে চলে গেল!"

"বাঃ, এ যে প্রায় গল্পের মতন।"

"গল্প নয়। সত্যি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা।"

"নাইরোবিতে থাকার সময় আমরা একটা গুজব শুনেছিলাম, দু'জন বিদেশি ট্যুরিস্ট নাকি এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেটা বোধহয় গুজবই, তাই না?"

"এই কথাটা আমিও শুনেছি। আমি বিশ্বাসও করিনি, অবিশ্বাসও করিনি। দু'জন জার্মান যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তারা নিশ্চয়ই নিজেরা ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছে। এক-এক সময় আমারই তো ইচ্ছে করে, হাঁটতে-হাঁটতে

দিগন্তে মিলিয়ে যাই।"

"এই হোটেলে হঠাৎ ট্যুরিস্ট কম আসছে কেন বলুন তো ? আপনার কী মনে হয় ?"

"আমার কিছু মনে হয় না। যত কম লোক আসে, ততই ভাল ! বেশি লোক এসে জঙ্গলের মধ্যে হইচই করে, সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।"

"তা অবশ্য আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ ওলেন !"

"আপনার নাম কী যেন বললেন ? মিঃ রোয়া, রোয়া, চুডারি ?"

"রায়চৌধুরী। তবে শুধু রায় বা রোয়া বললেও ক্ষতি নেই।"

গুনার ওলেন সন্তুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর কাকাবাবুকে বললেন, "মিঃ রোয়াচৌডারি, আপনি যে জঙ্গল দেখবেন, তা এই কিশোরটির চোখ দিয়ে দেখুন। এই বয়েসটাই সবকিছু দু'চোখ ভরে দেখতে জানে। আমি জন্মেছি সুইডেনের একটা দ্বীপে। সেখানে প্রচুর জঙ্গল ছিল। এখন আমি পৃথিবীর যে-কোনও জঙ্গলে বেড়াতে গেলেই আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।"

এই সময় ঝুনঝুন করে একটা বেল বেজে উঠল। বেশ খানিকটা দূরে। খুব সম্ভবত অফিস-তাঁবুর কাছ থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "ওই বোধহয় খাবার ঘণ্টা বাজছে।"

গুনার ওলেন হেসে বললেন, "না, এটা সে-ঘণ্টা নয়। এটা হাতি আসার ঘণ্টা। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনও হাতির পাল এসে পড়েছে। তখন ঘণ্টা বাজিয়ে এরা আমাদের তাঁবুর বাইরে যেতে নিষেধ করে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী, এই সব তাঁবুর কাছেও হাতি আসে নাকি ?"

গুনার ওলেন বললেন, "এরা যখন খুশি আসবে, সেইটাই তো স্বাভাবিক, তাই না ? আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। তবে, চিন্তার কিছু নেই। আফ্রিকার হাতি মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ দেখলে তারাই অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে সরে যায়।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বুঝি হাতিগুলোকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে ? চলো না, এগিয়ে দেখা যাক।"

গুনার ওলেন সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে জলাভূমির কাছে চলে গেলেন। কাকাবাবু কোটের পকেটে হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন কী যেন। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি চুরুট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু এখনও উত্তেজনার মুহূর্তে চুরুটের জন্য তাঁর হাত নিশপিশ করে।

চুরুট না খেলেও কাকাবাবু পকেটে সবসময় একটা লাইটার রাখেন। অনেক সময় ওটা অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগে। সেই লাইটারটা বার করে তিনি আপনমনে জ্বালতে লাগলেন।

সন্তুরা অবশ্য হাতির পালটা দেখতে পেল না। দূরের জঙ্গলে হোটেলের

কর্মীরা পটকা ফাটাচ্ছে, সেই ধোঁয়া উড়ছে।

একটু বাদে অল ক্লিয়ার ঘণ্টা বাজল। ওরা এবার খেতে গেল বড় তাঁবুটার দিকে।

সুন্দর রোদ-ঝিকিমিকি দিন বলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বাইরে। অনেকগুলো টেবিল এনে পাতা হয়েছে। ওপেন এয়ারে বুফে লাঞ্চ। অনেক রকমের খাবার, যে যত খুশি খেতে পারে। সন্তু গুনে দেখল, খেতে বসেছে ওরা মাত্র আটজন। আর হোটেলের এগারোজন কর্মচারী ওদের দেখাশোনা করছে। কী করুণ অবস্থা এই হোটেলের।

যে সাহেব-মেম দম্পতিটি ওদের সঙ্গে একই প্লেসে এসেছিল, তাদের সঙ্গে আলাপ হল। ওরা আমেরিকান, বিয়ে করার পর বেড়াতে এসেছে। কিছুদিন আগে যে এই হোটেল থেকে দু'জন ট্যুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে-কথা ওরা জানে না।

আর একটা প্রৌঢ় দম্পতি এখানে রয়েছেন, দিন-পাঁচেক ধরে। কাকাবাবু তাঁদের সঙ্গেও যেচে আলাপ করলেন। সেই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারও এই হোটেল সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই। এঁরা জাতিতে পর্তুগিজ, স্বামী আর স্ত্রী দু'জনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর সারা পৃথিবীতে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজতে বেরিয়েছেন। দু'জনেই বেশ মজার কথা বলেন।

সন্তুদের সঙ্গে একই প্লেনে আর একজন যে বুড়ো সাহেব এসেছিলেন, তিনি খেতে বসলেন একা একটি টেবিলে। অন্য কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি উঠে উঠে নিজের খাবারও নিতে যাচ্ছেন না, হোটেলের কর্মচারীরা তাঁর খাবার এনে দিচ্ছে। ইনি একটু করে খাচ্ছেন আর অনেকক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়ে থাকছেন জলাভূমির দিকে।

হোটেলের ম্যানেজারটি এসে ঘোষণা করল, খাওয়া-দাওয়া শেষ করার আধঘণ্টা পরেই সবাইকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। নদীর ওপারে গাড়ি তৈরি আছে।

খাওয়া শেষ করে কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে গিয়ে সেই বুড়ো সাহেবের টেবিলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন। সন্তু একটা বায়নোকুলার এনেছে, সেটা দিয়ে সে জলাভূমির দূরের জানোয়ারগুলোকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করছে। একটা জিনিস সে লক্ষ করেছে। এখানে কোনও কুকুর নেই। খোলা জায়গায় খেতে বসলে দু-একটা কুকুর এসে সামনে ঘুরঘুর করবে, এটাই যেন স্বাভাবিক মনে হয়। গুনার ওলেন অবশ্য সন্তুকে বলেছিলেন যে, এখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে ওয়াইল্ড ডগ্স আছে, তারা এমনই হিংস্র যে, মোষ কিংবা সিংহরাও তাদের ভয় পায়।

বুড়ো সাহেবটি একবার চোখ তুলতেই কাকাবাবু বললেন, "শুভ দ্বিপ্রহর। এখানে রোদ বেশ চড়া, কিন্তু হাওয়াটা ঠাণ্ডা, এটা বেশ চমৎকার, তাই না?"

লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, "হুঁ !"

কাকাবাবু আবার বললেন, "আপনার তো দেখছি এখনও কফি খাওয়া হয়নি, আমি আপনার টেবিলে বসে আর-এক কাপ কফি পান করতে পারি কি ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

সন্তুর চোখে যদিও দূরবীন তবু সে কান খাড়া করে সব কথা শুনছে। সে আগে কখনও কাকাবাবুকে এরকম সেধে-সেধে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে দ্যাখেনি।

সেই বৃদ্ধটির টেবিলে বসে কাকাবাবু বললেন, "অতি সুন্দর জায়গা। ইচ্ছে করে এখানে অনেকদিন থেকে যেতে।"

বৃদ্ধটি শুকনো গলায় বললেন, "আপনার ভাল লাগছে এ-জায়গাটা ? শুনে সুখী হলাম।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, আপনার এ জায়গাটা ভাল লাগছে না ?"

বৃদ্ধটি বললেন, "ভাল লাগালাগির তো প্রশ্ন নয়। আমি প্রত্যেক বছর অন্তত ছমাস করে এখানে থাকি !"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "আপনি প্রতি বছরে ছ' মাস...তার মানে কত বছর ধরে এখানে আসছেন ?"

"তা প্রায় পনেরো বছর হবে !"

"পনেরো বছর ? অর্থাৎ এই জায়গাটা আপনি এত ভালবাসেন যে, প্রতি বছর আপনাকে আসতেই হয় ?"

"এই জায়গাটা যে আমার খুব ভাল লাগে, তা আমি বলতে পারব না। মাঝে-মাঝে বেশ খারাপ লাগে, একঘেয়ে লাগে, তবু আমাকে আসতেই হয়।"

"খারাপ লাগে, একঘেয়ে লাগে, তবু আসতে হয় ? ঠিক বুঝলাম না। তার মানে কি এই যে, মাসাইমারা আপনাকে চুম্বকের মতন টানে ? আপনি না এসে পারেন না ?"

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "চুম্বকের টানের ব্যাপার নয়। আমাকে আসতে হয় সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আমার নাম পিয়ের লাফর্গ। আমি এই হোটেলটার মালিক !"

৫

মাসাইমারার রাত্তির যে এত লম্বা হবে, সে সম্পর্কে কাকাবাবুরও কোনও ধারণা ছিল না।

সূর্যের আলো ফুরিয়ে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে আর বেরোনো নিষেধ। তখন বাজে মাত্র আটটা।

রাত্তিরের ডিনার দেওয়া হয়েছিল বড় তাঁবুটার মধ্যে। তারপর প্রত্যেক তাঁবুর অধিবাসীদের এক-একজন মাসাই-গার্ড সঙ্গে দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ফেরার সময় সন্তুদের একটা সাঙ্ঘাতিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।

সন্ধে হতে না হতেই চতুর্দিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। এই হোটেলে এত সব আধুনিক ব্যবস্থা থাকলেও ইচ্ছে করেই বোধহয় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রত্যেক তাঁবুর মধ্যে রয়েছে বেঁটে-বেঁটে হ্যাজাক-বাতি। আর তাঁবুর বাইরে অন্ধকারের রাজত্ব। আর এই অন্ধকারের মধ্যে বণ্যপ্রাণীরা গিসগিস করছে, এ-কথা ভাবলেই গা ছমছম করে।

যে-মাসাই গার্ডটি সন্তুদের পৌঁছে দিতে এসেছিল, তার হাতে ছিল একটা বর্শা আর একটা শক্তিশালী টর্চ। তার নাম এমবো। কাকাবাবু তার সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সে মাত্র পনেরো-ষোলোটার বেশি ইংরেজি শব্দ জানে না। তা ছাড়া তার স্বভাবটাও গম্ভীর ধরনের।

সে আগে-আগে টর্চের আলো ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় সে চাপা গলায় বলে উঠল, "স্টপ !"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা ফাঁকা তাঁবুর পাশে দু-একটি কালো রঙের কী যেন জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

মাসাই-গার্ডটি আবার বলল, "বাফেলো ! ভেরি ব্যাড।"

বাফেলো শুনেই সন্তুর বুক কেঁপে উঠল। এত কাছে মোষ ? সকালেই ম্যানেজার বলে দিয়েছিল, এই মোষগুলো হঠাৎ রেগে গিয়ে পেট ফুটো করে দেয় !

মাসাই-গার্ডটি টর্চের আলো নাচাতে লাগল জন্তুগুলোর ওপরে। অরণ্যের কোনও প্রাণীই আলো পছন্দ করে না। আলো দেখলে তারা চলে যাবে। কিন্তু মোষ কি এত বড় হয় ? এ যে ছোটখাটো পাহাড়ের মতন দেখাচ্ছে। হাতি নাকি ?

একটা জন্তু মুখ ফেরাতেই মাসাই-গার্ডটি আবার বলল, "হিপো !"

তারপর সে নিজের ভাষায় কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

জলহস্তী ? খাওয়ার টেবিলে গুনার ওলেন নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব সম্পর্কে গল্প শোনাচ্ছিলেন। জলহস্তী সম্পর্কে বলেছিলেন, ওরা সারাদিন জলে ডুবে থাকে শুধু নাকটা উঁচু করে। সহজে দেখাই যায় না। কিন্তু সন্ধে হলেই ওরা জল থেকে উঠে আসে, যেখানে-সেখানে ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। জলহস্তী এমনিতে নিরীহ আর বোকা প্রাণী। কিন্তু সামনা-সামনি মানুষ পড়ে গেলে ওরা ছেলেমানুষি করে কামড়ে দেয়। ওদের হাঁ-টা এত প্রকাণ্ড যে তার মধ্যে একসঙ্গে দুটো মানুষ ঢুকে যেতে পারে। ওরা

মানুষের মাংস খায় না। মানুষকে কামড়ে তার শরীরটা দু' টুকরো করে ফেলে দেয়।

কাকাবাবু সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "ভয় নেই।"

টর্চের আলোয় জলহস্তীর চোখকে মনে হয় আগুনের ভাঁটা।

মাসাই-গার্ডটি ধমকের সুরে বলল, "ইউ, টর্চ ! ইউ, টর্চ !"

সন্তু আর কাকাবাবুর পকেটেও টর্চ রয়েছে। গার্ডটি ওদেরও টর্চ জ্বালাতে বলছে। এক সঙ্গে তিনটে টর্চের আলো পড়তেই জলহস্তী দুটো দৌড়ে গিয়ে নেমে পড়ল জলাভূমিতে। কয়েক টন ওজনের ওই জানোয়ারের কিন্তু ছোটার কোনও শব্দ নেই, শুধু জলে নামার সময় মনে হল, সেখানে কোনও পাহাড়ের চাঁই ভেঙে পড়ছে।

এরপর সন্তু আর কাকাবাবু দ্রুত নিজেদের তাঁবুতে পৌঁছতে মাসাই-গার্ডটি বলেছিল, "নো কাম আউট অ্যাট নাইট ! গুড নাইট !"

শীতের মধ্যেও সন্তুর সারা শরীর ঘেমে গেছে। কাকাবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "বোকা জানোয়ার দুটো যদি ভুল করে আমাদের দিকেই ছুটে আসত, তা হলে ওদের পায়ের চাপেই পিষে যেতাম !"

সন্তু জুতো-টুতো না খুলেই ঝপাস করে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়।

কাকাবাবু বললেন, "মাত্র আটটা বাজে, এর মধ্যেই শুয়ে পড়ব ! বাকি রাতটা কাটবে কী করে ?"

গুনার ওলেন বলেছেন, এটাই এখানকার নিয়ম। রাত্তিরবেলা বাইরে বেরুনো কোনওক্রমেই উচিত নয়। তাঁবুর মধ্যে থাকলে অবশ্য কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। সে-রকম কোনও ঘটনা এখানে ঘটেনি। সারা রাত বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রেখে মাসাই-গার্ডরা পাহারা দেয়। সিংহ, নেকড়ে, চিতা, হায়েনার মতন হিংস্র প্রাণীরা আগুন দেখলে সেদিকে আসে না, তবে হরিণ, জেব্রা, শুয়োর, ওয়াইল্ড বিস্ট-এর মতন যে-সব প্রাণীরা দল বেঁধে দৌড়য়, তারা অনেক সময় এসে পড়ে, তাদের সামনে পড়ে গেলেও মুশকিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, 'একপাল জেব্রা কিংবা হাতি-টাতিরা তাঁবু ভেঙে দিতে পারে না ?'

গুনার ওনেল উত্তর দিয়েছিলেন, 'জীবজন্তুদেরও তো মনস্তত্ত্ব আছে। সে-সব স্টাডি করা হয়েছে। অকারণে ওরা তাঁবু ভাঙতে যাবে কেন ?'

'ওদের যাওয়া-আসার পথে যদি পড়ে ?'

'ওদের যাওয়া-আসার নির্দিষ্ট পথ আছে। হাতিরা তো ধরাবাঁধা পথ ছাড়া কক্ষনো অন্য পথে যায় না। তবু দু-চারটে জানোয়ার যদি ছিটকে এসে পড়ে, তারাও তাঁবু এড়িয়ে চলে। তাঁবুর চার পাশে যে দড়ি আছে, সেগুলো পায়ে লাগলে ওরা বিরক্ত হয়। এই দড়িগুলো এত শক্ত যে, সহজে ছেঁড়ে না ! আমার তো এখানে রাত্তিরে বেশ ভাল ঘুম হয় !'

কিন্তু ওই জলহস্তী দুটো দেখার পর থেকে গুনার ওলেনের কথায় বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। ওই বোকা জলহস্তীরা যদি ভুল করেও তাঁবুর ওপরে একখানা পা রাখে তা হলেই তো সব কিছু চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে!

কাকাবাবুর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা অভ্যেস। তিনি বললেন, "এ তো মহা মুশকিল, রাত্তিরে বাইরে বেরুনো যাবে না, এরকম জায়গায় আমি আগে কখনও থাকিনি।"

সন্তুও কোনওদিন আটটায় ঘুমোয় না। সে একটু পরে জুতো-টুতো খুলে একখানা বই পড়বার চেষ্টা করল। বইটা আগে থেকে এখানে রাখা ছিল। সেটার নাম 'দ্য হিউম্যান জু'। হ্যাজাকের আলোয় খুব ভাল পড়া যায় না।

কাকাবাবুও একখানা বই খুললেন। তারপর আপন মনে বললেন, "দিনের বেলা এ-জায়গাটা খুব ভাল, কিন্তু রাত্তিরে যে একবোরে বন্দীদের মতন অবস্থা!"

খানিক বাদে তাঁবুর বাইরে থেকে কে যেন অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, "মিঃ রায়চৌধুরী!"

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে কাকাবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দরজা খুললেন।

হোটেলের সেই কালো ম্যানেজার। হাতে একটা টর্চ। সে বলল, "আপনি এত তাড়াতাড়ি ঘুমোন না আশা করি। আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "আসুন, আসুন! না, ঘুমোবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনি এই অন্ধকারের মধ্যে একলা এলেন?"

ম্যানেজারটি হেসে বলল, "আমার অভ্যেস আছে। কতবার কত জন্তু-জানোয়ারের মুখের সামনে পড়ে গেছি। আমার কিছু হয়নি।"

সন্তুও উঠে বসল। ম্যানেজারটি সন্তুর বিছানার এক ধারে বসে বলল, "প্রথম রাতটায় অনেকেরই এখানে ঘুম হয় না। কাল দিনের বেলা ঘুমিয়ে নেবেন!"

ম্যানেজারের নাম ফিলিপ কিকুইউ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, বেশ গড়গড় করে ইংরেজি বলে। কয়েকটা ভারতীয় শব্দও জানে, যেমন নমস্তে, ধন্যবাদ, রুপিয়া, বিদেশি।

ওর নাম শুনে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কিকুইউ? তার মানে জেমো কেনিয়াট্টার জাতের লোক?"

ফিলিপ সগর্বে বলল, "হ্যাঁ, আমরাই এ-দেশের 'উহুরু' মানে স্বাধীনতা এনেছি। তুমি জেমো কেনিয়াট্টা সম্পর্কে জানো?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "জেমো কেনিয়াট্টা ছিলেন এখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, এ-দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকদিন রাষ্ট্রপতি

ছিলেন।”

ফিলিপ বলল, “আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছি। বোম্বাইতে এক বছর ছিলাম। তারপর ইংল্যান্ডে পড়েছি চার বছর।”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি তো বেশ বিদ্বান দেখছি। তা হলে এই জঙ্গলে পড়ে আছ কেন?”

ফিলিপ দু' আঙুলে তুড়ি দিয়ে বলল, “মানি! মানি! আমার অনেক টাকা চাই। এই হোটেলের মালিকরা আমাকে ভাল টাকা দেয়। অনেক টাকা রোজগার করে একদিন আমি নিজেই এরকম একটা হোটেল খুলব। এ-দেশে হোটেলের ব্যবসায়ে খুব লাভ।”

“কিন্তু এখন তো এই হোটেলটা ভাল চলছে না দেখছি!”

“হ্যাঁ, একটা বদনাম রটেছে। কিছুদিন বাদেই কেটে যাবে। লোকে ভুলে যাবে!”

হঠাৎ বাইরে হুড়মুড় শব্দ হল। কয়েকটা বড় জন্তু ছুটে গেল যেন জানলার সামনে দিয়ে। সন্তু চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠতেই ফিলিপ তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল; “ভয় নেই, ও একটা ইলাণ্ড! এরকম শব্দ সারা রাত শুনতে পাবে। ওই জন্যই তো বললাম, প্রথম রাতে ঘুম হবে না!”

সন্তু জিজ্ঞেস করলে, “ইলাণ্ড কী?”

“তোমরা ইলাণ্ড দ্যাখোনি? ইলাণ্ডও এক জাতের হরিণ বলতে পারো, তবে এক-একটা প্রায় ঘোড়ার চেয়েও বড় হয়, মারলে সাতশো-আটশো কেজি মাংস পাওয়া যায়।”

“কী করে বুঝলেন ওটা ইলাণ্ড? যদি জলহস্তী হয়?”

“আমি সব জন্তুর পায়ের আওয়াজ চিনি।”

কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলেন। আকাশে চাঁদ নেই, বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তবে খানিক দূরে কোনও প্রাণীর নিশ্বাসের ফোঁসফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ল, একসঙ্গে অনেক জন্তুর নিশ্বাস।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ওগুলো কী?”

ফিলিপ বলল, “ওই যে ফোঁসফোঁস করছে? ওরা হচ্ছে এই জঙ্গলের সবচেয়ে নিরীহ আর বোকা প্রাণী। ওয়াইল্ড বিস্ট! মুখখানা মোষের মতন, কিন্তু ঘাড়টা লম্বা, তাতে আবার ঘোড়ার মতন কেশর, পেছন দিকটা আবার হরিণের মতন। এক কিম্ভূতকিমাকার জন্তু।”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ, দিনেরবেলা দেখেছি।”

ফিলিপ বলল, “কাল গাড়ি নিয়ে বেরোলে দেখতে পাবে হাজার-হাজার। লক্ষ-লক্ষও বলতে পারো। এই সময় ওরা টানজানিয়া থেকে দল বেঁধে এদিকে আসে, একটা দলের থেকে পঞ্চাশ-একশোটাকে মেরে ফেললেও কিছু এসে যায়

না। ওদের মাংস কিন্তু খুব সুস্বাদু !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের মারা হয় নাকি ?"

ফিলিপ বলল, "না, না, জন্তু মারা তো এ-দেশে নিষেধ। মাসাইরা লুকিয়েচুরিয়ে মারে। আর সিংহতে মারে। ওয়াইল্ড বিস্ট সিংহদের খুব প্রিয় খাদ্য। শুধু পেটের অংশটা খেয়ে বাকিটা ফেলে দেয়। সেই বাকি অংশ হায়েনারা খায়।"

"এখান থেকে যে দু'জন ট্যুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, তুমি তাদের দেখেছিলে ?"

"হ্যাঁ, দেখব না কেন ? এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনা। আমি তখন ছিলাম এখানে।"

"তোমার কী ধারণা ? তারা কী করে হারিয়ে গেল ?"

"ওদের হারিয়ে যাবার একটাই কারণ থাকতে পারে। ওরা রাত্তিরে বেরিয়েছিল। অনেকে তো বেশি-বেশি সাহস দেখাতে চায়। রাত্তিরবেলা পায়ে হেঁটে ঘুরতে গিয়ে যদি এক পাল ওয়াইল্ড ডগের সামনে পড়ে, তা হলে আর চিন্তা নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

"বুনো কুকুররা কি জামাকাপড়ও খেয়ে ফেলবে ?"

"আশ্চর্য কিছু না। ওরা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে একটা বড় মোষকে পর্যন্ত শেষ করে দিতে পারে। কিছুই পড়ে থাকে না।"

"পুলিশ এই থিয়োরি মেনে নিয়েছে ?"

"আর উপায়ই বা কী ? কিছুই যখন পাওয়া গেল না, আমরাও তো অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি।"

"আচ্ছা, সেই ট্যুরিস্ট দুজন একসঙ্গে এসেছিল, না আলাদা-আলাদা ? ওদের সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে ? ওরা মানুষ কেমন ছিল ?"

"ওরা আলাদা এসেছিল। এখানে দু-তিনদিন থাকার পর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এমনিতে বেশ ভালই লোক ছিল, হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ, বেশির ভাগ ট্যুরিস্ট যেমন হয়। একজন ছিল গায়ক, আর একজন অধ্যাপক। জানো তো, একটা গুজব আছে, এখানকার মাঠেঘাটে নাকি হঠাৎ হিরে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই হিরের খোঁজেই ওরা রাত্তিরবেলা বেরিয়েছিল কি না কে জানে !"

"সত্যি এখানে হিরে পাওয়া যায় ?"

"না, ওটা একেবারেই গুজব। হিরের খনি আছে সাউথ আফ্রিকায়, এখান থেকে অনেক দূরে।"

"আচ্ছা, আর-একটা কথা শুনেছিলাম। রাত্তিরবেলা এখানে তাঁবুর মধ্যে থাকলেও নাকি কী রকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। ঘুম আসতে চায় না।"

"সে ওই জন্তু-জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ আর নিশ্বাসের শব্দ তো সারা

রাত ধরে লেগেই থাকে। সেই জন্য অনেকের ঘুম হয় না।"

"শুধু ওই ? আর কোনও কারণ নেই ?"

"না, আর কী থাকবে ?"

"অনেক ট্যুরিস্ট নাকি ওই জন্য দু-একদিন থেকেই ফিরে যাচ্ছে।"

"সাধারণত এখানে দু-একদিন থাকার জন্যই লোকে আসে। রাত্তিরে ওইসব শব্দ অনেকেরই সহ্য হয় না। অন্যান্য দেশে লোকে সারাদিন জঙ্গলে ঘুরে একটা-আধটা জন্তু দেখতে পায় কিংবা একটাও পায় না। তোমাদের ইন্ডিয়ার একটা জঙ্গলে আমি বাঘ দেখতে গিয়েছিলাম, গাড়ি নিয়ে, স্পট-লাইট জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরেও বাঘ দেখতে পাইনি। একটাও না। আর আফ্রিকায় তুমি এইসব জায়গায় এসে প্রথম দিনেই এত জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাবে যে, দু' দিনেই তোমার জন্তু দেখার শখ মিটে যাবে। তোমরা এখনও কী কী জন্তু দ্যাখোনি বলো ? কাল সব দেখাবার ব্যবস্থা করে দেব।"

"আচ্ছা, এখানে রাত্তিরবেলা গাড়ি নিয়ে কি বেরোনো যায় না ?"

"সে-রকম নিয়ম নেই।"

"সবাই কি নিয়ম মানে ? ধরো, আজ রাত্তিরেই যদি আমি তোমাকে অনুরোধ করি আমাদের চুপিচুপি একটু গাড়িতে করে ঘুরিয়ে আনতে..."

"নাইরোবি থেকে স্পেশাল পারমিশন না পেলে সে-ব্যবস্থা আমি করতে পারব না। কোনওরকম বিপদ হলে তার দায়িত্ব কে নেবে ? গাড়ি নিতে গেলে নদী পার হতে হবে। নদী পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ই অনেক রকম বিপদ ঘটে যেতে পারে। সাপের কামড় খেতে পারো যখন-তখন।"

"আগে এই হোটেলের অন্য মালিক ছিল। মানে, সেই মালিক এখনও আছে। কিন্তু দু'মাস পরে অন্য দু'জন মালিক হবে। এই নতুন মালিকদের তোমার পছন্দ ?"

"নতুন মালিকদের মধ্যে একজন আমার আত্মীয়। অশোক দেশাইকেও আমি অনেকদিন ধরে চিনি। আগে আমি অন্য একটা হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলাম। ওরা ম্যানেজমেন্ট নেবার পরই আমি ম্যানেজার হয়েছি।

"ও, তুমি তা হলে নতুন মালিকদের নিজেদের লোক। সেটা জানতুম না। তা হলে তুমি এই হোটেলের উন্নতির জন্য বেশি চেষ্টা করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। নতুন মালিকরা ভাগ্যবান, তোমার মতন একজন উৎসাহী, কর্মঠ যুবককে পেয়েছে।"

"ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার দৃঢ় ধারণা, এই হোটেল আবার খুব ভাল চলবে। আমি তা হলে এখন যাই, তোমরা বিশ্রাম নাও। শুভরাত্রি !"

ম্যানেজারটির জুতোয় মশমশ শব্দ হয়। সে বেরিয়ে যাবার পরেও খানিকক্ষণ সেই শব্দ শোনা গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে দেখে তোর কেমন লাগল রে সন্তু ?"

"বেশ ভালই। তবে কথা বলবার সময় কী যেন লুকোবার চেষ্টা করছিল মনে হল।"

"তুই ঠিক ধরেছিস তো। গভীর জলের মাছ।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে কাকাবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "তুই এক কাজ কর, হ্যাজাকটা নে। আমাদের এক্ষুণি বাইরে যেতে হবে।"

সন্তু চমকে উঠে বলল, "বাইরে যাব ? সবাই যে বারণ করল রাত্তিরে বাইরে যেতে !"

"যা বলছি শোন। দেরি করা ঠিক হবে না। চল চল !"

সন্তু কাকাবাবুর অবাধ্য হতে সাহস করল না। কিন্তু তার বুকের মধ্যে ছমছম করছে। তাঁবুর বাইরে উঁকি মেরে সে শিউরে উঠল, একটু দূরেই দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কাকাবাবু সেদিকে টর্চ ফেলে বললেন, "ওটা তো একটা জেব্রা। ভয়ের কিছু নেই। আয় আমার সঙ্গে।"

সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে চললেন। খানিক দূরে আর-একটা তাঁবুর সামনে এসে বললেন, "দিনের বেলা লক্ষ করেছি, এটা খালি আছে। চটপট ঢুকে পড়, ভেতরে ঢুকে পড়।"

এখানে তালা দেবার কোনও ব্যাপার নেই। জিপারটা ধরে টানতেই তাঁবুর দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে বিছানা-টিছানা সবই পাতা আছে।

কাকাবাবু ভেতরে এসে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো তাঁবুটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "আলোটা খাটের নীচে রেখে দে। শুয়ে পড়। আজকের রাতটা আমরা এই তাঁবুতেই কাটাব। বনের হিংস্র প্রাণীর চেয়ে মানুষকেই ভয় বেশি রে !"

৬

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে ভাল করে আলাপ হল লিটল ভাইসরয় হোটেলের মালিক পিয়ের লাফর্গের সঙ্গে। বৃদ্ধটি আজও প্রথম দিকে গোমড়া-মুখো ছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু তাঁর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টায় অনবরত হোটেলটার প্রশংসা করে যেতে লাগলেন। একসময় বৃদ্ধটি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ওহে ইন্ডিয়ান, এখন আর এই হোটেলটা কী দেখছ ! আগে যদি দেখতে, তখন বুঝতে এই হোটেলটা কত ভাল ছিল ! আমি নিজেই হোটেলটার সর্বনাশ করেছি !"

সকালবেলা চারদিক এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, কোথাও ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। রোদ্দুর খুব নরম, সামনের জলাভূমিতে এখন কয়েকটা হরিণ ছাড়া অন্য

কোনও প্রাণী নেই। অনেক রকম পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটা পাখি কাছের কোনও গাছ থেকে খুব জোরে জোরে পিরুরুং পিরুরুং শব্দে ডাকছে, কিন্তু পাখিটা দেখা যাচ্ছে না।

সন্তুরা বসেছে খোলা জায়গায় টেবিল-চেয়ারে । বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব।

কাল রাতে জন্তু-জানোয়ারদের হাঁটা-চলা ও নিশ্বাসের শব্দ শুনে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলেও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্তু। যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেশ রোদ উঠে গেছে।

চোখ মেলেই সে পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, কাকাবাবু সেখানে নেই। তার বুকটা ধক করে উঠেছিল। তক্ষুনি ছুটে বাইরে এসে সে দেখতে পেয়েছিল, খানিক দূরে, তাদের আগেকার তাঁবুর সামনে, বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে এসে কাকাবাবু শান্তভাবে বসে আছেন।

সন্তু কাছে যেতেই কাকাবাবু বলেছিলেন, "আমার সন্দেহটা খুব একটা মিথ্যে হয়নি রে, সন্তু। কাল রাত্তিরে আমাদের এই তাঁবুতে কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন। কাল এক সময়ে বেশ জোর দু' পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তুই টের পাসনি। সেই বৃষ্টির জন্যই অতিথিরা তাঁবুর মধ্যে তাঁদের পায়ের ছাপ রেখে গেছেন। যা, দেখে আয়!"

সন্তু সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে দেখল দুটি বিছানাই লণ্ডভণ্ড। কারা যেন বালিশ, তোশক উলটেপালটে কী খোঁজাখুঁজি করেছে। মেঝেতে দড়ির কার্পেটে দু-তিন রকম জুতোর ছাপ। কাকাবাবুর সুটকেসটা হাট করে খোলা।

সন্তু আবার বেরিয়ে আসতেই কাকাবাবু বললেন, "দেখলি তো! তা হলে কাল তাঁবু বদলে ঠিকই করেছিলাম, বল্? যাক, এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।"

ব্রেকফাস্ট খেতে এসে প্রথমেই ম্যানেজার ফিলিপের সঙ্গে দেখা। সে বলেছিল, "গুড মর্নিং স্যার। কাল ঘুমটুম কি হয়েছিল একটুও? নিশ্চয়ই সারা রাত জেগে ছিলেন?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "আরও একটা অসুবিধে হয়েছিল। কী করে যেন তাঁবুর মধ্যে কয়েকটা মাছি ঢুকে পড়েছিল।"

ফিলিপ অবাকভাবে বলেছিল, "মাছি! রাত্তিরবেলা মাছি?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, মাছি! আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই সেট্‌সি মাছি। নাম শুনেছি তো আগেই। কিন্তু কী রকম দেখতে ঠিক জানি না। ওগুলো সেট্‌সি মাছি হলে ওদের কামড়ে ঘুম-রোগ ধরত। তাই ভয় পেয়ে আমরা অন্য একটা তাঁবুতে চলে গেলাম। সাঁইত্রিশ নম্বরে। আমাদের মালপত্রগুলো ওখানে সরাবার ব্যবস্থা করে দিও।"

ফিলিপ বলেছিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমরা তাঁবু বদলে খবু ভাল

করেছ। যদি সেট্‌সি মাছি এসে থাকে, খুবই বিপদের কথা। কিন্তু এখানে তো ওই মাছি নেই। আচ্ছা, আমি ভাল করে চেক করে দেখছি!"

তারপর কাকাবাবু এসে বসেছিলেন পিয়ের লাফর্গের টেবিলে।

পিয়ের লাফর্গ ওই কথা বলার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ লাফর্গ, আপনার হোটেল যখন ভালই চলছিল, তখন আপনি এটা অন্যের হাতে দিলেন কেন?"

বৃদ্ধ লাফর্গ বললেন, "বলতে পারো, সেটা আমার হঠকারিতা! অনেক বছর ধরে বেশ ভালভাবে হোটেল চালিয়েছি। তারপর ভাবলুম, বুড়ো হয়েছি, এখন আমার ছেলের হাতে হোটেলের ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব। ছেলে বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই সে বলল, ওই জঙ্গলে গিয়ে আমি হোটেল চালাব? কক্ষনো না! ছেলে একটা চাকরি নিয়ে চলে গেল আমেরিকা। তাতে আমার রাগ ধরে গেল। আমিও ঠিক করলুম, হোটেল বিক্রি করে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার ছেলে যদি না আসতে চায়, তা হলে আর কতদিন আপনি এই হোটেল চালাবেন? বেচে দেওয়াটাই তো ঠিক কাজ হবে।"

লাফর্গ বললেন, "আমি বেচে দেবার কথা ঘোষণা করতে না করতেই ওই নিনজানে আর দেশাই নামে দুটো লোক আমার সঙ্গে দেখা করল। তারা হোটেলটি কিনবে, কিন্তু তার আগে তারা ছ'মাস নিজেরা চালিয়ে দেখবে, হোটেলটা কেমন চলে। তারপর দর ঠিক হবে। আমাকেও সেই প্রস্তাবে রাজি হতে হল।"

"কেন রাজি হলেন?"

"আমার আর উপায় ছিল না। ওই নিনজানে লোকটার এখানকার সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে জানাশুনো আছে। আর ওই অশোক দেশাইয়ের ক্ষমতা অনেক। এদের কথা না শুনলে এরা এমন একটা কিছু করবে,যাতে আমি আর এই হোটেল বিক্রি করার কোনও খদ্দেরই পাব না। এমনকী যে-কোনও ছুতোয় আমাকে মেরে ফেলতেও পারে।"

"মেরে ফেলবে?"

"সেটা আর এমন আশ্চর্য কী কথা! এখন দেখছি, এরা ইচ্ছে করেই হোটেলটা খারাপভাবে চালাচ্ছে। যাতে ট্যুরিস্ট বেশি না আসে। কাল মাঝরাতে উঠে দেখি কী, কোথাও আগুন জ্বলছে না। আমার আমলে এটা ভাবাই যেত না। এই রকম করলে ট্যুরিস্ট আসবে কেন? ছ'মাস বাদে ওই নিনজানে আর দেশাই আমাকে বলবে, তোমার হোটেল ভাল চলে না। অতএব দাম কমাও! হয়তো অর্ধেকও দাম দেবে না।"

"মিঃ লাফর্গ, তুমিও ব্যবসায়ী, ওরাও ব্যবসায়ী, ব্যবসার ক্ষেত্রে এরকম

দরাদরি তো চলেই !”

“এটা দরাদরি নয়, স্রেফ জোচ্চুরি। আমি ওদের ফাঁদে পড়ে গেছি।”

“কিন্তু দু'জন ট্যুরিস্ট এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে-কথাটা তো ঠিক। তাতে এই জায়গাটা সম্পর্কে বদনাম তো রটবেই।”

“শোনো, ওহে ভারতীয়, এবারে আমি জার্মানিতে গিয়েছিলুম ওই ব্যাপারেই খোঁজখবর নিতে। যে দু'জন ট্যুরিস্ট অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারা জাতে জার্মান, তাদের পরিচয় আমি জানতে গিয়েছিলুম। কী জানলুম ভাবতে পারো ? ওই লোক দুটো ছিল ভাড়াটে গুণ্ডা, যাদের বলে মার্সিনারি, টাকার বিনিময়ে যে-কোনও দেশে গিয়ে ওরা যুদ্ধ করে, মানুষ খুন করে।”

“ম্যানেজার যে বলল, ওদের একজন ছিল গায়ক আর একজন অধ্যাপক ?”

“তা হলে এখানে খাতায় নাম লেখার সময় ওরা মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিল। আমি ওদের সম্পর্কে ঠিক খবর নিয়েছি। ওদের সঙ্গে সবসময় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকত। সুতরাং, ওরা হঠাৎ জন্তু-জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেবে, তা কি বিশ্বাস করা যায় ?”

“তা হলে ওরা গেল কোথায় ? নিজেরাই ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে আছে ?”

“এখানে খোলা জায়গায় কোনও মানুষ চব্বিশ ঘণ্টাও বেঁচে থাকতে পারবে কি না সন্দেহ আছে।”

“আচ্ছা, মিঃ নিনজানে আর মিঃ দেশাইয়ের অন্য কী কী ব্যবসা আছে, তা তুমি জানো ? আমি যতদূর জানি, ওরা আগে কখনও হোটেল চালায়নি।”

পিয়ের লাফর্গ হঠাৎ থেমে গিয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আবার সন্তুকে দেখলেন। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এতসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? তুমি কে ?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমি একজন ট্যুরিস্ট। আমার ভাইপোকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। তোমাকে এসব জিজ্ঞেস করেছি, নিছক কৌতূহলে। তুমি এই হোটেলের মালিক, তুমি অনেক কিছু জানবে।”

“আমি কাগজে-কলমে এখনও এই হোটেলের মালিক হলেও আমার কথা কেউ শুনছে না। এই হোটেলে যা সব কাণ্ডকারখানা চলছে, তা তোমার না জানাই ভাল, জানলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে !”

“আমার বিপদে পড়া অভ্যেস আছে। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কিছু না কিছু ঘটে যায়।”

“টাকা-পয়সার ক্ষতি যা হবে হোক। কিন্তু আমার এত পরিশ্রমে গড়া হোটেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটাই আমি সহ্য করতে পারছি না।”

“হোটেলটার যদি এরকম বদনাম হয়, তা হলে ভবিষ্যতেও তো আর লোক আসতে চাইবে না। যারা এখন এই হোটেলটা চালাচ্ছে, তাদেরও তো এই

দিকটা চিন্তা করা উচিত। হোটেলের ম্যানেজারটি তো বেশ কাজের লোক মনে হল।”

“হ্যাঁ, এই নতুন ম্যানেজারটা কাজের লোক তো বটেই। তবে, হোটেল চালানোর চেয়ে অন্য অনেক ব্যাপারে তার উৎসাহ বেশি! তবে, তোমাকে আবার বলছি, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না।”

“মাথা থাকলেই মাথা ঘামাতে হয়, এই তো মুশকিল!”

“তুমি হ্যারি ওটাংগোর নাম শুনেছ? তার ভাগ্যে কী ঘটেছিল জানো?”

এবারে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত ওই বুড়ো হোটেল-মালিকের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, “হ্যারি ওটাংগো...হ্যাঁ, তার কথা আমি জানি। কারিয়ুকি'র কথাও আমি জানি। আমি ওইরকমই কিছু সন্দেহ করেছিলাম। তুমি মনে করিয়ে দিলে, সেজন্য ধন্যবান। অনেক ধন্যবাদ!”

বৃদ্ধটি বললেন, “আমি তোমাকে সাবধান করছি, এখানকার কোনও ব্যাপারে মাথা গলিও না। তুমি বিদেশি, তুমি কিছুই করতে পারবে না। বেড়াতে এসেছ, বেড়াও, ফিরে যাও!”

বৃদ্ধ টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। কাকাবাবু এক মনে কফিতে চুমুক দিতে লাগলেন।

পাশের টেবিলে আমেরিকান ছেলেমেয়ে দুটি বসেছে। কাল ওরা খুব হাসিখুশি ছিল, আজ সকালে বেশ গম্ভীর। কেউ কোনও কথা বলছে না। ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে নাকি?

সন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, “গুড মর্নিং। কাল রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল?”

মেয়েটি বলল, “মর্নিং! হ্যাঁ, না, ঠিক ঘুম হয়নি; অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম...তোমরা কাল রাত্তিরে তাঁবুর মধ্যে একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলে?”

সন্তু বলল, “মিষ্টি গন্ধ? কই, না তো!”

আমেরিকান ছেলেটি বলল, “গন্ধটা আমিও পেয়েছি। এ-রকম কোনও জন্তু আছে কি না জিজ্ঞেস করতে হবে, যার গা থেকে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। ওই গন্ধটা নাকে আসার পর আমার গা গুলোচ্ছিল, সকালেও বমি-বমি পাচ্ছে।”

মেয়েটি বলল, “আমার তো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। চলো, আজই চলে যাই।”

ছেলেটি বলল, “দ্যাখো, একটু বাদে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। আজকের দিনটা অন্তত থাকি।”

মেয়েটি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তেই ছেলেটিও তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেল তাঁবুতে।

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। দূরে আর-একটা টেবিলে ম্যানেজার ফিলিপের সঙ্গে গুনার ওলেন গল্প করছেন। সন্তুকে তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সন্তু উঠে গেল ওদের টেবিলে। ম্যানেজার ফিলিপ একটা চেয়ার টেনে বসতে দিল তাকে।

গুনার ওলেন হাসতে হাসতে বললেন, "বুড়ো হোটেল-মালিকের সঙ্গে এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল তোমাদের ? আমি তো ওই বুড়োটার কাছে ঘেঁষি না। বড্ড বেশি কথা বলে।"

ফিলিপ বলল, "উনি লোক ভাল। তবে ইদানীং মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে বোধহয়। হোটেলটা বিক্রি করার ব্যবস্থা করে উনি কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ক'দিন বাদে আমাদের সরকার এমনিই এটা দখল করে নিত, তখন উনি একটাও পয়সা পেতেন না।"

পিয়ের লাফর্গকে সন্তুর বেশ পছন্দ হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে এইসব কথা শুনতে সন্তুর ভাল লাগল না।

সে জিজ্ঞেস করল, "আজ সকালে বেড়াতে যাওয়া হবে না ?"

ফিলিপ বলল, "আমাদের গাড়িগুলো এয়ারস্ট্রিপে গেছে, আজকের অতিথিদের আনবার জন্য। ওগুলো ফিরলেই তোমাদের পাঠানো হবে। তোমার কাকাবাবুকে বলো, আজ আমি নিজে তোমাদের নিয়ে যাব। যা দেখাব, তা আর কেউ দেখাতে পারবে না। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিও !"

গুনার ওলেন জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়াংম্যান, তোমার কাকাবাবু কী করেন ? মানে ওঁর পেশা কী ?"

কাকাবাবু সবাইকে বলেন যে উনি আগে ছিলেন জিওলজিস্ট, পা ভেঙে যাওয়ার জন্য আগে-আগে রিটায়ার করেছেন। সন্তুও সেই কথাটাই বলল।

গুনার ওলেন একবার ফিলিপের চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। সন্তুর মনে হল, এরা দু'জন এতক্ষণ কাকাবাবু সম্পর্কেই আলোচনা করছিল। একজন খোঁড়া লোক সব ব্যাপারে এত খোঁজখবর নিচ্ছে দেখে লোকের তো কৌতূহল হবেই।

ওদের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফিরে এল সন্তু। সামনের জলাভূমিতে এখন অনেক জন্তু এসে গেছে। কালকে ছিল একদল মোষ, আজ আর একটাও মোষ নেই, তার বদলে রয়েছে অনেকগুলো শুয়োর আর বেবুন।

গাড়ির শব্দে বোঝা গেল, এয়ারস্ট্রিপ থেকে আজকের যাত্রীরা এসে গেছে। সন্তু নদীর দিকের পথটার দিকে চেয়ে রইল। মিনিট দশেক বাদে মাসাই-গার্ডরা পাঁচ-ছ'জন যাত্রীকে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজনকে কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। কোথায় যেন দেখেছে, কোথায় যেন দেখেছে ! লোকটি একজন লম্বা-মতন ভারতীয়।

লোকটি নিজে থেকেই এগিয়ে এসে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে হাসি-মুখে বলল, "কেমন আছেন, মিঃ রায়চৌধুরী ? বলেছিলাম না আবার দেখা হয়ে যেতে পারে !"

তক্ষুনি সন্তুর মনে পড়ে গেল, এই লোকটিই প্লেন থেকে নামবার সময় কাকাবাবুর ব্যাগটা হাতে নিয়েছিল। এর নাম পি. আর. লোহিয়া।

কাকাবাবু হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আবার দেখা হয়ে গেল। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।"

লোকটি চমকে উঠে বলল, "চিঠি ? তার মানে ? কিসের চিঠি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি হোটেলে আমার নামে যে এক লাইন চিঠি পাঠিয়েছিলেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

লোকটি বলল, "আমি আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছি ? কই, না তো ! সে চিঠিতে আমার নাম ছিল ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "না, তা হলে বোধহয় অন্য কেউ পাঠিয়েছে। যাই হোক, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুশি হলাম, মিঃ লোহিয়া ! আপনি ক্লান্ত আছেন নিশ্চয়ই, যান, এখন বিশ্রাম নিন !"

লোহিয়া বললে, "আসবার সময় প্লেনটা অনেকবার ডিগবাজি খেয়েছে, ওয়েদার খারাপ ছিল নাইরোবির দিকে। তারপর এখানে এসে আর নামতে পারে না, এক পাল বুনো মোষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল এয়ারস্ট্রিপে।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল ছিল হাতি, আজ মোষ ! সিংহ থাকলে নাকি নামাই যায় না !"

লোহিয়া একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। তাকে খুব চিন্তিত মনে হল। আবার ফিরে এসে সে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কোনও অসুবিধে নেই। আমি আর সন্তু দিব্যি আছি এখানে !"

লোহিয়া আবার চলে যেতে গিয়েও পারল না। আবার থমকে দাঁড়িয়ে সে হাতছানি দিয়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, অনুগ্রহ করে এখানে একটু শুনবেন ?"

বোঝা গেল, সে কাকাবাবুকে আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু সন্তুর সামনে বলতে অসুবিধে হচ্ছে।

কাকাবাবু উঠে গেলেন তার কাছে। সন্তু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েও কানখাড়া করে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু শোনা গেল না।

একটু বাদে কাকাবাবু হাসি মুখে ফিরে এসে শুধু বললেন, "হুঁঃ !"

পি. আর. লোহিয়া চলে গেল অফিস-ঘরের দিকে। একটু পরে ম্যানেজার ফিলিপ এসে বলল, "চলো, এবার তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ব্যস্ত মানুষ। তুমি নিজে যাবে কেন ? যে-কোনও

একজন ড্রাইভারকে দিয়ে দিলেই তো হয়।"

ফিলিপ বলল, "তুমি আমাদের স্পেশ্যাল গেস্ট। আমার মালিকরা খবর পাঠিয়েছে যে, তোমাদের যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। আমার হাতে এখন অন্য কাজ নেই, আমি নিজেই তোমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তা হলে চলো, যাওয়া যাক।"

নদী পর্যন্ত জঙ্গলের পথটা আজ ফাঁকা, একটাও জন্তু-জানোয়ার নেই। দু'জন মাসাই-গার্ড অবশ্য ওদের পৌঁছে দিয়ে গেল নৌকো পর্যন্ত। নৌকোতে উঠে দেখা গেল, খানিকটা দূরে তিনটে হাতি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে, একটা হাতি শুঁড়ে করে জল ছেটাচ্ছে চারদিকে।

কাকাবাবু ফিলিপকে বললেন, "নৌকোটা একটু থামাও, ওদের ভাল করে দেখি!"

ফিলিপ অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "ও-রকম আরও অনেক দেখতে পাবে। হাতির কি অভাব! এদিকে হাতি খুব বেড়ে গেছে!"

এ-পাশে এসে দেখা গেল, গাড়ির চারপাশে এক পাল জেব্রা, তারা গাড়ির গন্ধ শুঁকছে। তাদের তাড়াতেও হল না, মানুষ দেখেই তারা ল্যাজ তুলে ছুটে পালাল।

চারখানা গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ির গায়ে চাপড় মেরে ফিলিপ বলল, "এইটাই সবচেয়ে ভাল, তোমরা দু'জনে সামনের সিটে বোসো, ভাল দেখতে পাবে।"

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই ফিলিপ বেশ জোরে চালাতে শুরু করল। পথ ছেড়ে সোজা মাঠের মধ্যে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, মাঝে-মাঝে গর্ত, তাতে ফিলিপের ভ্রূক্ষেপ নেই। তার গাড়িটাও খুব শক্তিশালী, গাঁক-গাঁক করে ছুটছে।

প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। ধুধু করছে মাঠ, মনে হয় দিগন্ত পর্যন্ত আর কিছুই নেই। আসলে মাঠটি ঢেউ-খেলানো। একবার একটু উঁচু জায়গাতে উঠতেই দেখা গেল একদিকে পিলপিল করছে জন্তু। কয়েক হাজার তো হবেই। গাড়িটা সেদিকে নিয়ে যেতে বোঝা গেল, সেই জন্তুগুলি অধিকাংশই জেব্রা আর ওয়াইল্ড বিস্ট। তারা মাঝে-মাঝে ঘাস খাচ্ছে আর একটু-একটু করে এগোচ্ছে। সন্তু একসঙ্গে এত গোরু-ছাগলও কোনওদিন দ্যাখেনি।

কাকাবাবু বললেন, "সব জন্তুগুলোর মুখই একদিকে... সেটা লক্ষ করেছিস সন্তু?"

ফিলিপ বলল, "তুমি ঠিক ধরেছ, রায়চৌধুরী। এইসব জন্তুরা আসছে তানজানিয়ার সারিংগেটি জঙ্গল থেকে। জন্তু-জানোয়াররা তো কোনও দেশের সীমানা মানে না। পাসপোর্টেরও পরোয়া করে না। প্রত্যেক বছর এই সময় এই জন্তুগুলো তানজানিয়া থেকে কেনিয়ায় ঢুকে লেক ভিক্টোরিয়ার দিকে যায়। প্রায় এক হাজার মাইল।"

সন্তু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "এক হাজার মাইল ? সত্যি ?"

ফিলিপ বলল, "হ্যাঁ সত্যি। যাবার পথে কতগুলো যে মরে তার ঠিক নেই। তবু ওরা যাবেই !"

"কেন যায় ?"

"যায় ঘাসের খোঁজে। যখন যেখানে বৃষ্টি হয়, সেখানে ঘাস ভাল হয়। ওরা সেটা জানে। কত কাল ধরে যে ওরা এই একই পথ ধরে যাচ্ছে তা কে জানে !"

"ওরা গাড়ি দেখে ভয় পায় না ?"

"গাড়িকেও ওরা একটা জন্তু মনে করে নিশ্চয়ই। অনেক গাড়ি দেখে-দেখে ওরা বুঝে গেছে যে, এই শব্দ-করা জন্তুগুলো ওদের কোনও ক্ষতি করবে না। যেমন ওরা হাতি দেখলে ভয় পায় না। কিন্তু সিংহ বা লেপার্ড দেখলে দৌড়বে !"

ফিলিপ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই সন্তু বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে আর একটু দেখব।"

ফিলিপ বলল, "এরকম আরও কত দেখতে পাবে। এদের সংখ্যা লক্ষ-লক্ষ। চলো, আগে গণ্ডার খুঁজে দেখা যাক। সিংহ, হাতি এসবও অনেক দেখতে পাবে, কিন্তু গণ্ডার সহজে দেখা যায় না। গণ্ডার খুব কমে এসেছে।"

মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড় রয়েছে, সেই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে জঙ্গল। কোনও জঙ্গলই তেমন ঘন নয়। এইরকম একটা জঙ্গলে দেখা গেল গোটা-পাঁচেক জিরাফ ঘুরছে। জিরাফরা বোধহয় গাড়ির মতন জন্তুকে পছন্দ করে না, গাড়ি দেখেই তারা দৌড়তে শুরু করল, লম্বা-লম্বা পা ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

ফিলিপ বলল, "ওরা কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পায়নি। জিরাফরা নিরিবিলি থাকতে ভালবাসে। অন্য কোনও জন্তুর সঙ্গে মেশে না। তুমি দেখবে, হরিণ, মোষ, জেব্রা পাশাপাশি ঘুরছে, কিন্তু জিরাফরা এরকম কোনও দলে থাকে না।"

একটু দূরে দেখা গেল এক পাল হরিণ। ছোট-বড়, নানারকম। কোনওটার মাথার শিং প্যাঁচানো-প্যাঁচানো, কোনওটার ছাগলের মতন।

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সবগুলোকেই হরিণ বলি। কিন্তু এদের আলাদা-আলাদা নাম আছে। ওই ছোটগুলো..."

কাকাবাবুকে বাধা দিয়ে ফিলিপ বলল, "হ্যাঁ, ওই ছোটগুলো বুক বাক, গায়ে সাদা-সাদা দাগ। ওই দিকে দ্যাখো গেজেল, ওরা ভেড়ার থেকে বড় হয় না। ওর চেয়ে বড়গুলো ইম্‌পালা, কী সুন্দর শিং দেখেছ, ওরা লাফাতেও পারে দারুণ জোরে। আর যেগুলোর দেখছ নীল-নীল রং, ওদের বলে টোপি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে ফিলিপ বলল, "চারদিকে লক্ষ রাখো, এখানে নিশ্চয়ই

কোথাও সিংহ দেখা যাবে। সিংহ ওই ইম্‌পালা হরিণ খেতে খুব ভালবাসে। অবশ্য ওদের মারা খুব শক্ত।"

ফিলিপ আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল। একটু দূরেই দেখা গেল একটা বড় গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে দুটো লেপার্ড। ঠিক যেন দুটো হলদে-কালো রঙের বড় আকারের বেড়াল।

ওদের দেখেই সন্তু বলে উঠল, "কী সুন্দর!"

ফিলিপ বলল, "হ্যাঁ, সুন্দর বটে, কিন্তু এরকম হিংস্র প্রাণী খুব কমই আছে। এই লেপার্ডের চামড়ার খুব দাম।"

গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে ফিলিপ বলল, "দাঁড়াও, এবারে একটা মজা দেখা যাবে। হরিণের পালটা আসুক!"

হরিণের পালটা ছিল একটা টিলার ওপারে। একটু পরেই তারা এদিকে চলে এল। সঙ্গে-সঙ্গে লেপার্ড দুটো তাড়া করে গেল তাদের।

ফিলিপও তার গাড়িটা ছোটাল ওদের পেছন-পেছন।

লেপার্ডের তাড়া খেয়ে হরিণগুলো ছুটল পাঁই-পাঁই করে।

কোনও-কোনওটা তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল। সন্তুর প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল, এই বুঝি কোনও হরিণ ধরা পড়ে যায়!

সে চোখ বুঝতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফিলিপ হো-হো করে হেসে উঠল। কাকাবাবুও হাসলেন। সন্তু দেখল যে, লেপার্ড দুটো দৌড় থামিয়ে এক জায়গায় ধপাস করে শুয়ে পড়ে জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে।

হরিণের পালটাও খানিকটা দূরে থেমে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে লেপার্ড দুটোকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

ফিলিপ বলল, "এই লেপার্ডগুলো সাঙ্ঘাতিক জোরে দৌড়য়, কিন্তু ওদের দম বেশি নেই, খানিকটা গিয়েই হাঁফিয়ে যায়। হরিণরা তা জানে। হরিণদের দম বেশি, তাই ওরা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেপার্ড দুটোকে লোভ দেখাচ্ছে।"

সন্তু বলল, "ঠিক যেন একটা খেলা চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আসলে কিন্তু খেলা নয়। একসময় একটা না একটা হরিণ মারা পড়বেই। লেপার্ড দুটো তো আর উপোস করে থাকবে না। কিন্তু সেই দৃশ্য আমরা দেখতে চাই না। চলো, অন্য দিকে যাই।"

এরপর হাতির দঙ্গল, উটপাখি, নেকড়ে, হায়না, দু' জায়গায় দুটো সিংহ পরিবার, এই সবই দেখা হল, কিন্তু গণ্ডার আর চোখে পড়ে না। অথচ ফিলিপ জেদ ধরেছে, গণ্ডার সে দেখাবেই। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে সে গাড়ি চালাচ্ছে, হোটেল থেকে চলে এসেছে বহু দূরে।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, "থাক, আজ আর গণ্ডার খোঁজার দরকার নেই।"

ফিলিপ বলল, "দেখি না। আর-একটু দেখি। পাওয়া যাবে ঠিকই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখন পর্যন্ত মাসাইদের গ্রাম তো একটাও দেখলাম না।"

ফিলিপ বলল, "আমাদের হোটেল থেকে মাইল দু-একের মধ্যেই একটা আছে। ওরা অবশ্য অনেকটা সভ্য হয়ে গেছে। আর অন্য মাসাইরা তো এখনও প্রায় যাযাবর। এক জায়গায় কিছুদিন ঘর বেঁধে থাকে, তারপর আবার অন্য কোথাও চলে যায়।"

"মাসাইরা তো যোদ্ধার জাত। ওদের সঙ্গে কখনও তোমাদের ঝগড়া-টগড়া হয়নি ? ওদের এলাকার মধ্যেই তো তোমরা হোটেল খুলছ।"

"না, ঝগড়া হবে কেন ? আমাদের হোটেলেই তো কয়েকজন মাসাই-ছেলে কাজ করে, দ্যাখোনি ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু ওদের সঙ্গে তো কথা বলাই যায় না। ওরা ইংরিজি জানে না একেবারে।"

"ইংরিজি জানলেও হোটেলের গেস্টদের সঙ্গে ওদের বেশি কথা বলা নিষেধ। তুমি ওদের কাছে কী জানতে চাও ?"

"আগে মাসাইরা ইচ্ছেমতন জন্তু-জানোয়ার মারত। ওদের ছেলেরা একটা সিংহ কিংবা হাতি মারতে না পারলে বিয়ে করতেই পারত না। এখন সরকার থেকে ওদের শিকার করা নিষেধ করে দিয়েছে। সেটা ওরা কতটা মেনে নিয়েছে ?"

"কিচ্ছু মানেনি। ওরা এখনও কত জন্তু-জানোয়ার মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছে !"

"ওরা মারে, আর সেইসব জন্তু-জানোয়ারের চামড়া কারা বিক্রি করে ?"

"রায়চৌধুরী, তুমি কি এইসব নিয়ে গবেষণা করার জন্যই ইন্ডিয়া থেকে এসেছ নাকি ?"

"না, না, না, নিছক কৌতূহল !"

"সব ব্যাপারে সকলকে বেশি কৌতূহল দেখাতে নেই, তা জানো না ?"

"ওইটাই তো আমার রোগ। আমার বড্ড বেশি কৌতূহল।"

"তুমি আমাদের বুড়ো হোটেল-মালিকের কাছে হ্যারি ওটাংগো বিষয়ে কী বলছিলে ?"

"তুমি তা শুনলে কী করে ? আমরা তো খুব আস্তে-আস্তে কথা বলছিলুম।"

"একজন বেয়ারা তোমাদের কফি দিতে এসেছিল। তোমাদের ধারণা সে ইংরিজি জানে না ! সে আমাকে সব বলে দিয়েছে।"

"তুমি হ্যারি ওটাংগোকে চিনতে ? তার নাম উচ্চারণ করা অপরাধ নাকি ?"

"তুমি বিদেশি, আমাদের ব্যাপারে নাক গলানো তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই

অপরাধ !”

“শোনো, ফিলিপ, তোমার দেশের ব্যাপারে আমি একটুও নাক গলাইনি, ততবড় লম্বা নাকও আমার নেই। আমি মাথা ঘামিয়েছি আমার এক বন্ধু সম্পর্কে। হ্যারি ওটাংগো আমার বন্ধু ছিলেন। কোনও বন্ধুর বেলায় স্বদেশি-বিদেশির প্রশ্ন ওঠে না। আমার একটা মাথা যখন আছে, তখন তা আমি মাঝে-মাঝে ঘামাবই।”

“তা হলে তোমার মাথাটা যাতে বেশিক্ষণ না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা দরকার।”

ফিলিপ ঘচ্‌ করে ব্রেক কষে পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে সন্তুর কানে ঠেকাল। তারপর হুকুমের সুরে বলল, “তোমার পকেটে কী কী আছে বার করো। কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করলে এই ছেলেটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব !”

সন্তু খুব একটা ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আরও দু'একবার হয়েছে। সে কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, “আমার পকেটে কোনও অস্ত্র নেই। বিদেশে আসার সময় আমি কোনও অস্ত্র বহন করি না। কেন পাগলামি করছ, ফিলিপ। ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার তো কোনও ক্ষতি করতে চাই না। হ্যারি ওটাংগোকে যে আগে খুন করে তারপর হায়েনাদের পালের সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তা আমি জানি। কয়েক বছর আগে কারিয়ুফি নামে নেতার ভাগ্যেও ওই ব্যাপার ঘটেছিল, তাই না ? কিন্তু এতে তোমার তো কোনও হাত নেই। আমি এখানে এসেছি, যে-জার্মান ট্যুরিস্ট দু'জন উধাও হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে। যদি সে-রহস্যের সমাধান করতে পারি, তা হলে তোমাদের হোটেলেরই তো উপকার হবে।”

“আমাদের হোটেলের উপকার করবার জন্য তোমার সাহায্য কে চেয়েছে ?”

“তোমার মালিকরা আমাকে সেইজন্যই পাঠিয়েছে।”

“আমার মালিকরাই খবর পাঠিয়েছে, তোমরা যাতে মাসাইমারা থেকে আর ফিরে না যাও সেই ব্যবস্থা করতে।”

“তোমার মালিকরা ? মানে দেশাই আর নিনজানে ? ও ! সেইজন্যই তুমি কাল রাত্তিরে লোক পাঠিয়েছিলে আমাদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে বাইরে নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে দিতে ? আমরা তাঁবু পালটে ছিলুম বলে আর খুঁজে পায়নি !”

“আজকের ব্যবস্থাটা অনেক ভাল। একেবারে পাক্কা ! নামো, গাড়ি থেকে নামো !”

“এখানে গাড়ি থেকে নামব ? তুমিই তো বলেছিলে এখানে গাড়ি থেকে নামা বিপজ্জনক। তা ছাড়া নিয়ম নেই।”

"নামো। চটপট নামো, ন্যাকামি কোরো না!"

"এখানে নামব, তুমি বলছ কী ফিলিপ ? হোটেলে ফিরে চলো, আমাদের খিদে পেয়েছে।"

"খাওয়া আর তোমাদের এ-জীবনে জুটবে না। তোমরা এখন কাদের খাদ্য হবে, তাই-ই চিন্তা করো!"

সন্তু এক ঝটকায় মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ফিলিপের হাত চেপে ধরতে গেল। কিন্তু ফিলিপ অত্যন্ত সতর্ক। সে রিভলভারের নলটা কাকাবাবুর দিকে ঘুরিয়ে অন্য হাতে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর গর্জন করে বলল, "নামো। আমি ঠিক পাঁচ গুনব। তার মধ্যে না নামলে...এক... দুই... তিন...।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ফিলিপ তারপর সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলেই দিল নীচে। নিজেও নেমে এসে কাকাবাবুর সারা গা চাপড়ে দেখল, কোথাও কোনও অস্ত্র লুকনো আছে কি না। সে কিছুই পেল না।

এক পা সরে গিয়ে সে বলল, "আমি এখনই তোমাদের দু'জনকে গুলি করে খতম করে দিতে পারি। কিন্তু শুধু-শুধু আমি গুলি খরচ করি না। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে যাব, এখান থেকে হোটেল প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। সেখানে তোমরা কিছুতেই পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে পারবে না। তার আগেই কোনও জন্তু-জানোয়ারের সামনে পড়ে তোমরা শেষ হয়ে যাবে। আমি ফিরে গিয়ে বলব, তোমরা হিরে খোঁজার লোভে জোর করে এক জায়গায় নেমেছিলে, তারপর..."

কাকাবাবু বললেন, "জার্মান ট্যুরিস্ট দু'জনকেও বুঝি এরকম করেছিলে ?"

"শাট আপ ! তোমাদের সঙ্গে আর আমি একটাও কথা বলতে চাই না!"

কাকাবাবু এবারে ফিলিপের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "শোনো ফিলিপ, তুমি সন্তুকে চড় মেরেছ। বিনা দোষে ওর গায়ে যে হাত তোলে তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করি না। আমার হাতে শাস্তি সে পাবেই!"

ফিলিপ অট্টহাসি করে উঠে বলল, "তুমি পাগল হয়ে গেছ দেখছি ! তুমি কি ভূত হয়ে আমাকে শাস্তি দিতে চাও নাকি ? আজকের দিনটাই তোমার জীবনের শেষ দিন।"

"আমাকে বাদ দিয়ে তুমি একা ফিরে গেলেই পি. আর. লোহিয়া তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। তাকে আমি সব বলে এসেছি।"

ফিলিপ মুখ ভেংচিয়ে বলল, "একজন ইন্ডিয়ান আমার হোটেলে বসে আমাকে অ্যারেস্ট করবে, এত সাহস ! এখানে আমিই রাজা। আমি ফিরে গিয়েই দেখছি সে কেমন লোক!"

ফিলিপ এক পা এক পা করে পিছিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "আমার ক্রাচদুটো অন্তত দিয়ে যাও !"

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর মুখ বাড়িয়ে ফিলিপ বলল, "লেপার্ড তাড়া করলে তুমি ক্রাচে ভর দিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না !"

গাড়িটা খানিকটা চলতে শুরু করে তারপর ওদের গোল করে ঘিরে দু'তিনবার চক্কর দিল। যেন ফিলিপ মজা দেখছে। তারপর হুশ করে ছুটে গেল দিগন্তের দিকে। একটুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল একেবারে।

সন্তু হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তবু এখনও যেন সে পুরো ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। লোকটা সত্যি তাদের ফেলে চলে গেল ? আফ্রিকার এই হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ভরা প্রান্তরে ? কাকাবাবু ওদের কী ক্ষতি করেছেন ? কাকাবাবু শুধু ওটাংগো না কাটেংগো কী যেন একটা নাম বলছিলেন। তাতেই ওরা রেগে রেগে উঠছিল। অশোক দেশাইয়ের কাকার নেমন্তন্নতে তারা এখানে বেড়াতে এসেছে, আর সেই অশোক দেশাই তাদের মেরে ফেলতে বলেছে ?

কাকাবাবু সন্তুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "বদমাইশটা তোর কানের ওপর অত জোরে মারল, তোর কানের ক্ষতি হয়নি তো ?
শুনতে পাচ্ছিস ঠিকঠাক ?"

সন্তুর একটা কান ভোঁভোঁ করছে, তাতে কিছু আসে যায় না। লোকটা তাকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দেবার সময় তার হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে, তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু এরপর কী হবে ?

সন্তু বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকাল। এখানে জঙ্গল প্রায় নেই বলতে গেলে, মাঝে-মাঝে একটা-দুটো বড় গাছ, আর সব দিকে ধুধু করছে মাঠ। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট টিলা। কোথাও কোনও জন্তু-জানোয়ার দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর ঝকঝক করছে সূর্য।

কাকাবাবু সন্তুর হাত ধরে তুললেন। তারপরই একটু ফিকেভাবে হেসে বললেন, "তুই ভয় পেয়ে গেলে নাকি রে, সন্তু ? দ্যাখ, এর আগে আমরা কতবার কতরকম বিপদের মধ্যে পড়েছি। সব সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক মানুষকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকায় এসে জন্তু-জানোয়ারের মুখে প্রাণ হারাব ? তা হতে পারে না। দ্যাখ না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

সন্তু তবু কথা বলছে না দেখে কাকাবাবু তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "এই সন্তু, কী হল রে তোর ? ভয় পেয়ে চুপ করে বসে থাকলে তো বাঁচা আরও শক্ত হয়ে যাবে ! চল, হাঁটতে শুরু করি।"

সন্তুর চোখে জল এসে গেল। যদিও সে ভয় পায়নি, সে ভাবছে অন্য কথা। তার দু'খানা শক্তসমর্থ পা আছে, সে দরকার হলে ছুটতে পারবে। কিন্তু কাকাবাবুর যে ছোটার ক্ষমতাও নেই।

জামার হাতায় চোখ মুছে সে বলল, "কাকাবাবু, তোমার ক্রাচ দুটোও নিয়ে গেল, তুমি হাঁটবে কী করে?"

"হ্যাঁ, দ্যাখ তো, লোকটা শুধু বদমাইশ নয়, তার ওপর আবার কী কৃপণ। অন্তত ক্রাচ দুটো তো দিয়ে যেতে পারত! থাক গে, কী আর করা যাবে। বাচ্চা বয়েসে তুই ককফাইট খেলিসনি? একটা পা মুড়ে আর-একটা পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে খেলতে হয়! সেই টেকনিকেই আমি হাঁটব!"

কাকাবাবুর একটা পায়ে একেবারেই জোর নেই। মাটিতে ভর দিয়ে কোনওমতে দাঁড়াতে পারেন, কিন্তু হাঁটা অসম্ভব। লাফিয়ে-লাফিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি ডেকে বললেন, "সন্তু, আয়, এইভাবেই যেতে হবে।"

সন্তু এবারে দৌড়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো।"

"না রে, তাতে দু'জনেই হাঁফিয়ে যাব। আমি লাফিয়ে-লাফিয়েই যাব, খানিকটা বাদে-বাদে দম নেবার জন্য দাঁড়ালেই হবে। তার আগে আমাদের প্ল্যানটা ঠিক করে নিই। একদিকে খুব ভাগ্য ভাল, এখন মাত্র বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। অনেকক্ষণ দিনের আলো পাওয়া যাবে। অনেকেই বলেছেন, এখানকার জানোয়াররা পারতপক্ষে মানুষকে মারে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব খাদ্য আছে। বড়-বড় জানোয়ার দেখলে আমরা কোনও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। ভয় হচ্ছে সাপ আর বন্য কুকুরের পালকে। দিনের আলোয় সাপের জন্য নজর রাখতে হবে সব সময়। আর বন্য কুকুরের ব্যাপারটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"কাকাবাবু, আমরা কোন্ দিকে হাঁটব?"

"যে-কোনও একদিকে একেবারে সোজা। বেঁকলে চলবে না। এখানে সাতটার সময় সন্ধে হয়। খুব আস্তে হাঁটলেও ঘণ্টা সাতেকে আঠারো-কুড়ি মাইল হাঁটা যায়। আর তার মধ্যে কোথাও না কোথাও মানুষের দেখা পাবই। লিট্‌ল ভাইসরয় ছাড়াও এখানে কিছু দূরে দূরে ছড়ানো আরও তিন-চারটে হোটেল আছে শুনেছি।"

কাকাবাবু এমনভাবে কথা বলছেন, যেন সিংহ, লেপার্ড, হাতি, হায়েনা, সাপ, ওয়াইল্ড ডগ্‌স ভরা এই বিশাল প্রান্তর পার হওয়া এমন কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়। যেন এটা একটা মজার অ্যাডভেঞ্চার।

"কাকাবাবু, ওটাংগো না কাটেংগা কী যেন একটা লোকের নাম বলছিলে ওই ফিলিপকে, সে কে?"

"হ্যারি ওটাংগো! তুই নাম শুনিসনি? না, তোর জানার কথা নয়। আট বছর আগে উনি একবার ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন, তখন আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। হ্যারি ওটাংগো আফ্রিকার একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। এক সময় ছিলেন উকিল, তারপর সে পেশা ছেড়ে দিয়ে যেখানেই অন্যায়-অবিচার

দেখতেন, সেখানেই ছুটে যেতেন বাধা দিতে। তিনি আবার ছিলেন বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি। আফ্রিকায় এমন অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার এখনও আছে, যা পৃথিবীর আর অন্য কোনও দেশে নেই। কিন্তু এখানকার কিছু-কিছু লোভী ব্যবসায়ী মাংস ও চামড়া বিক্রি করার জন্য সেইসব পশুদের মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছিল। জানিস তো, হাতির দাঁতের অনেক দাম, একটা হাতি মারলে তার দাঁত দুটো বিক্রি করেই অনেক টাকা পাওয়া যায়। সেই লোভে মারা হচ্ছিল হাতি। যদিও এই সব পশু শিকার করা এখন নিষিদ্ধ।"

"কাটেংগা বুঝি সে-সব থামাতে গিয়েছিলেন ?"

"কাটেংগা নয়, ওটাংগো। তিনি কেনিয়ায় এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন যে, এখানকার কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী আর সরকারি কর্মচারী, দু'একজন মন্ত্রীও আছে, গোপনে গোপনে এই পশু-নিধনের কারবার চালাচ্ছে। ইওরোপ-আমেরিকার কয়েকটি কোম্পানি তাদের কাছ থেকে সেইসব কেনে। ওটাংগো ঘোষণা করলেন, কারা কারা এই বে-আইনি, নৃশংস ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের নাম তিনি প্রকাশ করে দেবেন। পরদিন কী হল জানিস ? নাইরোবি শহর থেকে মাত্র তেইশ মাইল দূরে হ্যারি ওটাংগোর ছিন্নভিন্ন শরীরটা পাওয়া গেল। একপাল হায়েনা তাঁর অনেকখানি মাংস খেয়ে নিয়ে গেছে। খবরের কাগজে বেরোল যে, মিঃ ওটাংগো কোনওক্রমে হায়েনার পালের মুখে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, ওঁকে কেউ আগে থেকে খুন করে হায়েনাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"ওঁকে কারা খুন করতে পারে, তা তো বোঝাই যায়।"

"হ্যাঁ, বোঝা যায় তো বটেই। কিন্তু সেই দলটা এত শক্তিশালী যে, কেউ তাদের নাম প্রকাশ করতে সাহস করে না। সব জায়গাতেই ওরা টাকা খাইয়ে রাখে।"

"ওই ম্যানেজার ফিলিপটাও তা হলে ওই দলে !"

"ও একটা চুনোপুঁটি। আসল চাঁই হল অশোক দেশাই আর নিনজানের মতন লোকেরা। অশোক দেশাইয়ের আছে টাকার জোর, আর নিনজানের আছে সরকারি মহলে প্রতিপত্তি। পুলিশও ওদের ধরতে সাহস করবে না। এখন বুঝতে পারছিস তো, ওরা কেন হোটেলটা কিনতে চাইছে ?"

"কেন ?"

"এরকম জায়গায় একটা হোটেল হাতে থাকলে এখান থেকে অনেক জীবজন্তু মেরে পাঠাবার সুবিধে। হোটেলটা ভাল না চললেও অন্যদিকে ওদের লাভ হবে অনেক। বুড়ো সুইস সাহেবটার ওপর চাপ দিয়ে ওরা হোটেলটার দামও কমিয়ে ফেলবে অনেক।"

"তা হলে নাইরোবি শহরে থাকতে দুপুরে কে আমাদের টেলিফোনে ভয়

দেখাল, আর কে-ই বা ওই চিঠিটা পাঠাল !"

"একটু দাঁড়া, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি রে সন্তু ! ওই দ্যাখ..."

সামনের দিকে তাকিয়ে সন্তু কেঁপে উঠল।

৭

গণ্ডারটা দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট টিলার ওপরে। তার পেছন দিকে দেখা যাচ্ছে শুধু আকাশ। গণ্ডারটা এমন স্থির হয়ে রয়েছে, যেন মনে হয় একটা পাথরের মূর্তি।

ম্যানেজার ফিলিপ তাদের গণ্ডার দেখাবার ছল করে এতদূর নিয়ে এসেছিল, এবারে সত্যি-সত্যি সেই গণ্ডার নিজে থেকেই দেখা দিল।

কাকাবাবু সন্তুর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দু'জনেই বসে পড়েছেন মাটিতে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, "এবারে আস্তে-আস্তে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। ওর দিকে চোখ রেখে। গণ্ডার এমনিতে মানুষ মারে না। কিন্তু ও আমাদের দেখতে পেলেই চটে যেতে পারে। মাটিতে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবে না।"

সন্তু উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে চিবুক ঠেকিয়ে বলল, "কিন্তু ও যদি এদিকেই ছুটে আসে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও যদি আমাদের পিঠের ওপর দিয়ে চলে যায়, তা হলে ট্যাঙ্ক চাপা পড়লে যে অবস্থা হয়, আমাদেরও সেই দশা হবে। আশা করি, ও ভদ্রতা দেখিয়ে অন্য দিকে চলে যাবে। আর যদি সত্যি এদিকে দৌড়ে আসে, তা হলে আমরা দু'জনে গড়িয়ে যাব, বুঝলি। তাতে অন্তত একজন বাঁচব।"

গণ্ডারটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, এদিকেই তাকিয়ে আছে, কী দেখছে কে জানে ! অন্য বড় জন্তুরা একসঙ্গে অন্তত তিন-চারজন থাকে, গণ্ডারটি কিন্তু একলা। বিশাল তার চেহারা। গণ্ডারটি যখন টিলার ওপাশ দিয়ে উঠে এসেছে, তখন এই দিকেই তার যাওয়ার ইচ্ছে।

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হতে সন্তু চকিতে একবার পেছনে তাকাতেই তার বুক হিম হয়ে গেল। তাদের পেছনে, ঠিক পেছনে নয়, ডান দিকে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি হাতি, তিনটি দাঁতাল, তাদের মধ্যে একটি শুঁড় তুলে ডাকছে।

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই রে, সন্তু। একদম চুপ করে থাক, একটুও নড়াচড়া করবি না !"

সন্তু একবার ভাবল, সামনে বা পেছনে তাকাবে না। অথচ না-তাকিয়ে পারছেও না। গণ্ডারটি যেমন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, তেমনি হাতি তিনটিও আর এগোচ্ছে না, তবে তিজনেই একসঙ্গে শুঁড় দোলাচ্ছে ঘন ঘন।

এক-একটা মিনিট যেন এক-এক ঘণ্টা। কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে? ওরা কি পরস্পরকে তাড়া করবে, মাঝপথে সন্তুদের চিঁড়েচ্যাপ্টা করে দিয়ে? গণ্ডার আর হাতিদের মধ্যে শত্রুতা থাকে, না বন্ধুত্ব?

একসময় গণ্ডারটি পেছন ফিরে আস্তে আস্তে নেমে গেল টিলার অন্য দিকে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথে। সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল। তার ধারণা, এবারে বাঁচতে হলে হাতিদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে হবে।

কিন্তু হাতিগুলোও পেছন ফিরেছে। তারাও গদাই-লস্করি চালে ফিরে যেতে লাগল।

কাকাবাবু উঠে বসে কোটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "এইসব জানোয়াররা কী ভদ্র দেখলি? ওরা একদল অন্যের কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করতে চায় না, আবার কেউ কারও পথও আটকায় না। গণ্ডারটা হাতিদের পথ ছেড়ে দিল, হাতিরাও ভাবল, গণ্ডারটাই থাক, আমরা ফিরে যাই!"

সন্তু আচ্ছন্ন গলায় বলল, "সত্যি ওরা ফিরে গেল? আমাদের দেখতে পায়নি?"

"আরে ওদের কাছে আমরা তো এলেবেলে। আমাদের দেখলেও ওরা গ্রাহ্যই করত না। আমরা কার জন্য বেঁচে গেলাম বল তো? গণ্ডারটার জন্য, না হাতিগুলোর জন্য? বলা শক্ত।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু ভেবে দ্যাখ তো, যারা লুকিয়ে শিকার করে, যাদের বলে পোচার, সেইরকম দু'জন যদি এখানে উপস্থিত থাকত আমাদের বদলে, তা হলে কী হত? এরকম নির্জন জায়গায়, গণ্ডারটা, হাতিগুলো, একটাও বাঁচত না। আজকাল লাইট মেশিনগান দিয়ে এইসব বড় বড় জানোয়ার মেরে ফেলাও খুব সোজা!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "চল, আবার যাত্রা শুরু করি। ওই যে সামনের বড় গাছটা দেখছিস ওই দিকে যাব। একটা নির্দিষ্ট কিছু দেখে এগোতে হবে, নইলে এত বড় মাঠের মধ্যে দিক হারিয়ে ফেলব।"

এক-পা-বাঁধা মোরগের মতন কাকাবাবু লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগলেন। সন্তু দেখল, একটু বাদেই ঘামে কাকাবাবুর পিঠ একেবারে ভিজে গেছে। এরকমভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া দারুণ পরিশ্রমের ব্যাপার। এমনভাবে মানুষ কত দূর যেতে পারে? তবু কাকাবাবুর অদম্য উৎসাহ।

বড় গাছটার কাছে পৌঁছে সন্তু ভাবল এখানে একটু বিশ্রাম নেওয়া হবে, কিন্তু কাকাবাবু সেখানে না থেমে বললেন, "চল, হাঁফিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওই সামনের বাঁশঝাড়টা অবধি যাই, অবশ্য ওটার খুব কাছে যাওয়া ঠিক হবে না, ভেতরে কোনও জন্তু থাকতে পারে।"

আর-একটু যাওয়ার পরই সন্তু শুনতে পেল, কাকাবাবু ঠিক হাপরের মতন

নিশ্বাস ফেলছেন। সন্তু কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, "কাকাবাবু, থামো, থামো! এবার একটু বিশ্রাম নিতেই হবে। আমি আর পারছি না!"

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বুক ভরে কয়েকবার শ্বাস নিলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, "দেড়টা বাজে। তোর খিদে পেয়ে গেছে, না রে? আমরা ন'টার সময় হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি। অন্যদিন এই সময় তেমন খিদে পায় না। কিন্তু আজই বেশি খিদে পাবে। খিদে জিনিসটা খুব পাজি, সুবিধে অসুবিধে গ্রাহ্য করে না।"

সন্তুর পেটে দাউদাউ করে খিদের আগুন জ্বললেও সে সে-কথা ভাবছে না। সে ভাবছে, দু'ঘণ্টা তো কেটে গেল, এখনও জনমানবের সামান্য চিহ্নও নেই। প্রান্তরটির চেহারা আগেও যে-রকম ছিল, এখনও সে-রকম। তবে হোটেল থেকে বেরিয়েই এক ঘণ্টার মধ্যে যত জন্তু-জানোয়ার দেখা গিয়েছিল, এদিকে ওদের সংখ্যা খুবই কম। সেই গণ্ডার ও হাতি তিনটের পর মাঝখানে ওরা শুধু দুটো উটপাখি দেখতে পেয়েছিল। সে-দুটো দেখে কাকাবাবু বলেছিলেন, "ইশ, কোনওরকমে যদি ওদের ধরে ওদের পিঠে চাপা যেত! ওরা ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছোটে।"

এরকম অবস্থার মধ্যেও কাকাবাবুর কথা শুনে হেসে ফেলেছিল সন্তু।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কতদিন তো আমরা সকালে খেয়ে বেরোই। রাত্তিরের আগে আর খাওয়াই হয় না। মনে কর, আজকের দিনটাও সে-রকম!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, রাত্তিরে আমরা কোথায় খাব?"

সন্তুর পিঠে চাপড়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "হবে, হবে, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে থেকেই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? চল, বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে আর-একটা কোনও নিশানা ঠিক করি। থামলে চলবে না!"

বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি গিয়ে ওদের থামতে হল। এই প্রথম ওরা দেখতে পেল সাপ।

আফ্রিকাতে কোনও কিছুই কম-কম নয়। আমাদের দেশে একসঙ্গে একটা-দুটো সাপ দেখতে পাওয়াই যথেষ্ট, এখানে ওরা বাঁশঝাড়ের বাইরেই দেখতে পেল এগারোটা। ভেতরে আরও কত আছে কে জানে!

কয়েকটা সাপ বাঁশগাছে জড়িয়ে আছে, কয়েকটা কাছাকাছি মাটিতে কিলবিল করছে। সবগুলোরই রং কালো, তবে আকারে খুব বড় নয়। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। মাটিতে অনেক গর্ত।

কাকাবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নাক কুঁচকে বললেন, "এই একটা প্রাণীকে দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। সাপও নিরীহ প্রাণী, মানুষকে সহজে কামড়ায় না জানি, কিন্তু আমি সাপের দিকে তাকাতে পারি না, আমার গা ঘুলিয়ে ওঠে। আমি রিভলভার দিয়ে দু'বার দুটো সাপ গুলি করে মেরেছি। এখন যদি সঙ্গে

রিভলভারটা থাকত...”

বলতে বলতে থেমে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললেন।

সন্তু অনেকক্ষণ ধরেই রিভলভারটার কথা ভাবছে। কাকাবাবুর সঙ্গে সেটা থাকলে ওই হোটেল-ম্যানেজার ফিলিপ কি এত সহজে তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে কাপুরুষের মতন পালাতে পারত ? প্লেনে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ওঠা নিষেধ বলেই কাকাবাবু সেটা সঙ্গে আনেননি। তা ছাড়া, এবারে তো স্রেফ বেড়াতে আসা।

সন্তুর মনের কথাটাই যেন বুঝতে পেরে কাকাবাবু বললেন, “রিভলভারটা সঙ্গে আনিনি, ভালই হয়েছে। আনলে একটা-কিছু রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। ওই যে ফিলিপ, ওর চোখ দেখেই বোঝা যায়, লোকটা সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর। হি ইজ আ কিলার। তুই তো জানিস, সন্তু, আমি রিভলভার তুলে লোকদের ভয় দেখাই, চট করে কাউকে গুলি করতে পারি না। কিন্তু ওই ফিলিপ সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়, আমি ওর দিকে রিভলভার তুললেই ও এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দিত।”

“কাকাবাবু, ওই ফিলিপের মতন লোককে মায়াদয়া না করে গুলি করাই উচিত।”

“দ্যাখ না, পরে ওকে শাস্তি দিই কী রকম !”

“পরে মানে ? ওর সঙ্গে কি আমাদের আর দেখা হবে ?”

বাঁশঝাড়টাকে পাশ কাটিয়ে ওরা আর-একটা কিছু নিশানা ঠিক করার জন্য থামল। ঠিক সোজাসুজি আর কোনও বড় গাছ-টাছও চোখে পড়ে না। মেঘের গায়ে জেগে উঠেছে একটা বিশাল পাহাড়। তার চূড়া বরফে ঢাকা।

সন্তু একবার চোখ কচকাল। সে সত্যি-সত্যি ওরকম একটা সুন্দর পাহাড় দেখছে, না ওটা তার চোখের ভুল ?

কাকাবাবু পাহাড়টা আগে দেখতে পাননি। সন্তু ডেকে দেখাতেই তিনি বললেন, “বাঃ, এতদূর থেকেও যে দেখা যায়, জানতুম না তো ! ওটা কী পাহাড় জানিস ? ওই হচ্ছে কিলিমাঞ্জারো। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখা আছে, “স্নোজ অব কিলিমাঞ্জারো’, পড়িসনি বুঝি ? এবারে ফিরে গিয়ে পড়ে নিস !”

“যদি ফিরতে পারি।”

“ফিরবি না কেন ? আবার ঘাবড়াচ্ছিস। তুই কি ভাবছিস, এই মরুভূমির মতন মাঠে আমরা মরে পড়ে থাকব ; তা হতেই পারে না ! রাজা রায়চৌধুরী এভাবে মরার জন্য জন্মায়নি। আগে ওই ফিলিপটিকে শাস্তি দিতে হবে, অশোক দেশাই আর নিনজানেকে জেলে ভরতে হবে, তবে তো অন্য কথা !”

“কাকাবাবু, কাকাবাবু, এটা কী ? আমার পায়ে, আমার পায়ে...”

সন্তুর চিৎকার শুনে কাকাবাবু কেঁপে উঠলেন।

সন্তু ট্রাউজার্স পরে আছে, তার বাঁ পায়ে পেঁচিয়ে ধরেছে একটা সাপ, তার

মুখটা ওপরের দিকে, মাঝে-মাঝে একটা লকলকে জিভ বার করছে।

এই প্রথম ভয় পেয়ে গেলেন কাকাবাবু। তাঁর মুখখানা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সাপটাকে দেখে একবার তিনি ঘেন্নায় দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলেন, বোধহয় এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভাবলেন, এবারে আর সন্তুকে বাঁচানো সম্ভব হল না।

পরের মুহূর্তেই তিনি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, "সন্তু, স্ট্যাচু হয়ে থাক, একদম নড়বি না, না নড়লে ও কিচ্ছু করবে না..."

পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে কাকাবাবু ডান হাতে জড়িয়ে নিলেন। তারপর বিদ্যুতের গতিতে সেই হাতটা দিয়ে চেপে ধরলেন সাপটার মাথা। প্রবল শক্তিতে সন্তুর পা থেকে সাপটার প্যাঁচগুলো খুলে, সেটাকে আছড়াতে লাগলেন মাটিতে। চার-পাঁচ বার সেরকম আঘাতেই সাপটা অক্কা পেয়ে গেছে, তবু কাকাবাবু থামছেন না। মেরেই চলেছেন।

সন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল আর কোনও সাপ আছে কি না। এ জায়গাটা শুকনো, গর্ত-টর্তও নেই। বাঁশঝাড়টার পাশ দিয়ে আসবার সময়ই নিশ্চয় এই সাপটা কোনওরকমে সন্তুর পায়ে জড়িয়ে গেছে।

এক সময় মরা সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোকে কামড়ায়নি তো ? প্যাণ্টটা গুটিয়ে দ্যাখ।"

সন্তু বলল, "না, কামড়ায়নি, সে-রকম কিছু টের পাইনি।"

"তবু প্যাণ্টটা তুলে দ্যাখ। ওটা হাঁটুর ওপরে ওঠেনি, ওই পর্যন্ত কোনও ক্ষত-টত আছে কি না ! এগুলো কী সাপ আমি জানি না।"

সন্তু প্যাণ্ট গুটিয়ে ভাল করে দেখল। একটুও রক্ত-টক্ত চোখে পড়ল না।

"তোর বমি পাচ্ছে না ? কিংবা ঘুম পাচ্ছে না, সন্তু ?"

"না।"

কাকাবাবু এবারে নিজেই শুয়ে পড়লেন মাটিতে। রুমালটা তিনি ফেলে দিয়েছেন, হাত দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "এবারে আমি সত্যিকারের টায়ার্ড ফিল করছি রে, সন্তু। কেন জানিস ? কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার মনের জোর একেবারে চলে গিয়েছিল। সাপ দেখলে আমার ঘেন্না হয়, ভেবেছিলুম, ওটাকে আমি ধরতে পারব না, তোকে বাঁচাতে পারব না। একবারের চেষ্টায় ওকে ধরতে না পারলে কোনও উপায় ছিল না, তোকে বা আমাকে ঠিক কামড়ে দিত।"

কাকাবাবু চোখ বুজলেন।

সন্তুও ঝিম মেরে বসে রইল। তার বদলে কাকাবাবুর পায়ে যদি সাপটা জড়াত, তা হলে সে কি সাপটার মাথা ওইভাবে চেপে ধরতে পারত ?

সন্তুর চোখের পাতা জুড়ে আসছে। এই অবস্থায় কি কারও ঘুম পায় ? সাপে কামড়ালে নাকি ঘুম আসে। তা হলে কি সাপের বিষ কোথাও লেগেছে ?

একটু পরেই কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, "চল, চল, সময় নষ্ট করলে চলবে না। অনেকটা সময় চলে গেল।"

কাকাবাবু উঠে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে চলা শুরু করলেন। এর মধ্যেই তিনি হাল্‌কা মেজাজটা ফিরে পেয়েছেন। সন্তুকে বললেন, "সব জিনিসেরই কিছু-না-কিছু উপকারিতা আছে। এই যে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছি, এর উপকার কী বল তো ? আমার পায়ে কোনও সাপ জড়াতে পারবে না। তুই সাবধানে দেখে দেখে আয়।"

সন্তু বলল, "এবার আমরা কোন্ দিকে যাব !"

সামনে কোনও বড় গাছ বা ঝোপঝাড়ও দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া।

কাকাবাবু কপালে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে সেই পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, "স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো। এই নামটার মধ্যে কী নতুনত্ব আছে জানিস ? আছে বিস্ময়। এখান দিয়ে বিষুব রেখা গেছে, অর্থাৎ এই জায়গাটা খুব গরম হবার কথা। অথচ এখানেও পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে। যাক গে, আমাদের ওই পাহাড়ের ডিরেকশানে যাওয়া ঠিক হবে না। বাঁশঝাড়টাকে ঠিক পেছনে রেখে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।"

আবার খানিকটা যেতেই দেখা গেল অনেকগুলো হাড়গোড় পড়ে আছে। ঠিক যেন একটা মানুষের কঙ্কাল।

সন্তু কাকাবাবুর হাত চেপে ধরতেই তিনি বললেন, "ভয় পেলি নাকি ? মানুষ নয়, মোষ-টোষের কঙ্কাল মনে হচ্ছে।"

ফিলিপের সঙ্গে গাড়িতে আসার সময়ও এরকম কঙ্কাল কয়েক জায়গায় চোখে পড়েছিল। ফিলিপ বলেছিল, 'সিংহ তো মোষ বা হরিণ মেরে অর্ধেকটা খেয়ে চলে যায়। বাকি মাংস হায়েনা, শেয়াল, শকুনে খায়। হাড়গুলো পড়ে থাকে। বহু বছর পড়ে থাকে।'

কিন্তু চলন্ত গাড়িতে বসে দেখা আর অসহায় অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে চোখে দেখার মধ্যে অনেক তফাত। মনে হয়, যে সিংহ ওই মোষটাকে মেরেছিল, সে কাছাকাছি কোথাও আছে।

কাকাবাবু বললেন, "একটা ভাল ব্যাপার এই যে, এদিকে আমরা জেব্রা, হরিণ, মোষ বা ওয়াইল্ড বিস্টের ঝাঁক দেখতে পাইনি। ওরা থাকলেই কাছাকাছি সিংহ, নেকড়ে, লেপার্ড, চিতা, হায়েনা এই সব হিংস্র পশু থাকত। এটাই নিয়ম।"

সন্তুর মনে হল, এখন সিংহ-টিংহ কিছু একটা সামনে পড়ে গেলেও কিছুই আসে যায় না। ওরা এই ধূসর প্রান্তর কোনও দিনই পার হতে পারবে না।

সামনে জমিটা উঁচু-নিচু হয়ে গেছে। সোজা যেতে গেলে ওদের এখন খানিকটা উঁচুতে উঠতেই হবে।

কাকাবাবু আকাশের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা মোটামুটি দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছি। যদি তানজানিয়ার সীমান্তে পৌঁছতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই মানুষজনের দেখা পেয়ে যাব।"

সন্তু খানিকটা হতাশভাবে বলল, "কাকাবাবু, ফিলিপ যে-জায়গাটায় আমাদের ফেলে দিয়ে গেছে, সে নিশ্চয়ই হিসেব করে দেখে নিয়েছে। সে জানে, ওখান থেকে আর কোনও দিনই আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারব না।"

কাকাবাবু মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, "আবার তুই ওই সব অলক্ষুনে কথা বলছিস ? ফিলিপ কি জানে যে, একটা খোঁড়া লোকও বিনা ক্রাচে দশ মাইল পার হতে পারে এই মাঠের মধ্য দিয়ে ? আমরা দশ মাইলের বেশি চলে এসেছি।"

লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এমনিতেই কষ্টকর, উঁচুতে ওঠা আরও অনেক বেশি কষ্টের। কাকাবাবু সেই চেষ্টা করতে যেতেই সন্তু বলল, "তুমি এখান দিয়ে উঠো না, চলো, আমরা খানিকটা ঘুরে যাই। অন্য কোথাও নিচু জায়গা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

"না, তাতে সুবিধে হবে না। এইরকম ফাঁকা জায়গায় একটা অন্তত দিক ঠিক না রাখলে আমরা গোলকধাঁধায় পড়ে যাব। একই জায়গায় বার বার ঘুরব। চল, আমি ঠিক পেরে যাব।"

কাকাবাবু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রইলেন, যাতে মুখ দিয়ে না নিশ্বাস বেরোয়। জোরে জোরে লাফিয়ে তিনি সন্তুর আগে উঠে এলেন ওপরে। তারপর বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, "এইবার আমাদের একটু বেঁকতেই হবে।"

মাঠটা যেখানে ঢালু হয়ে গেছে, সেখানটা একটা ঘাসবন। তারপর অনেকটা ফাঁকা জায়গায় উইঢিপির মতন কী সব উঁচু-উঁচু হয়ে আছে। ডান দিকের কোণে ছোট ছোট গাছের একটা জঙ্গল। এক-মানুষ উঁচু গাছ।

কাকাবাবু বললেন, "ওই ঘাসবনে ঢোকা ঠিক হবে না। নেকড়ে আর লেপার্ডদের লুকিয়ে থাকার প্রশস্ত জায়গা। ওই উইঢিপিগুলোকেও আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ওখানে ইঁদুরের গর্ত থাকলে সাপও থাকবে। তার থেকে বরং ওই জঙ্গলটাই নিরাপদ। গাছগুলো ফাঁকা ফাঁকা আছে, ভেতরটা দেখা যাবে। তা ছাড়া, ছোট গাছ ভেঙে দুটো লাঠি তৈরি করতে হবে। হাতে একটা কিছু অন্তত অস্ত্র থাকলে মনে আরও জোর পাওয়া যাবে, কী বল ? তা ছাড়া, একটা লাঠি আমার এই পায়ে জড়িয়ে নিলে আমি আর-একটু ভালভাবে লাফাতে পারব। চল, আমরা ওপর দিয়েই ডান দিকে এগিয়ে যাই, তারপর নীচে নামব।"

হঠাৎ ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। বেশ রোদ ছিল আকাশে, কখন মেঘ

এসে গেছে, ওরা খেয়ালও করেনি। এতক্ষণে সন্তু খেয়াল করল যে, তেষ্টায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জামাটামাগুলোও ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে আছে একেবারে। এই বৃষ্টিস্নান বেশ ভালই লাগল ওদের। সন্তু আকাশের দিকে মুখটা হাঁ করে রইল। এ ছাড়া জল পান করার তো কোনও উপায় নেই।

মাটি এখানে এত শুকনো যে, বৃষ্টি পড়ামাত্র শুকিয়ে যাচ্ছে। হোটেলে থাকতে কে যেন বলেছিল, কয়েক মাস ধরে এখানে খরা চলছে। ঘাসবনটার রংও কেমন যেন হলদেটে হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেই সন্তুর শীত করতে লাগল। রীতিমতন কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে। কাকাবাবু নিজের কোটটা আগেই খুলে নিয়েছিলেন, সন্তুকে বললেন, "সোয়েটারটা খুলে ফ্যাল। শীত লাগলেও গায়ে ভিজে সোয়েটার থাকা ঠিক নয়।"

সৌভাগ্যের বিষয়, মিনিট দশেকের মধ্যেই থেমে গেল বৃষ্টি। আবার রোদ্দুরের ঝিলিক দেখা গেল।

কাকাবাবু বললেন, "ঘাসবনটা পার হয়ে এসেছি, এখন কোনাকুনি যেতে পারলে জঙ্গলটায় তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেত। কিন্তু এই উইঢিপিগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? এক কাজ করা যাক।"

উঁচু জায়গাটায় কিছু কিছু পাথর ছড়ানো আছে। কাকাবাবু কয়েকটা বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে একটা উইঢিপি টিপ করে ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি সন্তুও কয়েকটা পাথর ছুঁড়তে লাগল একই ঢিপি লক্ষ করে।

গোটাতিনেক পাথর একটা ঢিপির গায়ে লাগতেই একটা কাণ্ড ঘটল। তলা থেকে মাঝারি সাইজের একটা প্রাণী লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেই ছুটল প্রাণপণে। কাছাকাছি গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ওই রকম আরও দু'তিনটে। এত জোরে তারা ছুটতে লাগল, যেন ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "দাঁতাল শুয়োর! এগুলোকে বলে ওয়ার্ট হগ। এরা গর্তে লুকিয়ে থাকে।"

"এরা মানুষকে অ্যাটাক করে?"

"কী জানি! তবে এগুলো তো তেমন বড় নয়। আসল ওয়াইল্ড বোর অনেক পেল্লায় পেল্লায় সাইজের হয়। যাকগে, ওদের কাছাকাছি না যাওয়াই ভাল।"

ওরা যে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেন হঠাৎ থেমে যাওয়া একটা ঢেউয়ের পিঠের মতন। দু'দিকটা ঢালু। এখানে সুবিধে হচ্ছে এই যে দু'দিকের অনেকখানি দেখা যায়। দু'দিকেই কোনও আশার চিহ্ন নেই।

ঢেউয়ের পিঠের ওপর দিয়ে এগোতে এগোতেই ওরা জঙ্গলটার কাছে পৌঁছে গেল। এবারে নামতে হবে। ঢালু জায়গা দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠার

চেয়েও নামা অনেক শক্ত। যে-কোনও মুহূর্তে উল্টে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

কাকাবাবু বসে পড়ে দু' হাত দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে নামতে লাগলেন। সন্তু দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল, ওই ম্যানেজার ফিলিপটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত! ওকে যদি এখন হাতের কাছে পাওয়া যেত...

নীচে নেমেই সে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "নাইরোবিতে যারা আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিল, তারা কি জানত যে, এখানে আমাদের এই অবস্থা হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মনে হয় খানিকটা জানত। এখন ভেবে দ্যাখ, সে আমাদের উপকারই করতে চেয়েছিল। যে গাড়ি চাপা দিতে এসেছিল, আমাদের শুধু ভয় দেখানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। ইচ্ছে করলেই সে আমাদের একজনকে অন্তত চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে পারত। ফোন করে সে-ই আমাদের ফিরে যেতে বলেছিল।"

"তা হলে সে কে ? সে কি আমাদের কোনও বন্ধু ? অমলদা-মঞ্জুবৌদির তো এতখানি জানার কথা নয়। তা ছাড়া গাড়ি চাপা দিতে আসার ব্যাপারটা তো অমলদার হতেই পারে না !"

"না, অমল নয়। সে নিশ্চয়ই এমন একজন কেউ, যে শত্রুপক্ষের মধ্যে থেকেও আমাদের বন্ধু।"

"কাকাবাবু, অশোক দেশাই কী করে আমাদের শত্রু হল ? আমেদাবাদ থেকে তার কাকা ভুলাভাই দেশাই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন।"

"ভুলাভাই নিশ্চয়ই তাঁর ভাইপোর আসল ব্যবসাটা জানে না। অশোক দেশাইও আগে বুঝতে পারেনি আমি হ্যারি ওটাংগোর এতটা খোঁজখবর নেব।"

"বিকেল হয়ে গেল, এখনও আমরা কোনও মানুষের চিহ্ন দেখলুম না।"

"আরও ঘণ্টা-দেড়েক দিনের আলো থাকবে। চল, জঙ্গলে ঢুকে দু'খানা লাঠি তো বানাই আগে।"

জঙ্গলের কাছাকাছি এসে শোনা গেল, সেখানে গাছপালার মধ্যে নানারকম শব্দ হচ্ছে, কারা যেন সড়সড় করে গাছের ডাল ভাঙছে। দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানুষ আছে জঙ্গলের মধ্যে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "হাতি ! হাতির পাল ঢুকেছে ! আমাদের ঢোকার আশা নেই। বসে পড়। আর কিছু করার নেই এখন।"

একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ওরা বসার জায়গা করে নিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। চলন্ত হাতির পা। ছোট, বড়, নানারকম। হাতিদের পুরো একটা যৌথ পরিবার। এখানকার গাছগুলোতে সদ্য কাঁচা-কাঁচা সবুজ সবুজ পাতা গজিয়েছে। এই গাছ বোধহয় হাতিদের প্রিয় খাদ্য।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাতির পাল বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। প্রায় পনেরো ষোলোটা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড়, সেটা যেন একটা চলন্ত পাহাড়।

এক-একটা কানই যেন দুর্গাপুজোর বিরাট পাখার মতন। দাঁত দুটো যেন দুটো সাদা থাম। আবার, ওই দলে খুব ছোট-ছোট দুধের বাচ্চাও রয়েছে। দেখলে গণেশ-গণেশ মনে হয়। এক-একটা বাচ্চা পিছিয়ে পড়লেই মা-হাতি ঘুরে তাকিয়ে ডাকছে।

পুরো দলটাই আছে বেশ খোশমেজাজে। এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে না। আস্তে আস্তে পা ফেলে, শুঁড় দোলাতে দোলাতে চলেগেল ঘাসবনের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, যখন বনের মধ্যে আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না, তখন কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল !"

হাতির পাল আসায় একটা সুবিধে হল এই যে, তারা অনেক গাছের ডাল ভেঙে রেখে গেছে, সন্তুদের আর সে পরিশ্রম করতে হল না। বরং পছন্দমতন দু'খানা ডাল বেছে নিতে পারল।

কাকাবাবু বললেন, "এই তো বেশ চমৎকার হল। এবার আমি অনেক সহজে যেতে পারব। চল, তাড়াতাড়ি বনটা পেরিয়ে যাই। অন্ধকার হয়ে গেলে এখানে থাকা ঠিক হবে না।"

এই বনে বেবুন ছাড়া আর কোনও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল না। মাটিতে কয়েকটা বেবুনকে ঘুরতে দেখে সন্তু প্রথমে মানুষ ভেবে চমকে উঠেছিল। আশার ছলনা ! তার মনটা দমে গেল আবার। সারাদিনের পরিশ্রমে পা আর চলতে চাইছে না। পেটের মধ্যে খিদেটা ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

জঙ্গলটা পার হবার পর একটুক্ষণ যেতেই দেখা গেল, একদিকের আকাশ লাল হয়ে গেছে। সূর্য ডুবতে বসেছে। হাতির পাল তাদের অনেকটা সময় খরচ করিয়ে দিয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো রে, একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে যাবে, আর তো হাঁটা যাবে না। রাত্তিরের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে !"

সন্তু চুপ করে রইল। তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ফাঁকা জায়গায় খানিক দূরে ছাতিমগাছের মতন ডালপালা-ছড়ানো একটা গাছ একা দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপাশে আর কিছুই দেখা যায় না !

"চল সন্তু, ওই গাছতলায় গিয়ে আমরা বসি। একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। তুই তো গাছে উঠতে পারবি ? তুই গাছে উঠে বসে থাকবি রাতটা, আমি নীচে বসে পাহারা দেব।"

এত দুঃখের মধ্যেও সন্তুর হাসি পেল। সামান্য একটা লাঠি নিয়ে কাকাবাবু কী পাহারা দেবেন ?

গাছতলায় পৌঁছেই সন্তু ধপাস করে শুয়ে পড়ল।

কাকাবাবু বসে পড়ে, বিড়বিড় করে বললেন, "এমন একটা বাজে জঙ্গল, তাতে কোনও ফলের গাছও নেই। হাতির খাবার হবার জন্যই যেন জঙ্গলটা তৈরি হয়েছে, মানুষের জন্য নয়।"

তারপর নিজের ডান পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "এতক্ষণ ধরে লাফিয়ে আমার পা-টা ফুলে গেছে। কাল সকালে হাঁটতে মুশকিল হবে।"

এরপর দু'জনে চুপ করে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ। সব কথা ফুরিয়ে গেছে। সমস্ত আকাশটা লালচে হয়ে গেল এর মধ্য, তারপর আস্তে আস্তে কালোর ছোঁয়া লাগতে লাগল। একঝাঁক চিল না বাজপাখি না শকুন কী যেন উড়ছে ওদের মাথার উপরে। কয়েকটা এসে বসল ছাতিমের মতন গাছটার মগডালে।

এক সময় কাকাবাবু ক্ষোভের সঙ্গে বল উঠলেন, "তা হলে কি ওই ম্যানেজার ফিলিপটাই জিতে যাবে ? আমরা হারব ? না, তা হতেই পারে না !"

সন্তু কান খাড়া করে বলল, "কাকাবাবু, কিসের শব্দ ? কুকুর ডাকছে ?"

"কোথায়। আমি তো কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছি একবার। ওয়াইল্ড ডগ্স ?"

সন্তু তড়াক করে উঠে পড়ে সেই জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, সার বেঁধে আট-দশটি মানুষের মতন কী যেন প্রাণী যাচ্ছে। ঝুঁকে ঝুঁকে, লাফিয়ে লাফিয়ে। বেবুন নয়, বেবুনের চেয়ে অনেক বড়।

"কাকাবাবু, গোরিলা ! গোরিলা !"

"ধ্যাত ! কী বলছিস ! এখানে আবার গোরিলা আসবে কোথা থেকে ? এদেশে গোরিলা নেই। ভয় পেয়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?"

"ওই যে, ওই যে !"

কাকাবাবু এবারে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দে চিৎকার করে বললেন, "মানুষ ! মানুষ ! ওই তো মানুষ যাচ্ছে। সন্তু, ডাক, ডাক, গলা ফাটিয়ে ডাক !"

ঝট করে নিজের জামাটা খুলে তিনি লাইটার জ্বেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর সেই জ্বলন্ত জামা লাঠির ডগায় জড়িয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনিও চ্যাঁচাতে লাগলেন, "হেল্প ! হেল্প !"

মানুষের মতো যে-দলটি নাচতে নাচতে যাচ্ছিল, তারা বোধহয় ওদের ডাক শুনতে পায়নি, কিন্তু আগুন দেখতে পেয়েছে। তারা থমকে দাঁড়াল। তারপর সবাই একসঙ্গে কু-কু-কু ধরনের শব্দ করে ছুটে এল এদিকে।

কাকাবাবু জয়ের আনন্দে হেসে বললেন, "আগুন দেখে যারা ছুটে আসে, তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ! সন্তু, উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে রাখ। লাঠি ধরিস না !"

তিনি নিজেও আগুন সমেত ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে ওইরকম হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন।

মানুষের মতন দলটি ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ওদের কোনওরকম কথা বলার সুযোগ দিল না। তাদের দু'জন সন্তু আর কাকাবাবুকে পিঠে তুলে নিয়ে

আবার দৌড়ল।

৮

মাসাইদের পুরো গ্রামটাই গোল করে উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ছোট-ছোট আলাদা কুঁড়ে ঘর। একটি মাত্র ছোট দরজা দিয়ে সেই গ্রামে ঢোকা যায়। লম্বা মাচার ওপরে পালা করে পুরুষেরা পাহারা দেয় সারা রাত। রাতের অন্ধকারে কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের এখানে ঢুকে পড়ার উপায় নেই।

গ্রামের মধ্যে একটা বড় চালাঘরে রয়েছে অনেকগুলো গোরু আর মোষ আর ভেড়া। পশুপালনই এখন এদের জীবিকা। প্রত্যেকটি মাসাই-পুরুষই ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীর যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া, হাতে সবসময় থাকে বর্শা। মাসাই মেয়েরাও কম লম্বা নয়, তারাও যুদ্ধ করতে জানে। মাসাইরা আফ্রিকার অন্য সব জাতের তুলনায় আলাদা।

এক দল মাসাইপুরুষ সন্ধেবেলা গ্রামে ফিরছিল। আস্তে-আস্তে দৌড়বার সময় ওরা মাথা নিচু করে নাচের ভঙ্গিতে এগোয় আর গলা দিয়ে নানারকম পশু-পাখির ডাকের অনুকরণ করে। সন্তু আর কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে ওরা তাদের কাঁধে করে তুলে এনে গ্রামের ঠিক মাঝখানে ফেলল, দু'জনে ওদের বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে বর্শা তুলে রাখল। কয়েকজন গেল সর্দারকে ডাকতে।

সেখানেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা পাথর-ঘেরা জায়গায়। সেই আগুনের চার পাশে গোল হয়ে বসে আছে গ্রামের সব নারী-পুরুষ। একটা ভেড়া ঝলসানো হচ্ছে আগুনে।

সর্দার এসে বসল একটা কাঠের গুঁড়িতে, ঠিক রাজাদের মতন একটা পা সামনের দিকে বাড়িয়ে, একটু ঝুঁকে। তার বয়স খুব বেশি নয়, বড়জোর বছর চল্লিশ। নাকটা বেশ টিকোলো, গায়ের রং কালো হলেও খসখসে ধরনের নয়, চকচকে, তার মাথার চুল নানা রঙের পুঁতির মালা দিয়ে বাঁধা, তার গলাতেও অনেকগুলো পাথরের মালা।

সন্তু আর কাকাবাবুর দিকে এক পলক মাত্র দেখল সে, মনোযোগ দিল না। যে-লোকগুলো ওদের নিয়ে এসেছে, তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে সর্দার কী যেন চাইল। সেই লোকগুলো সবাই একসঙ্গে কী যেন উত্তর দিল।

সর্দার আবার কী জিজ্ঞেস করল, লোকগুলো উত্তর দিল একই রকম। এইভাবে কয়েক মিনিট উত্তর-প্রত্যুত্তর চলল। তারপর সর্দার যেন খুব অবাক হল। কাঠের গুঁড়ির আসন থেকে উঠে এসে সে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কাকাবাবু ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইংরেজি বোঝো ? তা হলে আমাকে উঠে বসতে দাও। আমি সব কথা খুলে বলছি।"

সর্দার কাকাবাবুর কথা একবর্ণও বুঝল না। সে এবার কী যেন জিজ্ঞেস করল নিজের ভাষায়, কাকাবাবুও তা বুঝলেন না একটুও।

যে লোক দুটি সন্তু ও কাকাবাবুর বুকের ওপর পা চেপে রেখেছিল, সর্দারের হুকুমে সরে গেল তারা। তারপর সর্দার হাততালি দিয়ে অন্যদের কী যেন একটা হুকুম করল।

কাকাবাবুর মাথার কাছে যদিও এখনও একজন বর্শা তুলে আছে, তবু সেটা অগ্রাহ্য করে কাকাবাবু বললেন, "ওয়াটার! জল না খেলে আমরা মরে যাব। একটু জল দাও!"

হাতের ইঙ্গিতে তিনি জল খাওয়া বোঝালেন।

সর্দার দু'দিকে হাত নেড়ে বোঝাল, না, এখন জল দেওয়া হবে না।

কাকাবাবু একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেউ একটুও ইংরেজি জানো না?"

দু'জন লোক হাত ধরে-ধরে একজন বৃদ্ধকে নিয়ে এল সেখানে। বৃদ্ধটির গায়ে একটা টকটকে লাল রঙের চাদর। মাথার চুল বেশ পাকা। চোখ দুটি দেখলে মনে হয়, লোকটি খুব অসুস্থ। কিন্তু তার মুখে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

সেই বৃদ্ধটি কাকাবাবুর পাশে এসে বসতেই সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। সর্দার হাত তুলে অন্যদের থামিয়ে নিজে কিছু বলল।

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। প্রায় দু-তিন মিনিট। তারপর আস্তে আস্তে, পরিষ্কার ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "এরা জানতে চাইছে, তোমাদের সঙ্গের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ইংরেজি জানো! হে মাননীয় বৃদ্ধ, আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। বন্দুক-পিস্তল তো দূরের কথা, সামান্য একটা ছুরিও ছিল না।"

বৃদ্ধ বলল, "আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তোমার সঙ্গে এই একটা বাচ্চা ছেলে রয়েছে, আর বাকি লোকজনরা কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না। আমরা দু'জন এই মাঠে-জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমাদের লোকজন ঠিক সময়ে না গিয়ে পড়লে আমরা মরেই যেতাম।"

বৃদ্ধ বলল, "আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না। তোমরা, সভ্য লোকরা, নানারকম মিথ্যে কথা বলতে পারো।"

কাকাবাবু বললেন, "মাননীয় বৃদ্ধ, দয়া করে একটু জল দিতে বলো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল না পেলে কোনও কথা বলতে পারছি না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমরা তোমাদের শত্রু নই, বিপদে পড়ে তোমাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছি।"

বৃদ্ধ অন্যদিকে ফিরে বলল আগুনটা বাড়িয়ে দিতে। দু-তিনজন লোক আধপোড়া কাঠগুলো ঠেলে দিতে আগুনটা আবার জোর হয়ে গেল।

বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে কাকাবাবুর মুখের একেবারে কাছে নিজের মুখটা নিয়ে এল, চোখের একটাও পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। চাদরের তলা থেকে একটা হাত বার করে জ্বর দেখার মতন কাকাবাবুর কপালে হাত রাখল, "তোমাদের শাস্তি হল মৃত্যু !"

কাকাবাবুও চোখের পলক না ফেলে বললেন, "মাসাইরা বীরের জাতি বলে খ্যাতি শুনেছিলাম। আমাদের মতন দু'জন নিরস্ত্র মানুষকে মেরে যদি তোমাদের খ্যাতি আরও বাড়ে, তা হলে মারো ! তোমার লোকজন প্রথমে আমাদের দেখতে পায়নি আমরাই আগুন জ্বালিয়ে ওদের ডেকেছি। কেউ আশ্রয় চাইলেও বুঝি তোমরা তাদের মেরে ফ্যালো ?"

বৃদ্ধটি খুব জোরে হেসে উঠল। তারপর পাশের একজন লোককে কী যেন একটা হুকুম করল। সর্দারের দিকে ফিরে অনেক কিছু বলল। সর্দারের মুখেও হাসি দেখা দিল এবার।

বৃদ্ধটি আবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "শোনো হে অতিথি, মাসাই কখনও নরহত্যা করে না। মাসাই কখনও নিরস্ত্র লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। মাসাই কখনও আশ্রিতকে অবিশ্বাস করে না। মাসাই কখনও কারও কাছে জলপান করতে চেয়ে তারপর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। কিন্তু তোমরা যারা লেখাপড়া শেখো, যারা সভ্যতার বড়াই করো, তারা এর প্রত্যেকটা জিনিস করো ! তোমরা যখন-তখন মানুষ মারো, তোমরা নিরস্ত্র লোককেও আক্রমণ করো, কাউকে আশ্রয় দিয়েও তাকে ঠকাও...ঠিক কি না ?"

কাকাবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ, এর অনেকটা সত্যি। কিন্তু সব সভ্য মানুষই সমান নয় ! লেখাপড়া শিখলেও অনেকে সৎ থাকতে পারে।"

একজন লোক একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে খানিকটা কী যেন তরল পদার্থ নিয়ে এল। সেটার রং লাল। দুধের মতন ঘন।

বৃদ্ধ বলল, "এটা খেয়ে নাও আগে, তারপর তোমার সব কথা শুনব।"

কাকাবাবু বাটিটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ বলল, "তোমরা দু'জনেই খাও।"

কাকাবাবু তরল পদার্থটিতে একটু চুমুক দিয়েই মুখটা তুলে বললেন, "আমরা শুধু একটু জল চেয়েছিলাম।"

বৃদ্ধটি হুকুমের সুরে বলল, "আগে ওটা খেয়ে নাও এক চুমুকে। তাতে শরীরে জোর পাবে।"

কাকাবাবু সন্তুকে ফিসফিস করে বললেন, "এরা দুধের মধ্যে কোনও না কোনও পশুর রক্ত মিশিয়ে খায়। তোর একটু খেতে খারাপ লাগলেও এক

চুমুকে যতটা পারিস খেয়ে নে, নইলে এরা অপমানিত বোধ করবে।"

সন্তু বিশেষ আপত্তি করল না। তেষ্টায় তার গলা ফেটে যাচ্ছে যেন। চোঁচোঁ করে সে অনেকখানি রক্ত-মেশানো দুধ খেয়ে ফেলল। কাকাবাবু বাকিটা শেষ করে দিয়ে বললেন, "এবারে কি আমরা খানিকটা জল পেতে পারি ?"

বৃদ্ধটি বলল, "পাবে। তার আগে তোমার কাহিনীটা শুনি। তোমরা কে ? কোথা থেকে এসেছ ? তোমাদের মতন দু'জন সভ্য মানুষকে এ-রকম নিরস্ত্র অবস্থায় এই দিকে কোনওদিন ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়নি, তাই আমাদের লোকজন খুব অবাক হয়েছে।"

কাকাবাবু সংক্ষেপে তাঁদের ঘটনাটা বললেন।

বৃদ্ধটি আবার পেছন ফিরে ওদের ভাষায় সবাইকে সেই কাহিনী শোনাল। সবাই দারুণ কৌতূহল নিয়ে শুনল। তারপর সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে কী একটা হুকুম করতেই দু'জন লোক এসে কাকাবাবুর দু'হাত চেপে ধরে দাঁড় করাল। সর্দার এগিয়ে এসে কাকাবাবুর খোঁড়া পা'টা তুলে হাত বুলিয়ে দেখল।

তারপর সর্দার প্রথমে অন্যদের দিকে ফিরে একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে কী একটা দুর্বোধ চিৎকার করল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সে আবার ফিরে নিজের কপালটা ঠুকে দিল কাকাবাবুর কপালে।

এর পর যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দু'জন নিয়ে এল দু'বাটি জল। দুটি মেয়ে দিল দু'বাটি ছাতুর মতন খাবার। একজন ঝলসানো ভেড়ার মাংস থেকে অনেকটা কেটে এনে রাখল কাকাবাবুর পায়ের কাছে। একজন কাকাবাবুর গলায় পরিয়ে দিল একটা পাথরের মালা।

বৃদ্ধটি হেসে বলল, "তুমি খোঁড়া পায়ে এত বিপদের মধ্যেও এতখানি পথ পার হয়ে এসেছ শুনে এরা তোমাকে বীর হিসেবে স্বীকার করছে। মাসাইরা বীরের সম্মান দিতে জানে।"

কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বললেন, "আমাকে এরকম সম্মান আগে কখনও কেউ জানায়নি। আজ আমি ধন্য হয়ে গেছি। আপনাদের সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি।"

সর্দার বৃদ্ধকে আবার কিছু একটা কথা মনে করিয়ে দিতেই বৃদ্ধটি কাকাবাবুকে বলল, "তোমরা আগে একটু খাবার খেয়ে নাও, তারপর তোমাদের কয়েকটা জিনিস দেখাব !"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "একটু একটু খেয়ে নে। আজ সারাদিন যা ধকল গেছে, হঠাৎ বেশি খাবার খেলে বমি এসে যাবে।"

সন্তু বলল, "আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। ওই দুধ খেয়েই খিদে চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তবু একটু করে সবই মুখে দে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা এখান থেকে ফিরব কী করে ? এ জায়গাটা কোথায় ? আমাদের হোটেল থেকে কতদূর ?"

"দাঁড়া, সব জানা যাবে। আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। সন্তুর কথা সে এক বিন্দু বুঝতে না পারলেও বোধহয় আন্দাজ করে নিল, সন্তু কী বলতে চায়। খানিকটা মজা করবার জন্যই যেন সে এবার সন্তুকে বলল, "তোমরা যখন আমাদের মধ্যে এসে পড়েছই, এখন এখানেই থেকে যেতে হবে সারাজীবন। থাকতে পারবে না ? আমাদের খাবার তোমার পছন্দ হয়নি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, এখানে থাকতে আমাদের ভালই লাগবে। কিন্তু তার আগে হোটেলের ম্যানেজার ফিলিপকে শাস্তি দিতে চাই। সেইজন্য একবার অন্তত ফিরে যেতে হবে।"

বৃদ্ধটি বলল, "বাঃ, তোমারও তো বেশ তেজ আছে দেখছি। তা তুমি ওই ম্যানেজারকে কী শাস্তি দেবে ঠিক করে রেখেছ ?"

"ওর ফাঁসি হওয়া উচিত !"

"ফাঁসির চেয়েও ভাল শাস্তি আছে। ধরো, যদি ওকে দিয়ে একেবারে সারাজীবন গোরুর গোবর পরিষ্কার করার কাজে লাগানো যায়, তা হলে কেমন হয়। আমরা হলে তাই করতাম !"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আপনি কোথায় কী দেখাবেন বলছিলেন ?"

বৃদ্ধটিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি নিজে হাঁটতে পারি না, আমাকে ধরে নিয়ে যেতে হয়। আমি খুব অসুস্থ, বেশিদিন বাঁচব না। এই দেখুন !"

বৃদ্ধটি গা থেকে লাল রঙের কাপড়টা খুলতেই দেখা গেল, তার বুকের ডান দিকে একটা মস্ত বড় ঘা। দগদগ করছে।

আবার কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে দু'দিকে দু'হাত ছড়াতেই দু'জন লোক তাকে ধরে-ধরে নিয়ে চলল। আর একজন সঙ্গে নিয়ে চলল একটা মশাল।

প্রথমে ঢোকা হল একটা কুঁড়েঘরে। মশালের আলোয় দেখা গেল, সেখানে বেশ কয়েকটা বড় বড় হাতির দাঁত ও অনেক রকম জন্তুর চামড়া পড়ে আছে। আর-এক পাশে রয়েছে তিনটে রাইফেল, দুটো রিভলভার ও দুটো লাইট মেশিনগান। কয়েকটা বেল্ট ভর্তি টোটা।

বৃদ্ধ বলল, "এইসব জন্তুগুলো আমরা মারিনি। মেরেছে শহরের লোকেরা। আমরা আজকাল পশুপালন করি, পশুহত্যা করি না। তবু আমাদের নামে দোষ পড়ে। সরকারের লোক আমাদের ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়। যে-সব অস্ত্র দিয়ে ওদের মারা হয়েছে সেগুলোও দ্যাখো।"

কাকাবাবু অবাকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা ওই অস্ত্রগুলো পেলেন কোথা থেকে ?"

"সভ্য লোকদের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমরা ব্যবহার করি না। তা বলে ভেবো না যে, আমরা ব্যবহার করতে জানি না। আমি নিজে মাউমাউ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করেছি।"

বৃদ্ধ একটা এল. এম. জি. তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরল, ট্রিগার টিপল, গুলি ভরা নেই, তাই শুধু খট্-খট্ শব্দ হল কয়েকবার। বৃদ্ধ সেটি অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবার!

এরপর আসা হল বড় চালাঘরটিতে। সেটি আসলে একটি বৃহৎ গোয়ালঘর। সেখানে রয়েছে গোটা-পঞ্চাশেক গোরু, শ'খানেক ভেড়া ও গোটা-চারেক জেব্রা।

বৃদ্ধ বলল, "এইসব পশু আমাদের নিজস্ব। এগুলোর ওপর নির্ভর করেই আমরা বেঁচে আছি। এক জায়গার ঘাস ফুরিয়ে গেলে আমরা সেখান থেকে গ্রাম তুলে নিয়ে আবার যেখানে ঘাস আছে সেখানে চলে যাই।"

"গোরুগুলোর স্বাস্থ্য চমৎকার। আমাদের হরিয়ানার গোরুকেও হার মানায়।"

"এইসব গোরুরই দুধ আর রক্ত একসঙ্গে আমরা খাই। তাতে গায়ে জোর হয়। এসো হে বিদেশি, তোমাদের আর দুটি বিচিত্র পশু দেখাই!"

গোয়ালঘরের খানিকটা ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় মশালের আলো ফেলতেই কাকাবাবু আর সন্তু দারুণ চমকে উঠল। দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, "এ কী!"

দুটো খুঁটির সঙ্গে হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা দু'জন মানুষ। তাদের পরনে শুধু নেংটি, খালি গা, সম্পূর্ণ কাদামাটি মাখা, চুল জট-পাকানো, তবু বোঝা যায় ওরা দু'জন শ্বেতাঙ্গ সাহেব।

সন্তু অস্ফুট স্বরে বলল, "সেই দু'জন জার্মান ট্যুরিস্ট!"

কাকাবাবু বললেন, "ট্যুরিস্ট নয়, মার্সিনারি। ভাড়াটে সৈনিক। টাকার বিনিময়ে মানুষ মারত।"

বৃদ্ধ বলল, "এদের দু'জনকে তোমাদের ওই লিট্‌ল ভাইসরয় হোটেল থেকে ভাড়া করা হয়েছিল গোপনে এখানে জন্তু-জানোয়ার মারার জন্য। এল. এম. জি. দিয়ে হাতি-গণ্ডার-হরিণ-লেপার্ড কিছুই মারতে বাকি রাখত না। দাঁত, শিং, চামড়ার জন্য। দোষ হত আমাদের। সেইজন্যই ওদের এখানে ধরে রেখেছি।"

"পুলিশ ওদের খোঁজ পায়নি? পুলিশ তো ওদের অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে শুনেছি।'

"না। কোনও পুলিশ বা সরকারি লোক গত ছ'মাসের মধ্যে আমাদের এখানে আসেনি। আমরা ওদের দিয়ে এই গোয়ালঘর পরিষ্কার করাই রোজ। এর মধ্যে তিনবার ওরা পালাবার চেষ্টা করেছিল, তিনবারই ধরা পড়েছে।

আমাদের জোয়ান ছেলেদের চোখ এড়ানো খুব শক্ত !"

একটু থেমে, একটু হেসে বৃদ্ধ আবার বলল, "সাহেব জাতি আমাদের এখান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস বানিয়েছে। তাই না ? এখন আমরা যদি দু'চারটে সাহেবকে ক্রীতদাস করে রাখি, সেটা কি অন্যায়, বলো ?"

"না, মোটেই না !"

মাসের পর মাস এই জার্মান দুটি বোধহয় সন্ধের পর আলো দ্যাখেনি। মশালের আলো দেখে গোরুগুলো যেমন ছটফট করতে লাগল, সেইরকম ওই মানুষ দু'জনও চোখ পিটপিট করতে লাগল। একজন কাকাবাবুর দিকে কোনওরকমে তাকিয়ে ধরা গলায় বলল, "হেল্প ! ইউ প্লিজ হেল্প আস !"

কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, "দুঃখিত, আমি তোমাদের কোনও সাহায্য করতে পারব না। তোমরা এই সহৃদয় বৃদ্ধটির কাছে ক্ষমা চাইতে পারো। দয়া চাইতে পারো।"

মাসাই বৃদ্ধটি বলল, "তা হলে শোনো ! এই দু'জন শ্বেতাঙ্গ যখন এখানে বহু পশু হত্যা করছিল, তখন আমি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থামাতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার বড় ছেলে, সে তখন মাসাই দলটির সর্দার। আমরা দু'জন এদের সঙ্গে কথা বলতে যেতেই এরা আমাদের ওপর গুলি চালাল। মানুষ বলে আমাদের গ্রাহ্য করল না। ওদের চোখে আফ্রিকার কালো মানুষ আর পশু যেন সমান। আমার বড় ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়, আমি তখন মরিনি, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুলি রয়ে গেছে, সেই ক্ষততেই আমি মরব। তার পরেও দ্যাখো, এদের দু'জনকে বন্দী করার পর আমরা সঙ্গে-সঙ্গে খুন করিনি। তারপরেও কি তোমরা বলবে, মাসাইরা নিষ্ঠুর ?"

বৃদ্ধের কথা শুনে জার্মান দু'জন চোখ বুজে পাশ ফিরেছে। কাকাবাবু সেই বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনিই প্রকৃত দয়ালু। এতটা ক্ষমাশীল আমরা কেউ হতে পারতাম না !"

সন্তু বলল, "আমি কি বাইরে যেতে পারি ? আমি আর ওদের দেখতে চাই না।"

সবাই মিলে বাইরে আসার পর কাকাবাবু সেই বৃদ্ধকে আবার বললেন, "আপনি জানেন নিশ্চয়ই, নির্বিচারে পশুহত্যা এখনও চলেছে। আপনি দু'জন খুনিকে বন্দী করেছেন, ওরা আরও এরকম লোক ভাড়া করবে। এই সব বন্ধ করার জন্য আমাদের একবার ফিরে যাওয়া দরকার।"

বৃদ্ধ হেসে বলল, "অফ কোর্স। তোমরা কি ভেবেছ, তোমাদের এখানে আটকে রাখব আমরা ! যখন ইচ্ছে যেতে পারো।"

"কিন্তু আজ সারাদিন এক পায়ে লাফিয়ে আমার হাঁটু ফুলে গেছে। কাল-পরশুর মধ্যে আমি এই হাঁটুতে আর লাফাতে পারব না। একটা গাড়ি

ডাকা দরকার। আচ্ছা, মাসাইমারা এয়ারস্ট্রিপ থেকে এই জায়গাটা কত দূরে?"
"বেশি দূর নয়।"
"তবু? কুড়ি মাইল? তিরিশ বা চল্লিশ মাইল?"
"অত না। তোমরা সারাদিন হাঁটলেও খানিকটা অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরেছ। এখান থেকে মাসাইমারা এয়ারস্ট্রিপ মাত্র দশ মাইল আর লিট্‌ল ভাইসরয় হোটেল হবে তেরো মাইল। আমরা অবশ্য ওদিকে কক্ষনো যাই না।"
"আমি একটা চিঠি লিখে দিলে তোমাদের কোনও মাসাই-ছেলে ওই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে প্লেনের পাইলটের হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিতে পারবে না?"
"কেন পারবে না। এ আর এমন শক্ত কী ব্যাপার। কিন্তু সে-সব কাল ভোরের আগে তো কিছু হবে না। এখন চলো, নাচ দেখবে। আমরা মাসাইরা প্রত্যেক রাত্তিরে খানিকটা নাচ-গান না করে ঘুমোতে যাই না!"
এর পর সেই আগুনের জায়গাটা ঘিরে শুরু হল নাচ-গান। কিন্তু সন্তু আর বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারল না। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু আগুনের আলোয় একটা চিঠি লিখলেন। তারপর একটু বাদে বৃদ্ধের অনুমতি নিয়ে তিনিও শরীর এলিয়ে দিলেন।
পরদিন দুপুরের আগেই একটি গাড়ি নিয়ে হাজির হল তিনজন। একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ, একজন ভারতীয়। মাসাইদের গ্রামের একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে তারা এগিয়ে এল আস্তে আস্তে।
ভারতীয়টি পি. আর. লোহিয়া, শ্বেতাঙ্গটি প্লেনের পাইলট আর কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি ওদের অচেনা।
কৃষ্ণাঙ্গ লোকটিই আগে এগিয়ে এসে মাসাই-সর্দার এবং বৃদ্ধ লোকটিকে অভিনন্দন জানাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের কোনও অনিষ্ট হয়নি।"
লোহিয়া তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "ইনি মিঃ জোসেফ এনবোয়া। ইনি কেনিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি। ইনি আজ সকালের প্লেনেই পৌঁছেছেন। হোটেলের ম্যানেজার ফিলিপ যখন কাল তোমাদের বাদ দিয়ে একলা ফিরে এল, তখনই আমি নাইরোবিতে এঁকে ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছি।"
জোসেফ এনবোয়া মাসাই-বৃদ্ধটিকে বললেন, "তোমার লোকজনকে বলে দাও, মাসাইদের সঙ্গে সরকারের কোনও ঝগড়া নেই। এই অঞ্চলে যে বে-আইনিভাবে বহু পশু হত্যা করা হয়, তার জন্য মাসাইরা দায়ী নয়, কয়েকজন ব্যবসায়ীর দুষ্টচক্র এই কাজ করছে, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রেসিডেন্টের একজন আত্মীয় প্রেসিডেন্টকে কিছু না জানিয়ে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এই কারবার চালাচ্ছিল, তাকে আর তার সঙ্গী-সাথী আরও চারজনকে কাল বন্দী করা

হয়েছে। তোমরা মাসাইরা এখানকার ঘাস-জমিতে যেমন পশু চরাতে, এখনও সেই অধিকার পাবে। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না।"

বৃদ্ধটি মাসাইদের ভাষায় সেই কথাগুলো অনুবাদ করে দিতে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

বৃদ্ধটি এবার জোসেফ এনবোয়া আর পাইলটটিকে নিয়ে গেল গোয়ালঘর দেখাতে।

লোহিয়া কাকাবাবুর হাত ধরে বলল, "আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিঃ রায়চৌধুরী, প্লেনে আপনাকে দেখতে পাওয়ার পরেই আমি বিবেকের দংশনে ভুগছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম, আপনি কোনও রহস্যের গন্ধ পেলে সহজে ছাড়বেন না। আর আপনি বেশি কিছু জেনে ফেললে এরাও আপনাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে।"

কাকাবাবু হাসিমুখে বলেন, "আপনিই নাইরোবির হোটেলে টেলিফোনে আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন?"

লোহিয়া বলল, "প্রথম টেলিফোনটা করেছিল নিনজানে। আমারই অফিসে বসে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্তু, তুই তা হলে ঠিকই ধরেছিলি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের গাড়িচাপা দিতে এসেছিল কে?"

"এটাও নিনজানের কীর্তি। ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছিল আপনাদের ভয় দেখাতে। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই গোঁয়ার। অশোক দেশাইয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু লোকটার প্রচণ্ড টাকার লোভ।"

"হ্যারি ওটাংগো-কে ওরাই খুন করিয়েছে, তাই না?"

"সেটা আমি মাত্র কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছি। আপনি নাইরোবি শহরে আরও দু'চারদিন থাকলে আমি আস্তে-আস্তে আপনাকে সব কিছু জানাতাম। কিন্তু আপনি সে সুযোগ দিলেন না। আমি চিঠি লিখে আপনাকে বারণ করলাম, তবু আপনি মাসাইমারায় চলে এলেন।"

"হোটেল-ম্যানেজার ফিলিপ কাল ফিরে গিয়ে আপনাদের কী বলল আমাদের সম্পর্কে?"

"সে এক উদ্ভট গল্প। আপনারা নাকি কোথায় হিরে খুঁজে পেয়েছিলেন। তারপর রিভলভার দেখিয়ে ওকে বাধ্য করেছেন গাড়িটা তানজানিয়ার দিকে নিয়ে যেতে। সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আপনারা পালিয়ে গেছেন! এ-গল্প আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করিনি। আমি তো আপনাকে চিনি।"

"সে আপনাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেনি? সে বলেছিল, এই এলাকায় সে কারুকে পরোয়া করে না!"

"সে আমাকে শাসিয়েছিল। সে তখনও জানত না, আমি তার মালিকদের

উকিল। আমি প্রথমে এসে পরিচয় দিইনি। তারপর যখন আমার আসল পরিচয় জানল, তখন চুপসে গেল। এ-দেশের লোক উকিলদের খুব ভয় পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, ওই ফিলিপকে ধরা গেল না। আজ ভোরবেলা সে পালিয়েছে।"

সন্তু চমকে উঠে বলল, 'লোকটা পালিয়েছে ? কী করে পালাল ?"

"ও তো এদিককার সব জায়গা চেনে। কোথায় লুকিয়ে বসে আছে কে জানে। আমরা হোটেলটা সিল করে দিয়েছি। আপাতত এক মাস বন্ধ থাকবে। গার্ডদের বলে দেওয়া হয়েছে, ফিলিপকে দেখলেই যেন বন্দী করে।"

গোয়ালঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে বাইরে। জার্মান বন্দী দু'জনকেও হাত বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে। মাসাইরা রাজি হয়েছে জোসেফ এনবোয়ার হাতে ওদের তুলে দিতে। নাইরোবিতে ওদের বিচার হবে।

সন্তু সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলল, "জানেন, ম্যানেজার ফিলিপ পালিয়ে গেছে ! ওকে শাস্তি দেওয়া গেল না !"

বৃদ্ধ শান্তভাবে বলল, "শাস্তি ও পাবেই। ও যদি মাসাইমারায় যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকে, মাসাইরা ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে। একা পালিয়ে ও বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। ওকে খিদে শাস্তি দেবে, ওকে রোদ্দুর শাস্তি দেবে, বৃষ্টি শাস্তি দেবে, আকাশ শাস্তি দেবে। যে পশুদের ও মেরে মেরে শেষ করতে চেয়েছিল, সেই পশুরাও ওকে শাস্তি দেবে।"

সন্তু বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গে শহরে চলুন না। হাসপাতালে চিকিৎসা করলে আপনি সেরে উঠবেন।"

বৃদ্ধ সন্তুর কাঁধে হাত রেখে হাসল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "মাসাইরা জানে, কখন তাদের মৃত্যু আসবে। মাসাইরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। আমার বুকের মধ্যে যে গুলিটা ঢুকে বসে আছে, সেটা আসলে সভ্যতার বিষ। আমি জানি, আমি আর বাঁচব না। তোমরা যাও, তোমরা শান্তিতে থেকো।"

সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। কান্না লুকোবার জন্য সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

জঙ্গলগড়ের চাবি

মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ সকালে! রাস্তা থেকে হকার খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে একটু আগে, সেটা পড়ে আছে দোতলার বারান্দার কোণে।

সন্তু কিন্তু ঘুমিয়ে আছে এখনও। আজ যার রেজাল্ট বেরুবার কথা, তার কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা উচিত? একটু চিন্তা-ভাবনা নেই?

আসলে সন্তু সারা রাত প্রায় ঘুমোতেই পারেনি। ছট্‌ফট্ করেছে বিছানায় শুয়ে। মাঝে-মাঝে উঠে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখেছে ভোর হল কি না। বুকের মধ্যে টিপ-টিপ শব্দ। ভয়ে সে সত্যি-সত্যি কাঁপছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, পরীক্ষা দেবার সময় সন্তুর একটুও ভয় হয়নি, তারপর যে এই তিন মাস কেটে গেল তখনও একদিনের জন্য কোনও ভয়ের চিন্তা মনে আসেনি। কাল সন্ধেবেলা সুমন্ত যেই বলল, "জানিস, আজই রেজাল্ট আউট হতে পারে!" তারপর থেকেই সন্তুর বুক-কাঁপা শুরু হয়ে গেল। যদি সে ফেল করে!

সব কটা পরীক্ষায় মোটামুটি ভালই সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছে সন্তু। কিন্তু কাল রাত্তিরেই শুধু তার মনে হল, যদি উত্তরগুলো উল্টোপাল্টা হয়ে যায়? অঙ্কগুলো যদি সব ভুল হয়? অঙ্কের পেপারের সব উত্তর সন্তু মিলিয়ে দেখেছে বটে, কিন্তু মাঝখানের প্রসেসে যদি কিছু লিখতে ভুল হয়ে থাকে?

ফেল করলে যে কী লজ্জার ব্যাপার হবে, তা সন্তু ভাবতেই পারছিল না। বন্ধুরা সব এগারো-বারোর কোর্স পড়তে চলে যাবে। আর সে পড়ে থাকবে পুরনো ক্লাসে! নিচু ক্লাসের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে তাকে? সন্তু ফেল করলে মা-বাবা-কাকাবাবু-ছোড়দিরা সবাই সন্তুর দিকে এমন অবহেলার চোখে তাকাবেন, যেন সন্তু একটা মানুষই নয়!

ফেল করার সবচেয়ে খারাপ দিক হল, তা হলে আর কাকাবাবু নিশ্চয়ই তাকে অন্য কোনও অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না! বাবা বলবেন, পড়াশুনো নষ্ট করে পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো? কক্ষনো চলবে না!

এই সব ভাবতে ভাবতে, সারা রাত ছট্‌ফটিয়ে, শেষ পর্যন্ত এই ভোরের একটু

আগে সন্তু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকাবাবু ছাড়া এ বাড়িতে সবাই একটু দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। তা ছাড়া ভূপাল থেকে ছোড়দি বেড়াতে এসেছে বলে কাল অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে। আজ আবার রবিবার। কারুর উঠবার তাড়াও নেই। সন্তু কাল রাত্তিরে কারুকে বলেওনি যে আজ তার রেজাল্ট বেরুবে।

কাকাবাবু ভোরবেলা উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন।

প্রথমে ঘুম ভাঙল ছোড়দির।

বিয়ের আগে ছোড়দিই সকালবেলা চা তৈরি করে বাবা আর মাকে ঘুম থেকে তুলত। আজও ছোড়দিই চা বানিয়ে এনে ঠিক সেই আগের মতন বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "চা কিন্তু রেডি!"

বাবা চায়ের টেবিলে এসেই অভ্যাস মতন বললেন, "খবরের কাগজটা কই রে?"

ছোড়দি বারান্দাটা ঘুরে দেখে এসে বলল, "এখনও কাগজ দেয়নি!"

আসলে হয়েছে কী, বারান্দায় কয়েকটা ফুলগাছের টব আছে তো। তারই একটা টবের পেছনে গোল করে বাঁধা কাগজটা লুকিয়ে আছে।

চা পানের সময় কাগজ পড়তে না পারলে বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তিনি বিরক্তভাবে বললেন, "কী যে হয়েছে আজকাল সব ব্যবস্থা, ঠিক সময়ে কাগজ আসে না। আর এক কাপ চা কর!"

মা বললেন, "সন্তু এখনও ওঠেনি? ওকে ডাক্।"

ছোড়দি বলল, "ডাকছি। সন্তু কি এখনও সকালে দুধ খায়, না অন্য কিছু খায়?"

মা বললেন, "পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে ওরও এখন ওর কাকার মতন খুব চা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে। শুধু দুধ খেতে চায় না।"

ছোড়দি আবার চায়ের জল চাপিয়ে ডাকতে গেল সন্তুকে।

বাড়িতে বেশি লোকজন এলে সন্তুর পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। সেই জন্য এখন সন্তুকে ছাদের ঘরটা একলা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়।

ডাকতে এসে ছোড়দি দেখল সন্তুর চোখ দুটো বোজা থাকলেও দুটো জলের রেখা নেমে আসছে তলা দিয়ে। বুকটা মুচড়ে উঠল ছোড়দির। আহা রে, ছেলেটা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনও দুঃখের স্বপ্ন দেখছে।

সন্তুর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছোড়দি ডাকল, "এই সন্তু, সন্তু! ওঠ!"

দু'বার ডাকতেই সন্তু চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে? মুখখানা এমন কেন? কী স্বপ্ন দেখছিলি?"

এবারেও সন্তু কোনও উত্তর দিল না। মনে-মনে বলল, আজকের সকালের

পর আর তাকে কেউ ভালবাসবে না।

ছোড়দি আদর করে সন্তুর হাত ধরে উঠিয়ে দিয়ে বলল, "অমন শুক্‌নো মুখ করে আছিস্ কেন ? চল্, নীচে চল।"

হঠাৎ সন্তুর মনে পড়ল, আজ রবিবার। আজ তো স্কুল খোলা থাকবে না। রেজাল্ট তো আনতে হবে ইস্কুল থেকে। তা হলে আর-একটা দিন সময় পাওয়া গেল। কালকের আগে তার রেজাল্ট জানা যাবে না।

দ্বিতীয় কাপ চা পেয়ে বাবা বললেন, "আঃ, এখনও কাগজ এল না ?"

ছোড়দি বলল, "দেখছি আর একবার।"

ছোড়দি ছুটে গেল বারান্দায়।

সন্তুর জন্য মা স্পেশাল চা বানিয়ে দিয়েছেন। অনেকখানি দুধের মধ্যে একটুখানি চা। তা-ও কাপে নয়, বড় গেলাসে। সেই গেলাসটা ধরে সন্তু গোঁজ হয়ে বসে আছে।

এবারে ছোড়দি টবের আড়াল থেকে কাগজটা পেয়ে গেল। সুতো খুলে প্রথম পাতাটা পড়তে-পড়তে এগিয়ে এসে বলল, "আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে !"

সন্তু যেন পাথর হয়ে গেছে, তার নিশ্বাস বন্ধ।

মা বললেন, "তাই নাকি ? এই সন্তু, তোদের আজ রেজাল্ট বেরুবে, তুই জানতিস না ?"

সন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে থেকে এমনভাবে একটু আস্তে মাথা নাড়ল যার মানে হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয়।

বাবা বললেন, "তোর রেজাল্ট তো ইস্কুলে আসবে ! এক্ষুনি ইস্কুলে চলে যা !"

সন্তু খস্‌খসে গলায় বলল, "আজ রবিবার !"

ছোড়দি বলল, "আমাদের সময় তো কলেজ স্ট্রীটে রেজাল্ট ছাপা বই বিক্রি হত। এখন হয় না ?"

বাবা বললেন, "কী জানি ! কিন্তু রবিবার হলেও আজ ইস্কুল খোলা রাখবে নিশ্চয়ই। ছেলেরা রেজাল্ট আনতে যাবে না ?"

ছোড়দি বলল, "এই তো ফার্স্ট বয় আর ফার্স্ট গার্লের ছবি বেরিয়েছে। ফার্স্ট হয়েছে সৌমিত্র বসু, নরেন্দ্রপুর। আর মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে কাকলি ভট্টাচার্য, বীরভূম। সেকেন্ডেরও নাম দিয়েছে। ওমা, এক সঙ্গে দু'জন সেকেণ্ড হয়েছে, ব্র্যাকেটে, অভিজিৎ দত্ত আর সিদ্ধার্থ ঘোষ। সন্তু, তুই এদের কারুকে চিনিস নাকি রে ?"

সন্তুর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। এক্ষুনি যেন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে। ক্রমশই তার বদ্ধমূলক ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, সে ফেল করেছে !

কান্না লুকোবার জন্য সন্তু বাথরুমে ছুটে চলে গেল।

ছোড়দির কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে নিলেন বাবা। অন্য খবরের বদলে তিনি রেজাল্টের খবরটা পড়তে লাগলেন মন দিয়ে। খবরের কাগজের লোকেরা কী করে আগে থেকে খবর পেয়ে যায়? কালকের রাত্তিরের মধ্যেই ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়েদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে হাজির হয়েছে, ছবি তুলেছে, তাদের বাবা-মায়ের ইন্টারভিউ নিয়েছে। কাকলি ভট্টাচার্যের মা বলেছেন, তাঁর মেয়ে লেখাপড়াতেও যত ভাল, খেলাধুলোতেও তত। অনেক মেডেল পেয়েছে।

কাগজ পড়তে-পড়তে বাবা হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, "এঃ রাম!"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

বাবা বললেন, "দেখেছ কাণ্ড! আমাদের সন্তুটা কী খারাপ করেছে!"

মা আর ছোড়দি দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠে বলল, "অ্যাঁ? কী বললে?"

বাবা বললেন, "এই তো প্রথম দশজনের নাম দিয়েছে। তার মধ্যে দেখছি তলার দিকে সন্তুর নাম।"

মা আর ছোড়দি ততক্ষণে দু'পাশ দিয়ে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মা বললেন, "কই কই?"

ছোড়দি বলল, "এই তো, সুনন্দ রায়চৌধুরী। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট ইস্কুল!"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এ আমাদের সন্তুই তো?"

মা বললেন, "তবে আবার কে হবে! ওর নাম রয়েছে, ইস্কুলের নাম রয়েছে···সন্তু, এই সন্তু, কোথায় গেলি?"

বাবা বললেন, "ওদের ইস্কুলে ঐ নামে অন্য কোনও ছেলে নেই তো?"

মা বললেন, "আহা হা! অদ্ভুত কথা তোমার। ওদের ক্লাসে ঠিক ঐ নামে আর কেউ থাকলে সন্তু আমাদের এতদিন বলত না? সন্তু, কোথায় গেল! এই সন্তু—"

বাবা কাগজটা সরিয়ে রেখে দিয়ে বললেন, "ছি ছি!"

মা দারুণ অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তার মানে? ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, আর তুমি বলছ ছি ছি?"

বাবা বললেন, "ফিফ্‌থ হল। ফার্স্ট হতে পারল না?"

মা বললেন, "ফিফ্‌থ হওয়াই কি কম নাকি? যথেষ্ট ভাল করেছে। আমি তো আশাই করিনি—"

বাবা বললেন, "যে ফিফ্‌থ হতে পারে, সে আর-একটু মন দিয়ে পড়লে ফার্স্টও হতে পারত!"

ছোড়দি বলল, "ভাল হয়েছে সন্তু ফার্স্ট হয়নি ! ও ফার্স্ট হলে সৌমিত্র বসু সেকেণ্ড হত ! তা বলে তার বাবার মনে দুঃখ হত না ?"

মা বললেন, "ছেলেটা বাথরুমে ঢুকে বসে রইল, নিশ্চয়ই এখনও কিছুই জানে না ! এই মুন্নি, ওকে ডাক না ।"

ছোড়দি ছুটে গিয়ে বাথরুমের দরজায় দুম্-দুম্ করে কিল মেরে বলল । "এই সন্তু, সন্তু !"

সন্তু কোনও সাড়া দিল না ।

ছোড়দি বলল, "শিগগির বেরো ! কী বোকার মতন এতক্ষণ বাথরুমে বসে আছিস !"

সন্তুর ইচ্ছে, সে আজ সারাদিন আর বাথরুম থেকে বেরুবে না । এইখানেই বসে থাকবে ।

"দরজা খোল না । কী হয়েছে, জানিস ? কাগজে বেরিয়েছে, তুই ফিফ্‌থ হয়েছিস !"

একটা পিংপং বল্ যেন সন্তুর বুকের মধ্যে নাচানাচি করতে লাগল । কী বলল ছোড়দি ? সে ভুল শোনেনি তো !

খটাস্ করে বাথরুমের দরজা খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী বললে ?"

"তুই ফিফ্‌থ হয়েছিস !"

"ঠাট্টা করছ্ আমার সঙ্গে ?"

"কাগজে নাম ছাপা হয়েছে তোর । দেখবি আয় বোকারাম !"

ফিফ্‌থ হওয়ার ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না সন্তু । তার মানে সে পাশ করেছে ? সত্যি সত্যি পাশ ! ইস্কুলের পড়া শেষ !

সন্তু ছুটে গেল কাগজ দেখতে ।

সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল । সন্তুর এক মামা ফোন করেছেন । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কাগজে মাধ্যমিকের রেজাল্টে এক সুনন্দ রায় চৌধুরীর নাম দেখছি । ওকি আমাদের সন্তু নাকি ?"

ছোড়দি বলল, "হ্যাঁ । বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই ইস্কুলের নামও তো রয়েছে পাশে ।"

মামা বললেন, "কোথায় সন্তু । দে না তাকে ফোনটা । তাকে কনগ্রাচুলেশান্স জানাই ।"

মায়ের মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে । বাবার মুখখানা কিন্তু দুঃখী-দুঃখী । তিনি বললেন, "যাই বলো, ফিফ্‌থ হওয়ার কোনও মানে হয় না । ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে পারলে তবু একটা কথা । নইলে ফিফ্‌থই হও আর টুয়েলফ্‌থই হও, একই কথা !"

ছোড়দি বলল, "মোটেই এক কথা নয় । দশ জনের মধ্যে নাম থাকা মানে তো সন্তু স্কলারশিপ পাবে ।"

মা বললেন, "পাবেই তো! তাও তো এ-বছর ওর কতগুলো দিন সেই নষ্ট হয়েছে নেপালে! পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই ও বেশি পড়ে—।"

সন্তু ফোন ছেড়ে দিতেই মা ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুই ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই আমরা খুশি হতুম রে সন্তু! তুই যে এতখানি ভাল করবি···। যা, বাবাকে প্রণাম কর!"

ছোড়দি বলল, "মা, দারুণ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু। সন্তুর সব বন্ধুদের ডেকে—"

সন্তু এখনও ভাল করে কথা বলতে পারছে না। সে এতই অবাক হয়ে গেছে! পাশ করা সম্পর্কেই তার সন্দেহ ছিল, আর সে কিনা স্কলারশিপ পেয়ে গেল!

বাবা বললেন, "ফার্স্ট হলে কাগজে ওর ছবি ছাপা হত!"

মা বললেন, "ফের তুমি ওরকম কথা বলছ? নেপালে সেবার ঐ রকম কাণ্ড করবার পর প্রত্যেকটা কাগজে সন্তুর ছবি বেরিয়েছিল তোমার মনে নেই? এর চেয়ে অনেক বড় ছবি।"

এই সময় কাকাবাবু ফিরলেন বাইরে থেকে। ঘরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার। এত গোলমাল কিসের?"

২

কাকাবাবুর চেয়ে সন্তুর বাবা মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার অনেক তফাত। কাকাবাবু যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া কাঁধ, চওড়া কব্জি। আর পুরুষ্টু গোঁফটার জন্য কাকাবাবুকে মিলিটারি অফিসারের মতন দেখায়। সন্তুর বাবাও বেশ লম্বা হলেও রোগা-পাতলা চেহারা, কোনওদিন গোঁফ রাখেননি, মাথার চুলও একটু-একটু পাতলা হয়ে এসেছে। কাকাবাবু যেমন অল্প বয়েস থেকেই পাহাড়-পর্বতে আর দেশ-বিদেশে ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন, বাবার স্বভাব ঠিক তার উল্টো। উনি বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না, অফিসের সময়টুকু ছাড়া। জীবনবীমা সংস্থায় উনি অ্যাকচুয়ারির কাজ করেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ, দারুণ অঙ্কের জ্ঞান লাগে।

দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক বন্ধুর মতন। সব রকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন দু'জনে।

কাকাবাবুর ডাকনাম খোকা!

সন্তুদের কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বাইরের কেউ এসে এই নাম শুনে অবাক হয়ে যায়। অনেকে হেসে ফেলে। অতবড় একজন জাঁদরেল চেহারার মানুষের নাম খোকা হতে পারে? কিন্তু কাকাবাবুও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন, তখন ঐ নাম তাঁকে মানাত। বড় হলেও তো আর ডাকনাম বদলায় না।

সন্তুর রেজাল্টের খবর শুনে কাকাবাবু বললেন, 'অ্যাঁ, পাশ করেছে ? কী আশ্চর্য কথা ! সন্তু তো তাহলে খুব গুণের ছেলে। কখন পড়াশুনো করে দেখতেই পাই না !"

বাবা বললেন, 'যা-ই বলো। ফার্স্ট হলে আমি খুশি হতুম। পাশ তো সবাই করে !"

মা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বললেন, "দেখেছ, দেখেছ ! বছরের মধ্যে ক'মাস বাইরে কাটিয়ে এসেও সন্তু যে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, তাতে ওর বাবার আনন্দ নেই !"

বাবা বললেন, "তুই-ই বল খোকা, যখন ফিফ্থ্ই হল, তখন চেষ্টা করলে ফার্স্ট হতে পারত না ? ফার্স্ট আর ফিফ্থের মধ্যে হয়তো বড় জোর কুড়ি-পঁচিশ নম্বরের তফাত !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো জীবনে কোনওদিন স্ট্যান্ড করিনি ! সন্তুর তবু কাগজে নাম উঠেছে...অবশ্য দাদা তুমিও...বলে দেব, দাদা, বলে দেব সেই কথাটা ?"

বাবা অমনি কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, সন্তু যা করেছে যথেষ্ট। এখন কোন্ কলেজে ভর্তি হবে সেটা ঠিক করো।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কী ? কী বলবে বলছিলে ? চেপে যাচ্ছ কেন ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "দাদা, বলে দিই ?"

বাবা বললেন, "আঃ খোকা, তুই কী যে করিস ! ওসব পুরনো কথা—"

কাকাবাবু তবু বললেন, "জানো বৌদি, দাদা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "অ্যাঁ ?"

সন্তু এতক্ষণ লজ্জায় মুখ গুঁজে বসেছিল, সে-ও মুখ তুলে তাকাল। ছোড়দিও অবাক হয়ে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

মা বললেন, "সত্যি ? এ-কথা তো আমি কোনওদিন শুনিনি।'

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি ! আমাদের সময় তো ইস্কুল ফাইনাল ছিল না। তখন ছিল ম্যাট্রিক। দাদাকে সবাই এখন পণ্ডিত মানুষ হিসেবে জানে, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না, দাদা কিন্তু সত্যিই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল।"

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "তখন দাদু কী করেছিলেন ? দাদু তো খুব রাগী ছিলেন, মেরেছিলেন বাবাকে ?"

দাদু অর্থাৎ ঠাকুর্দাকে সন্তু চোখেই দেখেনি, তিনি মারা গেছেন সন্তুর জন্মের আগে। দাদু সম্পর্কে অনেক গল্প সে শুনেছে। বাবা আর দাদুর এই নতুন কাহিনীটি শোনবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হল।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের বাবা খুব রাগী ছিলেন ঠিকই। আমরা কেউ

পড়াশুনোয় একটু অমনোযোগী হলেই উনি বলতেন, আর কী হবে, বড় হয়ে চায়ের দোকানে বেয়ারার চাকরি করবি। আমার খেলাধুলোয় বেশি ঝোঁক ছিল বলে পড়াশুনোয় মাঝে-মাঝে ফাঁকি দিতুম, সেইজন্য বাবার কাছে খুব বকুনি খেতুম, কিন্তু...”

বাবা অ-খুশি মুখ করে কাকাবাবুর কথা শুনছিলেন, এবার বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, “তুই অনেক মারও খেয়েছিস বাবার হাতে। সে-কথা বলছিস না কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, আমি মারও খেয়েছি অনেকবার। কিন্তু দাদা বরাবরই পড়াশুনোয় খুব ভাল। সেই দাদা যে ম্যাট্রিকে ফেল করবে, তা কেউ ভাবেইনি। আসলে হয়েছিল কী, অঙ্ক পরীক্ষার দিন দাদা আইনস্টাইনের মতন নতুন থিয়োরি দিয়ে সব কটা অঙ্ক করেছিল। প্রত্যেকটা অঙ্কের উত্তর লিখেছিল প্রথমে, তারপর প্রসেস দেখিয়েছে—এক্‌জামিনার রেগে-রেগে জিরো দিয়ে দিয়েছে। অঙ্কে ফেল মানেই একদম ফেল ! রেজাল্ট বেরুবার দিন মা আর আমাদের এক পিসি দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন। ওঁরা ভাবলেন, বাবা রেগে-মেগে বোধহয় রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবেন। সেই জন্য দাদাকে লুকিয়ে রাখা হল ঠাকুর ঘরে। বাবা কিন্তু দাদাকে খুঁজলেনও না। সারাদিন মন খারাপ করে শুয়ে রইলেন। তারপর সন্ধেবেলা মাকে বললেন, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার খরচ বেঁচে গেল। ও ছেলেকে আর আমি পড়াব না। ওকে চায়ের দোকানের চাকরি খুঁজে নিতে বলো তোমরা ! বাবা সাঙ্ঘাতিক জেদি আর এক-কথার মানুষ। কিছুতেই আর তাঁর মত ফেরানো গেল না। আমাদের ইস্কুলে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন যে তাঁর ঐ ছেলেকে আর ফেরত নেবার দরকার নেই।”

ছোড়দি জিজ্ঞেস করলেন, “তারপর কী হল ?”

“দাদা তখন ঠিক করল মনুমেন্টের ওপর থেকে ঝাঁপ দেবে !”

বাবা বললেন, “কী বাজে কথা বলছিস, খোকা ? মোটেই আমি ওরকম...”

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, “হ্যাঁ দাদা, আমার আজও মনে আছে। তুমি আমাকে ঐ কথা বলেছিলে। আমি তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। ভাবছিলুম মাকে জানিয়ে দেব। যাই হোক, দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল চন্দননগরে আমাদের মামাবাড়িতে। সেইখান থেকেই পরের বছর পরীক্ষা দেয়। পরের বছর কী হয়েছিল বলো তো !”

ছোড়দি বললেন, “জানি। বাবা ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছিল !”

মা বললেন, “আমরা এতদিন জেনে এসেছি যে, তুমি সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া ছাত্র। কিন্তু তোমারও যে এসব কলঙ্ক আছে তা তো আমাদের কোনওদিন বলোনি !”

কাকাবাবু বললেন, “একবার ফেল করে ভালই হয়েছিল দাদার পক্ষে। দাদা

ভাল ছাত্র ছিল বটে, কিন্তু ফার্স্ট হবার মতন ছিল না ! ফেল করে অভিমান হল বলেই—"

বাবা বললেন, "না। মোটেই না। প্রথমবারই আমার ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল, একজামিনার আমার অঙ্ক বুঝতে পারেননি !"

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "পরের বার বাবা যে ফার্স্ট হলেন, সে খবর পেয়ে দাদু কী বললেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা ফার্স্ট হওয়ায় আমার বাবা হঠাৎ উল্টে আমার ওপর চোটপাট শুরু করে দিলেন। আমায় ডেকে বললেন, পারবি ? তুই তোর দাদার মতন পারবি ? তোর দাদার পা-ধোওয়া জল খা, তবে যদি পাশ করতে পারিস !"

সবাই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

এইরকম ভাবে আড্ডায় সকালটা কেটে গেল। সন্ধেবেলা সন্তুর নেমন্তন্ন এক বন্ধুর বাড়িতে।

সন্তুর বন্ধু আজিজের বোন রেশমা গত মাসে জলে ডুবে গিয়েছিল। সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

আজিজরা কলকাতায় পার্ক সার্কাসে থাকলেও ওরা প্রায়ই যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে ওদের একটা চা-বাগান আছে। গত মাসে সেই চা-বাগান থেকে ওরা অনেকে মিলে গিয়েছিল ডায়না নদীর ধারে পিকনিক করতে। রেশমার বয়েস মাত্র সাত বছর, সে যে কখন চুপি চুপি খেলা করতে করতে জলে নেমেছে, তা কেউ লক্ষও করেনি। ডায়না নদীতে যখন জল থাকে, তখন বড় সাঙ্ঘাতিক নদী, খুব স্রোত। রেশমা সেই স্রোতে ভেসে যাবার পর আজিজের মামা প্রথমে দেখতে পান। তিনি চেঁচামেচি করে উঠলেন, সবাই তখন নদীর ধার দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। কাছেই একটা জেলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল, সে রেশমাকে দেখে জাল ছুঁড়ে আটকে ফেলে। আর একটু দূরেই ছিল একটা বড় পাথর। সেখানে ধাক্কা লাগলেই রেশমার মাথা একেবারে ছাতু হয়ে যেত !

প্রায় অলৌকিকভাবেই বেঁচে গেছে রেশমা। সেইজন্যই এবারে তার জন্মদিন করা হচ্ছে খুব ধুমধামের সঙ্গে।

খুব ফুর্তির সঙ্গেই সন্তু গেল নেমন্তন্ন খেতে !

আজিজদের বাড়িটা মস্ত বড়। আর ওদের আত্মীয়-স্বজনও প্রচুর। তারা অনেকেই সন্তুকে চেনেন। সন্তুর কয়েকজন বন্ধুও এসেছে। আজিজের বাড়ির লোকরা কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করছেন, সন্তু, কী রকম রেজাল্ট হল ? সন্তুকে নিজের মুখে কিছু বলতে হয় না। আজিজ কিংবা অন্য কোনও বন্ধু আগে থেকেই বলে ওঠে, জানো না, ও ফিফ্‌থ হয়েছে। কাগজে আমাদের ইস্কুলের নাম বেরিয়েছে এই সন্তুর জন্য।

তখন তাঁরা সবাই 'বাঃ বাঃ' বলে পিঠ চাপ্‌ড়ে দিচ্ছেন সন্তুর।

সন্তুর একটু-একটু গর্ব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু লজ্জাও হচ্ছে খুব। যেন এই বিষয়টা নিয়ে কেউ আলোচনা না করলেই ভাল হয়। ফিফ্‌থ হওয়াটাই বা এমন কী ব্যাপার!

কালকের সন্ধের সঙ্গে আজকের সন্ধের কত তফাত। আজ কত আনন্দ আর হৈ হৈ, আর কালকে সে ফেল করার দুশ্চিন্তায় একেবারে চুপসে কাচু হয়ে ছিল। মানুষের জীবনের পর পর দুটো দিন যে ঠিক এক রকম হবেই, তা কেউ বলতে পারে না।

এক সময় সন্তু ভাবল, কেন মিছিমিছি অত ভয় পাচ্ছিল কাল? ফেল করলেই বা কী হত? তার বাবাও তো ফেল করেছিলেন। ফেল করলেই জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায় না। মনের জোর রাখাটাই আসল ব্যাপার।

আজিজদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আগে অনেক রকম খেলা হল। তার মধ্যে শেষ খেলাটা হল বেলুন ফাটানো।

অন্তত দুশোটা বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে সারা বাড়িটা। লাল টুক্‌টুকে ভেলভেটের ফ্রক্ পরা রেশমাকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা পরীর মতন। জন্মদিনের কেক কাটার পর ফুঁ দিয়ে যখন মোমবাতিগুলো নেভানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওপর থেকে আপনা-আপনি একটা বেলুন খসে পড়ল সেখানে। জ্বলন্ত মোমবাতির কাছাকাছি আসতেই দুম্ করে ফেটে গেল সেটা।

রেশমা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "কী মজা! কী মজা!"

তারপরই সে আবদার ধরল, "কী মজা! কী মজা! আরও বেলুন ফাটিয়ে দাও! সব কটা বেলুন ফাটিয়ে দাও!"

রেশমার বাবা সুলেমান সাহেব বললেন, "না, না, এখন ফাটিও না, সুন্দর সাজানো হয়েছে, কাল সকালে..."

রেশমা তবু বলল, "না, ফাটিয়ে দাও! সব কটা ফাটিয়ে দাও!"

আজকের দিনে রেশমার আবদার মানতেই হয়। সেইজন্য অন্যরা হাতের কাছে যে যে-কটা বেলুন পেল, ফটাস ফটাস করে ফাটাতে শুরু করে দিল।

কিন্তু বেশির ভাগ বেলুনই ওপরে ঝোলানো, হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। অনেকে লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগল আর খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল রেশমা।

আজিজ টুক করে নিয়ে এল ওর এয়ারগানটা।

সেটা উঁচিয়ে তুলে বলল, "এবার দ্যাখ্ রেশমা, সব কটা কী রকম ফাটিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আজিজের অত ভাল টিপ নেই। সে চার-পাঁচটা গুলি ছুঁড়লে একটা বেলুন ফাটে।

তখন শুরু হয়ে গেল কমপিটিশান। পর পর দশটা গুলি ছুঁড়ে কে সবচেয়ে

বেশি বেলুন ফাটাতে পারে। কেউই তিন চারটের বেশি পারল না। আজিজের মামা ফাটালেন পাঁচটা।

সন্তু এয়ারগানটা হাতে নিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, "সবাই এক এক করে গুনুক! আমি দশটায় ঠিক দশটা ফাটাব।"

এ-ব্যাপারে গর্ব করতে সন্তুর কোনও লজ্জা নেই। সে আসল রিভলভারে গুলি ছুঁড়েছে। এ তো সামান্য একটা এগারগান!

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, এক!

সন্তু সত্যি-সত্যি পরপর দশটা বেলুন ফাটাতে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। সন্তু বীরের মতন এয়ারগানটা তুলে দিল পাশের বন্ধুর হাতে।

খুব মজা হল অনেক রাত পর্যন্ত।

পরদিন সকালটা আবার একেবারে অন্য রকম।

সন্তু সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়ার্ক থেকে ফেরেননি। বাবা যথারীতি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজের অপেক্ষায় বারান্দায় পায়চারি করছেন।

এই সময় পাড়ার দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে পাগলের মতন দুম্ দুম্ করে ধাক্কা দিতে লাগল সন্তুদের বাড়ির দরজায়।

বাবা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? এই যে, তোমরা ওরকম করছ কেন!"

ছেলে দুটি বলল, "শিগ্গির আসুন। পার্কে কে যেন কাকাবাবুকে গুলি করেছে!"

৩

বাবা ওপরের বারান্দা থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, "অ্যাঁ? কী বললে? কী সর্বনাশ! সন্তু কোথায়?"

সন্তু ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে তীরের মতন ছুটতে আরম্ভ করেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা, তারপর ডান দিকে বেঁকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পার্কটায় পৌঁছনো যায়। সন্তু সেখানে পৌঁছে গেল দেড় মিনিটে।

পার্কটা খুব বড় নয়, কিন্তু তার একপাশে একটা কবরখানা। আর একদিকে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, একটা বারোতলা বাড়ির লোহার কঙ্কাল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে রাশি-রাশি ইঁট।

সেই ইঁটের স্তূপের কাছে এক দঙ্গল মানুষের ভিড় দেখেই বোঝা গেল যে, ঘটনাটা সেইখানেই ঘটেছে। সেখানে শোনা যাচ্ছে একটা কুকুরের অবিশ্রান্ত ডাক।

সন্তু ভিড়ের মধ্যে গোঁত্তা মেরে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখল একটা ইঁটের পাঁজার কাছে কাকাবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। গুলি লেগেছে কাঁধের বাঁ

দিকে, পাতলা সাদা জামাটায় পাশাপাশি দুটো কালো গোল দাগ, তার চার পাশে রক্ত।

কাকাবাবু সন্তুর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন রোজ। সেই রকুকু কাকাবাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ডেকে চলেছে, সন্তুকে দেখতে পেয়েই সে পাগলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সন্তু কাকাবাবুর গায়ে হাত দিল না, কান্নাকাটিও শুরু করল না। তাকে এখন এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না।

সে রকুকুর গলায় চাপড় মেরে বলল, "তুই এখানে থাক। দেখিস, কেউ যেন কাকাবাবুর গায়ে হাত না ছোঁয়ায়।"

রকুকু সন্তুর সব কথা বোঝে। সে আবার গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর কাছে। সন্তু আবার ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে ছুটল।

ডঃ সুবীর রায় তখন চেম্বারে বেরুবার জন্য সবে মাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছেন, সন্তু ঝড়ের মতন ঢুকে এল তাঁর ঘরে। এক হাতে তাঁর যন্ত্রপাতির বাক্সটা টপ্ করে তুলে নিয়ে অন্য হাতে ডঃ সুবীর রায়কে ধরে টানতে টানতে বলল, "শিগ্গির চলুন! ডাক্তার মামা, এক্ষুনি..."

ডঃ সুবীর রায় অবাক হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? কী হয়েছে?"

"কিছু বলবার সময় নেই। কাকাবাবু—"

"কাকাবাবু? কোথায়...দাঁড়া জুতোটা পরে নিই।"

"না, জুতো পরতে হবে না!"

খালি পায়েই ডঃ সুবীর রায় ছুটতে লাগলেন সন্তুর সঙ্গে। তাঁর বাড়িও পার্কের কাছেই।

ততক্ষণে সন্তুর বাবা আর মা পৌঁছে গেছেন। আর এসেছে একজন পুলিশের কনস্টেবল।

ডঃ সুবীর রায় হাঁটু গেড়ে বসলেন কাকাবাবুর দেহের পাশে। আস্তে আস্তে উল্টে দিলেন কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর মুখে একটা দারুণ অবাক হবার ভাব।

যে-সমস্ত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা অনেকেই কাকাবাবুকে চেনে। অনেকেই এখানে সকালে বেড়াতে আসে। সবাই নানান কথা বলাবলি করছে। কিন্তু আগেই যে একজন ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত সে-কথা কারুর মনে পড়েনি।

দু'তিনজন নাকি স্বচক্ষে দেখেছে কাকাবাবুকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে। গুলির আওয়াজ হয়েছিল তিনবার, অর্থাৎ একটা গুলি ফস্কে গেছে। কিন্তু কে গুলি করেছে, তা বোঝা যায়নি। কাছাকাছি তো কেউ ছিল না, কিংবা কারুকে পালাতেও দেখা যায়নি।

একজন বলল, "নিশ্চয়ই কেউ কবরখানায় লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।"

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু পার্কে বেড়াতে এসে এই ইঁটের পাঁজার কাছে

কেন এসেছিলেন। এখানে বালি আর খোয়া ছড়ানো, এই জায়গাটা তো হাঁটার পক্ষেও ভাল নয়।

ডঃ সুবীর রায় এর মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে বললেন, "সন্তু, এক্ষুনি ওঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়ে অপারেশান করাতে হবে। এখনও বেঁচে আছেন···আমার ড্রাইভার বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে···তুই গিয়ে ডেকে আন বরং!"

সন্তু বলল, ঐ যে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে···যদি ট্যাক্সি করে নিয়ে যাই···"

বাবা বললেন, "সেই ভাল, সময় বাঁচবে!"

সবাই মিলে ধরাধরি করে কাকাবাবুকে তোলা হল ট্যাক্সিতে। রকুকু কী যেন বুঝে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, সেও সঙ্গে যেতে চায়।

রকুকুকে জোর করে মায়ের সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নার্সিং হোমে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপারেশনের পর জানা গেল একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ডঃ সুবীর রায় ছাড়া আরও দু' জন বড় ডাক্তারও ছিলেন অপারেশনের সময়। তাঁরা কেউ কখনও এরকম কাণ্ড দেখেননি।

কাকাবাবুর শরীরে যে গুলিদুটো ঢুকেছে, সেগুলি মানুষ মারবার জন্য নয়। বাঘ-সিংহের মতন বিশাল শক্তিশালী প্রাণীদের এই রকম গুলি মেরে ঘুম পাড়ানো হয়।

তিনজন ডাক্তারই দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর জন্য তো সঙ্গে-সঙ্গে অ্যান্টিডোট দেবার কথা, নইলে বাঁচানো যায় না। অথচ অনেক সময় কেটে গেছে।

যদিও ভরসার কথা এই যে কাকাবাবুর এখনও নিশ্বাস পড়ছে।

সুন্দরবনে দু' একটা বাঘকে গুলি করে ঘুম পাড়াবার কথা অনেকেই শুনেছে, কিন্তু কলকাতা শহরে সকালবেলা পার্কে কোনও মানুষকে এরকমভাবে গুলি করবে কে? কেন?

ডঃ তিমির বরাট একবার সুন্দরবনের একটা বাঘকে এই রকম গুলি মেরে অজ্ঞান করার সময় সেখানে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ জানবার জন্য তাঁকে ফোন করা হল পি জি হাসপাতালে।

ডঃ তিমির বরাট তো ঘটনাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। তারপর বলতে লাগলেন, "পেশেন্ট এখনও বেঁচে আছে? কী বলছেন আপনারা? এ যে অসম্ভব! ঠিক আছে; আমি এক্ষুনি আসছি। আপনারা ততক্ষণে চীফ্ কন্‌জারভেটার অব ফরেস্ট মিঃ সুকুমার দত্তগুপ্তকেও একটা খবর দিন। তাঁর এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে।

সুকুমার দত্তগুপ্তও টেলিফোনে ঐ একই কথা বলতে লাগলেন। ঘুমের গুলি? আপনাদের ভুল হয়নি তো? সেই গুলি শরীরে গেলে তো কোনও

মানুষের পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব ! মিঃ রায়চৌধুরীকে আমি চিনি, ওঁকে এইরকমভাবে···

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলেন ওঁরা দু'জনে। আর বারবার বলতে লাগলেন, "কী আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য !"

সুকুমার দত্তগুপ্ত বললেন, "এই রকম গুলি বিদেশ থেকে আসে, এ তো কোনও সাধারণ লোকের পাবার কথা নয়।"

ডঃ সুবীর রায় বললেন, "যারা পার্কের মধ্যে সকালবেলা কারুকে গুলি করে, তারা কি সাধারণ লোক ?"

সমস্ত ডাক্তারদের অবাক করে কাকাবাবু এর পরেও তিনদিন বেঁচে রইলেন অজ্ঞান অবস্থায়।

চতুর্থ দিনে তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

তবু আরও দু' দিন তাঁর ঘুম-ঘুম ভাব রইল, ভাল করে কথা বলতে পারেন না, কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যায়।

আস্তে-আস্তে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তাঁর হাত দুটো অবশ হয়ে রইল। হাতে কোনও জোর পান না। কোনও জিনিস শক্ত করে ধরতে পারেন না।

অনেক ওষুধপত্র দিয়েও আর হাত দুটো ঠিক করা গেল না। ডাক্তাররা বললেন, "আর কিছু করবার নেই। এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যদি আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যায়।"

এতদিন পর সন্তু রাত্তিরবেলা তার ছাদের ঘরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদল।

কাকাবাবুর হাত দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়া তো তাঁর মৃত্যুর চেয়েও খারাপ !

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া, শুধু মনের জোরে আর ঐ লোহার মতন শক্ত হাত দু'খানার জোরে তিনি কত পাহাড়ে-পর্বতে পর্যন্ত উঠেছেন। কিন্তু এখন ? আর তিনি কোনও অভিযানে যেতে পারবেন না। তিনি এখন অথর্ব।

এর মধ্যে কলকাতার পুলিশের বড় বড় কর্তারা আর দিল্লি থেকে সি· বি· আই-এর লোকেরাও কাকাবাবুর কাছে এসে অনেক খোঁজখবর নিয়ে গেছেন।

কাকাবাবু সবাইকেই বলেছেন যে, কে তাঁকে ঐ রকম অদ্ভুত গুলি দিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। আততায়ী একজন না কয়েকজন তাও তিনি জানেন না, কারণ কারুকেই তিনি দেখতে পাননি। তাঁকে গুলি করা হয়েছে পেছন দিক থেকে।

সকলেরই অবশ্য ধারণা হল যে, ঘুমের গুলি মারার কারণ একটাই হতে পারে। কাকাবাবুকে কেউ বা কারা অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিশ্চয়ই।

তবে তারা নিয়ে গেল না কেন ? সকালবেলা পার্কে কিছু নিরীহ লোক ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখের সামনে দিয়েই যদি তারা কাকাবাবুকে তুলে নিয়ে

যেত, কেউই বাধা দিতে সাহস করত না।

মিঃ ভার্গব নামে সি· বি· আই-এর একজন অফিসার কাকাবাবুর কাছে রোজই যাতায়াত করছিলেন। তিনিই বললেন যে স্বাস্থ্য সারাবার জন্য কাকাবাবুর কোনও ভাল জায়গায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার।

সন্তুর বাবা এবং মা দু'জনেই এতে খুব রাজি।

ঠিক হল যে সবাই মিলে যাওয়া হবে পুরীতে। সন্তুর মামাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে। সুতরাং কোনও অসুবিধে নেই। বাবা ছুটি নিয়ে নিলেন অফিস থেকে। ছোড়দিরও খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছোড়দিকে ফিরে যেতে হল ভূপালে।

শনিবার দিন রাত ন'টায় ট্রেন। একটু আগেই বেরুনো হল বাড়ি থেকে।

ট্যাক্সিটা যখন রেড রোড ছাড়িয়ে রেডিও স্টেশনের পাশ দিয়ে বেঁকছে, সেই সময় একটা সাদা রঙের জীপ গাড়ি তীব্র বেগে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন লোক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হুকুম দিল, "গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাও।"

সেই জীপ থেকে নামলেন মিঃ ভার্গব।

তিনি বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের প্ল্যানটা একটু বদল করতে হবে। আপনার পুরী যাওয়া হবে না।"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে শুধু চেয়ে রইলেন মিঃ ভার্গবের দিকে।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, কী ব্যাপার!"

মিঃ ভার্গব বললেন, "আমরা খবর পেয়েছি, পুরীতে কয়েকজন সন্দেহজনক লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর এই ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি না ঠিক বলা না গেলেও তারা ঠিক এই সময়ই পুরীতে গেল কেন, তা আমাদের জানতে হবে। যদি ওরা মিঃ রায়চৌধুরীর কোনও ক্ষতি করে···সেই জন্য আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না।"

বাবা বললেন, "তা হলে কি আমরা ফিরে যাব?"

মিঃ ভার্গব বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করেছি। আপনারা ইচ্ছে করলে পুরী যেতে পারেন।"

সন্তু বলল, "আমি কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গেই যাব!"

মিঃ ভার্গব হেসে বললেন, "তা জানি! সেরকম ব্যবস্থাই হয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আর-একজন যাবেন এঁর নাম প্রকাশ সরকার, ইনি একজন তরুণ ডাক্তার। সদ্য পাশ করেছেন···"

একটুক্ষণ কথা বলেই কাকাবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে তোলা হল জিপটায়। সন্তু ভাগ্যিস আলাদা একটা ছোট সুটকেসে নিজের জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিয়েছিল, তাই কোনও অসুবিধে হল না।

জিপটা ছুটল অন্য দিকে। সোজা একেবারে এয়ার পোর্ট।

সেখানে আর্মির একটা স্পেশাল ছোট প্লেনে উঠল ওরা। তখনও কোথায় যাচ্ছে, সন্তু জানে না। নামবার পর দেখল যে, জায়গাটা গৌহাটি।

প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে ধরে নামাল কাকাবাবুকে। এবার উঠতে হবে আর-একটা জীপে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতন হয়ে গেছি, না রে ? হাঁটতে পারি না, একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত ধরতে পারি না। আমায় নিয়ে কী করবি তোরা ?"

৪

প্লেনের সিঁড়ি থেকে কাকাবাবুকে ধরাধরি করে নামিয়ে আনা হল।

কাছেই টার্‌ম্যাকের ওপর অপেক্ষা করছে একটা বেশ বড় জিপ। তার পেছন দিকে দুই সীটের মাঝখানে বিছানা পাতা। প্রকাশ সরকার আর সন্তু দু'জনে মিলে কাকাবাবুকে সেখানে শুইয়ে দিল খুব সাবধানে।

সন্তু সেখানেই বসল। আর প্রকাশ সরকার গিয়ে বসল সামনের দিকে। সেখানে ড্রাইভারের পাশে আর-একজন লোক বসে ছিল।

সেই লোকটি প্রকাশ সরকারকে নিচু গলায় কিছু বলবার পরই চলতে শুরু করল গাড়ি।

সন্তু এর আগে কখনও অসমে আসেনি। কিন্তু অসমের পাহাড় আর জঙ্গল সম্পর্কে অনেক গল্পের বই পড়েছে। হাতি, গণ্ডার, বাঘ···কী নেই অসমে ! সেইজন্য অসমের নাম শুনলেই তার রোমাঞ্চ হয়।

সে কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিন্তু চারপাশে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

সন্তু ভেবেছিল, এয়ারপোর্টে যখন নেমেছে, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি শহর থাকবে। আলো দেখা যাবে।

কিন্তু গাড়িটা শহরের দিকে গেল না। মাঝে-মাঝে দুটো একটা আলো দেখা গেলেও বোঝা যায়, গাড়িটা চলে যাচ্ছে লোকালয়ের বাইরে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা আবার ছুটল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

ঘণ্টাখানেক পরে সন্তু অবাক হয়ে দেখল, তাদের গাড়ি আবার একটা এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে টার্‌ম্যাকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

কাকাবাবু ঘুমোননি, চুপচাপ শুয়ে ছিলেন।

এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কোথায় এলুম, বল্ তো, সন্তু ?"

সন্তু বলল, "আর-একটা এয়ারপোর্ট···নামটা পড়তে পারিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝতে পারলি না ? আবার সেই আগের এয়ারপোর্টেই ফিরে এলুম ! ঐ যে পাশাপাশি দুটো আলো, তার মধ্যে একটা দপ্ দপ্ করছে !"

সন্তু দেখল, তাই তো ! ঠিকই। অসুস্থ, শোয়া অবস্থাতেও কাকাবাবু এটা লক্ষ করেছেন ঠিক।

প্রকাশ সরকার এদিকে এসে বিনীতভাবে বলল, "স্যার, আপনাকে আবার একটু কষ্ট করে নামতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপার কী ? এত সাবধানতা কিসের ? আমি তো একেবারে অথর্ব হয়ে গেছি, হাঁটতে পারি না, কোনও কিছু ধরতে পারি না, আমায় নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা থাকবে ?"

প্রকাশ সরকার বলল, "আমাদের দেশের পক্ষে আপনার জীবন খুবই মূল্যবান। আপনার যদি কোনও বিপদ হয়···সে ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলতো, সন্তু ?"

সন্তুও তো কিছুই বুঝতে পারছে না। অন্য-অন্য বার কাকাবাবু নিজেই প্রথম দিকে সন্তুর কাছে অনেক কথা গোপন করে যান। এবার কাকাবাবু নিজেই জানেন না কী হচ্ছে ! একই এয়ারপোর্টে দু'বার তাঁকে কেন আনা হল ? কারুর চোখে ধুলো দেবার জন্য ? কিন্তু তারা যে প্লেনে অসমে চলে আসবে, সে-কথা তো সন্ধের আগে কেউ জানতই না।

কাকাবাবুকে আবার নামানো হল জিপ থেকে।

সেই সেনাবাহিনীর বিমানটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। সেটাতেই আবার উঠতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, একটু টাট্‌কা হাওয়া খেয়ে নিই। অসমের হাওয়া খুব ভাল।"

সত্যি-সত্যি তিনি মুখটা হাঁ করে হাওয়া খেতে লাগলেন।

এক দিকে প্রকাশ সরকার, আর-এক দিকে সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। সন্তু একটু লম্বায় ছোট বলে কাকাবাবুকে একদিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছে।

সেই অবস্থায় প্রায় প্রকাশ সরকারকে শুনিয়ে-শুনিয়েই কাকাবাবু সন্তুকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "মনে কর, এরাই যদি গুণ্ডা হয়, এরাই হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের কোথাও গুম্‌ করতে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে কী করবি ?

সন্তু আড়চোখে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল।

প্রকাশ সরকার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "এ কী বলছেন, স্যার ? এরা সব আর্মির লোক, এটা আর্মির জিপ, ওইটা আর্মির প্লেন···দিল্লি থেকে স্পেশাল অর্ডার এসেছে বলেই আপনাকে···"

কাকাবাবু বললেন, "হুঃ ! কিছুই বলা যায় না !"

প্রকাশ সরকার এবার রীতিমত আহত হয়ে বলল, "স্যার, আপনার এখনও অবিশ্বাস হচ্ছে ? মিঃ ভার্মার চিঠি আছে আমার কাছে। যদি দেখতে চান···"

"যাব ! চলো !"

আবার ওঠা হল সেই ছোট বিমানের মধ্যে। কাকাবাবু তাঁর সীটে বসবার পর তিনি চোখ বুজে রইলেন।

প্রকাশ সরকার সন্তুর পাশে বসে পড়ে বলল, "তোমার সঙ্গে আমার ভাল করে আলাপ হয়নি। কিন্তু আমি তোমাদের সব কটা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। সেই আন্দামানে...কিংবা নেপালে, এভারেস্টের কাছে, আর একবার সেই কাশ্মীরে...তুমি তো দারুণ সাহসী ছেলে !'

এই রকম কথা শুনলে সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে থাকে। কী যে উত্তর দেবে তা বুঝতে পারে না।

প্রকাশ আবার বলল, "আর তোমার কাকাবাবু, উনি তো জীনিয়াস ! একটা পা নেই বলতে গেলে...তবু শুধু মনের জোরে উনি কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। উনি কোনও বিপদকেই গ্রাহ্য করেন না !"

সন্তু এবার বলল, "কিন্তু কাকাবাবুর এখন হাতেও জোর নেই।"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার, আমি সঙ্গে রয়েছি, কোনও চিন্তা নেই। আমার ওপর নির্দেশ আছে, উনি যখন যা চাইবেন, তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্তত এক মাস যদি বিশ্রাম নিতে পারেন..."

"এক মাস ?"

"তা তো লাগবেই। আরও বেশি হলে ভাল হয়। কেন, তুমি সঙ্গে থাকতে পারবে না ?"

"আমার যে কলেজ খুলে যাবে।"

"তুমি কলেজে পড়ো বুঝি ?"

সন্তু আবার লজ্জা পেয়ে গেল। সে এখনও ঠিক কলেজের ছাত্র হয়নি। তবু 'কলেজ' কথাটা উচ্চারণ করতে তার বেশ ভাল লাগে।

এই সময় কাকাবাবু চোখ খুলে বললেন, "এই যে বৈজনাথ, শোনো !"

প্রকাশ একবার এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আমাকে ডাকছেন ?"

"হ্যাঁ !"

"আসছি, স্যার ! ইয়ে, মানে স্যার, আমার নাম তো বৈজনাথ নয়, এখানে বৈজনাথ বলে কেউ নেই। আমার নাম প্রকাশ, প্রকাশ সরকার।"

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমি বৈজনাথ নও ! ঠিক বলছ ? ভারী আশ্চর্য তো !"

"বৈজনাথ কে স্যার ? সন্তু তুমি ওই নামে কারুকে চেনো ?"

সন্তু দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ঠিক আছে। তোমার কী নাম বললে যেন ? প্রকাশ ? শোনো প্রকাশ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি একটু ডাবের জল

খাব।”

“ডাবের জল ? এখানে কি ডাবের জল পাওয়া যাবে ? কোল্ড ড্রিংক্স আছে বোধহয়।”

“আমি ডাবের জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না !”

“কিন্তু স্যার, রাত্তিরবেলা ডাবের জল খাওয়াটা বোধহয় ঠিক নয় !”

“কেন, কী হয় ?”

“কেউ খায় না। খেলে গলা ভেঙে যায় !”

“তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে ? যাই হোক, আমি রাত্তিরেও ডাবের জল খাই, আমার গলা ভাঙে না।”

“প্লেনের মধ্যে তো ডাবের জল দেবার উপায় নেই।”

“তা হলে সামনের স্টেশানে থামাও ! সেখান থেকে ডাবের জল জোগাড় করো। এই যে বললে, আমি যখন যা চাইব, তুমি তা-ই দেবার ব্যবস্থা করবে !”

প্রকাশ অসহায়ভাবে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তুও প্রায় নির্বাক হয়ে গেছে। কাকাবাবু এ কী রকম ব্যবহার করছেন ? কাকাবাবু কোনওদিন কারুর নাম ভুলে যান না। অথচ প্রকাশকে ডাকলেন বৈজনাথ বলে। ডাবের জল খাওয়ার জন্য আবদার, এ তো কাকাবাবুর চরিত্রের সঙ্গে একদম মানায় না ! তারপর উনি বললেন, ‘সামনের স্টেশান’ ! উনি কি প্লেনটাকে ট্রেন ভেবেছেন নাকি ?

প্রকাশ বলল, “স্যার, আমরা আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। সেখানে খুব চেষ্টা করব যদি ডাবের জল পাওয়া যায়। তার আগে কি একটা কিছু কোল্ড ড্রিংকস কিংবা এমনি জল খাবেন ?”

“না।”

কাকাবাবু আবার চোখ বুজলেন।

একটু পরে সন্তু ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, “এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?”

প্রকাশ বলল, “একটু বাদেই তো নামব। তখন দেখতে পাবে।”

চোখ না খুলেই কাকাবাবু বললেন, “আগরতলা, তাই না ? একে বলে ঘুরিয়ে নাক দেখানো !”

প্রকাশ দারুণ চমকে উঠল। কোথায় যাওয়া হবে, তা একজন আর্মি অফিসার শুধু তার কানে-কানে বলেছে। কাকাবাবুর তো কোনও ক্রমেই জানবার কথা নয়। উনি কি হিপ্‌নোটিজ্‌ম জানেন নাকি ! তাও তো চোখ বুজে আছেন।

অসম ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনে সন্তু একটু নিরাশই হল। সে আরও ভাবতে লাগল, কাকাবাবু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কথা বললেন কেন ? কে কাকে ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছে ?

প্লেনের আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, কখন সেটা নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে। একটু পরেই প্লেনটি একটি ঝাঁকুনি খেয়ে মাটি ছুঁল।

নামবার সময় এবারে আর কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। প্রকাশ খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে ফিরে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "স্যার, এত রাত্রে তো এখানে ডাব কোথাও নেই, কিছুতেই পেলুম না!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে।"

এবারে জিপ নয়, একটা সাদা রঙের গাড়ি। প্রত্যেকবারই কাকাবাবুকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে বসাতে হচ্ছে। অথচ, কাকাবাবু কক্ষনো পরের সাহায্য নেওয়া পছন্দ করেন না। খোঁড়া পায়েই ক্রাচ্ বগলে নিয়ে উনি একা পাহাড়ে পর্যন্ত উঠতে পারেন। কিন্তু এখন হাতেও জোর নেই, ক্রাচও ধরতে পারছেন না।

গাড়ি এসে থামল আগরতলার সার্কিট হাউসে।

খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘর কাকাবাবুর জন্য, অন্য ঘরটিতে প্রকাশ আর সন্তু থাকবে।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও তৈরিই ছিল। প্রকাশ বলল, "আজ অনেক ধকল গেছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু এখন নিজে খেতেও পারেন না, তাঁকে খাইয়ে দিতে হয়। চামচে করে যে খাবার তুলবেন, তাতে সেই জোরটুকুও নেই। এই ক'দিন বাড়িতে ছোড়দিই খাইয়ে দিয়েছে কাকাবাবুকে। আজ সন্তু বসল কাকাবাবুকে খাওয়াতে।

কিন্তু তার তো অভ্যেস নেই, সে ঠিকঠাক পারবে কেন? ভাত তুলে কাকাবাবুর মুখে দিতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে।

প্রকাশ বলল, "তুমি সরো, সন্তু, আমি দিচ্ছি। আমরা তো নার্সিং করতে জানি।"

কাকাবাবু দু' তিনবার ঠিকঠাক খেলেন। তারপর একবার কট্ করে চামচটাকেই কামড়ে ধরে এক ঝট্‌কায় ছাড়িয়ে নিলেন প্রকাশের হাত থেকে। তারপর সেই চামচটাকে চিবুতে লাগলেন কচর-মচর করে।

প্রকাশ আঁতকে উঠে বলল, "স্যার, স্যার, ও কী করছেন? ও কী?"

কাকাবাবু কট্‌মট্ করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমায় স্যার স্যার বলছ কেন! আমার নাম রামনরেশ যাদব। আমি বিহারের একজন গোয়ালা। আমার একশো সাতান্নটা গোরু আছে। তুমি কি সেই একটা গোরু?"

সন্তুর বুকের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হতে লাগল।

৫

প্রকাশ সরকার কাকাবাবুকে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর সন্তুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজেদের ঘরে এসে বসল।

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে। সে যেন বুঝতে পারছে কাকাবাবুর একটা ভীষণ বিপদ আসছে। এই অবস্থায় বাড়ি থেকে এত দূরে থাকা কি ঠিক?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার হল বলো তো, সন্তু? উনি একবার বৈজনাথ বলে ডাকলেন আমাকে। তারপর নিজের নাম বললেন রামনরেশ যাদব। এরা কারা?"

সন্তু বলল, "কোনওদিন আমি এই সব নাম শুনিনি!"

"তুমি তো ওঁর সঙ্গে সবকটা অভিযানেই গেছ, তাই না? সুতরাং যে-সব ব্যাড ক্যারেকটারদের উনি দেখেছেন, তুমিও তাদের দেখেছ?"

"তার কোনও মানে নেই। আমি তো মোটে চার-পাঁচ বার গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে। তার আগে কাকাবাবু আরও কত জায়গায় গেছেন। পা'টা ভেঙে যাবার আগে তো উনি আমাকে সঙ্গে নিতেন না।"

"আগেকার কথা বাদ দাও। গত পাঁচ-ছ বছর ধরে তো তুমি ওঁর সঙ্গেই থেকেছ—"

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, "না, তাও ঠিক বলা যায় না। গত বছর আমার যখন পরীক্ষা ছিল, সেই সময় কাকাবাবু একাই যেন কোথায় গিয়েছিলেন..."

"কোথায়?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় যেন অসমের দিকেই।"

"কেন তোমার অসমের কথা মনে হল? উনি কি তোমায় কিছু বলেছিলেন?"

"না। তা বলেননি। তবে, উনি মা'র জন্য একটা বেশ সুন্দর নানা রঙের কম্বলের মতন জিনিস এনেছিলেন, তার নাম খেস্। মা বলেছিলেন, ঐ জিনিস অসমেই ভাল পাওয়া যায়।"

"কিন্তু অসমে এসে বৈজনাথ কিংবা রামনরেশ যাদব টাইপের নামের ক্যারেকটারদের উনি মিট করবেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। বিহার, উত্তরপ্রদেশেই এই ধরনের নামের লোক থাকে।"

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু—"

"আমায় ডাক্তারবাবু বলার দরকার নেই। আমায় তুমি প্রকাশদা বলতে পারো।"

"আপনার কি মনে হয়, কাকাবাবুর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?"

"কিছু একটা গণ্ডগোল যে হয়েছে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। উনি নিজেকেও

অন্য মানুষ ভাবছেন। অবশ্য এটা খুব টেমপোরারিও হতে পারে। দেখা যাক, কাল সকালে কেমন থাকেন!"

"আপনি সত্যি করে বলুন, কাকাবাবু আবার ভাল হয়ে যাবেন তো?"

"নিশ্চয়ই! যে-কোনও ভাবেই হোক, ওঁকে ভাল করে তুলতেই হবে। ওঁর মাথাটাই তো একটা অ্যাসেট! তা হলে এবার শুয়ে পড়া যাক?"

পাশাপাশি দুটো খাটে ওদের বিছানা। মাঝখানে একটা টেব্‌ল ল্যাম্প। প্রকাশ সরকার সেই আলো নিভিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু সন্তুর ঘুম আসছে না। সে আকাশ-পাতাল ভাবছে শুধু। কাকাবাবুর কথা মনে করলেই তার কান্না এসে যাচ্ছে। কাকাবাবু যদি পাগল হয়ে যান? না, না, তা হতেই পারে না! কাকাবাবুর মতন সাহসী মানুষ এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবেন?

যদি সত্যি-সত্যি কাকাবাবুর কিছু হয়, তা হলে সন্তু ছাড়বে না। যারা কাকাবাবুকে ঘুমের গুলি দিয়ে মেরেছে, তাদের সন্তু দেখে নেবে, যদি তারা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গিয়েও লুকোয়, তা হলেও সন্তু প্রতিশোধ নেবেই।

কিন্তু তারা কারা?

কাপুরুষের মতন তারা কাকাবাবুকে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে। কাকাবাবুকে তারা পুরোপুরি মেরে ফেলতেও চায়নি, শুধু তাঁর মাথাটাকে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। এটা তো মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

এই সব ভাবতে-ভাবতে কত রাত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। একটু বোধহয় তন্দ্রার মতন এসেছিল, হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠল সন্তু।

একটা গাড়ি ঢুকেছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। ইঞ্জিনের শব্দটা খুব জোর। কয়েকজন লোকের কথাও শোনা গেল এর পরে।

সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানলার পাশে।

সার্কিট হাউসের বারান্দার আলো সারা রাত জ্বালাই থাকে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা জোঙ্গা জিপ এসে দাঁড়িয়েছে, তার থেকে দু'তিন জন লোক নেমে কথা বলছে নাইট গার্ডের সঙ্গে।

তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এল এদিকে। ঠিক যেন সন্তুর সঙ্গে কথা বলতেই আসছে। সোজা এসে তারপর লোকটি কিন্তু চলে গেল পাশের ঘরের দিকে।

সন্তুর তক্ষুনি মনে পড়ল কাকাবাবুর ঘরের দরজা খোলা আছে। কারণ, কাকাবাবু তো নিজে দরজা বন্ধ করতে পারবেন না, দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ লোকটা কাকাবাবুর ঘরের দিকেই গেল।

প্রকাশ সরকারকে ডাকবারও সময় পেল না সন্তু। সে অন্ধকারেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই। লোকটা নেই। কাকাবাবুর ঘরের একটা পাল্লা

খোলা।

সন্তু সেই দরজার কাছে আসতেই তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল সন্তু। তার ধারণা হল, এইবার কেউ তাকে গুলি করবে।

কিন্তু সেরকম গুলি ছুটে এল না।

তার বদলে একজন কেউ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

মানুষের গলার আওয়াজ শুনে অনেকটা ভয় কেটে যায়। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি কে? আমাদের ঘরে ঢুকেছেন কেন?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ফেলল খাটের ওপর কাকাবাবুর মুখে।

ততক্ষণে সন্তু দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বেলে ফেলেছে।

কালো রঙের প্যান্ট ও কালো ফুল শার্ট পরা একজন ঢ্যাঙা লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা বড় চৌকো ধরনের টর্চ। সন্তু আগে কোনও লোককে এরকম টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেনি।

লোকটা বলল, "এই চার নম্বর ঘর আমাদের নামে বুক করা ছিল। নাইট গার্ড বলল, আমাদের রিজার্ভেশান ক্যানসেল্‌ড হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন দেখছি, সত্যি এখানে একজন লোক শুয়ে আছে।"

প্রকাশ সরকারও এর মধ্যে উঠে এসেছে।

সে বলল, "আপনি কে? কিছু জিজ্ঞেস না-করে হুট করে এ-ঘরে ঢুকে এসেছেন কেন?"

লোকটি বলল, "কেন, তাতে কী হয়েছে? এ ঘর আমাদের নামে বুকিং..."

প্রকাশ বলল, "তা হতেই পারে না। একই ঘর কখনও দু'জনের নামে বুক হয়? আপনার বুকিং আছে কি না তা আপনি অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।"

লোকটি বলল, "আপনারা যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন আপনাদের এখন এখান থেকে তুলে দেব না নিশ্চয়ই। দেখি অন্য কী ব্যবস্থা করা যায়।"

সন্তু আর প্রকাশকে পাশ কাটিয়ে লোকটা চলে গেল বাইরে।

প্রকাশ কাকাবাবুর কাছে এসে একটা চোখের পাতায় সামান্য আঙুল ছুঁয়ে বলল, উনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, কিছুই টের পাননি। তা হলেও...এত রাত্রে একটা লোক হুট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে..."

সন্তু বলল, "ওরা দেখে গেল।"

প্রকাশ বলল, "ওরা মানে?"

সন্তু বলল, "যাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য প্রথমে গৌহাটি যাওয়া হল, তারপর আগরতলায়— সেই তারাই এসে দেখে গেল কাকাবাবু এখানেই এসেছে কি না!"

প্রকাশ হেসে বলল, "আরে না, না। ও লোকটা একটা উট্‌কো লোক।

ওদের বুকিংয়ে বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছে। তাছাড়া, আমরা তো ঠিক কারোর চোখে ধুলো দিতে চাইনি, এমনিই সাবধানতার জন্য...”

“কিন্তু যে লোকটা এই ঘরে ঢুকেছিল, সেই লোকটা মোটেই ভাল না।”

“তুমি কী করে বুঝলে?”

“ও কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরে ছিল। আমি কালো রঙের জামা পরা লোক আগে দেখিনি।”

“ওঃ হো! এই জন্য। ঠিক কালো নয় তো, খুব গাঢ় খয়েরি। এক রঙের প্যান্ট-শার্ট পরা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে।”

“ঐ রকম চৌকো টর্চ...”

“গোল আর লম্বা টর্চ হাতে থাকলেই লোকটা ভাল হয়ে যেত?”

“লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে।”

“তোমার দেখছি বড্ড বেশি বেশি সন্দেহ। শোনো, আমরা যে আজ আগরতলা এসেছি, তা বাইরের কারুর পক্ষে জানা অসম্ভব।”

“কেন, আমরা কি এখানে মিথ্যে নাম লিখিয়েছি? সার্কিট হাউসের লোকেরা তো জানে। যাই বলুন, ঐ লোকটার মুখ দেখে মনে হল, ও কাকাবাবুকে চিনতে পেরেছে।”

“যাঃ, কী যে বলো! কাল সকালেই আমি খবর নেব ওরা কারা। এখন চলো, শুয়ে পড়া যাক।”

“আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এ-ঘরেই শোব। প্রথম থেকেই আমার তাই করা উচিত ছিল। আপনি বললেন বলে পাশের ঘরে চলে গেলুম।”

“বেশ তো, থাকো না।”

সন্তু চট করে পাশের ঘর থেকে জামা কাপড় নিয়ে এল। এ-ঘরেও দুটো খাট। কাকাবাবুর পাশের খাটে কিছু জিনিসপত্র রাখা ছিল। সেগুলো নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল সন্তু।

এবারেও তার ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। তার বারবার মনে হচ্ছে, ঐ লম্বা লোকটা জোরালো টর্চ নিয়ে কাকাবাবুকে দেখতেই এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু এসে পড়ায় কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

সার্কিট হাউসে জায়গা না পেয়ে ওদের জোঙ্গা জিপটা একটু আগেই চলে গেছে। তা যাক। ওরা যদি শত্রু পক্ষের লোক হয়, তা হলে একজনের চেহারা তো সন্তুর জানা রইল। কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি হলে ঐ লোকটাকে সন্তু ঠিক খুঁজে বার করবেই।

পরদিন সন্তুর ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

সন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু জেগে উঠেছেন এর মধ্যেই। চোখ মেলে ঘরের ছাদ দেখছেন।

সন্তু কাছে গিয়ে বলল, "কাকাবাবু, চা খাবে ?"

কাকাবাবু কোনও উত্তর না দিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টি।

সন্তু কাকাবাবুর মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাঁকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে দিল। তারপর কাপে চা ঢেলে নিয়ে এল কাকাবাবুর মুখের সামনে।

কাকাবাবু একটা চুমুক দিলেন।

তারপর অদ্ভুত খস্‌খসে গলায় বললেন, "এটা চা নয়। ষাঁড়ের রক্ত। এ জিনিস বাঘে খায়। মানুষে খায় না।"

সন্তু বলল, "চা-টা ভাল হয়নি বুঝি। আচ্ছা, আমি আবার অন্য চা দিতে বলছি।"

তখন ফিরে সন্তু সেই চায়ের কাপে নিজে একটা চুমুক দিয়ে দেখল। তার তো কিছু খারাপ লাগল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আজ কি ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ ?"

সন্তু বলল, "না তো ! এখন তো জুন মাস, আজ আট তারিখ।"

কাকাবাবু বললেন, "এলতলা বেলতলা, কে এল আগরতলা ?"

সন্তু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, হরিণ বলে কোথায় যাই !"

সন্তুর আবার ভয় করতে লাগল। কাকাবাবু ভুল বকতে শুরু করেছেন। এক্ষুনি প্রকাশ সরকারকে ডাকা দরকার।

সে চলে গেল পাশের ঘরে। সে-ঘর ফাঁকা। প্রকাশ নেই। বাথরুমেও নেই। বাইরে উঁকি দিয়েও দেখা গেল না। সকালবেলা সে কোথায় চলে গেল ?

অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রকাশ সরকারকে।

৬

সন্তু এখন ঠিক কী করবে, তা প্রথমে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

এখন সে কি প্রকাশ সরকারকে ভাল করে খুঁজে দেখতে যাবে ? কিন্তু তা হলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? কাকাবাবুকে একা ফেলে রাখা যায় না।

প্রকাশ সরকার এত সকালে কোথায় গেল ? সন্তুকে কিছু না বলে সে সার্কিট হাউসের বাইরে চলে যাবে, এটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।

দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্তু একটুক্ষণ ভাবতে লাগল।

এই জায়গাটায় কারুকেই সে চেনে না। এখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছে প্রকাশ সরকার। সে যদি আর না ফেরে, তা হলে তো সন্তু মহা মুশকিলে পড়ে যাবে। কাকাবাবুর চিকিৎসার জন্য এক্ষুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কপালে হাত দিয়ে সন্তু নিজের ভুরু দুটো সোজা করল। ভুরু কুঁচকে থাকলে চলবে না। কেউ যেন বুঝতে না পারে সে ঘাবড়ে গেছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোক নজর রাখছে তার দিকে।

কিন্তু কারা শত্রুপক্ষ ?

প্রকাশ সরকার যদি সত্যিই আর না ফেরে, তা হলে এখানে সন্তু কতদিন থাকবে কাকাবাবুকে নিয়ে ? ফিরবেই বা কী করে ?

সন্তু একবার ভাবল, বাড়িতে বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে।

তারপরই ভাবল, এর আগে যতবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়েছে, কোনওবারই সে বাড়িতে কোনও বিপদের কথা জানায়নি। মা-বাবা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এবারে তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী ?

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "ব্রজেশ্বর ! সাহেব সিং !"

সন্তু ভেতরে এসে বলল, "কী কাকাবাবু ? কাকে ডাকছ ?"

কাকাবাবু গভীর মর্মভেদী দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে।

তারপর বললেন, "চেনা চেনা লাগছে! তোমার নাম কী খোকা ? তুমি কাদের বাড়ির ছেলে ?"

সন্তু বলল, "আমি তোমাদের বাড়ির ছেলে।"

"সত্যি করে বলো তো, অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ মানে কী ? অশ্বত্থামা নামে সত্যিই কি কোনও হাতি ছিল ? কই, আগে তো কোনওদিন ঐ নাম শুনিনি !"

সন্তু এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে তা বুঝতে পারল না। তার বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছে। কাকাবাবু তাকে চিনতে পারছেন না !

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "চুপ করে আছ কেন ? ঠিক করে বলো, কাচ্চু মিঞা কোথায় ?"

"কাচ্চু মিঞা কে ?"

"কাচ্চু মিঞা হল রাবণের ছোট ভাই। রাবণ ছিল লঙ্কার রাজা, আর কাচ্চু মিঞা গোলমরিচের ব্যবসা করে।"

"আমি কোনওদিন কাচ্চু মিঞার নাম শুনিনি।"

"কাচ্চু মিঞা জঙ্গলগড় থেকে পালিয়েছে। সে এখন লুকিয়ে আছে কোনও জায়গায়।"

"জঙ্গলগড় ? জঙ্গলগড় কোথায় ?"

কাকাবাবু শুক্‌নো গলায় হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ করে। তারপর বললেন, "অত সহজে কি জানা যায় ? তুমি কোন্ দলের স্পাই ?"

"কাকাবাবু, আমায় চিনতে পারছ না ? আমি সন্তু !"

"আমি সবাইকেই চিনি। আমি কুম্ভকর্ণকেও চিনি, আবার বেলগাছতলায় যে বসে থাকে, তাকেও চিনি।"

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়তেই সন্তু চোখ তুলে তাকাল।

খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লোক।

লোকটি বলল, "প্রকাশ সরকার কে আছে?"

সন্তু বলল, "আমাদের সঙ্গে এসেছেন। এখন এখানে নেই। কেন?"

লোকটি বলল, "এখানে নেই? ঠিক আছে!"

সন্তু বলল, "কেন? কে প্রকাশ সরকারকে খুঁজছে?"

"টেলিফোন আছে।"

সন্তু যেন হাতে স্বর্গ পেল। টেলিফোনে প্রকাশ সরকারকে এখানে কে ডাকবে? নিশ্চয়ই মিলিটারির লোক। কিংবা কলকাতার সেই মিঃ ভার্মা।

সন্তু বলল, "আমি টেলিফোন ধরছি। আপনি যান। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

সন্তু দেখল কাকাবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

কাকাবাবুকে এক মুহূর্তের জন্যও একা ফেলে রেখে যেতে চায় না সন্তু। কিন্তু টেলিফোনটাও ধরা দরকার।

টেবিলের ওপর তালা-চাবি পড়েছিল, সন্তু সেটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে তালা লাগিয়ে দিল। তারপর চাবিটা পকেটে ভরে সে দৌড় লাগাল অফিস-ঘরের দিকে।

ফোন তুলে সন্তু শুধু "হ্যালো" বলতেই একটি ভারী কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করল, "প্রকাশ সরকার? ইয়োর কোড নাম্বার প্লিজ।"

সন্তু বলল, "প্রকাশ সরকার এখানে নেই, কোথায় যেন গেছে। আমি—"

কট্ করে লাইনটা কেটে গেল।

সন্তু পাগলের মতন হ্যালো হ্যালো বলে চিৎকার করলেও আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

সন্তু দারুণ দমে গেল। আসল দরকারি কথাটাই বলা হল না। প্রকাশ সরকারকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা জানানো খুব দরকার ছিল। ওরা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করত।

হতাশভাবে সন্তু ফিরে এল আবার। চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে হল, উনি দারুণ রেগে গেছেন। কাকাবাবুকে ঘরে তালা বন্ধ করে যাওয়াটা উনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেননি। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী?

সকাল থেকে কাকাবাবুর চা-ও খাওয়া হয়নি। সন্তুরও খিদে পেয়েছে।

সে বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল বাজাল। বেয়ারা খাবার তো দিয়ে যাবে, কিন্তু তারপর পয়সা দেবে কে? কাকাবাবুর কাছে কি টাকাকড়ি আছে? সে না-হয় দেখা যাবে এখন।

বেয়ারা আসতে সন্তু তাকে দুটো ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। আর বলে দিল,

চা যেন খুব ভাল হয়। বাজে চা হলে ফেরত দেওয়া হবে।

কাকাবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, "কে ফোন করেছিল ?"

সন্তু বলল, "জানি না ! প্রকাশ সরকার নেই শুনেই লাইন কেটে দিল। আমার কোনও কথা শুনলই না। কোড্ নাম্বার জিজ্ঞেস করছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "কালো কোট না সাদা কোট ?"

"কোট না, কাকাবাবু, কোড নাম্বার।"

"নাম্বার, প্লাম্বার, স্লাম্বার, কিউকাম্বার..."

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাকাবাবুর কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনও আশাই নেই। প্রকাশ ডাক্তার যে এই সময় কোথায় গেল !

চুপ করে বসে রইল সন্তু। কাকাবাবু আপন মনে অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। সে-সব কোনও কথারই কোনও মানে নেই।

সন্তু ঠিক করে ফেলল, আজ বিকেলের মধ্যে যদি কোনও সাহায্য না আসে, তাহলে বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠাতেই হবে।

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল, সঙ্গে এল একজন বেশ সুন্দরী মহিলা। এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস।

মহিলাটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ, সন্তু ? ওমা, তুমি কত বড় হয়ে গেছ !"

মহিলাকে সন্তু চেনেই না। জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।

মহিলাটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, "কাকাবাবু কোথায় ? ও এই তো কাকাবাবু !"

ঝুঁকে পড়ে মহিলাটি কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিল। তারপর বলল, "আপনার শরীর এখন ভাল আছে নিশ্চয়ই ?"

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন মহিলাটিকে।

সে এবার সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "আমায় তুমি চিনতে পারোনি মনে হচ্ছে। আমার নাম ডলি। আমি তোমার মাসতুতো বোন হই। তুমি তোমার বেলি মাসিকে চেনো তো ? আমি তোমার সেই বেলি মাসির মেয়ে।"

সন্তু ডলি কিংবা বেলি মাসির নাম তো কোনওদিন শোনেই নি, এমন কী, আগরতলায় তার যে কোনও মাসি থাকে তাও সে জানে না !

ডলি বলল, "আমরা আগে শিলচর থাকতুম। এই তো গত মাসেই বাবা এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি জানলেন কী করে যে আমরা...মানে কাকাবাবু এখানে এসেছেন ?"

ডলি বলল, "বাঃ ! জানাটা এমন কী শক্ত ! আমার ভাই এয়ারপোর্টে কাজ করে। কাল রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে এসে সে বলল, কাকাবাবু আর সন্তুকে দেখলুম এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন থেকে নামতে। কাকাবাবুর মতন লোক

এখানে এলে সার্কিট হাউসেই উঠবেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। তারপর বলো, তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন? আর তোমার কুকুরটা?"

সন্তু ক্রমশই অবাক হচ্ছে। আর এই মাসতুতো দিদি তার কুকুরটার পর্যন্ত খবর রাখে, অথচ সে নিজে ওঁদের সম্পর্কে কিছুই জানে না? মা তো কোনওদিন এই বেলি মাসির কথা বলেননি।

ডলি বলল, "কাকাবাবু, আপনারা আগরতলায় এসে সার্কিট হাউসে থাকবেন, এর কোনও মানে হয় না। আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে। আমাদের মস্ত বড় কোয়ার্টার...মা বললেন, যা ডলি, যেমন করে পারিস কাকাবাবু আর সন্তুকে নিয়ে আয়।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু এখন নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না।"

ডলি বলল, "জানি, সে খবরও পেয়েছি। তুমি আর আমি ধরে-ধরে নিয়ে যাব। আমি একটা গাড়ি এনেছি সঙ্গে।"

সন্তু বলল, "আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া বারণ। এখানেই থাকতে হবে।"

ডলি বলল, "বারণ? কে বারণ করেছে?"

সন্তু বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন, তিনি এখন নেই। সেইজন্যই এখন অন্য কোথাও যাওয়া মুশকিল।"

ডলি বলল, "তাতে কী হয়েছে? এখানে আমাদের ঠিকানা রেখে যাব। তিনিও পরে যাবেন। নাও, খাবার ঠাণ্ডা করছ কেন, আগে খেয়ে নাও! কাকাবাবুকে খাইয়ে দিতে হবে তো? আমি দিচ্ছি।"

সন্তু দেখতে চাইল, ডলি নামের এই মেয়েটি খাইয়ে দেওয়ায় কাকাবাবু কোনও আপত্তি করবেন কি না।

কিন্তু কাকাবাবু একটুও আপত্তি করলেন না। লক্ষ্মীছেলের মতন সব খেয়ে নিতে লাগলেন।

খেতে-খেতে একবার মুখ তুলে ছেলেমানুষের মতন গলা করে বলে উঠলেন, "মাসির বাড়ি দারুণ মজা কিল-চড় নাই!"

৭

ডলি নামের মেয়েটি খুব যত্ন করে খাইয়ে দিল কাকাবাবুকে। তারপর মুখ ধুইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, "এবার চলুন, কাকাবাবু।"

সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "সন্তু, তুমি সব জিনিসপত্তর গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও।"

সন্তু পড়েছে মহা মুশকিলে। সে বুঝতে পারছে যে, এখন এই সার্কিট হাউস ছেড়ে অচেনা কোনও মাসির বাড়িতে যাওয়া তাদের উচিত নয়। চারদিকে যেন বিপদের গন্ধ। সার্কিট হাউসে তবু অনেক লোকজন আছে, পাহারা দেবার

ব্যবস্থা আছে। আর্মির লোকেরাও নিশ্চয়ই এখানে একবার খোঁজ-খবর নিতে আসবে। অথচ এই মহিলাটি এমন জোর করছে, যেন যেতেই হবে।

অবশ্য আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকাবাবু সন্তুর হাতে খেতে চান না। সন্তুর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। বোধহয় তিনি আর সন্তুকে চিনতেই পারছেন না। এই অবস্থায় কাকাবাবুর দেখাশুনো করা তো একা সন্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। আর একজন কারুর সাহায্য দরকার।

তবু সন্তু আমতা আমতা করে বলল, "এখন না গিয়ে বিকেলে গেলে হয় না ?"

ডলি বলল, "কেন, বিকেলে কেন ? এখন গাড়ি এনেছি, বিকেলে গাড়ি পাব না। তা ছাড়া মা তোমাদের জন্য ইলিশ আর গল্‌দা চিংড়ি আনতে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু যোগীপুরুষদের মতন হাত দুটো ওপর দিকে তুলে বললেন, "এই যে ! শিগ্‌গির !"

সন্তু ওই ভঙ্গিটার মানে বোঝে। কাকাবাবু গেঞ্জি পরে আছেন, এখন তিনি জামা পরতে চান। তাঁকে জামা পরিয়ে দিতে হয়। হাত উঁচু করতেও কাকাবাবুর কষ্ট হয়। ওইভাবে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

অর্থাৎ কাকাবাবু যেতে চাইছেন !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তু চটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ল, সার্কিট হাউস ছেড়ে গেলে এখানকার বিল মেটাবে কে ? সন্তুর কাছে মোটে দশ টাকা আছে। কাল রাত্তিরে প্রকাশ সরকার বলেছিল, কাকাবাবুর জন্য যা খরচপত্তর হবে সব ভারত সরকার দিয়ে দেবে। কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা করবার ভার প্রকাশ সরকারের ওপর। সেই প্রকাশ সরকারই তো নেই।

ডলি বলল, "চলো, চলো, আর দেরি করছ কেন ?"

সন্তু বলল, "আমাদের তো যাওয়া হবে না। সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে আমাদের বিল মেটাবে কে ?"

ডলি তক্ষুনি এ সমস্যার সমাধান করে দিল।

সে বলল, "তা হলে জিনিসপত্তর এখন নেবার দরকার নেই, সব এখানেই থাক। ঘরে তালা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি। পরে আমার বাবা এসে টাকাপয়সা দিয়ে বিল মিটিয়ে সব জিনিসপত্তর নিয়ে যাবেন।"

আর আপত্তি করা যায় না, এবার যেতেই হবে।

সন্তু আর ডলি কাকাবাবুর দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াল, কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধে হাত রাখলেন, সেইভাবে তিনজনে বার হল ঘর থেকে।

দরজায় তালা লাগাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল, কাকাবাবুর কাছে এমন কয়েকটা দরকারি জিনিস থাকে, যা তিনি কখনও হাতছাড়া করতে চান না।

তিনি যেখানেই যান, একটা কালো হ্যাণ্ডব্যাগ তাঁর সঙ্গে থাকে। এবারে কাকাবাবু সেই ব্যাগটা নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। ব্যাগটা নিয়ে যাওয়া উচিত, না এখানেই রেখে গেলে ভাল হয়, তা সন্তু বুঝতে পারল না।

তবু সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কালো ব্যাগটা—"

কাকাবাবু বললেন, "কার ব্যাগ ? কিসের ব্যাগ ? কেন ব্যাগ ? আমি ব্যাগ-ট্যাগের কথা কিছু জানি না।"

সন্তু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

হাঁটা শুরু করার পর কাকাবাবু ডলিকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা লক্ষ্মী, তুমি আগে আমাকে কতবার দেখেছ ?"

ডলি বলল, "অনেকবার। এই তো শেষবার দেখা হল, বছর চারেক আগে, আমরা পুজোর সময় কলকাতায় গিয়েছিলুম, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হল···আপনার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়, আপনি ব্যস্ত লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন মনে থাকবে না ? খুব মনে আছে। সেবার রাস্তায় খুব জল জমেছিল, তুমি জলে ভাসতে ভাসতে এসে থামলে আমাদের বাড়ির সামনে।"

ডলি একটু চমকে গিয়ে বলল, "জলে ভাসতে ভাসতে ? হ্যাঁ, রাস্তায় জল জমেছিল বটে, তবে হাঁটু পর্যন্ত। আমি তো জলে ভাসিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাসোনি ? বাঃ, বললেই হল ! তুমি একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে, একবার ভাসলে। একবার ডুবলে···"

কাকাবাবু ওই একই কথা বলে যেতে লাগলেন বারবার।

সার্কিট হাউসের ঘরগুলোর সামনে দিয়ে একটা লম্বা টানা বারান্দা। সেই বারান্দার অন্য দিক দিয়ে দু'জন লম্বামতন লোক জুতোর শব্দ করে হেঁটে আসছে এদিকে।

ডলি বলল, "চলো, সন্তু, আমরা উঠোন দিয়ে নেমে যাই। আমাদের গাড়িটা ওই দিকেই আছে।"

সন্তুর কেন যেন মনে হল, ওই লোক দুটি তাদের খোঁজেই আসছে। শত্রু, না মিত্র ? শত্রু হলেও এখন পালাবার কোনও উপায় নেই। সুতরাং দেখাই যাক না। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোক দুটি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন, "আপনিই তো মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু যদি কিছু উল্টো-পাল্টা বলেন এই ভয়ে সন্তু আগে থেকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই।"

প্রথমজন বলল, "নমস্কার। আমার নাম শিশির দত্তগুপ্ত। আমি এখানকার ডি এস পি। আর ইনি অরিজিৎ দেববর্মন, এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। কাল রাত্তিরে আমরা দিল্লি থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি

যে, আপনি এখানে এসেছেন। তাই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।"

কাকাবাবু লোক দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

শিশির দত্তগুপ্তর মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, বেশ বড় একটা গোঁফ আছে, সেটাও কোঁকড়া মনে হয়। আর অরিজিৎ দেববর্মনের মাথার ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোট্ট গোলমতন টাক। তাঁর গোঁফ নেই।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "ডঃ প্রকাশ সরকার কোথায়? তাঁরও তো আপনাদের সঙ্গে থাকবার কথা। আপনারা কি বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন?"

সন্তু বলল, "প্রকাশ সরকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তার মানে?"

সন্তু বলল, "সকালবেলায় উনি আমাদের কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন। এতক্ষণেও ফেরেননি!"

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! এ রকম তো হওয়া উচিত না। মিঃ রায়চৌধুরীকে ফেলে রেখে উনি চলে গেলেন? চলুন, ঘরে বসা যাক, পুরো ব্যাপারটা শুনি।"

ডলি কাকাবাবুর হাতটা নিজের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, "তা হলে আমি চলে যাই?"

শিশির দত্তগুপ্ত একদৃষ্টিতে ডলিকে দেখছিলেন, এবার ভুরু কুঁচকে বললেন, "তোমার নাম চামেলি না? তুমি এর মধ্যেই আবার কাজ শুরু করে দিয়েছ? আপনারা একে চেনেন? আগে দেখেছেন কখনও?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "মানে, ঠিক চিনি না, তবে ইনি বললেন, ইনি আমার এক মাসির মেয়ে··· মানে, মাসতুতো বোন, আমাদের যেতে বললেন ওঁর সঙ্গে···"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "মাসতুতো বোন?" তারপরই হেসে উঠলেন হা—হা করে।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু চামেলি ওরফে ডলির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "একবার ভাসলে, একবার ডুবলে!"

সঙ্গে সঙ্গে চামেলি ওরফে ডলি কেঁদে উঠল হাউহাউ করে।

কাকাবাবুকে ছেড়ে শিশির দত্তগুপ্তর একটা হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "স্যার, আমায় বাঁচান। আপনি আমায় বাঁচান। ওরা আমায় মেরে ফেলবে।"

শিশির দত্তগুপ্ত বাঁকাভাবে বললেন, "আবার নাটক করছ? তোমার অভিনয় আমি ঢের দেখেছি।"

চামেলি ওরফে ডলি বলল, "সত্যি বলছি, স্যার। আমি বাইরে বেরুলেই

ওরা মেরে ফেলবে আমায়। আপনি আমাকে বাঁচান।"

"ওরা মানে কারা ?"

"তাদের চিনি না। কয়েকজন গুণ্ডামতন লোক, তারা বলেছে, যদি কাজ উদ্ধার করতে না পারি, তা হলে তারা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।"

"কাজ মানে, কী কাজ ?"

"কাকাবাবুকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোনওরকমে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলেছিল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

"কোথায় গাড়ি ? কী রঙের গাড়ি ? কত নম্বর ?"

"নম্বর জানি না। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর।"

শিশির দত্তগুপ্ত তক্ষুনি পেছন ফিরে দৌড়ে চলে গেলেন গেটের দিকে।

চামেলি ওরফে ডলির কান্নাকাটি শুনে আরও কয়েকজন লোক ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি-সত্যি চোখের জলে চামেলির গাল ভেসে যাচ্ছে।

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "আপনাদের ঘর কোনটা ? চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক।"

সন্তু বলল, "আপনি একটু কাকাবাবুকে ধরুন, উনি নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না। আমি ঘরের তালা খুলছি।"

চামেলি তখনও ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছে। অরিজিৎ দেববর্মন কড়া গলায় বললেন, "কান্না থামাও ! তুমি রায়চৌধুরীকে অন্যদিকে ধরো।"

ওরা কাকাবাবুকে ধরে ধরে ফিরিয়ে আনতে লাগল। সন্তু যখন চাবি দিয়ে তালা খুলছে, সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল চামেলি। সে কাকাবাবুকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল অরিজিৎ দেববর্মনের গায়ে। টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই পড়ে গেলেন মাটিতে।

সন্তু অবাক হয়ে পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখে চামেলিকে তাড়া করতে যাচ্ছিল, অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "থাক, ছেড়ে দাও। বোকা মেয়ে, এইভাবে কেউ পালাতে পারে ! ঠিক ধরা পড়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চিংড়ি মাছের মালাইকারি, ইলিশ মাছে শর্ষে বাটা...ফসকে গেল, ফসকে গেল !"

৮

সন্তু ঘরের দরজা খুলে প্রথমে কাকাবাবুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। তারপর অরিজিৎ দেববর্মনকে বলল, "আপনি একটু এখানে থাকবেন, আমি একটু বাইরেটা দেখে আসব ?"

অরিজিৎ দেববর্মন বললেন, "ব্যস্ত হবার কিছু নেই। শিশিরবাবু ঠিক চামেলিকে ধরে নিয়ে আসবেন।"

সন্তু তবু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বলল, "উনি আমাদের কাছে ওঁর

নাম বলেছিলেন ডলি। বললেন যে, আমার মাসতুতো বোন, আমাদের বাড়িতে অনেকবার গেছেন।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "ওর যে কত নাম তার ঠিক নেই। ওর কাজই হল কলকাতা-আগরতলা প্লেনে উঠে অন্য যাত্রীদের হ্যান্ডব্যাগ চুরি করা। এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে!"

সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সে আগে কখনও কোনও মেয়ে-চোর দেখেনি। ডলি ওরফে চামেলির কথাবার্তাগুলো যেন তার প্রথম থেকেই কেমন অদ্ভুত লাগছিল, তা বলে ও যে চুরি করে, তা সে ধারণাই করতে পারেনি।

অরিজিৎবাবুর কথাই ঠিক হল। চামেলি ধরা পড়ে গেছে। সন্তু দেখল, শিশির দত্তগুপ্ত তার এক হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে আসছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে আসছে এক দঙ্গল লোক!

শিশিরবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বার পরেও লোকগুলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। শিশিরবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "এই যে ভাই, আপনারা সব যান তো! এখানে ভিড় করবেন না!"

সন্তু গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চামেলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নকল কান্না নয়, জলের ধারা গড়াচ্ছে তার দু'গাল বেয়ে।

শিশিরবাবু কড়া গলায় বললেন, "কান্না থামাও! হঠাৎ এরকম নাটক শুরু করে দিলে কেন? এখানে এসেছিলে কী মতলবে?"

কাঁদতে-কাঁদতে চামেলি বলল, "ওরা পাঠিয়েছিল। ওরা বলেছিল, এ কাজ ঠিকঠিক না করতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।"

"ওরা মানে কারা? তাদের নাম বলো।"

"নাম আমি জানি না। তাদের ভয়ংকর চেহারা, দেখলেই মনে হয় মানুষ খুন করতে পারে। তারা বলল, কাকাবাবুকে যে-কোনও উপায়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গাড়িতে নিয়ে এসো। নইলে তুমি প্রাণে বাঁচবে না!"

অরিজিৎবাবু বললেন, "ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম। প্রায় তো নিয়েই যাচ্ছিল মেয়েটা!"

শিশিরবাবু বললেন, "না, না, এ মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। আমি বাইরে গিয়ে কোনও কালো অ্যামবাসাডর দেখতে পাইনি। কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে খবর পাওয়ার পর আজ ভোর থেকেই আমি সার্কিট হাউসের বাইরে দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তারা বলল, অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে ওরকম কোনও কালো গাড়ি এখানে আসেনি। চামেলিকে তারা ঢুকতে দেখেছে, চামেলি এসেছে সাইকেল রিকশা করে।"

চামেলি তবু হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "না, স্যার, বিশ্বাস করুন,

আমি সত্যি কথা বলছি। কালো গাড়িটা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, একেবারে কাছে আসতে চায়নি।"

শিশিরবাবু বললেন, "কতটা দূরে গাড়িটা রেখেছিল ?"

"প্রায় আধমাইল।"

"এত দূরে তুমি মিঃ রায়চৌধুরীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে ?"

"না না, সাইকেল রিকশায়।"

শিশিরবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমায় কী বলেছিল ? সার্কিট হাউসের বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, না ?"

সন্তু আমতা-আমতা করে বলল, "হ্যাঁ,···মানে, সেইরকমই বলেছিলেন।"

কাকাবাবু ঘরে ঢোকার পর থেকেই চোখ বুজে আছেন। যেন তিনি কিছুই শুনছেন না ; এ-সব ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

চামেলি আবার বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই। ওরা আমায় ভয় দেখিয়ে সব করিয়েছে।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "কাজ হাঁসিল তো তুমি করতে পারোনি। তবু তুমি পালাবার চেষ্টা করলে কেন ? তোমার সেই "ওরা" না হয় তোমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল, তা বলে আমরা কি তোমায় খুন করতাম ?"

"কী জানি স্যার, আপনাদের দেখেই আমার মাথাটা হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে গেল।"

তারপর সে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি আমায় মাপ করুন। আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি···ছি ছি ছি ছি, আমি কী অন্যায় করেছি ! আমার মাথার ঠিক ছিল না···বলুন, কাকাবাবু, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন বলুন !"

সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা বলেই কেউ তাঁর পায়ে হাত দিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কী কারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেন না। নিশ্চয়ই কাকাবাবু এবার খুব রেগে উঠবেন।

কিন্তু কাকাবাবু চোখ মেলে খুব শান্তভাবে বললেন, "একে ছেড়ে দিন ! এই মেয়েটি এখানে রয়েছে কেন ?"

অরিজিৎবাবু ও শিশিরবাবু দু'জনেই চমকে উঠলেন।

শিশিরবাবু বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি একে ছেড়ে দিতে বলছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে, মেয়েটি এখন বাড়ি যাক্।"

শিশিরবাবু বললেন, "এই মেয়েটি দাগি আসামি। ওকে জেরা করলে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, কারা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, সে সম্পর্কে আপনার কোনও আইডিয়া আছে ? আগরতলায় আপনার কোনও শত্রু আছে ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার ?

হায়, হায়, হায়, হায় ! সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায় ! হায়, হায়, হায়, হায় !"

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। শিশিরবাবুর মুখখানা গোমড়া হয়ে গেল। অরিজিৎবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস। দিল্লি থেকে যা খবর এসেছে..."

কাকাবাবু বললেন, "রামনরেশ ইয়াদব কভি নেই দিল্লি গিয়া !"

সন্তু ফিসফিস করে শিশিরবাবুকে বলল, "শুনুন, আমার কাকাবাবুর মাথায় কীরকম যেন গোলমাল হয়ে গেছে। ওঁর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।"

শিশিরবাবু বললেন, "ইজ দ্যাট সো ?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, "এই খোকা, বড়দের সামনে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলতে নেই, জানো না ? ব্যাড ম্যানার্স ! যাও, তোমার দিদির সঙ্গে বাড়ি চলে যাও।"

সন্তুর যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে ! কাকাবাবু তাকে আর একদম চিনতে পারছেন না।

এমন কী, চামেলি পর্যন্ত কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে কাকাবাবুর দিকে।

অরিজিৎবাবু বললেন, "তা হলে তো এঁর এক্ষুনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ডক্টর প্রকাশ সরকারই বা কোথায় গেলেন ?"

শিশিরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি চামেলিকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে ওকে আপাতত আটকে রাখুক। মিঃ রায়চৌধুরীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কি এখানে সুবিধে হবে, না হাসপাতালে পাঠাবেন ?"

অরিজিৎবাবু বললেন, "এখানে নানা লোকের ভিড়। মহারাজার গেস্ট হাউস খালি আছে, আমি ভাবছিলাম মিঃ রায়চৌধুরীকে সেখানে রাখলে কেমন হয়। সেখানে চিকিৎসার কোনও অসুবিধে হবে না। একজন নার্স রেখে দিলেই হবে।"

চামেলি বলে উঠল, "আমায় নার্স রাখুন। আমি নার্সিং খুব ভাল জানি। আমি কাকাবাবুর সেবা করব !"

অরিজিৎবাবু বললেন, "এ মেয়ের আবদার তো কম নয়। একটু আগে এই মেয়েটা ভদ্রলোককে ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছিল, এখন আবার বলে কি না সেবা করব !"

চামেলি বলল, "একবার ভুল করেছি বলে বুঝি ক্ষমা করা যায় না ?" আমি কাছাকাছি থাকলে ওরা আর কাকাবাবুকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শিশিরবাবু বললেন, "এবার সত্যি করে বলো তো, ওরা মানে কারা ?"

"আপনি আমায় ঠিক বাঁচিয়ে দেবেন বলুন ? আমি ওদের মধ্যে একজনকে

চিনি। সে হচ্ছে জগদীপ!”

“জগদীপ!”

“হ্যাঁ, জগদীপই তো একটা রিভলভার আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল...”

“ওঃ, এই মেয়েটা কী অসহ্য মিথ্যেবাদী! জগদীপ গত ছ’মাস ধরে জেল খাটছে, আর সে কি না ওর কপালের সামনে রিভলভার তুলতে এসেছে?”

“হ্যাঁ, স্যার, সত্যি বলছি, জগদীপই আমায় ভয় দেখিয়েছে। জগদীপ জেল থেকে পালিয়ে গেছে, জানেন না?”

“একদম বাজে কথা!”

ঠিক তখনই ঠকঠক করে শব্দ হল দরজায়।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখল, একজন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠ লোক, সাদা ধুতি আর সাদা হাফশার্ট পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখলেই বোঝা যায় লোকটি পুলিশ। কেন যে এদের সাদা পোশাকের পুলিশ বলে, তা কে জানে। একবার তাকালেই তো পুলিশ বলে চেনা যায়।

লোকটি প্রথমে শিশিরবাবুর দিকে তাকিয়ে লম্বা স্যালুট দিল। তারপর অরিজিৎবাবুকে।

শিশিরবাবু ওকে দেখেই বললেন, “এই তো ভজনলাল! তুমি বলো তো, জগদীপ এখন কোথায়? সে জেলে আছে না?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ স্যার!”

“সে কি জেল ভেঙে পালিয়েছে এর মধ্যে?”

“না স্যার!”

শিশিরবাবু অন্যদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “দেখলেন, মেয়েটা কী রকম মিথ্যে কথা বলে?”

চামেলি একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, “তা হলে বোধহয় জগদীপ নয়। তা হলে বোধহয় ওর নাম রাজাধিপ।”

শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু দু’জনেই দারুণ চমকে উঠলেন এই নামটা শুনে।

অরিজিৎবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, “প্রিপস্টারাস! এ তো সাংঘাতিক মেয়ে।”

শিশিরবাবু বললেন, “একে আবার জেলে না দিয়ে উপায় নেই।”

বাইরের সাদা পোশাকের পুলিশটি এবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “স্যার!”

শিশিরবাবু বললেন, “ও! কী ব্যাপার, ভজনলাল?”

সেই লোকটি বলল, “স্যার, গেটের কাছে একটা সাইকেল রিকশা একজন লোককে নিয়ে এসেছে। লোকটা অজ্ঞান!”

শিশিরবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুও ছুটল গেটের দিকে।

৯

সন্তুর ধারণা হল বাইরে গিয়ে সে ডক্টর প্রকাশ সরকারকে দেখতে পাবে কারণ ভোর থেকে প্রকাশ সরকারের উধাও হয়ে যাবার সে কোনও যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না।

কিন্তু বাইরে এসে দেখল, একটা সাইকেল-রিক্শার ওপর একজন সম্পূর্ণ অচেনা লোক গা এলিয়ে শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটির গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ের চটিও বেশ দামি। কিন্তু লোকটির চেহারার সঙ্গে এই পোশাক যেন একেবারেই বেমানান। লোকটির গায়ের রং পোড়া-পোড়া, মুখে পাঁচ-ছ' দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো।

শিশির দত্তগুপ্ত আর অরিজিৎ দেববর্মনও লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

সাইকেল-রিক্শা-চালকটি হতভম্ব মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশিরবাবু প্রথমে শুয়ে-থাকা লোকটির হাত ও বুক পরীক্ষা করে দেখলেন যে সে বেঁচে আছে কি না। তারপর রিকশাচালককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, একে কোথায় পেলে?"

রিকশাচালক বলল, "বাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না। ফিসারি অফিসের ধার থেকে দুটি বাবু কাঁধ ধরাধরি করে উঠলেন। আমারে হেঁকে বললেন, 'সার্কিট হাউস চলো! খানিকবাদে আমি একবার পিছু ফিরে দেখি এক বাবু নেই। আর-এক বাবু এরকমধারা এলিয়ে পড়ে আছেন।"

"একজন মাঝপথ থেকে নেমে গেল, তুমি টেরও পেলে না?"

"না, বাবু! আমি তো আগে আর পেছুন ফিরে তাকাইনি!"

"কিন্তু গাড়ি তো হালকা হয়ে গেল। তা ছাড়া একজন লোক নেমে গেলে গাড়িতে একটা ঝাঁকুনিও তো লাগবে?"

"মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তা খারাপ ছিল, সেখানে এমনিতেই তো গাড়ি লাফাচ্ছিল!"

"যে-লোকটি নেমে গেছে, তাকে দেখতে কেমন মনে আছে?"

"জামা আর প্যাণ্টুলুন পরা এমনি সাধারণ ভদ্দরলোকের মতন!"

"আর এই লোকটি কি তখন নিজে থেকেই তোমার রিকশায় উঠেছিল?"

"অন্য বাবুটির কাঁধ ধরাধরি করে এল। আমি ভাবলুম বুঝি শরীর খারাপ।"

সন্তু বলল, "চামেলি এই লোকটিকে চেনে কি না একবার দেখলে হয়।"

শিশিরবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে, এই লোকটির সঙ্গে মিঃ রায়চৌধুরীর কেসের কোনও সম্বন্ধই নেই। এ হয়তো সার্কিট হাউসের অন্য ঘরে থাকে। যাই হোক, দেখা যাক।"

ধরাধরি করে লোকটিকে নিয়ে আসা হল সার্কিট হাউসের অফিস-ঘরে।

ম্যানেজার কিংবা দারোয়ানরা কেউই লোকটিকে চেনে না।

সন্তু গিয়ে চামেলিকে ডেকে আনল। অরিজিৎবাবু রইলেন কাকাবাবুর কাছে।

চামেলি লোকটিকে দেখে বলল, "ও মা, এ আবার কে ? একে তো কখনও দেখিনি।"

শিশিরবাবু সার্কিট হাউসের ম্যানেজারকে বললেন, লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। একজন পুলিশ সেখানে রেখে দিলেন লোকটিকে পাহারা দেবার জন্য।

কাকাবাবুর ঘরে ফিরে এসে সন্তু জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলল। তাদেরও সার্কিট হাউস ছেড়ে চলে যেতে হবে। শিশিরবাবু এখানকার মহারাজার একটি গেস্ট হাউসে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

চামেলি এই সময় বলল, "স্যার, আমি তা হলে এবারে যাই ?"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তুমি যাবে ? কোথায় যাবে ?"

"বাড়ি যাব। আমি আর এখানে থেকে কী করব ?"

"তোমার আবার আগরতলায় বাড়ি আছে নাকি ? আমি তো যতদূর জানি তোমার বাড়ি ধর্মনগরে।"

"না, মানে, এখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে।"

"তোমার বন্ধু কে, তার নামটা তো জানতে হচ্ছে। সে-ও নিশ্চয় তোমারই মতন।"

শিশিরবাবু বললেন, "একটু আগে তুমি বললে, তুমি কাজ হাসিল না করতে পারলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে। তারপর একটু বাদে বললে, তুমি আগের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাকাবাবুর সেবা করবে। আবার এখন বলছ বন্ধুর বাড়ি যাবে। তুমি দেখছি পাগল করে দেবে আমাদের !"

অরিজিৎবাবু বললেন, "তোমায় আর ছাড়া হবে না। জেলখানাই তোমার পক্ষে ভাল জায়গা।"

চামেলি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে, এইভাবে বলল, "না, না, আমায় আর জেলে পাঠাবেন না। আমার জেলের মধ্যে থাকতে একদম ভাল লাগে না !"

কাকাবাবু আগাগোড়া চুপ করে চোখ বুজে বসে আছেন। এসব কথা শুনছেন কি না কে জানে !

শিশিরবাবু এবার বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, উঠুন, এখন আমাদের যেতে হবে।"

সন্তু বলল, "ওকে ধরে-ধরে তুলতে হবে। উনি নিজে হাঁটতে পারেন না।"

শিশিরবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো ! চলো, তুমি আর আমি ওঁকে ধরে নিয়ে যাই।"

কাকাবাবু এবারেও কোনও কথা বললেন না, ওদের বাধাও দিলেন না।

সার্কিট হাউস ছেড়ে বাইরে যাবার সময় সন্তুর মনে পড়ল ডাক্তার প্রকাশ সরকারের কথা। ভদ্রলোক কোথায় যে গেলেন ? এর পর তিনি ফিরে এলেও সন্তুদের খুঁজে পাবেন কি না কে জানে !

শিশিরবাবু একটা স্টেশান ওয়াগান আনিয়েছিলেন। সেটার পেছন দিকে শুইয়ে দেওয়া হল কাকাবাবুকে। তারপর গাড়িটা ছেড়ে দিল।

ত্রিপুরার রাজাদের অনেকগুলো বাড়ি। তার মধ্যেই কয়েকটি বাড়িতে অতিথিশালা করা হয়েছে। সন্তুরা যে-বাড়িটাতে এসে পৌঁছল, সেটা দেখলে রাজার বাড়ি মনে হয় না। বাড়িটা এমনিতে বেশ সুন্দর, ছোট্টখাট্টো, দোতলা। সাদা রঙের। সামনে অনেকখানি বাগান। মনে হয় কোনও সাহেবের বাড়ি। হয়তো এক সময় কোনও সাহেবেরই ছিল।

সবাই মিলে উঠে এল ওপরে। দোতলায় মাত্র তিনখানা ঘর আর বেশ চওড়া বারান্দা। এর মধ্যে মাঝখানের ঘরটা সন্তুদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে।

অরিজিৎবাবু বললেন, "নীচে রান্নার লোক আছে, কেয়ারটেকার আছে, যখন যা চাইবে দেবে। তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সারাক্ষণ থাকবে। আর একজন ডাক্তারও এসে দেখে যাবেন একটু বাদে।"

শিশিরবাবু বললেন, "একতলার ঘরে দুজন পুলিশও থাকবে। অচেনা কোনও লোককে ওরা ওপরে আসতে দেবে না। তোমরাও কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা কোরো না। তোমার কাকাবাবুর এখন একদম চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকা উচিত।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এখানে টেলিফোন আছে ? হঠাৎ কোনও দরকার পড়লে খবর দেব কী করে ?

শিশিরবাবু বললেন, "হ্যাঁ। একতলায় টেলিফোন আছে। তাছাড়া কোনও দরকার হলে আমার পুলিশদের বোলো, ওরাই সব ব্যবস্থা করবে।"

অরিজিৎবাবু বললেন, "আমায় এক্ষুনি অফিসে যেতে হবে। দিল্লিতে সব খবর জানানো দরকার। সন্তু, কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে কোনও খবর পাঠাতে হবে ?"

একটু চিন্তা করে সন্তু বলল, "না, থাক।"

শিশিরবাবুরও কাজ আছে, তাকেও এখন যেতে হবে। দুজনেই 'আবার বিকেলে আসব', বলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বারান্দার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে কাকাবাবুকে। অনেকক্ষণ থেকে তিনি একেবারে চুপ করে আছেন। শিশিরবাবু আর অরিজিৎবাবু এর মধ্যে কাকাবাবুর সঙ্গে দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কাকাবাবু কোনও উত্তর দেননি। এখনও তিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে।

কাকাবাবুর বেশ কয়েক কাপ কফি খাওয়ার অভ্যেস সকালবেলা। আজ উনি মোটে এক কাপ চা খেয়েছেন। বেলা এখন প্রায় এগারোটা। সেইজন্য সন্তু কাকাবাবুর কাছে গিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কফি খাবে? আমাদের সঙ্গে কফি আছে, নীচের লোকদের বানিয়ে দিতে বলতে পারি।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মুখ ফেরালেন সন্তুর দিকে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "তুমি···তুই সন্তু না?"

সন্তু ব্যগ্রভাবে বলল, "হ্যাঁ, কাকাবাবু!"

"একবার মনে হচ্ছে সন্তু, আর একবার মনে হচ্ছে সিংমা। আমি কিছুই মনে রাখতে পারছি না রে। মাথার মধ্যে সব যেন কী-রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

এ-কথা শুনেও সন্তু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাল রাত্তির থেকে সে কাকাবাবুর মুখে এত স্বাভাবিক কথা আর শোনেনি।

সে বলল, "কাকাবাবু, তুমি কয়েকদিন একটু বিশ্রাম নাও, তা হলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমরা কোথায় এসেছি রে? এই জায়গাটা কোথায়?"

"এটা ত্রিপুরার আগরতলা।"

"আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানেই নিয়ে এল!"

"কেন কাকাবাবু? এখানে তোমার অসুবিধে হবে?"

"কী জানি! আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!"

কাকাবাবু আবার চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। সন্তু আর কফি খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না।

প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে সন্তু একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিল। তারপর ঘুরে দেখতে গেল সারা বাড়িটা।

অন্য দু খানা ঘরের মধ্যে একটা ঘরে তালা বন্ধ, অন্য ঘরটি খোলা। সেটার দরজা ঠেলে সন্তু দেখল, ঘরটি বেশ বড়, এক পাশে একটা খাওয়ার টেবিল আর অন্য পাশে কয়েকটা সোফা-কৌচ সাজানো। একটা বেশ বড় রেডিও রয়েছে সেখানে। সে-ঘরের দু' দিকের দেওয়ালে দুটো ছবি। একটা ত্রিপুরার আগেকার কোনও মহারাজার, আর একটা রবীন্দ্রনাথের।

তিনতলার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে সন্তু দেখল ছাদের দরজা তালাবন্ধ। সন্তু একটু নিরাশ হয়েই নেমে এল। যে-কোনও নতুন বাড়িতে গেলেই তার ছাদটা দেখতে ইচ্ছে করে।

সন্তু নেমে গেল একতলায়।

সিঁড়ির পাশের ঘরটার সামনেই টুল পেতে দুজন সাদা-পোশাকের ষণ্ডামার্কা পুলিশ বসে আছে। সন্তুকে দেখেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কী, কিছু লাগবে?"

সন্তু বলল, “না, বাগানটা একটু দেখতে এসেছি।”

বাগানটি বেশ যত্ন করে সাজানো। নিশ্চয়ই মালি আছে। গোলাপ আর জুঁই ফুলই বেশি। সন্তু কক্ষনো ফুল ছেঁড়ে না, ফুল গাছে থাকলেই তার দেখতে ভাল লাগে। সে মুখ নিচু করে এক-একটা ফুলের গন্ধ নিতে লাগল।

বাগানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সন্তু অনেক কথা চিন্তা করতে লাগল। সকাল থেকে কত ঘটনাই না ঘটে গেল!

একটা ব্যাপার সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। প্রথমে তাদের থাকবার কথা ছিল পুরী। তারপর হঠাৎ সেই প্ল্যান বদল করে তাকে আর কাকাবাবুকে নিয়ে যাওয়া হল গৌহাটিতে। সেখান থেকে আবার তাদের আনা হল এই আগরতলায়। এক রাত্তিরের মধ্যে এসব ঘটেছে। তবু আগরতলায় এত লোক তাদের কথা জানল কী করে? আর এখানে তাদের এত শত্রুই বা হল কেন?

সন্তু এই সব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল, হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। কী-রকম যেন স্প্রে করার মতন ফিঁস্‌স ফিঁস্‌স শব্দ। সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখল একটা সাপ ফণা তুলে আছে তার দিকে।

১০

সন্তু তো আর সাধারণ শহরের ছেলেদের মতন নয় যে, সাপ দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠবে! সে কত দুর্গম পাহাড় আর কত গভীর জঙ্গলে গেছে, সাপ-টাপ দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে আর একটু হলেই সে সাপটাকে মাড়িয়ে দিত। তা হলেই হয়েছিল আর কী!

সেবার আন্দামানে যাবার পথে কাকাবাবু সন্তুকে সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সন্তু জানে, যে সাপ ফণা তুলতে পারে, সে সাপের বিষ থাকে। তা হলেও বিষাক্ত সাপ চট করে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ তো আর সাপের খাদ্য নয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যায়।

কিন্তু এই সাপটা তো যাচ্ছে না। সন্তুর দিকেই ফণাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু একটু দুলছে। চিড়িক চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে তার লম্বা জিভটা। এবার সন্তুর গায়ে ঘাম দেখা গেল।

সাপটার দিকে চোখ রেখে সন্তু খুব সাবধানে আস্তে আস্তে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে লাগল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেই ছুঁড়ে মারল সাপটার গায়ে। সাপটা অমনি পাঞ্জাবিটার মধ্যে পাক খেতে-খেতে ছোবল মারতে লাগল বারবার।

সন্তু এই সুযোগে সরে গেল অনেকটা দূরে। এই কায়দাটাও কাকাবাবুর কাছ থেকে শেখা। ছোটখাটো লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে সাপ মারার চেষ্টা না করে গায়ের জামা ছুঁড়ে মারলে অনেক বেশি কাজ হয়। সাপটার যত রাগ পড়েছে ওই পাঞ্জাবিটার ওপরে, ওটার মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে বারবার।

সন্তুর ভাবভঙ্গি দেখে বারান্দায় বসে-থাকা পুলিশ দু'জনের কী যেন সন্দেহ হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, খোকাবাবু ?"

এই খোকাবাবু ডাকটা শুনলে সন্তুর গা জ্বলে যায়। আর ক'দিন বাদে সে কলেজে পড়তে যাবে ! এখনও সে খোকাবাবু !

যেন কিছুই না, একটা আরশোলা বা গুবরে পোকা, এইরকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে সন্তু বলল, "কুছ নেহি, একঠো সাপ হ্যায় !"

ত্রিপুরায় সবাই বাংলায় কথা বলে, তবু সন্তু হিন্দিতে কেন জবাব দিল কে জানে ! বোধহয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনিই হিন্দি এসে যায় !

"সাপ !" একজন পুলিশ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বাগানের মধ্যে নেমে এসে বলল, "কোথায় ?"

সন্তু আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবিটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ওই যে !"

এবারে পুলিশটি চমকে উঠে বলল, "বাপ রে ! সত্যিই তো সাপ ! লাঠি, লাঠি কোথায়। এই শিবু, লাঠি আনো !"

তখন অনেকে দৌড়ে এল।

সাপেরা এমনিতে কানে কিছুই শুনতে পায় না। কিন্তু লোকজন চলার সময় মাটিতে আর হাওয়ায় যে তরঙ্গ হয়, সেটা ঠিক শরীর দিয়ে টের পায়। এক সঙ্গে অনেক লোকের পায়ের ধুপধাপে সাপটা বুঝে গেল যে বিপদ আসছে। এবারে সে পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল পাশের একটা ঝোপে।

পুলিশ দু'জন আর রান্নার লোকটি সেই ঝোপটায় লাঠিপেটা করতে লাগল। সেই লাঠির চোটে আহত হল কয়েকটা ফুলগাছ, সাপের গায়ে লাগল না। সন্তু দেখতে পেয়েছে সাপটা একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে। সাপেরা কিন্তু বেশ বোকা হয়। গর্তের মধ্যে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় মুখটা, লেজের দিকটা অনেকক্ষণ বাইরে থাকে। যে-কেউ তো লেজটা ধরে টেনে তুলতে পারে।

পুলিশরা ফুলের ঝোপে তখনও লাঠি পিটিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হৈ-হৈ করে ছুটে এল বাগানের মালি। সাপের ব্যাপারটায় সে কোনও গুরুত্বই দিল না, ফুলগাছ নষ্ট হচ্ছে বলে সে খুব রাগারাগি করতে লাগল। ওটা নাকি বাস্তুসাপ, কারুকে কামড়ায় না।

সন্তু অবশ্য বাস্তুসাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। গায়ে পা পড়লেও সাপটা কামড়াত না ? তা কখনও হয় ! তাহলে তো জামার ওপর অত ছোবল মারল কেন ? আর তার বাগানে আসার শখ নেই।

মালি সন্তুর পাঞ্জাবিটা মাটি থেকে তুলতে যেতেই সন্তু বলল, "ছোঁবেন না, ওটা ছোঁবেন না, ওতে সাপের বিষ আছে !"

মালি কিন্তু বিষের কথা শুনেও ঘাবড়াল না। বলল, "আপনার জামা ? ও কিছু হবে না, একটু ধুয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তু অবশ্য আগেই ঠিক করে ফেলেছে যে, ও জামা সে আর গায়ে দেবে না। সাপের বিষ মাখা জামা কেউ গায় দেয় ? সে ওটা আর ছুঁয়েই দেখবে না।

মালি জামাটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই সন্তু বলল, "ওটা আমার চাই না।"

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল ওপরে। এতবড় একটা খবর কাকাবাবুকে না জানালে চলে !

কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তার উৎসাহ চুপসে গেল। কাকাবাবুর যেন এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই নেই।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, সাপ ! এই অ্যাত্ত বড় !"

ইচ্ছে করেই সন্তু সাপের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেখাল, কিন্তু কাকাবাবু শুকনো মুখে তাকিয়ে রইলেন। সন্তু আবার বলল, "ঠিক আমার পায়ের কাছে, আর একটু হলেই কামড়ে দিত !"

কাকাবাবু তবু কোনও কথা বললেন না। যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। মনে হল, কোনও কারণে কাকাবাবুর খুব মন খারাপ।

সন্তুরও মন খারাপ হয়ে গেল। সাপটা যদি তাকে কামড়ে দিত তা হলে কী হত ? সন্তু মরেও যেতে পারত। সাপে কামড়ালেই অবশ্য সব সময় মানুষ মরে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেরে যায়। কিন্তু হাসপাতাল-টাতাল সন্তুর খুব বিচ্ছিরি লাগে। সে মরে গেলে কিংবা হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কাকাবাবুর দেখাশুনো করত কে ? কাকাবাবুর মাথার একেবারেই ঠিক নেই !

সন্তু বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দেখল রিকশা করে একজন মহিলা এসে নামল গেটের কাছে। একটু বাদেই একজন পুলিশ সেই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওপরে।

সেই মহিলা একজন নার্স। দেববর্মনবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা মহিলার, কাজে বেশ পটু মনে হয়। সন্তু তাকে কাকাবাবুর অসুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিল। কাকাবাবুও বেশ শান্তভাবে মেনে নিলেন এই নার্সের ব্যবস্থা। সন্তু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে সন্তুর মনে হল, এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে নিয়ে এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল। কাকাবাবু যদি নিজেই কোনও নির্দেশ না দেন, কখন কী করতে হবে বলে না দেন, তা হলে আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। এবং কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবুর

চিকিৎসা করানো দরকার। বিকেলবেলা গভর্নমেণ্টের লোকেরা এলেই সন্তু এই কথা বলবে।

বিকেলবেলা ওঁরা আসবার আগেই আর একজন এলেন, যাঁকে দেখে সন্তু খুব খুশি হয়ে উঠল। এর নাম নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লির খুব বড় অফিসার, কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। নরেন্দ্র ভার্মা এসে গেছেন, আর সন্তুর কোনও চিন্তা নেই।

ভার্মাকে জিপ থেকে নামতে দেখেই সন্তু ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নীচে নেমে গেল। ভার্মা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন বলে বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন।

সন্তুকে দেখে ভার্মা বললেন, "আরে আরে সনটুবাবু, কেমুন আছ ? সব ভাল তো ?"

ভার্মা সন্তুকে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ভার্মা খুবই লম্বা মানুষ, নস্যি-রঙের সাফারি সুট পরে আছেন, তাঁর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ।

সন্তু অভিমান ভরা গলায় বলল, "না নরেনকাকা, এবারে কিছুই ভাল না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমি দুপুরে এসে পৌঁছেই সার্কিট হাউসে গেলাম তোমাদের ঢুঁড়তে। তোমাদের না পেয়ে ফোন করলাম দেববর্মনকে। তার কাছে শুনলাম কী এর মধ্যেই রায়চৌধুরীকে স্ন্যাচ্ করার অ্যাটেম্প্ট হয়ে গেছে। বড় তাজ্জব কথা। আগরতলায় আমিই তোমাদের পাঠাতে বলেছি, এখানকার কোনও লোকের তো জানবার কথা নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এত জায়গা থাকতে আমাদের এই আগরতলাতেই পাঠালেন কেন ?"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মা বললেন, "ত্রিপুরার কথা তোমার কাকাবাবু খুব বলাবলি করছিলেন তখন। মানে ত্রিপুরাতে উনি কী যেন একটা ধান্দা করেছিলেন। তাই আমরা ভাবলাম কী, উনি ত্রিপুরাতে হাজির হয়ে শরীরটা সারিয়ে নিন্ আর এখানে কিছু খোঁজখবরও নিন। একটা গুড্ নিউজ দিই সনটুবাবু তোমাকে, যে বদমাসটা তোমার কাকাবাবুকে গুলি করেছিল, সে ধরা পড়ে গেছে।"

"ধরা পড়েছে ? সে কী বলল ? কেন গুলি করেছিল ?"

"লোকটা গুংগা...মানে কী যেন বলে, হ্যাঁ, বোবা !"

"বোবা ? যাঃ !"

"তাতে কোনও অসুবিধা নেই। ওকে কে পাঠিয়েছিল সে কানেকশান আমরা ঠিক বার করে নিব।"

"নরেনকাকা, এখানে কাকাবাবুর কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এখন আমাদের কলকাতায় ফিরে গেলে ভাল হয় না ?"

"কলকাতার জন্য মন ছটফট করছে ? কেন, ঘুড়ি উড়াবার সিজ্‌ন বুঝি ? আচ্ছা রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখি !"

কাকাবাবু পিঠের নীচে দুটো বালিশ দিয়ে আধ-বসা হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই যে রাজা, কেমন আছ ? তবিয়ৎ তো বেশ ভালই দেখছি।"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "এ আবার কে ? এই লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা লোকটা কোথা থেকে এল ?"

ভার্মা যেন বুকে একটা ঘুঁষি খেয়ে থমকে গেলেন। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "রাজা, আমি নরেন্দ্র, আমায় চিনতে পারছ না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নরঃ নরৌঃ নরাঃ আর ফলম্‌ ফলে ফলানি ! আর একটা আছে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, গানের আমি কী জানি ! আসলে কিন্তু আমি সব জানি ! আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা হতভম্ব মুখে বললেন, "এটা কী ব্যাপার ! তুমি কী বলছ, রাজা।"

সন্তু ম্লান গলায় বলল, "কাকাবাবু কোনও কথা বুঝতে পারছে না। ওই গুলি খাওয়ার জন্য বোধহয় মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।"

"সর্বনাশ !"

কাকাবাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, "কী সর্বনাশ ? কেন সর্বনাশ ? কার সর্বনাশ ? তুমি সর্বনাশের কী বোঝো হে ছোকরা !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এ যে খুব খারাপ কেস।"

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওঁর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জাদুকরের ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমি হিপনোটিজম্‌ জানি। দেখি তাতে কোনও কাজ হয় কি না ! রাজা, আমার চোখের দিকে তাকাও ! এবার মনে করার চেষ্টা করো, তুমি কে ? মনে করো দিল্লির কথা...তুমি দিল্লিতে গত মাসে আমায় কী বলেছিলে...ডিফেন্স কলোনিতে আমার বাড়িতে...সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল..."

উনি এক পা এক পা করে এগিয়ে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু একবারও চোখের পলক না ফেলে একই রকম গলায় বললেন, "বাঃ বেশ নাচতে জানো দেখছি। এবার ধেইধেই করে নাচো তো ছোকরা !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য, কোনও কাজ হচ্ছে না কেন ? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, ঘর অন্ধকার করতে হবে। সনটু জানলা-দরোয়াজা বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু চলে গেল বাইরে। নরেন্দ্র ভার্মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

১১

প্রায় আধঘণ্টা বাদে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "নাঃ, কিচ্ছু হল না! মাথা একদম গড়বড় হয়ে গেছে। আমার কোনও কথাই বুঝতে পারছেন না।"

সন্তু উদ্‌গ্রীবভাবে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। সে বলল, "তা হলে এখন কী হবে?"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কোনও ডক্‌টর কি তোমার আংকেলকে দেখেছিলেন, সনটু?"

সন্তু বলল, "না, মানে, আমাদের সঙ্গেই তো একজন ডাক্তার এসেছিলেন কলকাতা থেকে। ডাক্তার প্রকাশ সরকার। কিন্তু তাঁকে আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "প্রকাশ সরকার···তাকে পাওয়া যাচ্ছে না? কেন?"

"ভোর থেকেই তাঁকে আর দেখতে পাইনি।"

"এসব কী কারবার চলছে এখানে? তবে তো আর এখানে থাকাই চলে না।"

"আমার মনে হচ্ছে এবার কলকাতা ফিরে যাওয়াই ভাল। ওখানে আমাদের চেনা ভাল ডাক্তার আছে।"

"তা ঠিকই বলেছ। লেকিন তোমার আংকেল ফিরে যাবেন কি এখানে থাকা পছন্দ করবেন, সেটা তো জানা যাচ্ছে না। উনি তো কোনও কথাই ঠিক ঠিক বুঝছেন না।"

"সে-কথা আমিও ভেবেছি, নরেনকাকা। কাকাবাবু কোনও ব্যাপারেই শেষ না দেখে কখনও ফিরে যেতে চান না। কিন্তু এখানে আর তো উপায় নেই। এবার আমাদের ডিফিট, মানে হার স্বীকার করতেই হবে।"

"ডিফিট? কিন্তু লড়াইটা কার সঙ্গে সনটুবাবু? সেটাই তো এখনও বোঝা গেল না। ঠিক আছে, এবার কলকাতাতেই চলে যাওয়া যাক। আজ রাত সাবধানে থাকো। কাল মর্নিং ফ্লাইটে কলকাতা ব্যাক করব। আমি এখন সার্কিট হাউসে ওয়াপস্ যাচ্ছি।"

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, আমি তবে এখন যাচ্ছি!"

কাকাবাবু হুংকার দিয়ে দিয়ে বললেন, "গেট আউট! যত সব রাস্‌কেল এসে গোলমাল করছে এখানে!"

নরেন্দ্র ভার্মার মুখখানা কালো হয়ে গেল। সন্তুরই খুব লজ্জা করতে লাগল কাকাবাবুর ব্যবহারে।

একটু পরেই নরেন্দ্র ভার্মা আবার হাসলেন। জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বললেন, "ইশ, এমন গুণী মানুষটা একেবারে বে-খেয়াল হয়ে গেছে! ভাল করে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। আমি চলি সন্টুবাবু!"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু আবার চিৎকার করে বললেন, "কফি! কেউ আমায় এক কাপ কফি খাওয়াতে পারে না?"

সন্তু দৌড়ে নীচে চলে গেল কফির অর্ডার দিতে।

কফি আনবার আগেই নার্সটি গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে কাকাবাবুর মুখ-টুখ মুছিয়ে দিয়েছেন আর জামাও পাল্টে দিয়েছেন।

কাকাবাবু কফি খাওয়ার সময় কোনও কথা বললেন না। শুধু মাঝে-মাঝে চোখ তুলে দেখতে লাগলেন সন্তুকে। সন্তুর খুব আশা হল কাকাবাবু তাকে কিছু বলবেন।

কিন্তু কফি খাওয়া শেষ করার পর কাকাবাবু নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি চামেলির দিদি?"

নার্স অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চামেলি? চামেলি কে? আমি তো তাকে চিনি না।"

কাকাবাবু তবু জোর দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তুমি চামেলির দিদি। তোমার নাম কী?"

নার্স বললেন, "আমার নাম সুনীতি দত্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "মোটেই তোমার নাম সুনীতি নয়। তোমার নাম পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগো রে, কেন বোন পারুল ডাকো রে? এবার বলো তো, আমি কে?"

নার্সটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সন্তুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "আমায় চিনতে পারলে না তো? সিংহের মামা আমি নরহরি দাস, পঞ্চাশটি বাঘ আমার এক এক গেরাস! হালুম!"

নার্স বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আমায় খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, কিন্তু আমার বয়েস চল্লিশ।

কাকাবাবু আর কিছু না বলে চোখ বুজলেন।

নার্সটি বাইরে চলে এসে সন্তুকেও হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

দু'জনে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াবার পর নার্স জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ভাই, তোমার কাকাবাবুর এই রকম অবস্থা কতদিন ধরে?"

সন্তু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "বেশি দিন নয়। কারা ওকে বাঘ-মারা গুলি মেরে পালিয়ে গেল—"

"বাঘ-মারা গুলি? বাঘ মারতে আলাদা গুলি লাগে বুঝি?"

"ভুল বলেছি, বাঘ-মারা গুলি নয়। বাঘকে ঘুম-পাড়ানো গুলি। তারপর থেকেই ওর গায়ের জোর সব চলে গেল, আর মাথাতেও গোলমাল দেখা দিল।"

"উনি কিচ্ছু মনে করতে পারেন না?"

"না। আমাকেই চিনতে পারছেন না!"

"উনি খুব নাম-করা লোক বুঝি? ওঁর জন্য এখানকার পুলিশ আর গভর্নমেন্টের বড় বড় অফিসাররা সব ব্যস্ত দেখছি।"

"হ্যাঁ উনি খুবই নাম-করা লোক।"

"আহা, এমন লোকের এই দশা! জানো না, এই রকম পাগলরা আর কোনওদিন ভাল হয় না।"

সন্তু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, "নিশ্চয়ই ভাল হয়। কলকাতায় অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে!"

নার্সটি সমবেদনার সুরে বলল, "আমি তো ভাই এরকম কেস অনেক দেখেছি, সেইজন্য বলছি। যারা চেনা মানুষ দেখলে চিনতে পারে না, তারা আর কখনও ভাল হয় না! দ্যাখো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে।"

সন্তুর আর নার্সের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল না। সে সেখান থেকে সরে গেল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আকাশটা লাল। সামনের বাগানটা সেই লাল আভায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সন্তুর আর বাগানে যাবার শখ নেই। বাস্তু সাপ হোক আর যাই হোক, অত বড় সাপের কাছাকাছি সে আর যেতে চায় না!

সন্ধেবেলা দেববর্মন এলেন খবর নিতে।

কাকাবাবু সেই একভাবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। সেইজন্য দেববর্মন আর ওঁকে বিরক্ত করলেন না। সন্তুর সঙ্গে একটুক্ষণ গল্প করার পর বললেন, "আমি তা হলে নরেন্দ্র ভার্মার কাছেই যাই। তোমরা যদি কাল চলে যাও, তা হলে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রাত্তিরটা তা হলে ঘুমিয়ে নাও ভাল করে। মর্নিং ফ্লাইটে গেলে খুব ভোরে উঠতে হবে। এই নার্স সারারাতই থাকবে এখানে।"

ন'টার মধ্যে রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। কাকাবাবু আর এর মধ্যে একটাও কথা বলেননি। সন্তু অনেকবার ভেবেছিল, কাল কলকাতায় ফিরে যাবার কথা কাকাবাবুকে জানাবে কি না। শেষ পর্যন্ত আর বলতে ভরসা পায়নি। কাকাবাবু হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, শুধু আবার উল্টোপাল্টা কথা শুনতে হবে। কাকাবাবুর মুখে ছেলেমানুষি কথা শুনতে সন্তুর একটুও ভাল লাগে না।

কিছুক্ষণ বারান্দার আলো জ্বেলে সন্তু ওডহাউসের লেখা 'আংকল ডিনামাইট' নামে একটা মজার বই পড়ার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু এই পরিবেশে সে মজার বইতে মন বসাতে পারছে না। এক সময় সে এসে শুয়ে পড়ল

কাকাবাবুর পাশের খাটে। নার্স বসে রইলেন চেয়ারে, ওই ভাবেই উনি সারারাত জেগে থাকবেন।

মাঝরাত্রে একটা চেঁচামেচির শব্দ শুনে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। সামনের বাগানে কে যেন কাঁদছে।

সন্তু মাথার কাছে টর্চ নিয়েই শুয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি সেই টর্চটা নিয়ে ছুটে গেল বারান্দায়। আলো ফেলে দেখল, একটা লোক কাঁপা কাঁপা গলায় বলছে, "বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!"

তক্ষুনি সন্তু বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী। একটা কোনও চোর এসে বাগানে লুকিয়ে ছিল। সে পড়েছে ওই বাস্তু সাপের পাল্লায়। চোর, না শত্রুপক্ষের কোনও লোক?

সাদা পোশাকের পুলিশ দু'জনও ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই। তাদের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে সাপটার কাছে।

এইবারে পুলিশ দু'জনের সাড়া পাওয়া গেল। সন্তুও নেমে গেল নীচে।

পুলিশ দু'জন টর্চের আলো ফেলে জিজ্ঞেস করছে, "কে? তুমি কে? বাগানে ঢুকেছ কেন?"

ভয়ে পুলিশ দু'জনও রাত্তিরে বাগানে ঢুকতে চাইছে না। সেই লোকটার গলা নেতিয়ে আসছে, বোধহয় এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

আলো ফেলে সন্তু দেখল, সাপটা ওই লোকটার একটা পা জড়িয়ে আছে। কিন্তু কামড়ায়নি। ফণাটা লকলক করছে বাইরে। বাস্তু সাপের গুণ আছে বলতে হবে।

দু'তিনটে টর্চের আলো পড়ায় সাপটা আস্তে আস্তে লোকটাকে ছেড়ে পাশের ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল। লোকটা টলতে টলতে ছুটে এল এদিকে।

একজন পুলিশ লোকটার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুই কে?"

কিন্তু লোকটা উত্তর দেবার অবসরও পেল না। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শব্দ করে একটা ট্রেকার ঢুকল গেট পেরিয়ে। গেট কী করে খোলা ছিল তা বোঝা গেল না।

সন্তু ভাবল, নিশ্চয়ই নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা দেববর্মনরা কেউ এসেছেন। জরুরি কোনও খবর দিতে।

ট্রেকারটা বাড়ির সামনে এসে যাবার আগেই তার থেকে টপাটপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের মুখে সরু মুখোশ আঁটা। তাতে তাদের চোখ দেখা যায় না। সবাইকেই এক-রকম দেখায়। একজনের হাতে একটা মেশিনগান, অন্য দু'জনের হাতে রিভলভার। পুলিশ দু'জনের বুকের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে ওদের দু'জন বলল, "মরতে যদি না চাস তো চুপ করে থাক্।"

সন্তু এরই মধ্যে তীরের মতন ছুটে উঠে গেল দোতলায়। কাকাবাবুর ঘরে

ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে হাঁফাতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল দুম দুম করে।

নার্সটি নিজেই খুলে দিল দরজার ছিটকিনি। তিনজন লোক এক সঙ্গে ঢুকে পড়ল, তাদের একজনের হাতে মেশিনগান। একজন সন্তুর মুখ চেপে ধরল। মেশিনগানধারী বলল, "চলুন মিঃ রায়চৌধুরী।"

গোলমালে কাকাবাবু জেগে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে বললেন, "রাত দুপুরে ভূতের উপদ্রব!"

আগন্তুকদের একজন বলল, "নার্স, তোমার পেশেন্টকে তৈরি করে নাও, এক্ষুনি যেতে হবে।"

নার্স বললেন, "সব তৈরিই আছে। আমি চট করে ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিচ্ছি।"

নার্স একটা সিরিঞ্জ বার করে কাকাবাবুর ডান হাতে একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া মাত্র তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল। সন্তুকেও অন্য লোকটি ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে এল বাইরে।

মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ট্রেকার গাড়িটি ওদের তুলে নিয়ে আবার স্টার্ট দিল।

১২

গাড়িটা গেস্ট হাউসের গেট ছাড়িয়ে বাইরে পড়বার পর লোকগুলো দুটো কালো কাপড় দিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুর চোখ বেঁধে দিল। কাকাবাবুর তো বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই নেই, সন্তুও বুঝল বাধা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।

নার্স সুনীতি দত্ত ওদের সঙ্গেই এসেছে আর লোকগুলোর সঙ্গে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে। এই নার্স তাহলে শত্রুপক্ষেরই লোক। কাকাবাবুর মাথার গোলমাল হলেও এটা তো ঠিকই বুঝেছিলেন। এই জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, এই নার্স হচ্ছে চামেলির দিদি।

সন্তু কাকাবাবুকে কোনওদিন গান গাইতে শোনেনি। কিন্তু এখন এই চলন্ত গাড়িতে কাকাবাবু গুনগুন করে গান ধরেছেন। মেশিনগান ও রিভলভারধারী কয়েকজন দস্যুর সঙ্গে যে তিনি বসে আছেন সে ব্যাপারে যেন তাঁর কোনও দুশ্চিন্তাই নেই। অথচ সন্তুর বুকের মধ্যে ধকধক করছে। কাকাবাবু যে গান গাইছেন, তার সুরও যেমন বে-সুরো, কথাগুলোও অদ্ভুত।

কাকাবাবু গাইছেন :
যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে।

ত্রিপুরায় যারা যায়
তারা খুব কাঁঠাল খায়।
ধর্মনগর উদয়পুর
কোন্‌দিকে আর কতদূর···

এই রকম আরও কী সব যেন কাকাবাবু একটানা গেয়ে যেতে লাগলেন, সন্তু সব কথা বুঝতে পারল না গাড়ির আওয়াজে। গাড়িটা যে খুব জোরে ছুটছে, তা বোঝা যায়। সন্তু মনে-মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল। ঘণ্টায় কত মাইল? ষাট? রাত্তিরবেলা রাস্তা ফাঁকা, আরও বেশিও হতে পারে।

এই রকম বিপদের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়? কাকাবাবু অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। সন্তুরও ঝিমুনি এসেছিল খানিকটা, হঠাৎ আবার ধড়ফড় করে উঠে বসল।

আর অমনি একজন কেউ তার মাথায় একটা চাপড় মেরে বলল, "চুপ করে বসে থাক্‌। অত ছটফটানি কিসের?"

অন্যান্যবারে সন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি বিপদের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু আগে সব সময়ই মনে হয়েছে, কাকাবাবু কিছু না কিছু একটা উপায় বার করবেনই। কিন্তু এবারে কাকাবাবুরই তো মাথার ঠিক নেই! এবারে আর উদ্ধার পাওয়া যাবে কী করে?

কাকাবাবুর মতন একজন অসুস্থ লোককে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এই লোকগুলো এত ব্যস্ত কেন, তাও সন্তু বুঝতে পারছে না। পুরনো কোনও শত্রুতা?

গাড়ির গতি কমে এল আস্তে আস্তে। তারপর থামল এক জায়গায়। সন্তুর চোখ বাঁধা। তাকে এখন কী করতে হবে সে জানে না।

একজন লোক সন্তুর হাত ধরে ট্রেকার থেকে নীচে নামল।

একজন কেউ হুকুমের সুরে বলল, "ছেলেটার চোখ খুলে দাও; কিন্তু হাত বেঁধে রাখো ওর। খেয়াল রেখো, ও কিন্তু মহা বিচ্ছু ছেলে!"

সন্তুর চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর সে দেখল অনেক গাছপালার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থেমেছে তাদের গাড়ি। সেই বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বামতন লোক, নস্যি রঙের সুট পরা, চোখে কালো চশমা। অন্ধ ছাড়া আর কেউ যে রাত্তিরে কালো চশমা পরে, তা সন্তু আগে জানত না।

একজন লোক কাকাবাবুর এক হাত ধরে নীচে নামাতে গেল। কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। বেশ জোরেই পড়েছেন, কারণ সন্তু ঠকাস করে ওঁর মাথা ঠুকে যাবার শব্দ পেল।

কালো-চশমা পরা লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "ইডিয়েট! সাবধানে! জানো না, ওর এক পায়ে চোট আছে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না!

একজন ওর মাথার কাছে রিভলভার ধরে থাকো, কখন যে কী করবে ঠিক নেই। ওকে সার্চ করেছ?"

দু'জন লোক কাকাবাবুকে সাবধানে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন বলল, "হ্যাঁ, সার্চ করে দেখেছি, কাছে কোনও ওয়েপন্ নেই।"

কাকাবাবুর গায়ে স্লিপিং সুট। খালি পা। আছাড় খাবার সময় নিশ্চয়ই খুব ব্যথা লেগেছে। কিন্তু তাঁর যেন সে বোধই নেই। তিনি আবার গুনগুন করে গান ধরলেন :

যদি যাও বঙ্গে
কপাল তোমার সঙ্গে
যারা যায় ত্রিপুরায়
যখন-তখন আছাড় খায়...।

লম্বা, কালো-চশমা পরা লোকটি বিস্ময়ে একটা শিস দিয়ে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, "গান গাইছ, অ্যাঁ? কী রায়চৌধুরী, নেশা-টেশা করেছ নাকি?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "পি লে, পি লে, হরিনাম কা পেয়ালা...ঠুন ঠুন ঠুন। মাতোয়ালা, মাতোয়ালা, হরিনাম কা পেয়ালা!"

লোকটি এক হাত বাড়িয়ে কাকাবাবুর থুতনি ধরে উঁচু করে বললেন, "ওসব নকশা ছাড়ো। কী রায়চৌধুরী, আমায় চিনতে পারো?"

কাকাবাবু একদৃষ্টে লোকটির মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "চেনা চেনা লাগছে। তুমি পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা না?"

লোকটি ঠাস করে এত জোরে চড় মারল কাকাবাবুর গালে যে, কাকাবাবুর মুখটা ঘুরে গেল। তারপর অন্য গালে ঠিক তত জোরে আবার একটা চড় মেরে লোকটা বলল, "এবার নেশা কেটেছে? এবার ভাল করে দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না?"

কাকাবাবু আবার লোকটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। সেই একই রকম গলায় বললেন, "হুঁ, আগের বারে ভুল হয়েছিল। তুমি আসলে রামগড়ুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে হাসব, না না না না!"

লোকটি আবার মারবার জন্য হাত তুলতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "মারবেন না, মারবেন না। উনি সাঙ্ঘাতিক অসুস্থ।"

সন্তু দারুণ চমকে উঠল। এ তো ডাক্তার প্রকাশ সরকারের গলা!

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে সন্তু তাকে দেখতে পেল না। বেশি খুঁজবারও সময় নেই। সন্তু আবার এদিকে তাকাল।

কালো-চশমা পরা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী অতি ধুরন্ধর! ওসব ভেক আমি জানি। ওর পেটের কথা আমি ঠিক বার করবই। দেখি ও

কত মার সহ্য করতে পারে।”

লোকটি আবার এক চড় কষাতে গেল কাকাবাবুকে। তার আগেই সন্তু ছুটে গিয়ে এক ঢুঁ মারল লোকটার পেটে। আচমকা আঘাত পেয়ে লোকটা তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'জন লোক এসে চেপে ধরল সন্তুকে। একজন তার কপালের ওপর রিভলভারের নল চেপে ধরল।

লম্বা লোকটি উঠে পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, “বলেছিলুম না, এটা একটা শয়তানের বাচ্ছা। ওর ব্যবস্থা আমি পরে করছি। আগে বুড়োটাকে টিট করি।”

কাকাবাবু এই সব কোনও ব্যাপারেই একটুও বিচলিত হননি। মুখে এখনও মৃদু-মৃদু হাসি। লম্বা লোকটি তাঁর মুখোমুখি হতেই তিনি বললেন, 'তা হলে কী ঠিক হল? তুমি পান্তভূতের ছানা, না রামগড়ুড়ের ছানা?”

লম্বা লোকটি অতি কষ্টে রাগ দমন করে বলল, “রায়চৌধুরী, তোমার সঙ্গে আমি এক তাঁবুতে কাটিয়েছি সাত দিন। তুমি আমায় চিনতে ঠিকই পারছ। তুমি ভালয় ভালয় জঙ্গলগড়ের সন্ধানটা দিয়ে দাও। তারপর তোমায় ছেড়ে দেব। নইলে এখান থেকে তোমার বেঁচে ফেরার কোনও আশাই নেই।”

কাকাবাবু বললেন, “জঙ্গলগড়? সে আবার কী? এর কথা তো সুকুমার রায় লিখে যাননি। জঙ্গলগড়ের বদলে তুমি চণ্ডিগড়ে যেতে চাও? কিংবা গড়মান্দারনপুর?”

লম্বা লোকটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে, এদের ওপরে নিয়ে চলো। হাত-পা বেঁধে রাখবে। তারপর আমি দেখছি।”

১৩

কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না জেনেও দু'জন লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। কাকাবাবুর খুবই ব্যথা লাগছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিছুই বলছেন না। সন্তুও যে কিছু করবে তার উপায় নেই। আর দু'জন লোক তার জামার কলার ও চুলের মুঠি ধরে আছে। তার নড়বার উপায় নেই।

মুখোশধারীরা দোতলায় একটা হলঘরে নিয়ে এল ওদের। হলঘরটায় একটি মাত্র চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। কাকাবাবুকে এনে বসিয়ে দেওয়া হল সেই চেয়ারে। হাত-বাঁধা অবস্থায় সন্তুকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হল তাঁর পায়ের কাছে।

বাকি লোকগুলো ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে শুধু টিমটিম করে একটা কম-পাওয়ারের আলো জ্বলছে। মনে হয়, এ বাড়িতে অন্য সময় কোনও মানুষজন থাকে না।

নস্যিরঙের সুট পরা লোকটি ঘরে ঢুকল সবার শেষে। হুকুমের সুরে বলল, "সরো! সরে যাও, সামনে থেকে!"

অমনি অন্যরা সরে গিয়ে সামনে জায়গা করে দিল।

লোকটি কাকাবাবুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল কোমরে দু'হাত দিয়ে। ঠিক সিনেমার ভিলেনের মতন। চোখ থেকে এখনও কালো চশমাটা খোলেনি। একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল, "রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমার সামনে ভড়ং করে থেকো না। তাতে কোনও লাভ হবে না। শোনো, তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। আমি যা চাই, তুমি যদি ভালয় ভালয়—"

কাকাবাবু মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, "ডাবের জল! আমি একটু ডাবের জল খাব!"

লম্বা লোকটি হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "ডাবের জল?"

পাশ থেকে তার এক অনুচর বলল, "এদিকে তো ডাব পাওয়া যায় না।"

লম্বা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "চুপ করো! ডাবের জল কেন, এখন কোনও জলই ওকে দেওয়া হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "জল দেবে না তাহলে জলপাই দাও? এখানে ডাব পাওয়া যায় না, কিন্তু জলপাই তো পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে একটু নুন দিও!"

লম্বা লোকটি ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। রাগে তার হাত কাঁপছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "তোমার সঙ্গে মশকরা করবার জন্য আমি রাতদুপুরে ধরে এনেছি? আমার কথার সোজাসুজি উত্তর দাও, আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। নইলে—"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কে বাপু? নইলে বলে থেমে রইলে? কালো চশমায় চক্ষু ঢাকা, গোঁফখানি তো ফড়িং-পাখা!"

লোকটি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর বাঁ হাতখানা তুলে তার তালুতে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল।

কাকাবাবুর হাত অসাড়, তাই তিনি কোনও ব্যথা পেলেন না, মুখে টুঁ শব্দও করলেন না। কিন্তু সন্তু ওই কাণ্ড দেখে শিউরে উঠল।

তখন মুখোশধারীদের পেছন থেকে ঠেলে সামনে এসে প্রকাশ সরকার বলল, "দেখুন, রাজকুমার, আমি একজন ডাক্তার। আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, ওঁর মাথায় সত্যিই গোলমাল হয়েছে। উনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। ওঁর ওপর অত্যাচার করে কোনও লাভ হবে না।"

"তাহলে তোমার মতে কী করা উচিত এখন?"

"এখন ওঁর চিকিৎসা করানো উচিত। পর পর কয়েকদিন টানা ঘুমোলে উনি একটু সুস্থ হতে পারেন।"

"সে সময় আমার নেই!"

"কিন্তু অত্যাচার করলে ফল খারাপ হবে।"

নার্স সুনীতি দত্ত বললেন, "দেখুন, আমিও তো আজ সারাদিন ধরে ওঁকে ওয়াচ করেছি। উনি সত্যিই এখন মানসিক রুগি। নিজের ভাইপোকেও চিনতে পারেন না। দিল্লি থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছিলেন, তাঁকেও কী সব গালমন্দ করলেন।"

লম্বা লোকটি আরও রেগে গিয়ে বলল, "মাথা খারাপ হয়েছে? বললেই হল? জানো, জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে? আর কোথাও নেই, আছে ওর মাথার মধ্যে! কর্নেল!"

মুখোশধারীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, "স্যার?"

"শোনো, যে-করেই হোক ওর কাছ থেকে কথা বার করতে হবে।"

যে-লোকটিকে কর্নেল বলে ডাকা হল, তার অবশ্য মিলিটারিদের মতন পোশাকও নয়, তার মিলিটারি গোঁফও নেই। এমনই সাধারণ চেহারার একটা লোক।

সে বলল, "স্যার, জঙ্গলগড় জায়গাটা আসলে কোথায়? আমরা তো এদিকে জঙ্গলগড় বলে কোনও কিছুর নাম শুনিনি।"

লম্বা লোকটি ভেংচি কেটে বলল, "সে-কথা আমি তোমায় বলে দি, আর তুমি তারপর আমার পেছন থেকে ছুরি মারো, তাই না? তখন নিজেই তার লোভে পাগল হয়ে উঠবে। শোনো, জঙ্গলগড়ের ভেতরের জিনিসের ওপর একমাত্র আমারই বংশগত অধিকার আছে। আর কারুর নেই। এই লোকটা বাগড়া না দিলে এতদিনে আমি সব-কিছু পেয়ে যেতাম।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "জঙ্গলগড় নয়, জঙ্গলগড় নয়, বোম্বাগড়! এতক্ষণে চিনলাম, তুমি হলে বোম্বাগড়ের রাজা। আর তুমি খাও আমসত্ত্ব ভাজা!"

লম্বা লোকটি ঝট করে কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আর তুমি কী খাও, তা মনে আছে? তুমি ছাগলের মতন কাগজ খাও! তুমি আমাদের ম্যাপটা খেয়ে ফেলেছিলে।"

কর্নেল নামের লোকটা বলল, "ম্যাপ খেয়ে ফেলেছিল?"

"হ্যাঁ। বলতে গেলে আমারই চোখের সামনে। অ্যাত্ত বড় একটা তুলোট কাগজের ম্যাপ। আমি সেটা গায়েব করার আগেই ও সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল। ম্যাপটা আগেই ও মুখস্থ করে ফেলেছিল। এখন ও ছাড়া আর কেউ সে পথের হদিস দিতে পারবে না।"

"হয়তো এই বুড়োটা সেই ম্যাপ আবার অন্য কোনও জায়গায় এঁকে রেখেছে।"

"না! ও অতি শয়তান। সে সুযোগ ও দেবার পাত্র নয়। ওরা আগরতলায় চলে আসবার পর আমার লোকেরা ওদের কলকাতার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে

দেখেছে। সেখানে কিছু নেই। দিল্লিতেও পাঠায়নি, সেখানেও আমাদের লোক রেখেছি। সুতরাং ম্যাপটা ওকে দিয়েই আঁকাতে হবে। কিংবা ও নিজেই যদি গাইড হয়ে আমাদের পথের সন্ধান দিতে রাজি হয়—"

তারপর সে কাকাবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কী রায়চৌধুরী, রাজি ?"

কাকাবাবু বললেন, "এক থালা শুপারি, গুনতে নারে ব্যাপারি, বলো তো কী ? কিংবা এইটা পারবে ? চক্ষু আছে মাথা নাই, রস খাব, পয়সা কোথা পাই ?"

কালো-চশমা হুংকার দিয়ে বলল, "কর্নেল ! তোমার ছুরিটা বার করো।"

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ফোল্ডিং ছুরি বার করল। তার স্প্রিং টিপতেই চকচকে ফলাটা বেরিয়ে এল।

কালো-চশমা বলল, "ওই ছুরি দিয়ে ওর বুক চিরে দাও, দেখি তাতে ওর মুখ খোলে কি না।"

কাকাবাবুর জামার বোতামগুলো খুলে বুকটা ফাঁক করে ফেলল কর্নেল। ছুরিটা খুব আস্তে আস্তে নিয়ে গিয়ে বুকে ঠেকাল।

সন্তু সেই সময় ছটফট করে উঠতেই লম্বা লোকটির ইশারায় দু'জনে গিয়ে চেপে ধরে রইল তাকে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করল, "কতটা ঢোকাব ছুরি ?"

"রক্ত বার করো !"

কর্নেল হালকাভাবে একটা টান দিতেই লম্বা রেখায় রক্ত ফুটে উঠল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবাক হয়ে দেখছেন এই সব কাণ্ড-কারখানা। তাঁর মুখে কোনওরকম যন্ত্রণার চিহ্নই নেই।

প্রকাশ সরকার আবার এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বলল, "আমি ডাক্তার, আমার কথাটা শুনুন। এভাবে কথা আদায় করা যাবে না। ওঁর মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

লম্বা লোকটি বলল, "হুঁ, তোমার যে দেখছি খুব দরদ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমিও থাকো এখানে। কী করে পাগল জব্দ করতে হয় আমি জানি। কর্নেল, উঠে এসো। এই তিনটেকে এখানেই আটকে রেখে দাও। এদের খাবার দেবে না, জল দেবে না, এমন কী ডাকলে সাড়াও দেবে না। শুধু বাইরে থেকে পাহারা দেবে। দেখি কতক্ষণ লাগে শিরদাঁড়া ভাঙতে !"

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একে একে। কালো-চশমা পরা লোকটা দরজার কাছ থেকেও ফিরে এল আবার।

কাকাবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে চরম বিদ্রূপের সুরে বলল, "রায়চৌধুরী, আমি বাজি ফেলতে পারি, তুমি চব্বিশ ঘণ্টাও তোমার জেদ বজায় রাখতে পারবে না। আর যদি সত্যিই তুমি পাগল হয়ে থাকো, তবে সেই দোষে এই

দু'জনও খিদেতেষ্টায় ছটফট করে মরবে ! আমার কোনও দয়ামায়া নেই।"

কাকাবাবুর নড়বড়ে অবশ হাত দুটি এবারে বিদ্যুতের মতন উঠে এল ওপরে ! তিনি বজ্রমুষ্টিতে লম্বা লোকটির গলা চেপে ধরে প্রকাশ সরকারকে বললেন, "শিগগির দরজাটা বন্ধ করে দাও ভেতর থেকে।"

১৪

কাকাবাবু বজ্রমুষ্টিতে গলা চেপে ধরায় লম্বা লোকটা দু'বার মাত্র আঁ আঁ শব্দ করল। একটা হাত কোটের পকেটে ভরে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করেও পারল না। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কাকাবাবু ওর অচৈতন্য দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে প্রকাশ সরকারকে বললেন, "বললুম যে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এসো ! এক্ষুনি ওর দলের লোকেরা ফিরে আসবে !"

প্রকাশ সরকার এতই অবাক হয়ে গেছে যে, নড়তেই পারছে না যেন। সন্তুরও সেই অবস্থা।

এবার প্রকাশ সরকার দৌড়ে গেল দরজা বন্ধ করতে। কাকাবাবু নিচু হয়ে সন্তুর হাতের বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন।

সন্তুর এমন অবস্থা যে, সে যেন কথাই বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলেই যেন তার ফুঁপিয়ে কান্না এসে যাবে। তার এত আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ সরকার দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে বলল, "স্যার, আপনি ভাল হয়ে গেছেন ? মিরাকুলাস ব্যাপার ! শুনেছি,সাড়ন শক্ পেলে এরকম হতে পারে !"

কাকাবাবু বললেন, "এই লোকটার কোটের পকেটে রিভলভার আছে। সেটা বার করে আমায় দাও !"

প্রকাশ সরকার বেশি তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এমনই উল্টোপাল্টা করতে লাগল যে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার কোটের পকেটই সে খুঁজে পেল না।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "শিগগির ! যে-কোনও মুহূর্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।"

শেষ পর্যন্ত প্রকাশ সরকার রিভলভারটা খুঁজে পেল। কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে তাতে গুলি ভরা আছে কি না চেক করে দেখলেন।

এবার সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আসলে তোমার কিছুই হয়নি, তাই না ?"

প্রকাশ সরকার বলল, "অভিনয় ? মানুষ এরকম অভিনয় করতে পারে ?"

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

প্রকাশ সরকার বলল, "সত্যিই স্যার, আপনার কিছু হয়নি ? আপনি আমাদের পর্যন্ত ঠকিয়েছেন ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি ইচ্ছে করে এরকম সেজেছিলে, নিশ্চয়ই কোনও

উদ্দেশ্য ছিল ?”

কাকাবাবু বললেন, “হাত দু'টো ক'দিনের জন্যে সত্যিই অসাড় হয়ে গিয়েছিল রে ! পরশু থেকে হঠাৎ আবার ঠিক হয়ে গেল, তখন ভাবলুম, কিছুদিন ওই রকম সেজে থাকা যাক।”

প্রকাশ সরকার জিজ্ঞেস করল, “আপনার মাথাতেও তাহলে কোনও গোলমাল হয়নি ?”

কাকাবাবু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “মাথাটায় খুব ব্যথা করত মাঝে মাঝে। এক এক সময় ভাবতুম, পাগলই হয়ে যাব নাকি ! তা সত্যি সত্যি কি আমি পাগল হয়েছি ? তোমাদের কী মনে হয় ?”

“স্যার, আপনার হাতের তালুতে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরল, তবু আপনি একটুও মুখ বিকৃত করলেন না। এটা কী করে সম্ভব ?”

কাকাবাবু বললেন, “ইচ্ছে করলে সবই পারা যায়।”

বাঁ হাতটা দেখলেন তিনি। সেখানে একটা বড় ফোস্‌কা পড়ে গেছে এর মধ্যেই।

এই সময় দরজায় দুম্‌দুম্‌ করে ধাক্কা পড়ল। বাইরে থেকে সেই ‘কর্নেল’ উত্তেজিতভাবে ডাকল, “রাজকুমার ! রাজকুমার।”

প্রকাশ সরকার বিবর্ণ মুখে বলল, “সাড়া না পেলে ওরা তো দরজা ভেঙে ফেলবে। ওদের দলে অনেক লোক !”

কাকাবাবু বললেন, “চিন্তার কিছু নেই। নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এক্ষুনি এসে পড়বে !”

সন্তু বলল, “নরেনকাকা ? তিনি কী করে জানবেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “তাকে বলা আছে, আমাকে ধরে নিয়ে আসার পর ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে যেন না আসে। এদের পালের গোদাটা কে, তা জানা দরকার। আধঘণ্টার মধ্যেই ভার্মা আসবে।”

প্রকাশ সরকার বলল, “কিন্তু, কিন্তু, আপনি এত বড় ঝুঁকি নিলেন ? এরা অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। আগেই যদি আপনাকে মেরে ফেলত ?”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমাকে ওরা মারবে কেন ? আমি মরে গেলেই তো ওদের দারুণ ক্ষতি ! জঙ্গলগড়ের চাবি কোথায় আছে জানো ? আর কোথাও নেই, আছে আমার মাথার মধ্যে। আমাকে মারলে ওদের এত কাণ্ড করা সব ব্যর্থ হয়ে যেত। জঙ্গলগড়ের সন্ধান আর কেউ পেত না !”

দরজায় আবার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “এই রাজকুমার কে ? ওকে তুমি আগে চিনতে ?”

কাকাবাবু বললেন, “রাজকুমার না ছাই ! এখানে এরকম গণ্ডায় গণ্ডায় রাজকুমার আছে। অনেক রাম-শ্যাম-যদুও নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ-ও ঠিক পালের গোদা নয়। আর একজন

কেউ আছে। আমারই ভুল হল, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলুম না।"

দরজায় দমাস-দমাস শব্দ হচ্ছে। ওরা কোনও ভারী জিনিস দিয়ে দরজায় আঘাত করছে। কিন্তু পুরনো আমলের শক্ত কাঠের উঁচু দরজা। ভাঙা সহজ নয়।

কাকাবাবু বললেন, "ওই লোকটাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

সন্তু আর প্রকাশ সরকার লোকটিকে ধরাধরি করে কাকাবাবুর পায়ের কাছে নিয়ে আসতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে তাঁর চুলের মুঠি ধরে অন্য-হাতের রিভলভারের ডগাটা তার ঘাড়ে ঠেকালেন। তারপর বললেন, "এই যে রাজকুমার, ঘুম ভেঙেছে?"

লোকটি হাত তুলে নিজের গলায় বুলোতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, নড়াচড়া একদম চলবে না। পট্ করে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। আমি দেখে নিয়েছি, ছ'খানা গুলি ভরা আছে।"

লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তা হলে তুমি পাগল হওনি! যাক, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু তুমি কি এরকমভাবে জিততে পারবে? আমার লোক এক্ষুনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আসুক না, তাতে কোনও চিন্তা নেই। শোনো, আমি সিগারেট খাই না। না হলে তোমার হাতে আমারও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া উচিত ছিল।"

প্রকাশ সরকার বলল, "স্যার, আমার কাছে সিগারেট আছে। ধরাব?"

লোকটি কটমট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার আমি সর্বনাশ করে দেব।"

প্রকাশ সরকার বলল, "আপনি যা খুশি করতে পারেন, আর আমি ভয় পাই না!"

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে কাচুমাচুভাবে বলল, "দেখুন, আমি কিন্তু ওদের দলের নই। সেদিন সকালবেলা আমার এক বন্ধুর নাম করে এদের লোক আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর এখানে ধরে নিয়ে আসে। আমার একটা গোপন ব্যাপার এরা জানে, সে-কথা বলে ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে। সব কথা আপনাকে আমি পরে খুলে বলব।"

দরজার খিলটা এবার মড়মড় করে খানিকটা ভেঙে গেল। এবার ওরা ভেতরে ঢুকে আসবে।

সন্তু বলল, "আমি আর প্রকাশদা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াব?"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও দরকার নেই। তোরা দুজনে বরং দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়া। হঠাৎ গুলি ছুঁড়লে তোদের গায়ে লাগতে পারে।"

দরজার খিল ভেঙে প্রথমেই এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে রিভলভার নিয়ে

ঢুকল 'কর্নেল', তারপর আরও চার-পাঁচজন লোক।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আর এক পা-ও এগিও না। তা হলে তোমাদের রাজকুমারের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। ওহে রাজকুমার, তোমার লোকদের বলো পিছিয়ে যেতে!"

রাজকুমার নামের লোকটি হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার গলা টিপে অজ্ঞান করে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছ বলেই জিততে পারবে? কর্নেল, এগিয়ে এসো!"

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান! আমি সত্যি গুলি করব। প্রথমে তোমাকে, তারপর ওদের!"

রাজকুমার অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "মিথ্যে ভয় দেখালেই আমি ভয় পাব? রাজা রায়চৌধুরীকে আমি ভাল করেই জানি, সে কখনও কোনও মানুষ খুন করতে পারবে না। তুমি আমায় কেমন মারতে পারো দেখি তো! কর্নেল, এ যদি আমায় মেরেও ফেলে, তবু তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের ধরে ফেলো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠিক তিন গুনব। তারপর..."

রাজকুমার বলল, "কর্নেল, ওর কথায় বিশ্বাস কোরো না! ও গুলি করে আমায় কিছুতেই মারবে না আমি জানি। তোমরা এগিয়ে এসো!"

১৫

সন্তুর বুকের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছে। এক্ষুনি একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। কাকাবাবু কি ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোককে সত্যিই গুলি করে মেরে ফেলতে পারবেন? কাকাবাবু যে ভয় দেখাচ্ছেন, তা কি ওই "কর্নেল" নামে লোকটা বিশ্বাস করবে?

একবার সে চট করে প্রকাশ সরকারের দিকে তাকাল। প্রকাশ সরকারও সন্তুর মতন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে একটু-একটু সরে যাবার চেষ্টা করছে পাশের বারান্দার দিকে। বারান্দার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে প্রকাশ সরকারের। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে সন্তুকে ইশারা করল এদিকে সরে আসবার জন্য।

কর্নেল আর তার পেছনে তিনজন লোক একটু ঝুঁকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন যে-কোনও সময় তারা বাঘের মতন কাকাবাবুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাজকুমারের ঘাড়ে রিভলভারের নলটা ঠুসে ধরে কাকাবাবু বললেন, "আমি শেষবার বলছি, আর এক পা-ও এগোবে না। আমি ঠিক তিন পর্যন্ত গুনব, তারপরই গুলি করব!"

রাজকুমার বলল, "ওর কথা গ্রাহ্য কোরো না কর্নেল। এগিয়ে এসে ওকে

ধরো !”

কাকাবাবু বললেন, “এক !”

কর্নেল তবু এক পা এগিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, “দুই।”

রাজকুমার বলল, “কর্নেল, তুমি শুধু-শুধু দেরি করছ কেন ? ভয় পাচ্ছ নাকি ? আমি তো বলছি, ভয় নেই !”

কাকাবাবু বললেন, “তোমরা আমায় চেনো না ! আমি কখনও স্বেচ্ছায় ধরা দিই না। আর আমার ওপর কেউ অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়ি না। রাজকুমার, তুমি আমার গালে চড় মেরেছ, আমার হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছ। এর শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। শাস্তি আমি নিজের হাতে দিতে চাই না, পুলিশের হাতে তোমায় তুলে দেব। তোমার ভালর জন্যই বলছি, এই লোকগুলোকে চলে যেতে বলো। ওরা যদি আর এগিয়ে আসে, তা হলে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে বাধ্য হব।”

এবার ‘কর্নেল’ বলল, “শুনুন মোশাই। আপনি তো অনেক কথা বললেন, এবারে আমি একটা কথা বলি। আপনি যদি বাই চান্স রাজকুমারকে গুলি করেন, তা হলে তারপর আপনাকে তো মারবই, এই বাচ্চা ছোঁড়াটাকে আর ডাক্তারটাকেও গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব ! আমি মোশাই এক কথার মানুষ। রাজকুমারকে আপনি ছেড়ে দিন। তা হলে আপনাদেরও আমি মারব না। কাটান-কুটিন হয়ে যাবে।”

কাকাবাবু বললেন, “আগে তোমরা সবাই ঘরের বাইরে চলে যাও—হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখো, তারপর— ।”

রাজকুমার চেঁচিয়ে উঠল, “খবর্দার, এর কথা বিশ্বাস করবে না। বলছি তো, এ লোকটা ফাঁকা আওয়াজ করছে। আমাকে মারবার হিম্মত ওর নেই ! এরা মিড্‌ল ক্লাস ভদ্দরলোক, এরা গুলি করে মানুষ মারতে পারে না। তোরা সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড় আমার ওপরে— ।”

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেছে।

রাজকুমার নিজেকে ছাড়াবার জন্য শরীর মোচড়াতেই কাকাবাবু এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলেন ‘কর্নেল’-এর পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা তুলে ঠেকালেন নিজের কপালে।

অন্যরা রাজকুমারকে ঝটপট তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। একজনের হাত থেকে একটা রিভলভার নিয়ে রাজকুমার এদিকে ফিরতেই দেখল কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

কাকাবাবু বললেন, “এবার ? অন্য লোককে গুলি করতে পারি না বটে, কিন্তু নিজেকে গুলি করতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না। আমাকে ধরবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। আর আমি যদি এখন মরে যাই তা হলে, রাজকুমার,

তোমার কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছ ? যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। সে তোমায় আর আস্ত রাখবে ? জঙ্গলগড়ের চাবি আছে আমার মাথার মধ্যে। তোমার হাতে ধরা দেবার আগে আমি আমার এই মাথাটাই উড়িয়ে দেব। জঙ্গলগড়ের চাবি চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে।

রাজকুমার ঝট করে মুখ ফিরিয়ে দেখল সন্তুকে।

কাকাবাবু বললেন, 'শোনো ! আমি মরলে তোমার কোনও লাভ নেই, ক্ষতিই বেশি। আমারও আপাতত মরবার ইচ্ছে নেই। সুতরাং, এসো, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। জঙ্গলগড়ের সন্ধান যদি আমি দিই, তা হলে তোমরা তার বদলে আমায় কত টাকা দেবে ?"

রাজকুমার বলল, "টাকা ? এর আগে তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।"

"উঁহুঃ ! অত কমে হবে না। তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

"আমায় কেউ পাঠায়নি ! কে পাঠাবে ? জঙ্গলগড়ের যা কিছু সবই আমার পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। এর ওপর সব দাবি আমার। যা কিছু বলার সব আমার সঙ্গেই বলতে হবে।"

"বেশ তো ! ঠাণ্ডা মাথায় অনেক কিছু আলোচনা করা দরকার। তোমার এখানে চা কিংবা কফির কিছু ব্যবস্থা নেই ? এখন সন্তু আর প্রকাশকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দাও। ওরা বিশ্রাম নিক।"

রাজকুমার এবারে হা-হা করে হেসে উঠল। যেন কয়েক টুকরো হাসি সে ছুঁড়ে দিল কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি নিজেকে খুব চালাক ভাবো, তাই না ? আর আমরা সব বোকা, কিছু বুঝি না ?"

লম্বা হাত বাড়িয়ে সে সন্তুর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় টেনে আনল নিজের কাছে। তারপর সন্তুর ডান দিকের কানের ফুটোর মধ্যে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল। "নাউ হোয়াট ? তুমি নিজে মরতে ভয় পাও না জানি, কিন্তু তোমার ভাইপোকে যদি মেরে ফেলি ? এই জন্যই তুমি ওকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিতে চাইছিলে !"

কাকাবাবু বললেন, "আর, এসব নাটকের কী দরকার ? বললুম তো তোমার সঙ্গে আমি আলোচনায় বসতে রাজি আছি। আমি কত কষ্ট করে জঙ্গলগড়ের সন্ধান বার করেছি, সে জন্য কিছু পাব না ?"

রাজকুমার বলল, "তোমায় কিছু দেব না। তুমি আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছ ! এবারে তুমি এক্ষুনি জঙ্গলগড়ের সব সন্ধান দিয়ে দাও, নইলে এ ছেলেটাকে এক্ষুনি শেষ করব !"

এর মধ্যে টকাং করে একটা শব্দ হল। প্রকাশ সরকার এই সব কথাবার্তার সুযোগে বারান্দার দরজার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছে।

কিছু একটা করবার জন্য 'কর্নেল'-এর হাত নিশপিশ করছিল। এবারে সে লাফিয়ে গিয়ে তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল প্রকাশ সরকারের মাথায়। প্রকাশ সরকার একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে ঢলে পড়ে গেল।

সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজকুমার। এমন একটা ভাব করল যেন কিছুই হয়নি।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এবার চটপট বলে ফেল। শোনো রায়চৌধুরী, আমরা রাজপরিবারের লোক। দরকার হলে দু-চারটে লোক মেরে ফেলতে আমাদের একটুও ভুরু কাঁপে না।"

সন্তু বলল, "আপনি আমায় মেরে ফেললেও কাকাবাবু কোনও অন্যায় মেনে নেবেন না!"

রাজকুমার বলল, "চোপ্!"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে তুমি মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছ, রাজকুমার। তোমাদের এত সব চেষ্টাই পণ্ডশ্রম। জঙ্গলগড়ে আসলে কিছুই নেই। হয়তো কিছু ছিল এক সময় ঠিকই, কিন্তু আগেই কেউ তা সাফ করে নিয়ে গেছে!"

"সেটা আমরা বুঝব কিছু আছে কি নেই। আমরা সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখতে চাই!"

"ওকে ছেড়ে না দিলে আমি কিছুই বলব না!"

"বলবে না? তবে দ্যাখো, আমি প্রথমে এক গুলিতে এর পা খোঁড়া করে দিচ্ছি। তারপর এক এক করে..."

এমন সময় একটা লোক দৌড়ে এসে বলল, রাজকুমার! রাজকুমার! এক দল লোক আসছে এদিকে। বোধহয় মিলিটারি!"

অমনি 'কর্নেল' আর অন্যরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

রাজকুমার জিজ্ঞেস করল, "কটা গাড়ি?"

লোকটি বলল, গাড়ি নেই, দৌড়ে দৌড়ে আসছে!"

রাজকুমার কাকাবাবুর দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "মিলিটারি এলেও তুমি নিস্তার পাবে না রায়চৌধুরী। আমরা তোমার ভাইপোকে নিয়ে চললুম। যদি একে প্রাণে বাঁচাতে চাও, তাহলে আমাদের কাছে তোমাকে নিজে থেকেই আসতে হবে। কর্নেল ওকে কভার করে থাকো!"

সন্তুকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রাজকুমার। কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না। অসহায়ভাবে বসে রইলেন।

১৬

হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন প্রকাশ সরকারের কাছে। মাথার এক জায়গা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, প্রকাশ সরকার অজ্ঞান। কাকাবাবু

পরে আছেন রাত-পোশাক, সঙ্গে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই। ফ্যাঁস করে তিনি নিজের জামাটা ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর সেটা দিয়ে খুব শক্ত করে বাঁধলেন ওর মাথাটা। নাকের কাছে হাত নিয়ে নিশ্বাসটা অনুভব করে দেখলেন। এখন আর কিছু করার নেই তার।

লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এলেন কাকাবাবু। রাগে-দুঃখে তাঁর মুখটা অদ্ভুত হয়ে গেছে। তাঁর হাতে রিভলভার, অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে চলে গেল!

এবারে বাড়ির বাইরে শোনা গেল ভারী ভারী জুতোর শব্দ। কারা যেন ছুটে ছুটে আসছে।

সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "আর ইউ সেইফ, রায়চৌধুরী? নো হার্ম ডান?"

কাকাবাবু একেবারে ফেটে পড়লেন।

"অপদার্থ! ওয়ার্থলেস! তোমাদের সামান্য সেন্‌স অফ রেসপনসিবিলিটি নেই!"

"আরে শুনো, শুনো। পহ্‌লে তো শুনো!"

"কী শুনব, আমার মাথা আর মুণ্ডু? যা হবার তা তো হয়েই গেছে! তোমাদের আরও আধঘণ্টা আগে আসবার কথা ছিল—"

"গাড়ির অ্যাকসিলেটরের তার কেটে গেল যে! এমন বেওকুফ, সঙ্গে একটা এক্‌স্ট্রা তার পর্যন্ত রাখে না। ব্যস, গাড়ি বন্ধ!"

"গাড়ি বন্ধ? সি আর পি'র গাড়ি খারাপ? এমন গাড়ি রাখে কেন?"

"বাইরে তো দেখতে নতুন, ভিতরে একদম্ ঝরঝরে। নদীর ধারে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, সেখান থেকে আমরা ডাবল্ মার্চ করে চলে এলাম!"

"আর এসে লাভটা কী হল? ওরা সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে!"

"কোন দিকে গেল?"

"এখন তুমি দৌড়ে দৌড়ে ওদের পেছনে তাড়া করবে? ওদের সঙ্গে ভাল গাড়ি আছে। শোনো, এই লোকটি আহত হয়েছে, ওর এক্ষুনি চিকিৎসা করা দরকার।"

প্রকাশ সরকারের জ্ঞান ফিরে এসেছে এর মধ্যে। আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "কী হল? সবাই পালিয়ে গেল?"

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওরা সন্তুকে নিয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস লোক ওরা, সন্তু ওদের কাছে একটু চালাকি করতে গেলেই মহাবিপদ হবে। ওদের মায়াদয়া নেই।"

নরেন্দ্র ভার্মা খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু রাজা। তোমার হাতে রিভলভার, তবু ঐ লোকগুলো সন্তুকে ধরে নিল কী করে? তুমি রেজিস্ট করলে না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কী করব ? লোকগুলোকে গুলি করে মারব ! আজ খুব একটা শিক্ষা হল। সাধারণ গুণ্ডা—বদমাসরা অনায়াসে মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। আমরা কি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারি ?"

"ওদের কাছেও আর্মস ছিল ?"

"এটাও তো ওদেরই। আমি এটা কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারী, তাই কোনও লাভ হল না। আমি কথা দিয়ে ওদের ভুলিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করলাম, খালি ভাবছি তোমরা এসে পড়বে, আর তোমাদের পাত্তাই নেই !"

"গাড়িটা যে এমন বিট্রে করবে, তা কী করে বুঝব বলো ! আই অ্যাম ভেরি সরি ! ওদের সর্দার কে ? চিনতে পারলে ?"

"সে সব কথা পরে হবে ! এখন এখান থেকে যাব কী করে ? পায়ে হেঁটে ?"

"এক জনকে ফেরত পাঠিয়েছি। আর একটা গাড়ি নিয়ে আসবে।"

"সে গাড়ি আসতে আসতে রাত ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি হাঁটব কী করে ? আমার ক্রাচ্ নেই। তোমাকে ক্রাচ্ আনতে বলেছিলাম, এনেছ ?"

"সেও তো গাড়িতে রয়ে গেছে !"

"বাঃ !"

"রাজা, আর দিমাগ্ খারাপ কোরো না। কোনও উপায় তো নেই। একটু ঠাণ্ডা মাথা করে বোসো !"

এমন সময় নীচে থেকে উঠে এলেন দেববর্মন। কাকাবাবুকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের যা ব্যবস্থার ধাক্কা, তাতে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ব মনে হচ্ছে।"

"আপনার মাথার গোলমাল...মানে...সেটা সত্যি নয় ? একবারও বুঝতে পারিনি !"

"আমার আবার মাথার গোলমাল শুরু হবে এক্ষুনি। সন্তুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে ! আপনারা ওই ছেলেটাকে চেনেন না, ওর দারুণ সাহস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এখানে বেশি সাহস দেখাতে গেলে কী যে হবে ঠিক নেই। ওদের মধ্যে "কর্নেল" বলে একটা লোক আছে, সে দারুণ গোঁয়ার। ওই দেখুন না, প্রকাশ সরকারের মাথা কী রকম জখম করে দিয়েছে।"

দেববর্মন বললেন, "কর্নেল ? একজন তো কর্নেল আছে, নামকরা ক্রিমিনাল। জেল ভেঙে পালিয়েছে।"

"আর রাজকুমার বলে কারুকে চেনেন ?"

"দেখুন, আমাদের এখানে অনেকেই রাজকুমার। আমি নিজেই তো অন্তত

কুড়িজন রাজকুমারকে চিনি।”

নরেন্দ্র ভার্মা চেয়ারটা নিয়ে এসে কাকাবাবুর কাছে রেখে বললেন, “রাজা, তুমি এখানে বোসো। আর কতক্ষণ এক ঠ্যাংকা উপার খাড়া হয়ে থাকবে?”

কাকাবাবু বললেন, “একটা গাড়ি। একটা গাড়ির জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল।”

দেববর্মন বললেন, “আমাদের আর একটু তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল। দুটো গাড়ি আনলে কোনও গণ্ডগোল ছিল না। ওদের সঙ্গে দুটো গাড়ি ছিল। চাকার দাগ দেখে বুঝতে পারছি। ওরা ডান দিকে গেছে। জঙ্গলের দিকে।”

কাকাবাবু বললেন, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগরতলায় ফিরে যাওয়া দরকার। কাল সকালেই একটা মিটিং ডাকতে হবে।”

এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। নরেন্দ্র ভার্মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, “ওই তো আমাদের গাড়ি এসে গেল বোধ হয়!”

দেববর্মন বললেন, “আমাদের গাড়ি? এত তাড়াতাড়ি কী করে আসবে? একজন লোক আগরতলায় যাবে আবার ফিরে আসবে, এত কম টাইমে তো হবার কথা নয়?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তা হলে কি ওরাই আবার ফিরে আসছে? ওদের দলে কত লোক আছে?”

নরেন্দ্র ভার্মা তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

১৭

একটা গাড়ি এসে থামল বাড়িটার সামনে। তার থেকে নামলেন পুলিশের কর্তা শিশির দত্তগুপ্ত।

নরেন্দ্র ভার্মা দোতলার সিঁড়ির কাছে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শিশির দত্তগুপ্তকে দেখে বললেন, “আমাদেরই লোক! কী আশ্চর্য, আপনি?”

টকটক করে জুতোর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে শিশিরবাবু বললেন, “আপনাদের গাড়ি মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে আছে দেখলাম! আপনারা ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন? ওরা ধরা পড়েছে তো?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “না, আমরা বহুত দেরি করে ফেলেছি। সব ব্যাটারা ভেগেছে। সন্তুকে পাকাড়কে লিয়ে গেছে। কিন্তু আপনার তো শরীর খুব খারাপ। একশো পাঁচ ফিভার হয়েছে শুনলাম!”

দেববর্মন বললেন, “আপনার স্ত্রী বললেন, আপনার ম্যালেরিয়া হয়েছে—”

শিশিরবাবু বললেন, “হ্যাঁ, আমার হাই ফিভার হয়েছিল, তাই আপনাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। কিন্তু থাকতে পারলাম না। এখনও জ্বর আছে, যাক গে, সে এমন কিছু নয়, এখানে কী হল বলুন!”

কাকাবাবু দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "সেসব কথা পরে হবে। এখানে একজন ইনজিওরড হয়ে আছে, আগে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।"

শিশির দত্তগুপ্তও কাকাবাবুকে সুস্থ মানুষের মতন কথা বলতে শুনে নরেন্দ্র ভার্মার মতন খুব অবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি তা হলে—"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এখন সুস্থ হয়ে গেছি। চলুন, আগরতলায় ফেরা যাক্।"

প্রকাশ সরকার এগিয়ে এসে বললেন, "আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার ইনজুরি মারাত্মক কিছু না।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে আর থাকবার কোনও দরকার নেই।"

কাকাবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করলেন।

শিশিরবাবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, "আমি ধরছি। আপনি আমার কাঁধে ভর দিন।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও দরকার নেই। আমার অসুবিধে হচ্ছে না।"

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ভাইপোকে ধরে নিয়ে গেল? ওরা কতজন এসেছিল বলুন তো?"

"পাঁচ-ছ'জন হবে। তার মধ্যে একজনের নাম রাজকুমার, বেশ লম্বা, মজবুত স্বাস্থ্য, নস্যিরঙের সুট পরা। আর একজনকে ওরা কর্নেল বলে ডাকছিল।"

"কর্নেল? ওর চেহারাটা কী রকম বলুন তো? মুখখানা বুলডগের মতন?"

"তা খানিকটা মিল আছে বটে। নাকটা থ্যাবড়া। মনে হয় নাকের ওপর দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেছে!"

"সে তো একজন সাঙ্ঘাতিক খুনি! টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। কিন্তু···কিন্তু··· ওই রকম একজন ভাড়াটে খুনি আপনাকে মারতে আসবে কেন? আপনার ওপর কার এত রাগ থাকতে পারে?"

"কার রাগ আছে, তা আমি জানি না। তবে মনে হচ্ছে, কারুর কারুর কাছে আমি খুব দামি হয়ে গেছি। যে-কোনও উপায়ে তারা আমার মাথাটা চায়।"

"আপনার মাথা?"

"হ্যাঁ। কাটা মুণ্ডু নয়। জ্যান্ত মাথা। কেন জানেন? আমি কিছুদিন আগে ত্রিপুরায় এসে এক জায়গায় একটা খুব পুরনো মুদ্রা খুঁজে পেয়েছিলাম। রাজা মুকুট-মাণিক্যের মুদ্রা, তাতে একটা ঈগল পাখির ছবি আঁকা। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রায় সিংহের মূর্তি থাকত, শুধু ওই একজনের মুদ্রাতেই ঈগলের ছবি ছিল। সেই জন্যই ওই মুদ্রা খুব দুর্লভ আর দামি।"

"হ্যাঁ, এ-রকম একটা মুদ্রা আবিষ্কারের কথা কাগজে বেরিয়েছিল বটে।

আপনিই সেই লোক ? আপনি আগে ত্রিপুরায় এসেছিলেন ?"

"অনেকবার। তবে বে-সরকারিভাবে। সেইজন্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি কি ত্রিপুরার লোক ?"

"আমাদের পূর্বপুরুষরা ত্রিপুরাতেই ছিলেন বটে, তবে আমার জন্ম কুমিল্লায়। সেইখানেই পড়াশুনো করেছি।"

"অমরমাণিক্যের গুপ্তধন ? সে তো একটা গুজব ! সে-রকম কিছু আবার আছে নাকি ?"

"আছে কি না তা আমিও জানি না। না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে কারুর কারুর বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমি অমরমাণিক্যের জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনে ফেলেছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গুপ্তধন, মানে হিড্‌ন ট্রেজার ? এই যুগে ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !"

শিশিরবাবুও হেসে বললেন, "আমারও ধারণা, এসব একেবারে বাজে কথা। ওই গুপ্তধনের গুজব এখানে অনেকদিন ধরেই চালু আছে ! এ-সম্পর্কে দেববর্মন ভাল বলতে পারবেন।"

দেববর্মন বললেন, "রাজা অমরমাণিক্য সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে, গান আছে। তাঁর ওই গুপ্তধনের কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করে। এখনও কেউ কেউ ওই গুপ্তধনের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।"

প্রকাশ সরকার বললেন, "ত্রিপুরায় আমার মামার বাড়ি। ছোটবেলায় আমিও এই গুজবের কথা শুনেছি।"

কথা বলতে বলতে বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন ওঁরা। শিশিরবাবুর জিপগাড়িটার হেডলাইন দুটো জ্বালানো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকার চিরে সেই আলোর রেখা চলে গেছে অনেক দূরে।

দেববর্মন শিশিরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ড্রাইভার কোথায় ?"

শিশিরবাবু বললেন, "ড্রাইভার আনিনি। আমার অসুখ বলে আমার ড্রাইভার রাত্রে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি নিজেই চালিয়ে নিয়ে এলাম।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত হাই ফিভার নিয়ে, এই রাত্তিরে জঙ্গলের রাস্তায় একা একা এলেন, না, না, এটা আপনার বিলকুল অন্যায় হয়েছে।"

শিশিরবাবু বললেন, "কী করব ! মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেছে শুনে বিছানায় ছটফট করছিলাম। আমারই এরিয়ার মধ্যে এইরকম কাণ্ড। তাই আর থাকতে পারলাম না।"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে দৃঢ় স্বরে শিশিরবাবু বললেন, "আপনার ভাইপোকে আমি কালকের মধ্যেই খুঁজে বার করব। ত্রিপুরা ছোট জায়গা। যাবে কোথায় !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই কোঠিটা কার ? জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম ফাঁকা

কোঠি পড়ে আছে ?"

দেববর্মন বললেন, "সেটা জানা শক্ত হবে না। সকালেই বার করে ফেলব। তবে ত্রিপুরায় এ-রকম বাড়ি অনেক পাবেন। রাজপরিবারের লোকরা জঙ্গলের মধ্যে এ-রকম বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন অনেক জায়গায়।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে গাড়িতে উঠতে একটু সাহায্য করতে হবে।"

নরেন্দ্র ভার্মা আর দেববর্মন দু'দিক থেকে ধরে কাকাবাবুকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

সবাই গাড়িতে ওঠবার পর স্টার্ট দিলেন শিশিরবাবু।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি ত্রিপুরার হিস্ট্রি ঠিক জানি না। এই রাজা অমরমাণিক কোন্ টাইমের ? ইনি কোথায় গুপ্তধন রেখেছিলেন ?"

দেববর্মন বললেন, "অমরমাণিক নয়, অমরমাণিক্য। ত্রিপুরায় সব রাজাদের নামই মাণিক্য দিয়ে হত। এমন কী অন্য কোনও লোক রাজাকে মেরে রাজা হয়ে বসলেও তিনি কিছু-একটা মাণিক্য হয়ে যেতেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, রাজা, এই অমরমাণিক্যের হিস্ট্রিটা আমায় একটু শোনাবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ নয়, কাল। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই। সারা রাত জেগে থাকলে কাল সকালে আর কিছু চিন্তা করতে পারব না !"

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কী জানি সন্তুকে নিয়ে ওরা কী করছে !"

১৮

চায়ে চুমুক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "গুপ্তধনে আমার আগ্রহ নেই। এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও কোথাও হঠাৎ গুপ্তধন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সে সবই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি হওয়া উচিত। আমি ত্রিপুরায় কয়েকবার এসেছি মুদ্রার খোঁজে। আপনারা সবাই জানেন, ইতিহাস চর্চার জন্য প্রাচীন কালের মুদ্রার দাম। এই দাম মানে বাজারের দাম নয়। ইতিহাসের দাম। ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজা রত্নমাণিক্যের আগেকার কোনও রাজার নামের কয়েন পাওয়া যায়নি। আমি খুঁজছিলাম তাঁর আগেকার কোনও রাজার, অর্থাৎ ফিফটিন্থ সেনচুরির আগেকার কোনও রাজার কয়েন উদ্ধার করতে।"

কাকাবাবুর ঘরে সকালবেলাতেই এসে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর শিশির দত্তগুপ্ত। শিশিরবাবুর চোখ লাল, গায়ে এখনও জ্বর আছে, তবু তিনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেননি।

শিশিরবাবু বললেন, "কিন্তু আপনি যে ঈগল আঁকা মুদ্রা খুঁজে পেয়েছেন। সেটা কোন্ সময়কার ?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক ঈগল কি না বলা যায় না। তবে ওই রকমই একটা

পাখি আঁকা। সেটা মুকুটমাণিক্য নামে এক রাজার সময়কার। তাঁর মুদ্রায় সিংহের বদলে ঈগল পাখির ছবি, সেটা একটা রহস্য। অবশ্য সেই সময় ত্রিপুরার ইতিহাসে খুব খুনোখুনির পালা চলেছিল। প্রায়ই একজন রাজাকে তার সেনাপতি খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসত। আবার আগেকার সেই রাজার কোনও ভাই বা ছেলে সেই সেনাপতিকে খুন করে সিংহাসন ফিরিয়ে আনত। ঈগল পাখি আঁকা মুদ্রা ছাড়া আমি আরও কয়েকটা মুদ্রাও পেয়েছি। সেগুলো কোন্ সময়কার তা এখনও জানা যায়নি। যাই হোক, আমার ওই মুদ্রা আবিষ্কারের কথা খবরের কাগজে ছাপা হয়ে যায়। যদিও এ কথা প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেই খবর পড়েই কাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অমরমাণিক্যের গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে গেছি।"

শিশিরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মুদ্রা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "পেয়েছিলাম জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে। লোকে সেটাকেই জঙ্গলগড় বলে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন। "অমরমাণিক্যের গুপ্ত্ধনের কাহানিটা কী আমি একটু শুনতে চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে একটু আগে থেকে শুরু করি। দিল্লিতে যখন আকবর বাদশা রাজত্ব করছেন, তখন ত্রিপুরায় রাজা ছিলেন বিজয়মাণিক্য। তাঁর ছেলের নাম অনন্তমাণিক্য। রাজা বিজয়মাণিক্য তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি গোপীপ্রসাদের মেয়ে রত্নাবতীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিশ্বাসী সেনাপতিটি কিন্তু চমৎকার বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন। অনন্তমাণিক্য রাজা হবার দু' বছরের মধ্যে গোপীপ্রসাদ তাঁকে খুন করে নিজে রাজা হয়ে বসল।"

শিশিরবাবু বললেন, "সেনাপতিকে আপনি দোষ দিতে পারেন না! জোর যার সিংহাসন তার, এই ছিল তখনকার নিয়ম।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে নিজের জামাইকে খুন করে, নিজের মেয়েকে বিধবা করে রাজা হওয়াটাকে ভাল বলব? বলুন?"

শিশিরবাবু আর কিছু না বলে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, "এই গোপীপ্রসাদ রাজা হয়েই নাম নিয়ে নিল উদয়মাণিক্য। তার রাজধানী রাঙামাটির নাম বদলে দিয়ে নিজের নামে নাম রাখল উদয়পুর। এই উদয়মাণিক্য আর তার রানি হিরা দাপটে রাজত্ব করতে লাগল কিছুদিন। কিন্তু বেশিদিন সুখ ভোগ করতে পারল না। কোনও একটি মেয়ে ওই রাজা উদয়মাণিক্যকে বিষ খাইয়ে দেয়। অনেকে বলে তার বিধবা মেয়েই নাকি বাবাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। তখন রাজা হল উদয়মাণিক্যের ছেলে জয়মাণিক্য!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে রয়াল থ্রোন সেনাপতিদের ফ্যামিলিতেই চলে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আগেকার রাজা বিজয়মাণিক্যের এক ভাই ছিলেন অমরমাণিক্য নামে। গোপীপ্রসাদের অত্যাচারে তিনি রাজবাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। জয়মাণিক্য রাজা হবার পর সেই অমরমাণিক্য এসে চ্যালেঞ্জ জানালেন তাকে। লড়াইতে তিনি জয়মাণিক্যকে পরাজিত ও নিহত করলেন। আবার সিংহাসন এসে গেল রাজপরিবারে। এই অমরমাণিক্য ছিলেন সেকালের ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "লেকিন রাজা হয়ে তিনি গুপ্তধন রাখবেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, সে কথা বলছি। রাজা অমরমাণিক্য অনেকদিন গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন, প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যেও সুখ সইল না বেশি দিন।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "আবার সেনাপতি এসে মারল তাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, তা নয়। অমরমাণিক্য সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সেনাপতিকে তিনি বেশি বিশ্বাস করতেন না, তাকে বেশি ক্ষমতাও দেননি। কিন্তু তার ফলও ভাল হয়নি। হঠাৎ আরাকানের রাজা সিকান্দার শাহ্ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল ত্রিপুরা। অমরমাণিক্য এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর সৈন্যবাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না তখন। তিনি যুদ্ধে হারতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত আরাকানের মগ সৈন্যরা যখন এসে পড়ল রাজধানী উদয়পুরের দোরগোড়ায়, তখন অমরমাণিক্য ধরা না দিয়ে পালিয়ে গেলেন সপরিবারে। মগ সৈন্য এসে উদয়পুরে লুঠতরাজ করে একেবারে তছনছ করে দিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এবার বললেন, "তারপর? তারপর? রাজা ধরা পড়ে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "না। রাজা অমরমাণিক্য লুকিয়ে রইলেন তিতাইয়ার জঙ্গলে। সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরও গিয়েছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে চারদিকে দেয়াল গেঁথে একটা ছোট দুর্গের মতনও বানিয়ে ফেললেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ওহি হ্যায় জঙ্গলগড়?"

"লোকে তাই বলে। এখন আর গড়ের চিহ্ন বিশেষ নেই, কয়েকটা দেয়াল আর দু'একটা ভাঙা ঘর মাত্র রয়েছে। আরাকান রাজার সৈন্যরা ওদের সন্ধান পায়নি, কিন্তু রাজা অমরমাণিক্য হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেললেন।"

শিশির দত্তগুপ্ত মুখ তুলে বললেন, "রাজা কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা করে বসলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি এই ইতিহাস জানেন দেখছি!"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "এই ঘটনা সবাই জানে। রাজা অমরমাণিক্য বিষ খেয়েছিলেন। ত্রিপুরার আর কোনও রাজা এরকম কাপুরুষের মতন আত্মহত্যা

করেননি।”

কাকাবাবু বললেন, “এটা ঠিক কাপুরুষতা বলা যায় না। রাজা অমরমাণিক্যের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল খুব বেশি। তিনি তো দুর্বল রাজা ছিলেন না। নিজের ক্ষমতায় সিংহাসন দখল করেছিলেন। আরাকান রাজার কাছে হেরে গিয়ে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, এই অপমান তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই হঠাৎ একদিন আত্মহত্যা করলেন।”

“ওঁর ধনসম্পদ সব ওই জঙ্গলগড়েই রয়ে গেল ?”

“অনেকে তাই বিশ্বাস করে। রাজধানী থেকে পালিয়ে আসবার সময় তিনি নিশ্চয়ই অনেক ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। সেসব গেল কোথায় ? অমরমাণিক্য হঠাৎ মারা যান, তাঁর ধনসম্পদ কোথায় লুকনো আছে, সে কথা কারুকে বলে যাননি। সেই থেকেই গুপ্তধনের গুজবের জন্ম। এই গুপ্তধনের দাবিদার শুধু রাজপরিবার নয়। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের বংশধররাও মনে করে সেই গুপ্তধনে তাদেরও ভাগ আছে। এই নিয়ে দুই পরিবারে মারামারিও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই কিছু খুঁজে পায়নি।”

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, “আভি তো কই রাজাও নেই, সেনাপতিও নেই। এখন আর কে লড়ালড়ি করবে ?”

কাকাবাবু বললেন, “রাজা নেই, সেনাপতি নেই বটে, কিন্তু তাদের বংশধররা আছেন। সেই সব বংশের অনেক শাখা-প্রশাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কার মনের ভাব কী তা কে জানে ? যে লোকটি কাল রাতে নিজেকে রাজকুমার বলে পরিচয় দিচ্ছিল! সে তো বলল, ওই গুপ্তধনের ওপরে তারই সম্পূর্ণ অধিকার।”

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, “ওই রকম রাজকুমার অনেক আছে! সত্যিকারের রাজবংশের কোনও ছেলে কি সাধারণ গুণ্ডার মতন ব্যবহার করতে পারে ? কক্ষনো না!”

কাকাবাবু বললেন, “আর একটা ব্যাপার আছে। কাল নরেন্দ্র ভার্মার আসতে যখন দেরি হচ্ছিল, তখন সময় নেবার জন্য আমি বলেছিলুম, ঠিক আছে, জঙ্গলগড়ের সন্ধান আমি দিতে পারি, কিন্তু আমায় কত টাকা বখরা দেবে বলো। তখন রাজকুমার বললে, “রায়চৌধুরী, তোমাকে আগেই অনেক টাকা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, তুমি রাজি হওনি!” কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই, এর আগে তো আমায় কেউ এ ব্যাপারে কোনও টাকা দেবার প্রস্তাব করেনি! তার মানে, ওই রাজকুমার ঠিক জানে না। সে প্রধান দলপতি নয়। আর কেউ আছে।”

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, “ধরে ফেলব, সবাইকেই ধরে ফেলব। ওই রাজকুমার আর কর্নেল, ওদের সবাইকেই কালকের মধ্যে আপনার সামনে হাজির করে দেব!”

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে সন্তুকে উদ্ধার করার কী ব্যবস্থা করবেন ?"

এই সময়ে সিঁড়িতে একটা গোলমাল শোনা গেল। শিশির দত্তগুপ্ত আর নরেন্দ্র ভার্মা সেই শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াতেই সাদা পোশাকের পুলিশ দু'জন একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।"

ওদের একজন বলল, "স্যার, এই লোকটা চিঠি নিয়ে এসেছে। ওকে আমরা ছাড়িনি।"

১৯

রাজকুমার বজ্রমুষ্টিতে সন্তুর ঘাড় চেপে ধরে প্রায় ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে এনে তুলল একটা জিপ গাড়িতে। নিজে ড্রাইভারের সিটে বসে মাঝখানে বসাল সন্তুকে। আর পাশে খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে বসল 'কর্নেল'।

গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর রাজকুমার বলল, "কেউ আমাদের ফলো করলে সোজা গুলি চালাবে। আমরা কিছুতেই ধরা দেব না।"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, খোকা। প্রথমেই প্রাণে মারব না তোমায়! আমার লোকদের বলা আছে, তুমি পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবে, দ্বিতীয়বারে একটা হাত কেটে দেবে। সারা জীবন ল্যাংড়া আর নুলো হয়ে থাকতে হবে, মনে রেখো!"

সন্তু কোনও কথা বলল না। কাকাবাবু যে পাগল হয়ে যাননি, এমনকী তাঁর যে পক্ষাঘাতও হয়নি, এই আনন্দেই সে আর কোনও বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। এই ডাকাতরা কাকাবাবুর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা যে সন্তুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য সন্তুর একটুও ভয় নেই।

অন্য লোকগুলো আসছে পেছনের একটা গাড়িতে। হেডলাইটের আলোয় সন্তু দেখতে পাচ্ছে, সামনে কোনও রাস্তা নেই। এখানে জঙ্গল সে-রকম ঘন নয়। আলাদা আলাদা বড় বড় গাছ, জিপটা চলছে এরই ফাঁক দিয়ে এঁকে বেঁকে।

আন্দাজ প্রায় আধঘণ্টা চলার পর সন্তু দেখল সামনে একটা নদী। প্রথমে মনে হয়েছিল জিপটা একেবারে নদীতেই নেমে পড়বে। কিন্তু খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে রাজকুমার সেটা থামাল একেবারে জলের কিনারে।

রাজকুমার বলল, "কর্নেল, ওকে তোমার ঘোড়ায় তোলো!"

সত্যি সেখানে গোটা পাঁচেক ঘোড়া বাঁধা আছে। বড় ঘোড়া নয়, ছোট ছোট পাহাড়ি টাট্টুঘোড়ার মতন। সন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে এই রকম ঘোড়া দেখেছে।

'কর্নেল' প্রথমে সন্তুকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর নিজেও সেই

ঘোড়াটায় চেপে বসল। রাজকুমার বসল তার পাশের ঘোড়ায়। তারপর অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, "তোমাদের মধ্যে দু'জন জিপ নিয়ে চলে যাও। বাকিরা এসো আমাদের সঙ্গে।"

সন্তুদের ঘোড়াটা প্রথমে কিছুতেই জলে নামতে চায় না। 'কর্নেল' তার দু'পায়ের গোড়ালি দিয়ে বারবার খোঁচা মারতে লাগল তার তলপেটে। তারপর ঘোড়াটা হঠাৎ হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে।

সন্তু আগে কখনও এভাবে নদী পার হয়নি। সিনেমাতে সে এরকম দৃশ্য কয়েকবার দেখেছে। সে সব ওয়েস্টার্ন ছবি। এই দেশেও যে কেউ ঘোড়ার পিঠে নদী পার হয়, তা তার ধারণাতেই ছিল না। তার দারুণ উত্তেজনা লাগছে।

নদীটাতে জল বেশি নয়, তবে বেশ স্রোত আছে। সন্তুর কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে গেল। সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। একবার তার লোভ হল 'কর্নেল'-কে এক ধাক্কা দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ডুব সাঁতার দিয়ে সে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে। জলের মধ্যে ওরা গুলি করলেও তার গায়ে লাগবে না।

কিন্তু সন্তু সেই লোভ সংবরণ করল। সে ভাবল, দেখাই যাক না এরা কোথায় তাকে নিয়ে যায়। এদের আস্তানাটা তার চেনা দরকার।

নদী পেরিয়ে অন্য পারে পৌঁছবার পর ঘোড়া চলতে লাগল দুলকি চালে। মাঝে-মাঝে ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিচ্ছে আর তখন তার গা থেকে বৃষ্টির মতন জলের কণা উড়ছে। সেই সময় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাই মুশকিল!

সন্তুর সারা শরীর জবজবে ভিজে। তার একটু-একটু শীত করছে। আকাশে এখন পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে, তাতে চারদিকটা বেশ দেখা যায়। এদিকে আর জঙ্গল প্রায় নেই। উঁচু নিচু পাহাড়ি জায়গা। সন্তুর মনে হল, ঠিক যেন টেক্সাস কিংবা আরিজোনার কোনও প্রান্তর দিয়ে চলেছে তাদের ঘোড়া।

একটা ছোট টিলার ওপর উঠে একটা পাথরের বাড়ির সামনে থামল ঘোড়াগুলো। টপাটপ নেমে পড়ল সবাই। রাজকুমার সেই বাড়িটার সামনের লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বলল, "আসছি, আসছি!"

বাড়িটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার, এবারে তার একটা ঘরে জ্বলে উঠল একটা লণ্ঠনের আলো। তারপর সেই লণ্ঠনটা উঁচু করতেই দেখা গেল তার মুখ। ঠিক যেন একটা গেরিলা।

লোকটি বলল, "এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?"

রাজকুমার বলল, "মেজর, এই একটা ছোঁড়াকে এনেছি, একে কিছুদিন তোমার জিম্মায় রাখতে হবে।"

'মেজর' লণ্ঠনটা সন্তুর মুখের কাছে এনে বলল, "এ তো দেখছি একটা দুধের

ছেলে। একে এনে কী লাভ হল ? ধাড়িটা কোথায় ?”

রাজকুমার বলল, “আসবে, আসবে, সেও আসবে। কান টানলেই মাথা আসে। এই ছোঁড়াটাকে এখন দোতলার কোণের ঘরে রাখো। দুধের ছেলে বলে হেলাফেলা কোরো না। এ মহা বিচ্ছু। একটু আলগা দিলেই পালাবার চেষ্টা করবে।”

‘কর্নেল’ বলল, “রাজকুমার, এবার তা হলে আমি যাই ?”

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল, “যাবে মানে ? কোথায় যাবে ?”

‘কর্নেল বলল, “আমি আর থেকে কী করব ? আমার তো এক রাত্তির ফ্রি সার্ভিস দেবার কথা ছিল। হাওয়া খুব গরম, আমি আর ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।”

রাজকুমার ‘কর্নেলের’ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, “তোমার নামে যে কেস ঝুলছে, তাতে তোমার নির্ঘাত ফাঁসি হবে তা জানো ?”

‘কর্নেল’ বলল, “সেইজন্যই তো আর আমি একদিনও ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।”

রাজকুমার বলল, “তুমি না চাইলেই কি ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে পারবে ? তা ছাড়া যাবেই বা কোথায় ? অসম, পশ্চিম বাংলা এই দু’ জায়গাতেই তোমার নামে হুলিয়া ঝুলছে।”

‘কর্নেল’ বলল, “সে কোথায় যাব, তা আমি ঠিক বুঝে নেব।”

রাজকুমার বলল, “তোমার মাথায় যা ঘিলু আছে, তাতে তুমি কিছুই বুঝবে না।”

কর্নেল এবার রেগে উঠে বলল, “কেন আমায় আবার এসব ঝুট-ঝামেলায় জড়াচ্ছেন ? এমনিতেই আমি মরছি নিজের জ্বালায়···আজ রাত্তিরে আমি সার্ভিস দিয়েছি, আর কিছু পারব না !”

রাজকুমার বলল, “ওরে গাধা ! একমাত্র ত্রিপুরাতেই তুই নিরাপদ। এখানে আর কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না। তোর নামে এখানে যে কেস ছিল, তা আমি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছি।”

‘কর্নেল’ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “সত্যি বলছেন ? নাকি আমায় চুপ্‌কি দিচ্ছেন ?”

‘মেজর’ এবার বলল, “ও কর্নেলদাদা, রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক কোরো না, উনি যা বলছেন, মেনে নাও ! ত্রিপুরা পুলিশ তোমায় আর কিছু বলবে না।”

রাজকুমার এবার মেজরের দিকে ফিরে বলল, “এ কী, তুমি এখনও যাওনি ? ছোঁড়াটাকে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছ, ও সব শুনছে ? যাও !”

‘মেজর’ এবার সন্তুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সন্তু শুনল, কর্নেলের একজন সঙ্গী বলছে, “রাজকুমার, তা হলে আমার কেসটাও তুলে

নেওয়া হবে তো ?”

সন্তু অবশ্য এই সব কথার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। কেস কী ? এদের নামে কিসের কেস ? রাজকুমার নিজেই তো একটা ডাকাত, সে ওদের নামে পুলিশ কেস তুলে নেবে কী করে ?”

ঘোরানো একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে 'মেজর' থামল একটা ঘরের সামনে। দরজাটা খুলে সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়ে-টেয়ে এসেছ তো, নাকি এত রাত্তিরে খাবার দিতে হবে ?”

সন্তু বলল, “না, খাবার চাই না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? তোমার নাম 'মেজর' কেন ? তুমি কি মিলিটারির লোক ?”

লোকটি হা-হা করে হেসে উঠে বলল, “ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে খোকা ? সাধ করে এই বিপদের মধ্যে এসেছ কেন ?”

সন্তু বেশ স্মার্টলি বলল, “আর বেশিদিন থাকব না, কাল-পরশু ফিরে যাব ভাবছি !”

'মেজর' ভুরু তুলে বলল, “তাই নাকি ? কাল-পরশু ? এত তাড়াতাড়ি ? হা-হা-হা-হা !”

লোকটির মুখের চেহারা গেরিলার মতন হলেও কথাবার্তা কিংবা হাসিটা তেমন নিষ্ঠুর নয়। বরং বেশ যেন মজাদার লোক বলে মনে হয়। হাসির সময় তার মস্ত গোঁফটা নাচে।

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়ে সে বলল, “এসো খোকাবাবু, দ্যাখো, আমাদের অতিথিশালাটি তোমার পছন্দ হয় কি না ! এসো, এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না।”

লোকটি সন্তুর হাত ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। ওর হাতে কোনও অস্ত্রও নেই। গোটা বাড়িটা অন্ধকার, এখন ইচ্ছে করলেই সন্তু এক ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তু বুঝতে পারল, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নীচে অন্য সবাই রয়েছে, শিকারি কুকুরের মতন তাড়া করে ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

সন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এ ঘরে কোনও খাট, চেয়ার, টেবিল নেই। মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বিছানা মানে শুধু একটা কম্বল আর বালিশ। আর একটা জলের কুঁজো।

'মেজর' বলল, “কাল সকালে তোমায় গরম দুধ খাওয়াব। দেখো, এখানকার দুধের স্বাদ কত ভাল। তুমি খরগোশ খেতে ভালবাসো ? আজ একটা খরগোশ ধরেছি, সেটাকে রান্না করব কাল। তুমি রুটি খাও, না ভাত খাও ?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “এটা কি হোটেল ?”

'মেজর' অকারণে আবার হেসে উঠল। তারপর গোঁফ মুছে বলল, “শোনো

ছেলে। একে এনে কী লাভ হল ? ধাড়িটা কোথায় ?”

রাজকুমার বলল, “আসবে, আসবে, সেও আসবে। কান টানলেই মাথা আসে। এই ছোঁড়াটাকে এখন দোতলার কোণের ঘরে রাখো। দুধের ছেলে বলে হেলাফেলা কোরো না। এ মহা বিচ্ছু। একটু আলগা দিলেই পালাবার চেষ্টা করবে।”

‘কর্নেল’ বলল, “রাজকুমার, এবার তা হলে আমি যাই ?”

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল, “যাবে মানে ? কোথায় যাবে ?”

‘কর্নেল বলল, “আমি আর থেকে কী করব ? আমার তো এক রাত্তির ফ্রি সার্ভিস দেবার কথা ছিল। হাওয়া খুব গরম, আমি আর ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।”

রাজকুমার ‘কর্নেলের’ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল। তারপর বলল, “তোমার নামে যে কেস ঝুলছে, তাতে তোমার নির্ঘাত ফাঁসি হবে তা জানো ?”

‘কর্নেল’ বলল, “সেইজন্যই তো আর আমি একদিনও ত্রিপুরায় থাকতে চাই না।”

রাজকুমার বলল, “তুমি না চাইলেই কি ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে পারবে ? তা ছাড়া যাবেই বা কোথায় ? অসম, পশ্চিম বাংলা এই দু' জায়গাতেই তোমার নামে হুলিয়া ঝুলছে।”

‘কর্নেল’ বলল, “সে কোথায় যাব, তা আমি ঠিক বুঝে নেব।”

রাজকুমার বলল, “তোমার মাথায় যা ঘিলু আছে, তাতে তুমি কিছুই বুঝবে না।”

কর্নেল এবার রেগে উঠে বলল, “কেন আমায় আবার এসব ঝুট-ঝামেলায় জড়াচ্ছেন ? এমনিতেই আমি মরছি নিজের জ্বালায়…আজ রাত্তিরে আমি সার্ভিস দিয়েছি, আর কিছু পারব না !”

রাজকুমার বলল, “ওরে গাধা ! একমাত্র ত্রিপুরাতেই তুই নিরাপদ। এখানে আর কেউ তোর টিকি ছুঁতে পারবে না। তোর নামে এখানে যে কেস ছিল, তা আমি তুলে নেবার ব্যবস্থা করেছি।”

‘কর্নেল’ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, “সত্যি বলছেন ? নাকি আমায় চুপ্‌কি দিচ্ছেন ?”

‘মেজর’ এবার বলল, “ও কর্নেলদাদা, রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক কোরো না, উনি যা বলছেন, মেনে নাও ! ত্রিপুরা পুলিশ তোমায় আর কিছু বলবে না।”

রাজকুমার এবার মেজরের দিকে ফিরে বলল, “এ কী, তুমি এখনও যাওনি ? ছোঁড়াটাকে নিয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে আছ, ও সব শুনছে ? যাও !”

‘মেজর’ এবার সন্তুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। যেতে যেতে সন্তু শুনল, কর্নেলের একজন সঙ্গী বলছে, “রাজকুমার, তা হলে আমার কেসটাও তুলে

নেওয়া হবে তো ?”

সন্তু অবশ্য এই সব কথার মানে ঠিক বুঝতে পারল না। কেস কী ? এদের নামে কিসের কেস ? রাজকুমার নিজেই তো একটা ডাকাত, সে ওদের নামে পুলিশ কেস তুলে নেবে কী করে ?”

ঘোরানো একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসে 'মেজর' থামল একটা ঘরের সামনে। দরজাটা খুলে সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়ে-টেয়ে এসেছ তো, নাকি এত রাত্তিরে খাবার দিতে হবে ?”

সন্তু বলল, "না, খাবার চাই না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? তোমার নাম 'মেজর' কেন ? তুমি কি মিলিটারির লোক ?”

লোকটি হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, বুঝলে খোকা ? সাধ করে এই বিপদের মধ্যে এসেছ কেন ?”

সন্তু বেশ স্মার্টলি বলল, "আর বেশিদিন থাকব না, কাল-পরশু ফিরে যাব ভাবছি !”

'মেজর' ভুরু তুলে বলল, "তাই নাকি ? কাল-পরশু ? এত তাড়াতাড়ি ? হা-হা-হা-হা !”

লোকটির মুখের চেহারা গেরিলার মতন হলেও কথাবার্তা কিংবা হাসিটা তেমন নিষ্ঠুর নয়। বরং বেশ যেন মজাদার লোক বলে মনে হয়। হাসির সময় তার মস্ত গোঁফটা নাচে।

ঘরের মধ্যে এক পা দিয়ে সে বলল, "এসো খোকাবাবু, দ্যাখো, আমাদের অতিথিশালাটি তোমার পছন্দ হয় কি না ! এসো, এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

লোকটি সন্তুর হাত ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগেই। ওর হাতে কোনও অস্ত্রও নেই। গোটা বাড়িটা অন্ধকার, এখন ইচ্ছে করলেই সন্তু এক ছুটে কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সন্তু বুঝতে পারল, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। নীচে অন্য সবাই রয়েছে, শিকারি কুকুরের মতন তাড়া করে ওকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

সন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। এ ঘরে কোনও খাট, চেয়ার, টেবিল নেই। মেঝেতে একটা বিছানা পাতা। বিছানা মানে শুধু একটা কম্বল আর বালিশ। আর একটা জলের কুঁজো।

'মেজর' বলল, "কাল সকালে তোমায় গরম দুধ খাওয়াব। দেখো, এখানকার দুধের স্বাদ কত ভাল। তুমি খরগোশ খেতে ভালবাসো ? আজ একটা খরগোশ ধরেছি, সেটাকে রান্না করব কাল। তুমি রুটি খাও, না ভাত খাও ?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এটা কি হোটেল ?”

'মেজর' অকারণে আবার হেসে উঠল। তারপর গোঁফ মুছে বলল, "শোনো

বাপু, আগেভাগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি। তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছ নিশ্চয়ই? আমিও অনেক পড়েছি। সব বইতেই দেখেছি, তোমার বয়েসি ছেলেরা একবার না একবার পালাবার চেষ্টা করেই। তুমিও করবে নিশ্চয়ই। তোমার সবে ডানা গজাচ্ছে, এই তো পালাবার বয়েস! কিন্তু তুমি যদি পালাও, তাহলে আমার যে গর্দান যাবে! সুতরাং তুমি পালাবার চেষ্টা করলে আমিও তোমাকে ধরতে বাধ্য। তারপর ধরা যখন পড়বে, তখন তোমায় শাস্তিও দিতে হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে খেতে না দেওয়া। তুমি যদি কাল দুপুরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু খরগোশের মাংস তোমায় দেব না, বুঝলে?"

সন্তু বলল, "আমি খরগোশের মাংস খেতে চাই না।"

'মেজর' বলল, "যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। আজ রাতে অনেক ধকল গেছে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়ো!"

দরজার সামনে থেকে রাজকুমার ঠিক তক্ষুনি বলল, "দাঁড়াও, এখন ঘুমোবে কী, ওকে এখন চিঠি লিখতে হবে।"

২০

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার 'মেজর'-কে বলল, "যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এসো!"

'মেজর' যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড়-বড় করে বলল, কাগজ? কলম? সে আমি পাব কোথায়?"

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন, তোমার কাছে কাগজ-কলম নেই?" জোগাড় করে রাখোনি কেন?"

'মেজর' হে-হে করে হেসে বলল, "কী যে বলেন, রাজকুমার! আমরা যে-কাজ করি, তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয়? আপনি আগে তো জোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি।"

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ানো 'কর্নেল' আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কারুর কাছে কলম আছে?"

'কর্নেল' কোনও উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেইনি। অন্যরাও কেউ কোনও কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে 'মেজর'-কে বলল, "তুমি অন্য ঘরগুলিতে খুঁজে দেখে এসো!"

'মেজর' বলল, "আমি তিন দিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘর ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি!"

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে

বলল, "সামান্য কাগজ-কলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে ? এখন সময়ের কত দাম জানো ? যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে ! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারোনি ?"

'মেজর' বলল, "পাশের ঘরে একটা পুরনো ক্যালেন্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে ?"

'কর্নেল' বলল, "আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।"

এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল।

রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, "গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে ? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায় ? কালি কোথায় পাওয়া যাবে ?"

'কর্নেল' বলল, "কাঠকয়লা নেই বাড়িতে ? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বানানো যায়।"

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, "তবে যাও ! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে এসো !"

'মেজর' আর 'কর্নেল' দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্‌ পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চ্যাঁচামেচি করছে, সে-ও তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সে-ও পকেটে একটা কলম রাখে না ? এতেই বোঝা যায়, এরা কী রকম ধরনের মানুষ !

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দিল। তারপর জানলার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কি না।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্‌ দেখিয়েছ ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই !"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্‌ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই 'মেজর' আর 'কর্নেল' ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। 'মেজর' নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেন্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, "নাও, এবারে লেখো !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে লিখতে হবে ? প্রধানমন্ত্রীকে ?"

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে ? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি

বাপু, আগেভাগে তোমায় একটা কথা বলে রাখি। তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়েছ নিশ্চয়ই? আমিও অনেক পড়েছি। সব বইতেই দেখেছি, তোমার বয়েসি ছেলেরা একবার না একবার পালাবার চেষ্টা করেই। তুমিও করবে নিশ্চয়ই। তোমার সবে ডানা গজাচ্ছে, এই তো পালাবার বয়েস! কিন্তু তুমি যদি পালাও, তাহলে আমার যে গর্দান যাবে! সুতরাং তুমি পালাবার চেষ্টা করলে আমিও তোমাকে ধরতে বাধ্য। তারপর ধরা যখন পড়বে, তখন তোমায় শাস্তিও দিতে হবে। প্রথম শাস্তি হচ্ছে খেতে না দেওয়া। তুমি যদি কাল দুপুরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু খরগোশের মাংস তোমায় দেব না, বুঝলে?"

সন্তু বলল, "আমি খরগোশের মাংস খেতে চাই না।"

'মেজর' বলল, "যাক গে, ওসব কথা পরে হবে। আজ রাতে অনেক ধকল গেছে, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়ো!"

দরজার সামনে থেকে রাজকুমার ঠিক তক্ষুনি বলল, "দাঁড়াও, এখন ঘুমোবে কী, ওকে এখন চিঠি লিখতে হবে।"

২০

ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজকুমার 'মেজর'-কে বলল, "যাও, জলদি কাগজ আর কলম নিয়ে এসো!"

'মেজর' যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখ বড়-বড় করে বলল, কাগজ? কলম? সে আমি পাব কোথায়?"

রাজকুমার বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন, তোমার কাছে কাগজ-কলম নেই?" জোগাড় করে রাখোনি কেন?"

'মেজর' হে-হে করে হেসে বলল, "কী যে বলেন, রাজকুমার! আমরা যে-কাজ করি, তাতে কি কখনও কলমের দরকার হয়? আপনি আগে তো জোগাড় করে রাখার কথা বলেও যাননি।"

রাজকুমার তখন দরজার কাছে দাঁড়ানো 'কর্নেল' আর অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কারুর কাছে কলম আছে?"

'কর্নেল' কোনও উত্তর দেবার বদলে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। যেন কলম কথাটি সে আগে কখনও শোনেইনি। অন্যরাও কেউ কোনও কথা বলল না।

রাজকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে 'মেজর'-কে বলল, "তুমি অন্য ঘরগুলিতে খুঁজে দেখে এসো!"

'মেজর' বলল, "আমি তিন দিন ধরে এ-বাড়িতে আছি। সব ঘর ঘুরে দেখেছি। এক টুকরো কাগজও দেখিনি, কলমও দেখিনি!"

রাজকুমার নিজের বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরে

বলল, "সামান্য কাগজ-কলমের জন্য সময় নষ্ট করতে হবে ? এখন সময়ের কত দাম জানো ? যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে কালকের মধ্যে ! একটা চিঠি লেখার ব্যবস্থা রাখতে পারোনি ?"

'মেজর' বলল, "পাশের ঘরে একটা পুরনো ক্যালেন্ডার আছে, তার একটা পাতা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে লেখা যেতে পারে। কিন্তু কলম কোথায় পাওয়া যাবে ?"

'কর্নেল' বলল, "আমি গাছের ডাল কেটে কলম বানিয়ে দিতে পারি।"

এই বলে সে কোটের পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল।

রাজকুমার ভেংচিয়ে বলল, "গাছের ডাল কেটে কলম বানালেই চলবে ? শুধু কলম দিয়ে লেখা যায় ? কালি কোথায় পাওয়া যাবে ?"

'কর্নেল' বলল, "কাঠকয়লা নেই বাড়িতে ? কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালি বানানো যায়।"

রাজকুমার এবার একটা হুংকার দিয়ে বলল, "তবে যাও ! শিগগির কালি আর কলম বানিয়ে এসো !"

'মেজর' আর 'কর্নেল' দৌড়ে বেরিয়ে গেল। রাজকুমার দুই কোমরে হাত দিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তুর বেশ মজা লাগছে। এতগুলো লোক, কারুর কাছে একটা ডট্‌ পেন পর্যন্ত নেই। এই যে রাজকুমার এত চ্যাঁচামেচি করছে, সে-ও তো খুব সেজেগুজে রয়েছে, সে-ও পকেটে একটা কলম রাখে না ? এতেই বোঝা যায়, এরা কী রকম ধরনের মানুষ !

রাজকুমার এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের জানলাটা খুলে দিল। তারপর জানলার শিকগুলো টেনে টেনে দেখল, সেগুলো ঠিক শক্ত আছে কি না।

সন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তোমার কথা আমি জানি। নেপালে আর আন্দামানে তুমি অনেক রকম খেল্‌ দেখিয়েছ ! এখানে যেন সে রকম কিছু করতে যেও না। এটা শক্ত ঠাঁই !"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। এই রাজকুমারকে গোড়া থেকেই তার খুব গোঁয়ার বলে মনে হয়েছে। এই রকম লোকের পক্ষে ফট্‌ করে গুলি চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব কিছু না।

একটু বাদেই 'মেজর' আর 'কর্নেল' ফিরে এল। একটা চায়ের কাপে কালি গুলে এনেছে, আর গাছের ডাল কেটে একটা কলমও বানিয়েছে। 'মেজর' নিয়ে এসেছে পুরনো ক্যালেন্ডারটা।

তার একটা পাতা ছিঁড়ে সন্তুর সামনে ফেলে দিয়ে রাজকুমার বলল, "নাও, এবারে লেখো !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে লিখতে হবে ? প্রধানমন্ত্রীকে ?"

রাজকুমার চোখ পাকিয়ে বলল, "ইয়ার্কি হচ্ছে ? তোমার কাকাবাবুকে চিঠি

লেখো। আমি যা বলছি, তাই লিখবে!"

সন্তু প্রথমে লিখল। "পূজনীয় কাকাবাবু। তারপর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাল।"

রাজকুমার বলল, "লেখো। আমি বেশ ভাল আছি।"

সেই ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার সময় সন্তু ডিকটেশান লিখেছে, তারপর আর কারুর কথা শুনে শুনে তাকে চিঠি লিখতে হয়নি। যাই হোক, রাজকুমারের এই কথাটায় আপত্তির কিছু নেই বলে সে লিখে ফেলল।

রাজকুমার বলল, "তারপর লেখো, এখনও পর্যন্ত ইহারা আমার উপর কোনও অত্যাচার করে নাই।"

সন্তু বলল, "আমি সাধু ভাষা লিখি না। আমি চলতি ভাষায় চিঠি লিখি।"

রাজকুমার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "যা বলছি, তাই লেখো!"

সন্তু লিখল, "এখনও পর্যন্ত এরা আমার ওপর কোনও অত্যাচার করেনি।"

'কর্নেল', 'মেজর' ও অন্য দু'জন সন্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল সন্তুর চিঠি লেখা।

রাজকুমার বলল, "হয়েছে? এবারে লেখো, তবে, আপনার উপরেই আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের সন্ধান ইহাদের না দিলে ইহারা আর আমায় জীবন্ত ফিরিয়া যাইতে দিবে না!"

সন্তু বলল, "একথা আমি লিখব না!"

রাজকুমার বলল, "লিখব না মানে? তোর ঘাড় ধরে লেখাব। হতচ্ছাড়া, যা বলছি তাই লেখ্ শিগগির!"

সন্তু বলল, "আমায় দিয়ে জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারবে না।"

রাজকুমার বলল, "তবে রে? আচ্ছা, দ্যাখ্ একটুখানি নমুনা। কর্নেল, ওর বাঁ হাতে একটু অপারেশান করে দাও তো।"

'কর্নেল' অমনি খপ্ করে সন্তুর বাঁ হাতটা চেপে ধরে টেনে নিল নিজের কাছে। তারপর তার ছুরিটা সন্তুর কনুইয়ের খানিকটা নীচে একবার ছুঁইয়ে দিল শুধু। মনে হল ঠিক যেন পালক বুলিয়ে গেল একটা। তবু সেই জায়গাটায় একটা লম্বা রেখায় ফুটে উঠল রক্ত। টপ্ করে এক ফোঁটা রক্ত পড়ল ক্যালেণ্ডারের পাতাটার ওপর।

রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলল, "এইবার দেখ্‌লি? লেখ্ যে, এই রক্তের ফোঁটাটা আমার। কাকাবাবু, আপনি আমার কথা না শুনিলে ইহারা আমার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবে। তারপর সেই রক্তে আমার জামা কাপড় চুবাইয়া তাহা আপনার নিকট পাঠাইবে।"

সন্তু বলল, "এ রকম বিচ্ছিরি ভাষা আমি কিছুতেই লিখব না। আমাকে মেরে ফেললেও না।"

রাজকুমার পকেট থেকে রিভল্‌ভারটা বার করে উল্টো করে ধরল। ওর বাঁট

দিয়ে সন্তুর মাথায় মারতে চায়।

কিন্তু সে মারবার আগেই 'মেজর' হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "রাজকুমার, একটা কথা বলব? আমি একটু একটু লেখাপড়া করেছি। গুম-খুনের কিছু বইও পড়েছি। এই রকম সময় কী রকম চিঠি লিখতে হয়, তা খানিকটা জানি। আমি ওকে বলে দেব?"

রাজকুমার বলল, "তুমি কী রকম লেখাতে চাও, শুনি!"

'মেজর' বলল, "যেটুকু লেখা হয়েছে, তারপর লিখুক, কাকাবাবু, আপনি জঙ্গলগড়ের গুপ্তধনের জায়গাটার একটা নকশা এঁকে যদি এদের কাছে পাঠান, তবেই এরা আমাকে ছাড়বে বলেছে। তবে এ সম্পর্কে আপনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন। আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—।"

সন্তুর দিকে ফিরে 'মেজর' বলল, "দ্যাখো ভাই, চিঠি তো তোমায় একটা লিখতেই হবে। নইলে আমরা তোমায় ছাড়ব না। শুধু শুধু কেন মারধোর খাবে? আমি যা বললুম, তা লিখতে তোমার কি আপত্তি আছে?"

কথা বলতে বলতে সকলের অলক্ষিতে 'মেজর' সন্তুর দিকে একবার চোখ টিপে দিল। যেন সে বলতে চাইল, এই কথাগুলো লিখতে রাজি হয়ে যাও, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

গাছের ডালের কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে সন্তু লিখে দিল এই কথাগুলো।

রাজকুমার কাগজটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর বলল, "রায়চৌধুরী তোমার এই হাতের লেখা দেখে চিনতে পারবে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, আমার সই দেখে ঠিক চিনবেন।"

রাজকুমার বলল, "পুনশ্চ দিয়ে আবার লেখো, ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর চাই।"

সন্তু বলল, "আর আমি কিছু লিখতে পারব না।"

'মেজর' বলল, "দিন, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি। আমার হাতের লেখা কেউ চিনতে পারবে না, আমি সাত-আট রকমভাবে লিখতে পারি।

'মেজর' সন্তুর চিঠির নীচে লিখল, "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর আর নকশা না পেলে সব শেষ। তোমার ভাইপোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুলিশে খবর দিলে কোনও লাভ হবে না।"

এর নীচে সে আবার একটা মড়ার মাথার খুলি এঁকে দিল।

রাজকুমার আবার চিঠিখানা নিয়ে একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। এটাই পাঠিয়ে দাও! 'কর্নেল' তোমার একজন লোককে বলো ঘোড়া নিয়ে আগরতলায় চলে যেতে, ভোরের আগেই যেন পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জেনারেলই চিঠি ডেলিভারি দেবার ব্যবস্থা করবেন!"

'কর্নেল' বলল, "কিন্তু আমার লোক যদি রাস্তায় ধরা পড়ে যায় ?"

রাজকুমার হুংকার দিয়ে বলল, "কে ধরবে ? কেউ ধরবে না, যাও ! ধরা পড়লেও চিঠি পৌঁছে যাবে ঠিক জায়গায়। আর যে ধরা পড়বে, তাকে আমি একদিন পরেই ছাড়িয়ে আনব। আমি রাজকুমার, ভুলে যেও না !"

এরপর রাজকুমার সদলবলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সন্তুকে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সন্তু আর সে দরজা টানাটানির চেষ্টা করল না।

সে এসে দাঁড়াল খোলা জানলার ধারে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গেটের কাছে ঘোড়ার ক্ষুর ঠেকার আর বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক জোনাকি। টি ট্রি টি ট্রি করে দূরে একটা রাত পাখি ডাকছে। এরই মধ্যে কপাকপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া ছুটে চলে গেল।

যদিও কাছেই বিছানা পাতা, কিন্তু সন্তু বসে পড়ল ওই জানলার পাশেই। তারপর জানলার শিকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। সকাল হয়ে রোদ এসে তার মুখে পড়াতেও তার ঘুম ভাঙল না।

দড়াম করে দরজাটা খুলে যেতেই সন্তু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

২১

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে 'মেজর'। তার এক হাতে একটা কাচের গেলাস ভর্তি দুধ, তা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আর এক হাতে কয়েকখানা হাতে-গড়া রুটি ! সে পা দিয়ে দরজাটা ঠেলেছে বলেই অত জোরে শব্দ হয়েছে।

'মেজর' চোখ বড় বড় করে বলল, "বাপ্ রে ! তোমাকে দেখে ধড়ে প্রাণ এল ! জানো তো, কী কাণ্ড ? কাল তোমার দরজায় তালা লাগাতে ভুলে গেছি। এখন এসে তা দেখে ভাবলুম পাখি বোধহয় উড়ে গেছে ! কী ব্যাপার, তুমি এত লক্ষ্মীছেলে হয়ে গেলে যে, পালাবার চেষ্টা করোনি ?"

সন্তু হাসল। তারপর বলল, "দরজায় যে তালা লাগাননি, সে কথা বলে যাবেন তো ! আমি জানব কী করে যে ডাকাতরাও তালা দিতে ভুলে যায় !"

'মেজর' বলল, "ভাগ্যিস তুমি পালাওনি ! তা হলে রাজকুমার আর আমায় আস্ত রাখত না ! রিভল্ভারের ছ'টা গুলিই পুরে দিত আমার মাথার খুলিতে। তুমি আমায় খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছ। তারপর, কী, খিদেটিদে পায়নি ? এই নাও, দুধ আর রুটি এনেছি।"

সন্তু বলল, "আমি দাঁত না মেজে কিছু খাই না !"

'মেজর বলল, "এই রে ! তাহলে তো তোমায় নীচে নিয়ে যেতে হয় ! নীচে কুয়ো আছে। কিন্তু তোমায় তো ঘর থেকে বার করার হুকুম নেই। তা বাপু, একদিন দাঁত না মেজেই খেয়ে নাও বরং !"

সন্তু বলল, "না, তা পারব না। আমার ঘেন্না করে।"

"তোমার জন্য কি আমি বিপদে পড়ব নাকি? তোমাকে আমি নীচে নিয়ে যাই, তারপর তুমি যদি একটা দৌড় লাগাও? এই পাহাড়ি জায়গায় তোমার পিছু পিছু আমি ছুটতে পারব না!"

"সকালবেলা ছোটাছুটি করার ইচ্ছে আমার নেই।"

"অত সব আমি শুনতে চাই না। এই তোমার খাবার রইল। খেতে হয় খাও, না হলে যা ইচ্ছে করো!"

লোকটি ঘরের মধ্যে গেলাসটা নামিয়ে তার ওপরেই রুটি রেখে দিল। তারপর দরজাটা খোলা রেখেই চলে গেল।

যখন অন্য কোনও কাজ থাকে না, তখন খুব খিদে পায়। গরম দুধ দেখেই সন্তুর পেট জ্বলতে শুরু করেছে। সে জানে, হাতের কাছে খাবার দেখলে কখনও অবহেলা করতে নেই। বিশেষত এইরকম বিপদের অবস্থায় কখন কী হয় তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করলেই এরা তাকে শাস্তি দেবার জন্য খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। সেইজন্য খেয়ে নেওয়াই উচিত।

কিন্তু ওই 'মেজর'কে যে সে বলল, দাঁত না মেজে খেতে তার ঘেন্না করে। এখন সে খেয়ে নিলে লোকটা নিশ্চয়ই তাকে হ্যাংলা ভাববে।

লোকটা দরজাটা খোলা রেখে গেছে। কী ব্যাপার, এবারেও ভুলে গেছে নাকি?

তক্ষুনি 'মেজর' আবার ফিরে এল। তার এক হাতে এক মগ জল।

সে গজগজ করে বলল, "এই নাও, জল এনেছি। এখানেই চোখ মুখ ধুয়ে নাও।"

সন্তু বলল, "দাঁত মাজব কী দিয়ে? একটা নিমগাছের ডাল ভেঙে আনতে পারলেন না?"

"ইস্, তোমার শখ তো কম নয়! এর পর বলবে, শুধু রুটি খাব না। আলুর দম চাই। হালুয়া চাই! এই জলেই আঙুল দিয়ে দাঁত মেজে নাও!"

সন্তু দেখল কালকের রাত্তিরের সেই গাছের ডাল কেটে বানানো কলমটা তখনও সেখানে পড়ে আছে। সেটাকেই সে তুলে নিল। কোন্ গাছের ডাল তা কে জানে! সেই কলমটারই উল্টো দিকটা চিবিয়ে দাঁতন বানিয়ে নিয়ে সে দাঁত মাজল। বেশ মজা লাগল তার।

দুধটা এখনও বেশ গরম আছে। তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সে রুটি তিনটে খেয়ে ফেলল। কাছেই মেজর বসে রইল উবু হয়ে। তার পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি। মস্ত বড় ঝোলা গোঁফের জন্য তার মুখখানা সিন্ধুঘোটকের মতন দেখায়।

খেতে খেতে সন্তু ভাবল, এই 'মেজর' লোকটি কিন্তু ঠিক ডাকাতদের মতন নয়। প্রথম থেকেই সে সন্তুর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছে। কাল রাত্তিরে

চিঠি লেখার সময় সন্তুর দিকে তাকিয়ে ও একবার যেন চোখ টিপেছিল না ? কেন, কিছু কি বলতে চায় ? সন্তু জিজ্ঞেস করবে, না ও নিজের থেকেই বলবে ?

এই যে সন্তুর মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দিল লোকটা, এটাও কম কথা নয় । গেলাস প্রায় ভর্তি করে দুধ এনেছে । আধ গেলাসও তো দিতে পারত !

সন্তুর খাওয়া শেষ হতে 'মেজর' বলল, "হ্যাঁ, বেশ খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারছি । আর দু'খানা রুটি খাবে ?"

সন্তু বলল, "না ।"

"আচ্ছা, এবারে তা হলে শুয়ে পড়ো । তোমার তো এখন কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই ! যতক্ষণ তোমার কাকাবাবু জঙ্গলগড়ের নক্‌শাটা না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তোমাকে এইভাবেই থাকতে হবে !"

"আচ্ছা, জঙ্গলগড়ে আপনারা কী খুঁজছেন বলুন তো ?"

"তুমি জানো না ?"

"না । কাকাবাবু আমায় কিছুই বলেননি !"

"ও-হো-হো-হো ! তুমিও জানো না । আমিও জানি না !"

"আপনিও জানেন না ? তা হলে আপনি এই ডাকাতের দলে রয়েছেন কেন ?"

"ডাকাতের দল আবার কোথায় ? আমি তো কোনও ডাকাতের দলে নেই !"

"আপনি এদের দলে নন ? তা হলে...মানে, এরা যে আমায় এখানে আটকে রেখেছে...আপনিও তো তাতে সাহায্য করছেন !"

"সে হল অন্য ব্যাপার । আসল ব্যাপারটা কী জানো ? তোমায় বলছি, আর কারুকে জানিও না ! আমি একটা বাড়িতে ঢুকে লোভ সামলাতে পারিনি । কয়েকখানা হিরে চুরি করেছিলুম । তারপর অবশ্য পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করে সে হিরে সব কটাই উদ্ধার করে নিয়ে গেছে । আমায় জেলেও দিয়েছিল । তা চুরি করার জন্য জেল না হয় খাটতুম দু'তিন বছর । কিন্তু যে-বাড়ি থেকে আমি চুরি করেছিলুম, সেই বাড়ির একজন দারোয়ান খুন হয়েছে । পুলিশ এখন সেই খুনের দায়ে আমাকে জড়াতে চায় । কী অন্যায় কথা বলো তো ! আমি খুন করিনি । সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো । খুনটুন করার সাহস আমার নেই । শুধু শুধু আমি কেন খুনের দায়ে ফাঁসি যাব ?"

"আপনি জেল থেকে পালিয়েছেন ?"

"আমি একলা নয় । সবশুদ্ধ ন' জন । কাগজে পড়োনি, আগরতলা জেল ভেঙে আসামিদের পালানোর খবর ? অন্যরা পালাচ্ছিল, আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়লুম !"

"তারপর ?"

"তারপর এই তো দেখছ এখানে !"

"জেল থেকে পালিয়ে এখানে আছেন ? এটা আপনার নিজের বাড়ি ?"

"এটা আমার বাড়ি ? আমার এত বড় বাড়ি থাকলে কি আমি হিরে চুরি করি ? এটা আগেকার কোনও রাজা-টাজাদের বাড়ি হবে বোধহয়। কেউ থাকত না। আমিই তো এসে পরিষ্কার করেছি।"

"এটা ওই রাজকুমারের বাড়ি ?"

"হতেও পারে, না-ও হতে পারে। সে-সব আমি জানতে চাইনি। আমার কাজ উদ্ধার হলেই হল।"

"কাজ মানে ?"

"জেল থেকে পালালে তো সারাজীবন পালিয়েই থাকতে হয়। কোনওদিন নিজের বাড়িতে ফিরতে পারব না। আমরা যারা এই জেল থেকে বেরিয়েছি, তাদের কয়েকজনকে এই রাজকুমার বলেছে যে, আমরা যদি ওর কাজ উদ্ধার করে দিই, তা হলে উনি আমাদের নামে কেস তুলিয়ে নেবেন। পুলিশ আর আমাদের কিছু বলবে না। জঙ্গলগড়ে কী আছে না আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি রাজকুমারকে সাহায্য করব, রাজকুমার আমায় সাহায্য করবে, ব্যাস !"

"রাজকুমার যদি মানুষ খুন করতে বলে তাও করবেন ?"

"মাথা খারাপ ! আমি অত বোকা নই ! খুন করে আবার পুলিশের ফাঁদে পড়ব ! খুন করিনি, তাতেই প্রায় ফাঁসি হয়ে যাচ্ছিল !"

"কিন্তু এই রাজকুমার তো সাংঘাতিক লোক !"

"সে যেমন থাকে থাক না, তাতে আমার কী ? আমি ওসব সাতে পাঁচে নেই। এখন তোমার ওপর আর তোমার কাকাবাবুর ওপরে আমার সব কিছু নির্ভর করছে। তোমরা যদি মানে মানে জঙ্গলগড়ের জিনিসপত্তর সব রাজকুমারকে দিয়ে দাও, তা হলেই আমরা ছাড়া পাই। রাজকুমার বলেছে, পুরো কাজ হাঁসিল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নিষ্কৃতি নেই।"

"ওই কর্নেলও সেই দলে ?"

"হ্যাঁ, ও-ওতো আমারই মতন জেল-পালানো।"

"ওর নাম কর্নেল কেন ?"

"কাজ হিসেবে এক-একজনের এক-একটা নাম দেওয়া হয়েছে। আসল নাম ধরে কারুকে ডাকা নিষেধ। এই যাঃ, তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললুম। আসলে, সকালের দিকটায় আমার মনটা খুব নরম থাকে। আর ঠিক তোমার মতন বয়েসি আমার একটা ভাই আছে তো ! আমি যে তোমাকে এত সব কথা বলেছি, তা যেন রাজকুমারকে আবার বলে দিও না ! কী, বলবে না তো ?"

"না, হঠাৎ রাজকুমারকে আমি এসব বলতে যাব কেন ?"

"তবে তুমি এখানে থাকো। আমি যাই, চায়ের জল-টল বসাই গিয়ে। বাবুরা সব এখনও ঘুমোচ্ছেন। তোমার চিঠি তোমার কাকাবাবুর কাছে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে বোধহয়।"

দরজা বন্ধ করে দিয়ে 'মেজর' চলে গেল।

সন্তু গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে। এখানে সময় কাটাবে কী করে? সকালবেলা তার যে-কোনও ধরনের বই পড়া অভ্যেস। কিংবা একা একা বেড়াতেও তার ভাল লাগে। বাইরে দেখা যাচ্ছে বেশ ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গল। গেটের বাইরে দু'তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। একটাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

এইভাবে তাকে ঘরের মধ্যে সারাদিন বন্দী থাকতে হবে! কাকাবাবুকে সে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আনতে চায়নি। কাকাবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, সন্তু ওই রকম চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছে।

কাকাবাবু যে কখন, কী ভাবে এখানে এসে পড়বেন, তা কিছুই বলা যায় না। যদি এই মুহূর্তে কাকাবাবু পেছন থেকে 'সন্তু' বলে ডেকে ওঠেন, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কী খেয়াল হল, সন্তু জানলার কাছ থেকে সরে এসে বন্ধ দরজাটা ধরে টান মারল। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। এবারেও দরজায় তালা লাগায়নি, এবারেও ভুলে গেছে? তা কখনও হতে পারে? এটা কোনও ফাঁদ নয় তো!

যাই হয় হোক ভেবে সন্তু দরজার বাইরে পা বাড়াল।

২২

সামনে একটা টানা বারান্দা। কোথাও কেউ নেই। তবে কিসের একটা শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু একটু আগেই সন্তু জানলা দিয়ে দেখেছে যে আকাশ একেবারে নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। তারপর মনে হল, কেউ যেন পাথরের ওপর একটা পাথর ঘষছে। আরও একটু মন দিয়ে শোনবার পর সন্তু বুঝতে পারল, আসলে ওটা কারুর নাক ডাকার আওয়াজ।

আওয়াজটা পাশের একটা ঘর থেকে আসছে। সন্তু পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল। সে-ঘরের দরজা বন্ধ। সন্তু হাত দিয়ে একটু ঠেলল, তবু সেটা খুলল না।

সন্তু আর একটু এগিয়ে গিয়ে আর একটা ঘর দেখতে পেল। এ ঘরের দরজা খোলা। কোনও বিছানা-টিছানা নেই, খালি মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে 'কর্নেল' আর দুজন লোক। 'কর্নেল'-এর মাথার কাছে রয়েছে রিভল্‌ভার। বোধহয় ওদের পাহারা দেবার কথা ছিল।

সন্তুর একবার লোভ হল চুপি চুপি গিয়ে টপ্ করে রিভল্‌ভারটা তুলে নেয়। তারপর নিজেকে সামলে নিল। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে ওরা কেউ, তা হলে

মুশকিল আছে। ‘কর্নেল’ লোকটা বড্ড নিষ্ঠুর ধরনের।

সন্তু এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। তার বুকের ভেতরটা ছম্‌ছম্‌ করছে। তাকে যে কেউ বাধা দিচ্ছে না, এটাতেই ভয় লাগছে বেশি। খালি মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকে লক্ষ করছে। হঠাৎ ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একতলাতেও কারুকে দেখা গেল না। সেই ‘মেজর’-ই বা গেল কোথায়? একতলায় সবকটা ঘর তালাবন্ধ। অনেক দিন সেইসব তালা খোলা হয়নি মনে হয়। মাঝখানে একটা উঠোন। তার এক পাশে একটা ছোট দরজা, সেটা দিয়ে বোধহয় বাড়ির পেছনটায় যাওয়া যায়।

সন্তু সেই দরজার কাছে এসে উঁকি মারল। কাছেই একটা কুয়ো। বেশ উঁচু করে পাড় বাঁধানো। দুটো খরগোশ সেখানে ঘুরঘুর করছে। সন্তু কোনও শব্দ করেনি, শুধু তার ছায়া পড়তেই ওরা টের পেয়ে গেল। দু'এক পলক কান খাড়া করে খরগোশ দুটো দেখল সন্তুকে। তারপরই পেছন দিকটা উঁচু করে মারল লাফ। প্রায় চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সন্তু কুয়োটার কাছে এসে এদিক-ওদিক তাকাল। খরগোশ দুটোর গায়ের রং পুরো সাদা নয়, খয়েরি-খয়েরি, তার মানে ওরা বুনো খরগোশ। একটু দূরে একটা করমচা গাছের নীচে আর একটা খরগোশ বসে আছে। এবারেও এর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৌড় মারল। বেশ মজা লাগল সন্তুর। এখানে তো অনেক খরগোশ। সেইজন্যই কাল রাত্রে ‘মেজর’ লোভ দেখাচ্ছিল খরগোশের মাংস খাওয়াবার।

বাড়ির পেছন দিকটায় এক সময় নিশ্চয়ই বেশ বড় বাগান ছিল। এখন ফুলগাছ-টাছ বিশেষ নেই, আগাছাই বেশি। বাউণ্ডারি দেওয়ালের পাশে পাশে রয়েছে অনেকগুলো কাঁঠাল গাছ। তাতে কত যে কাঁঠাল ফলে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলো পাকা কাঁঠাল মাটিতেও পড়ে আছে, কেউ খায় না বোধহয়। সন্তুও কাঁঠাল খেতে ভালবাসে না। কিন্তু এঁচোড়ের তরকারি তার ভাল লাগে। এত কাঁঠালে কত এঁচোড়ের তরকারিই না হতে পারে!

শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যেন হঠাৎ ডাকাত-ফাকাত, গুপ্তধন, মারামারির কথা সব ভুলে গেল। মাথার ওপর নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সন্তুর মনে হল সে যেন কোথাও বেড়াতে এসেছে। টিলার ওপর এইরকম একটা বাড়ি, কাছাকাছি মানুষজন নেই। এই রকম জায়গা বেড়াবার পক্ষে খুব চমৎকার। মা-বাবা আর সবাই মিলে এলে কী ভাল হত।

হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বাড়িটার সামনের দিকে চলে এল। গেটের কাছে তিনটে ঘোড়া এখনও বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুর কালকের রাতের কথা মনে পড়ল। বাব্বাঃ, এক রাতের মধ্যে কত কী কাণ্ডই না ঘটেছে! যাই হোক,

শেষ পর্যন্ত এই ডাকাতরা সন্তুকে ধরে আনলেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই যে, কাকাবাবুর আর অসুখ নেই, তিনি ভাল আছেন।

কাকাবাবু কি তার চিঠিটা পেয়ে গেছেন এতক্ষণে ?

সন্তু একবার মুখ ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল। কই, কেউ তো জাগেনি। কেউ তো তার ওপর নজর রাখছে না। সন্তু এখন স্রেফ একটা দৌড় মেরে পালিয়ে গেলে কে তাকে ধরবে ?

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে সন্তু দাঁড়াল। এগুলো বেশি বড় ঘোড়া নয়। পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া। এই একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে পালালে কেমন হয় ?

সন্তু কখনও ঘোড়ায় চড়া শেখেনি। তবু তার ধারণা হল, টাট্টু-ঘোড়ার পিঠে চাপা সহজ। যে-কেউ পারে। একটা ঘোড়ার পিঠে হাত রাখল সন্তু, ঘোড়াটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল, সন্তুকে লাথি-টাথি কিছু মারার চেষ্টা করল না।

ঘোড়ায় চাপার ইচ্ছেটা সন্তুর একেবারে অদম্য হয়ে উঠল। একটা ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে লাগামটা হাতে নিল সে। পিঠে কিন্তু জিন নেই। লাফিয়ে কী করে পিঠে উঠবে, ভাবতে ভাবতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। লোহার গেট বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপা যেতে পারে।

সেইভাবে ঘোড়াটায় উঠে সন্তু বলল, হ্যাট হ্যাট !

কিন্তু ঘোড়াটা নট নড়ন-চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্তু তার হাঁটু দিয়ে কয়েকটা গোঁত্তা দিলেও কোনও লাভ হল না।

কিন্তু একবার ঘোড়ায় চেপে পালাবার প্ল্যান করে আবার সেটা বদলাবার কোনও মানে হয় না। এখন যদি কেউ এসে পড়ে তা হলে সন্তুকে দেখে নিশ্চয়ই হাসবে। ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ, অথচ ঘোড়া ছোটাতে জানে না !

মরিয়া হয়ে সন্তু হাঁটু দিয়ে গোঁত্তাও মারতে লাগল, আর লাগামটা ধরেও টানতে লাগল খুব জোরে।

তাতে ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি আওয়াজ করে শূন্যে দু'পা উঁচু করল একবার। তারপর ছুটতে লাগল।

প্রথম ঝাঁকুনিতে সন্তু প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলে নিল নিজেকে। কিন্তু বল্‌গাটা আর ধরতে পারল না কিছুতেই।

ঘোড়াটা যখন বেশ জোরে টিলার নীচের দিকে নামতে লাগল, তখন সন্তুর মনে হল, সে আর কিছুতেই ব্যালান্স রাখতে পারবে না। এই অবস্থায় ছিট্‌কে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে নিশ্চয়ই। আর কোনও উপায় না দেখে সন্তু ঘোড়াটার গলাটা জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে।

ঘোড়াটাও বেশ অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ সে মাঝে মাঝেই চিঁ-হি-হি-হি করে ডাক ছাড়ছে। সে ছুটছেও এলোমেলোভাবে। টিলাটার নীচেই জঙ্গল, সেখানে ঢুকে ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে বড় বড় গাছের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্তুর গা ঘষটে যাচ্ছে। এক একবার সে ভাবছে

কোনও গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে কি না। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

কোন্‌দিকে যে ঘোড়াটা যাচ্ছে তাই বা কে জানে ! জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে। কাল রাত্তিরে এই পথ দিয়েই গিয়েছিল কি না তা সন্তুর মনে নেই। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে কিছু দেখতেই তো পায়নি সে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ঘোড়াটা একটা নদীর সামনে থামল। কাল রাতেও সন্তুরা একটা নদী পার হয়েছিল। এটা কি সেই নদী ? তাই বা কে জানে !

যা থাকে কপালে ভেবে সন্তু লাফিয়ে নেমে পড়ল নদীর ধারের নরম মাটিতে। আসলে ওইভাবে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ওরকমভাবে আর যাওয়া যাবে না।

যাই হোক, সন্তু মোটামুটি তার সার্থকতায় বেশ খুশি হয়েছে। বিনা বাধাতেই সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে তার কোনও আপত্তি নেই। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক কোনও এক সময় সে একটা কোনও শহরে পৌঁছে যাবে।

এতক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে সন্তু কোনও মানুষজন দেখেনি। এবারে নদীর ধারে সে যেন কাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল।

একটা কী যেন বড় গাছ নদীর ওপরে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। কথা শোনা যাচ্ছে তার ওধার থেকেই। সন্তু আস্তে আস্তে গিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখল দু'জন জেলে মাছ ধরছে। একজন বয়স্ক লোক, একজন প্রায় সন্তুর সমান।

সন্তু ভাবল, যাক, ভয়ের কিছু নেই। তবে তক্ষুণি সে লোকগুলোর কাছে গেল না। এদিকেই একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। ওদের কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই ওদের কয়েকটা কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বয়স্ক জেলেটি ছোট ছেলেটিকে বলছে, "সবই কপাল, বুঝলি ? আমিও মাছ ধরি আর তোর সুবলকাকুও মাছ ধরত। সেই ছোটবেলা থেকে আমরা সমানে এই কাজ করেছি। মাছ ধরা ছাড়া আমরা আর কিছু জানি না। অথচ, আজ আমি কোথায় আর তোর সুবলকাকু কোথায় !"

ছেলেটি বলল, "সুবলকাকুকে তো সাপে কামড়েছে !"

জেলেটি বলল, "সাপে কী আর এমনি এমনি কামড়েছে। নিয়তি যে ওরে টেনে নিয়ে গেছে। আমি বারণ করেছিলুম।"

"ছেলেটি বলল, "মাছ-ধরা ছেড়ে সুবলকাকু জঙ্গলে খরগোশ মারতে গিয়েছিল।"

"খরগোশ না হাতি ! আমরা জলের মাছ মারতে জানি, ডাঙার শিকারের কী জানি ! আসল কথা কী জানিস, একদিন হাট থেকে সুবল আর আমি ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরতেছিলাম, এমন সময় কী যেন একটা জিনিস চকচক

করে উঠল। একটুখানি মাটি খুঁড়ে সুবলই সেটা টেনে তুলল। সেটা একটা সোনার টাকা। আগেকার রাজা মহারাজাদের আমলে ওই রকম টাকার চল ছিল। তা সেই টাকাটা পেয়ে সুবলের কী আহ্লাদ। লাফাতে লাগল একেবারে। আমি বললুম, ওরে সুবল, এসব বড় মানুষদের জিনিস, গরিবের ঘরে রাখতে নেই। ও টাকাটা তুই থানায় জমা দিয়ে দে। তা সে কথা সে কিছুতেই শুনবে না। সোনার টাকা পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেল। অন্য কাজকম্ম সব ছেড়েছুড়ে দিনরাত জঙ্গলে পড়ে থাকত। লোককে বলত খরগোশ মারতে যায়, কিন্তু আমি তো জানি! ও সেখেনে যত গর্ত আছে আর পাথরের ফোঁকর আছে, সব জায়গায় হাত ভরে ভরে খুঁজত। সেইরকম একটা গর্তে হাত ঢুকিয়েই তো সাপের কামড় খেলে!"

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলের মধ্যে একখানা সোনার টাকা এল কী করে?"

বয়স্ক লোকটি বলল, "ও জায়গাটারে কয় জঙ্গলগড়। এককালে ওখানে ত্রিপুরার এক মহারাজা এসে লুকিয়ে ছিলেন। তাই লোকে এখনও বলে, ওখানকার মাটির নীচে অনেক সোনাদানা পোঁতা আছে।"

জঙ্গলগড়ের নাম শুনেই সন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে। এই বয়স্ক লোকটি তা হলে জানে জঙ্গলগড় কোথায়? তা হলে তো এক্ষুণি ওর সঙ্গে ভাব করা দরকার।

কিন্তু সন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই অন্য একটা শব্দ শুনতে পেল। টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে।

২৩

পুলিশরা যে লোকটিকে ধরে নিয়ে এসেছে, কাকাবাবু তার আপাদমস্তক দেখলেন কয়েকবার। ধুতি আর নীল রঙের শার্ট-পরা সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ। মুখে একটা ভয়ের ছাপ।

কাকাবাবু বললেন, "ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক। এ লোকটাকে ধরে রেখে কোনও লাভ নেই। কই, চিঠিটা কই?"

শিশির দত্তগুপ্ত উঠে লোকটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বললেন, "এই, তুই এই চিঠি কোথায় পেয়েছিস?"

লোকটি বলল, "আমি বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম একজন লোক এসে বলল, এই চিঠিটা রাজার অতিথিশালায় পৌঁছে দিলে আমায় ইয়ে মানে একটা টাকা দেবে, তাই আমি—"

শিশির দত্তগুপ্ত ধমক দিয়ে বললেন, "সবাই এই এক গল্প বলে! যদি জেলে যেতে না চাস তো সত্যি কথা বল্!"

লোকটি বলল, "এক টাকা নয়, ইয়ে, মানে, পাঁচ টাকা!"

"অ্যাঁ?"

"সত্যি কথা বলছি স্যার, দশ টাকা দিয়েছে! আমি দিব্যি কেটে বলছি, তার বেশি দেয়নি।"

"একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য দশ টাকা দিল?"

"হ্যাঁ, স্যার। ফস্ করে টাকাটা আমার পকেটে গুঁজে দিল। আমি ভাবলুম, ডাকে চিঠি যেতে পঁয়তিরিশ পয়সা লাগে, আর আমি পাচ্ছি দশ টাকা! মোটে তো দু' পা রাস্তা। তাই ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলুম।"

"ওদের মানে? এই যে বললি একটা লোক? ফের মিথ্যে কথা!"

"মানে, একজন লোকই আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আর একটা লোক পাশে দাঁড়িয়েছিল।"

"তারা তোর চেনা?"

"না স্যার। কোনওদিন দেখিনি।"

"অচেনা লোক এসে তোকেই চিঠি দেবার কথা বলল কেন?"

"আমি এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলুম কি না, পকেটে একটাও পয়সা নেই, ভাবছিলুম কী করে কিছু রোজগার করা যায়, তাই বোধহয় ওরা ঠিক বুঝেছে!"

"লোকদুটোকে দেখতে কেমন?"

"খুব ভাল দেখতেও নয়, আবার খুব খারাপ দেখতেও বলা যায় না।"

"ভাল খারাপের কথা হচ্ছে না। লোকদুটোকে দেখলে কী মনে হয়, চোর-ডাকাতের মতন?"

একটু চিন্তা করে লোকটি বলল, "আজ্ঞে না!"

"তবে কি ভদ্রলোকের মতন?"

"আজ্ঞে না।"

"চোর-ডাকাতের মতনও না। ভদ্রলোকের মতনও না। তবে কিসের মতন?"

"আজ্ঞে, পুলিশের মতন!"

"অ্যাঁ?"

"খুব গাঁট্টাগোট্টা চেহারা আর লম্বা গোঁপ আছে।"

'তুই যে বাজারের সামনে একলা একলা দাঁড়িয়ে ছিলি, তার কোনও সাক্ষী আছে?"

"স্যার, সাক্ষী রেখে কি একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকা যায়?"

"ফের মুখে মুখে কথা বলছিস? যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দে।"

"পান্নাদার পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, পান্নাদা নিশ্চয়ই দেখেছে আমাকে!"

শিশির দত্তগুপ্ত একজন পুলিশকে বললেন, "অবিনাশ, একে বাজারের কাছে নিয়ে যাও! লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, এ সত্যি কথা বলছে কি না!"

পুলিশ দু'জন লোকটিকে নিয়ে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু সন্তুর চিঠিটা দু'তিনবার পড়লেন, কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখলেন ভাল করে। তারপর সেটা এগিয়ে দিলেন নরেন্দ্র ভার্মার দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এটা সনটুর হ্যান্ডরাইটিং ঠিক আছে তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যে-জায়গায় সন্তুকে আটকে রেখেছে, সেখানে তো কাগজ-কালি-কলম কিছু পাওয়া যায় না। জঙ্গলের মধ্যে কোনও গোপন আস্তানা মনে হচ্ছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এরা খুব কুইক কাজ-কাম করে তো ! বহোত জলদি চিঠি চলে এল ! তার মানে খুব বেশি দূরে নেই ! ঠিক কি না ? এখন কী করা যাবে ?"

শিশির দত্তগুপ্ত চিঠিটা নিয়ে দু'বার পড়লেন। তারপর বললেন, "এবারে সব কটাকে জালে ফেলা যাবে ! আপনি ওদের সঙ্গে একলা দেখা করবেন। আমি পুলিশ ফোর্স নিয়ে দূরে অপেক্ষা করব। আপনার হাত থেকে ওরা জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা যেই নিতে যাবে, অমনি আমরা ক্যাঁক করে চেপে ধরব ওদের !"

কাকাবাবু বললেন, "দেখা করব মানে ? কোথায় দেখা করব ? সে রকম কোনও জায়গার কথা তো লেখেনি ?"

"তাই তো ! আসল কথাটাই লিখতে ভুলে গেছে !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সনটু তো জঙ্গলগড়ের প্ল্যান এঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে !"

কাকাবাবু বললেন, সেটাই বা পাঠাব কোথায় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সনটু ছোকরা বহোত দুষ্টু আছে। ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট চিঠি লিখেছে, যাতে কি না আরও টাইম পাওয়া যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু তো আর নিজের ইচ্ছেতে এই চিঠি লেখেনি, ওকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে। এই দ্যাখো কাগজের ওপর এক ফোঁটা রক্ত। এ কার রক্ত বলে মনে হয় ?"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ইশ ! একটা ছোট ছেলের ওপর অত্যাচার করেছে ওরা। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একদিন সব কটাকে ধরে চাব্‌কাব !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার খালি ভয় হচ্ছে, সন্তু আবার পালাবার চেষ্টা না করে ! ও যা ছটফটে ছেলে। চুপচাপ বন্দী হয়ে থাকবে না নিশ্চয়ই। পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে আরও বিপদ হবে। ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক !"

শিশিরবাবু উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, "আমি একটা জিনিস ভাবছি, ওদের কাছে একটা টোপ দিলে কেমন হয় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "টোপ ? টোপ কী ?"

শিশিরবাবু বললেন, "বেইট ! কিংবা ডিকয় ! ধরুন, আমরা আর একটা

লোককে অবিকল মিস্টার রায়চৌধুরীর মতন সাজিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরা নিশ্চয়ই তাকে ফলো করবে। তারপর তাকে ধরবে। তখন পেছন পেছন গিয়ে আমরা ওদের সব কটাকে ধরব !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মতন একজনকে সাজাবেন ? তা আবার হয় নাকি ? সে তো ওরা চিনে ফেলবে !"

শিশিরবাবু বললেন, "না, না, অত সহজ নয়। আমাদের পুলিশ লাইনে ছদ্মবেশের এক্সপার্ট আছে। দেখবেন একজনকে এমন আপনার মতন সাজিয়ে আনব যে, আপনি নিজেই চিনতে পারবেন না। একেবারে ক্রাচ-ট্রাচ সব থাকবে !"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমার একজোড়া ক্রাচ চাই, আর দুপুরের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবেন। আমার মতন একজনকে সাজাবার দরকার কী, আমি নিজেই তো জঙ্গলে একা যেতে পারি।"

শিশিরবাবু বললেন, "না, না, আপনাকে আর আমরা বিপদের মধ্যে পাঠাতে চাই না। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর অনেক ধকল গেছে এর মধ্যেই !"

নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনিই বলুন মিঃ ভার্মা, মিঃ রায়চৌধুরীকে কি আবার বিপদের মধ্যে পাঠানো উচিত ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠাবার যে এরকম রেজাল্ট হবে, তা তো বুঝিনি আগে। বিলকুল সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল কি না ! আমাদের প্ল্যান সব গড়বড় হয়ে গেল !"

শিশিরবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা মিঃ রায়চৌধুরীকে প্ল্যান করে ত্রিপুরায় পাঠিয়েছেন ? কেন ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিল্লি থেকে প্ল্যান করা হয়েছিল। আমার বস্ মিঃ রাজেন্দ্র ভার্গবের মাথা থেকে এটা বেরিয়েছে। আপনি যেমন বললেন না, সেইরকম আগেই আমরা রাজা রায়চৌধুরীকে এখানে টোপ্ ফেলেছি।"

বলেই নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে লাগলেন।

কাকাবাবুও হাসতে হাসতে বললেন, "বাঃ, বেশ মজা ! আমাকে তোমরা টোপ ফেলবে, আমার জীবনের বুঝি কোনও দাম নেই ? গৌহাটি এয়ারপোর্ট থেকে যখন আমায় আবার প্লেনে তোলা হল, তখনই আমি বুঝেছি আমাকে আগরতলা নিয়ে আসা হচ্ছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেইজন্যই তো আমি তখন থেকে পাগল সেজে গেলাম !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার জীবনের দাম ? তোমাকে মারতে পারে, এমন বুকের পাটা হোল্ ইন্ডিয়াতে কিসিকো নেহি হ্যায় ! বন্দুকের গুলি খেলেও তুমি মরো না !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি সত্যিকারের বন্দুকের গুলি কখনও খাইনি ! খেলে

ঠিকই মরে যাব ! খেয়েছি তো ঘুম পাড়ানো গুলি !"

শিশির দত্তগুপ্ত তখনও কিছুই বুঝতে পারছেন না দেখে কাকাবাবু বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন, কলকাতার পার্কে আমায় ঘুম পাড়াবার গুলি মারা হয়েছিল তো ! এরকম গুলি তো বাজারে বিক্রি হয় না ! তা হলে যে আমাকে মেরেছে, সে এই গুলি পেল কোথায় ? আপনি পুলিশের লোক, আপনি জানবেন নিশ্চয়ই, কয়েক মাস আগে একটা হিংস্র ভাল্লুককে ধরবার জন্য দিল্লি থেকে ওইরকম ছ'টা গুলি আনা হয়েছিল ত্রিপুরায়। ভাল্লুকটাকে দুটো গুলিতেই বশ করা গিয়েছিল। তারপর বাকি চারটে গুলি আর পাওয়া যায়নি !"

শিশিরবাবুর মুখে একটা লজ্জার ছায়া পড়ল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। সে গুলি চারটে কীভাবে হারাল তা কিছুতেই বোঝা গেল না। অনেক খোঁজ করা হয়েছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রায়চৌধুরীকে ত্রিপুরায় পাঠানো হল দুস্‌রা একটা কারণে। সে অনেক বড় ব্যাপার। একটা ইন্টারন্যাশ্‌নাল গ্যাংকে পাকড়াতে চেয়েছিলাম। এখন এখানে এসে শুনছি, জঙ্গলগড়, গুপ্তধন, ফলানা ফলানা সব লোকাল ব্যাপার ! ধুত ! চলো, কালই ফিরে যাই !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, সন্তুকে এখনও একদল সাঙ্ঘাতিক হিংস্র লোক আটকে রেখেছে। দশটা ইন্টারন্যাশ্‌নাল গ্যাঙের চেয়েও সন্তুর জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি।"

শিশিরবাবু বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার ভাইপোকে ঠিক আমি উদ্ধার করে দেব !"

এই সময় একজন পুলিশ এসে খবর দিল শিশির দত্তগুপ্তের ফোন এসেছে নীচে।

শিশিরবাবু ফোন ধরতে চলে গেলেন আর কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন।

শিশির দত্তগুপ্ত ফিরে এলেন দারুণ উত্তেজিতভাবে। দরজার কাছ থেকে বেরিয়ে বললেন, "ধরা পড়েছে ! ধরা পড়েছে !"

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, "কে ?"

"ওদের তিনজন। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কাল রাতে যারা আপনাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এই তিনজন ছিল সেই দলে। নিজেরাই স্বীকার করেছে। এখন ওদের চাপ দিলে বাকি সব কটার সন্ধান পাওয়া যাবে !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গুড ওয়ার্ক !"

শিশিরবাবু বললেন, "বলেছিলুম না, পালাতে পারবে না। জাল ছড়িয়ে রেখেছি। ওরা ঠিক ধরা পড়বে ! লোক তিনটে লক্ আপে আছে। এখন ওদের জেরা করব, চলুন আমার সঙ্গে।"

নরেন্দ্র ভার্মা যাবার জন্য পা বাড়ালেও কাকাবাবু বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তিনি বললেন, "আপনারা ঘুরে আসুন, আমার আর যাবার দরকার নেই! আমি ততক্ষণ বরং জঙ্গলগড়ের ম্যাপটা এঁকে ফেলি।"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "ঠিক আছে। সেই ভাল। চলুন, মিঃ ভার্মা!"

ওরা দরজার বাইরে যেতেই কাকাবাবু আবার ডেকে বললেন, "শিশিরবাবু, আমার জন্য দুটো ক্রাচ্ পাঠাতে ভুলবেন না! আমি এবারে একটু নিজে নিজে হাঁটতে চাই!"

২৪

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেই সন্তু তরতর করে সেই ঝাঁকড়া গাছটায় চড়তে শুরু করে দিল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে। তার শরীরের সমস্ত শিরা যেন টানটান হয়ে গেছে। সে আবার ধরা পড়তে চায় না কিছুতেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেকগুলো ঘোড়া আসছে। তারপর বোঝা গেল একটাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়াটা ঠিক এই দিকেই আসছে। সন্তু যে-ঘোড়াটার পিঠে এসেছিল, সেটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটু বাদেই দেখা গেল একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল সন্তুর ঘোড়াটার পাশে। তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে চিনতে সন্তুর প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল। খাকি প্যান্ট আর একটা ছাই-রঙের হাফশার্ট পরা গাঁট্টাগোট্টা লোক। ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি এই গাছের দিকে মুখ ফেরাতেই তার সিন্ধুঘোটকের মতন ঝোলা গোঁফ দেখেই সন্তু চিনতে পারল এ তো সেই 'মেজর'।

একটু দূরে জেলে দু'জনের কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছে। 'মেজর' নদীর ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। তারপর মুখ উঁচু করে বলল, "কই হে সন্তুবাবু, কোথায় লুকোলে? চলে এসো, ভয় নেই!"

সন্তু একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল, যাতে কোনও শব্দ না হয়। কিন্তু পাতার আড়ালে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আড়াল হয়নি। এখানে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যাবে না।

মেজর আবার বলল, "কোন্ গাছে উঠে বসে আছে? ও সন্তুবাবু, শিগগির নেমে এসো! সময় নষ্ট করে লাভ নেই!"

সন্তু বুঝতে পারল, সত্যিই সময় নষ্ট হচ্ছে। 'মেজর' সবকটা গাছ ভাল করে দেখতে শুরু করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে ওঠার সময় তার একপাটি চটি পড়ে আছে গাছের নীচে।

সন্তু ডালপালা সরিয়ে বলল, "আসছি!"

তারপর সরসরিয়ে নেমে পড়ল। 'মেজর' তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সন্তু

একটুও অবাক হবার কিংবা ভয় পাবার ভাব না দেখিয়ে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমায় কী করে খুঁজে পেলেন ?"

'মেজর' সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এ তো খুব সহজ ! তুমি আমাদের এই সব ঘোড়া চালাতে পারবে না তা জানি ! ঘোড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে ! এই ঘোড়াগুলো নদীর ওপারের একটা গ্রামে থাকে। সেইজন্য ছাড়া পেলে ওরা সেইদিকেই যায় !"

সন্তু বলল, "বিচ্ছিরি ঘোড়া ! আমি নেপালে এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়ায় চেপেছি !"

'মেজর' বলল, "সে যাই হোক ! শেষ পর্যন্ত সেই পালালে তা হলে ? এখন কী হবে ? তুমি আমায় ফাঁসাবার ব্যবস্থা করে এসেছ ! রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, তুমি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে একটা গুলি চালাবে না ? এখন তোমায় যদি আমি আবার ধরে নিয়ে যাই, তাহলে আমি হয়তো বকশিস পাব, কিন্তু তোমার কী অবস্থা করে ছাড়বে বলো তো ?"

সন্তু বলল, "দোষ তো আপনারই। আপনি ভাল করে পাহারা দেননি কেন ? দরজা সব সময় খোলা। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লুম ! কেউ আমায় দেখতেই পেল না !"

'মেজর' মুচকি হেসে বলল, "আমি কিন্তু দেখেছি ! রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সব লক্ষ করছিলুম !"

সন্তু এবার লোকটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কাল রাত্তির থেকেই এ লোকটির ব্যবহার সে ঠিক বুঝতে পারছে না। লোকটা কি ভালমানুষ, না মিচকে শয়তান ?

লোকটি বলল, "শোনো, সন্তুবাবু, তোমায় সব কথা খুলে বলি। আমার নাম নরহরি কর্মকার। একটা গভর্নমেন্ট অফিসে সিকিউরিটির ডিউটি করতুম। একবার লোভের বশে হিরে চুরি করেছি। সেজন্য আজ আমার বড় লজ্জা। কিন্তু নিজের দোষে তারপর আমি ক্রমশই চোর-ডাকাতের দলে জড়িয়ে পড়েছি। এ আমি চাই না। শেষে দাগি আসামি হয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে ? তাই আমি ইচ্ছে করে তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এসো, তোমাতে আমাতে দু'জনেই এখন পালাই। তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের চেনা আছে। তাঁকে বলে আমার একটু ব্যবস্থা করে দিও। আমি দু'এক বছর জেল খাটতে রাজি আছি, তার বেশি শাস্তি যেন না হয় !"

সন্তু কথাগুলো শুনে গেল, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা এখনও ঠিক করতে পারল না।

নরহরি কর্মকার বলল, "এখানে আর থাকা ঠিক নয়। ওরা খুঁজতে শুরু করলে প্রথমে এখানেই আসবে ! চলো, এক্ষুনি আগরতলা যাই ! তুমি আমার সঙ্গে এক-ঘোড়ায় চেপে যেতে পারবে ?"

সন্তু বলল, "আমি এখন আগরতলায় যাব না !"

নরহরি কর্মকার চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল "আগরতলায় যাবে না ? তোমার কাকাবাবু তো সেখানেই আছেন !"

সন্তু বলল, "তা হোক। এখানে কাছেই জঙ্গলগড়। আমি সেখানে যেতে চাই !"

নরহরি বলল, "এখানে জঙ্গলগড় ? কে বলল তোমাকে ?"

সন্তু দূরের জেলে দু'জনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ওই ওরা জানে। ওরা বলাবলি করছিল !"

নরহরি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, "দূর ! ওসব বাজে কথা ! ওরকম কত জঙ্গলগড় আছে ! কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা ভাঙা বাড়ি-টাড়ি থাকলেই লোকে তার নাম দেয় জঙ্গলগড় ! সেরকম জায়গার তো অভাব নেই এ দেশে !"

সন্তু বলল, "তবু আমি এই জঙ্গলগড়ে একবার যেতে চাই !"

নরহরি বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ ! আসল জঙ্গলগড়ের খবর তোমার কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই রাজকুমার আর অন্যরা কী কম খোঁজাখুঁজি করেছে !"

সন্তু বলল, "ওরা যে জঙ্গলগড়ের কথা বলছে, সেখানে একটা সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে !"

নরহরি চমকে উঠে বলল, "মুদ্রা, মানে টাকা ? সোনার টাকা ? চলো তো !"

দু'পা গিয়েই নরহরি আবার থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় ভাব। ডান হাত দিয়ে গোঁফ চুলকোতে চুলকোতে বলল, "না, না সন্তুবাবু, আমায় আর লোভ দেখিও না। সোনার টাকা শুনেই আমার মনটা চমকে উঠেছিল ! একবার হিরে চুরি করে আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি যে আমাদের মতন লোকদের হিরে মুক্তো সোনাদানা সহ্য হয় না ! ওসবে একবার হাত দিলেই বিপদ ! জঙ্গলগড়ের সোনায় যদি আমি হাত দিই, তা হলে রাজকুমারের দলবল আমায় একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে !"

সন্তু আর কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল জেলে দু'জনের দিকে। নরহরি তার পেছন পেছন এসে কাতরভাবে বলল, "কোথায় যাচ্ছ, সন্তুবাবু ! আমি ভাল কথা বলছি, আগরতলায় চলো !"

সন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না।

জেলে দু'জন এখন কথা থামিয়ে মন দিয়ে মাছ ধরছে। একটা জাল ফেলে সেটা টেনে তুলছে খুব আস্তে আস্তে। জাল টেনে তোলার সময় তারা একেবারে চুপ করে থাকে।

সন্তু আর নরহরি ওদের কাছে যখন পৌঁছল, তখনও জালটা পুরো টেনে তোলা হয়নি। বড় জেলেটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শুধু, কোনও কথা

বলল না।

জালটা তোলার পর দেখা গেল তার গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ লেগে আছে। চকচকে রুপোলি রঙের।

ছোট জেলেটি জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখতে লাগল। বড় জেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, "এ মাছ বিক্কিরি নেই, মহাজনকে দিতে হবে!"

নরহরি লোকটার ঘাড় চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "তোর মাছ কে চাইছে? জঙ্গলগড়ের সোনার টাকা কে নিয়েছে, আগে বল্!"

লোকটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "সোনার টাকা! আমি তো সোনার টাকা নিইনি! মা কালীর দিব্যি বলছি!"

"তবে কে নিয়েছে?"

"সে তো সুবল!"

"কোথায় সেই সুবল? এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল তার কাছে?"

ছোট জেলেটি এবারে বলল, "সুবলকাকা তো মরে গেছে! তাকে সাপে কামড়েছে!"

নরহরি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "মরে গেছে? মিথ্যে কথা বলছিস আমার কাছে? এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব!"

সন্তু বলল, "ওরা আগেই বলছিল সুবলকে সাপে কামড়েছে। ঠিক আছে, সেই জঙ্গলগড় জায়গাটা কোথায়, আমাদের একটু দেখিয়ে দেবে চলো তো!"

নরহরি বলল, "যেখানে সোনার টাকা পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা আর কে দেখেছে? তুই দেখেছিস?"

বড় জেলেটি বলল, "বাবু, সেখানে যেও না। সেখানে খুব সাপখোপের উপদ্রব। জায়গাটা ভাল না!"

নরহরি বলল, "সাপ থাক আর যাই থাক, সে আমরা বুঝব। শিগগির সেখানে আমাদের নিয়ে চল্।"

বড় জেলেটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, "সে যে অনেক দূরের পথ। সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার যে আজকের দিনটার রোজগার নষ্ট হয়ে যাবে!"

নরহরি বলল, "মনে কর তোর জ্বর হয়েছে। তা হলেও কি মাছ ধরে রোজগার করতে পারতি?"

জেলেটি বলল, "আমার জ্বর হয়নি, তবু শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন? মনে করো, তুমি রাজা, তা হলেই কি তুমি রাজা হয়ে যাবে?"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, সবটা পথ তোমায় যেতে হবে না। খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও ঠিক কোন্‌দিকে যেতে হবে!"

ছোট্ট জেলেটিকে সেখানেই বসিয়ে রেখে ওরা তিনজন চলল, নদীর ধার

ঘেঁষে ঘেঁষে। তার আগে নরহরি ঘোড়া দুটোকে ঠেলে ঠেলে নদীতে নামিয়ে দিয়ে এল। ঘোড়া দুটো সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল নদীর ওপারে।

খানিকটা দূরে গিয়েও নরহরি থেমে গিয়ে ফিসফিসিয়ে সন্তুকে বলল, "উহুঃ ঐ ছোঁড়াটাকে ওখানে বসিয়ে রেখে আসা ঠিক হল না। কেউ আমাদের খুঁজতে এলে ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে যাবে।"

সে বড় জেলেটিকে বলল, "এর পর সারাদিন মাছ ধরলে তোর আর কত রোজগার হত?"

জেলেটি বলল, "মাছ ধরতে পারি না পারি, রোজ মহাজনকে দশ টাকা শোধ দিতে হয়। এখন তো মাছ ওঠেই না।"

নরহরি তার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, "এই নে। এখন ওই ছেলেটাকেও ডাক। ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তোরা আজ গাঁয়ে ফিরে যাবি। খবরদার, কারুকে কিচ্ছু বলবি না! এসব পুলিশের কাজ, খুব গোপন রাখতে হয়!"

সন্তু বলল, ওদের আরও দশটা টাকা দিন। আমি পরে আপনাকে শোধ করে দেব।

প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর ওরা নদীর ওপর একটা সাঁকো দেখতে পেল। খুব নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সেটার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে ওরা এক এক করে চলে এল অন্য ধারে।

আবার নদীর ধার দিয়েই হাঁটতে হল প্রায় দেড় ঘণ্টা। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। অনেক গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলে।

আসবার পথে গোটা দুয়েক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কয়েকটা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। নদীটাও ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। সামনেই পাহাড় আছে মনে হয়।

এক জায়গায় বড় জেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "এবারে আপনারা যান, আমরা আর যাব না!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলগড় আর কতদূর?"

"সামনে আর একটুখানি গেলেই দেখতে পাবেন। একেবারে নদীর ধারেই।"

নরহরি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের গাঁ ছেড়ে এত দূরের জঙ্গলে এসেছিলে কেন শুনি? তোমাদের নিশ্চয়ই কোনও মতলব ছিল।"

বড় জেলেটি বলল, "নিয়তি, বাবু, নিয়তি! এইদিকে এক গাঁয়ে সুবলের শ্বশুরবাড়ি। একটু আগের ফাঁকা মাঠ দিয়েও যাওয়া যায়, আর এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাওয়া যায়। তা সুবলের কী দুর্বুদ্ধি হল। বলল, এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই যাই, যদি দু'একটা খরগোশ মারতে পারি। সেই লোভেই তার কাল হল।"

নরহরি বলল, "ঠিক আছে, তোমরা এবারে ফিরে যেতে পারো !"

বড় জেলেটি বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনারা এখন জঙ্গলে যাবেন, তারপর ফিরবেন কখন ? জায়গাটা ভাল না। তাছাড়া দুপুরে খাওয়া-দাওয়াই বা করবেন কোথায় ?"

নরহরি বলল, "সে আমরা বুঝব। তোমরা এখন যাও তো !"

ওরা চলে যাবার পর সন্তু আর নরহরি খুব সাবধানে এগোতে লাগল। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে নানারকম গর্ত, আর এখন সেখানে পাথর আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে।

তারপর দেখা গেল একটা লম্বা পাথরের দেওয়াল। তার মধ্যে কয়েকখানা পাথরের ঘর, কিন্তু কোনওটারই ছাদ নেই। একটা কারুকার্য করা কাঠের দরজাও পড়ে আছে মাটিতে।

পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু ভাবল, এই কি তবে সেই জঙ্গলগড় ?

২৫

কাকাবাবু একা একাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন। নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা শিশির দত্তগুপ্তর দেখা নেই। ওঁরা কোনও খবরও পাঠাননি। তবে একটু আগে শিশির দত্তগুপ্তর একজন আর্দালি এসে এক জোড়া ক্রাচ্ দিয়ে গেছে।

খেয়ে উঠে কাকাবাবু নিজের আঁকা ম্যাপগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। মোট পাঁচটা ম্যাপ। তারমধ্যে চারখানা ছিঁড়ে ফেলে একখানা রাখলেন তিনি। সেটাকে আবার নতুন করে আঁকলেন। তারপর সেটাকে পকেটে ভরে রেখে তিনি ক্রাচ বগলে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। অনেকদিন বাদে তিনি নিজে নিজে হাঁটছেন, কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে।

আকাশটা মেঘলা মেঘলা। চারদিকে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বেশ একটা বেড়াবার মতন দিন ! কাকাবাবু ভাবলেন, এখন সন্তু কোথায় ? কী করছে ? ছেলেটাকে ওরা ঠিকমতন খেতে-টেতে দিয়েছে তো ?

এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটার অসুবিধে এই যে, খট্ খট্ শব্দ হয়। কাকাবাবুর নিজস্ব ক্রাচের তলায় রবার লাগানো আছে। কিন্তু সে দুটো তো সঙ্গে আনেননি।

নীচতলায় যে দু'জন পুলিশের পাহারা দেবার কথা, তারা এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাকাবাবু যে বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তা তারা লক্ষও করল না। কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন।

সামনের লোহার গেটটা অবশ্য বন্ধ। তালা দেওয়া। অগত্যা কাকাবাবু নিজেই গেটের গায়ে দু'বার থাবড়া মারলেন। সেই আওয়াজ শুনে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল আর কাকাবাবুকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতন মুখের ভাব

হয়ে গেল তার !

একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বলল, "এ-এ-এ কী স্যার ! আ-আ-আ-প্‌নি !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব, গেটটা খুলে দাও !"

পুলিশটি বলল, "আ-আ-প্‌নি বেড়াতে যা-যা-যাবেন ? আপনার তো অসুখ ! আপনি নিজে নিজে হাঁটছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। খেয়ে ওঠার পর আমার একটু হাঁটাহাঁটি করা অভ্যেস।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে। আমরা ততক্ষণে একটু খেয়ে নিই। উনুনে তরকারি ফুটছে !"

"আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব।"

"না, স্যার, তা হয় না ! আমাদের বড় সাহেব বলেছেন..."

"তোমাদের বড় সাহেব কি আমায় আটকে রাখতে বলেছেন ? যাও, শিগগির চাবি নিয়ে এসো !"

কাকাবাবুর ধমক খেয়ে লোকটি আর তর্ক করতে সাহস করল না। চাবি এনে গেট খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের সাহেব এলে বসতে বোলো। আমি ফিরে আসব। আর দিল্লি থেকে যে সাহেব এসেছিলেন, তিনি ফিরলে বোলো, আমার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেছি।"

"কোথায় যাচ্ছেন স্যার, বলে যাবেন না ?"

"বললুম তো, একটু বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন হাঁটা হয়নি ভাল করে !"

গেট থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটলেন না। একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসলেন।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে যাব বাবু ?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, যেদিকে খুশি ! বেশ মেঘলা মেঘলা দিন, আমায় কোনও ভাল জায়গায় একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এসো। তুমি দশটা টাকা পাবে।"

রিকশা চলতে শুরু করতেই কাকাবাবু চোখ বুজলেন। যেন তাঁর কোনও দুশ্চিন্তাই নেই। সত্যিই তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

দু'জন সাইকেল-আরোহী একটু বাদেই কাকাবাবুর দু'পাশ দিয়ে চলে গেল তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে। খানিকদূর গিয়ে লোক দুটি আবার ফিরে এল। কাকাবাবুকে আবার ভাল করে লক্ষ করে তারা চলে গেল খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে। কাকাবাবু এসব কিছুই দেখলেন না। যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।

সাইকেল রিকশাটা শহরের ভিড় ছাড়িয়ে চলে এল একটা ফাঁকা জায়গায়।

সামনেই একটা ছোট পাহাড়। আকাশে মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

রিকশাওয়ালা থেমে গিয়ে বলল, "ও বাবু! বৃষ্টি আসতেছে। এবার কোথায় যাবেন!"

কাকাবাবু চোখ মেলে উঠে বসে বললেন, "এ কোথায় এসেছ? বাঃ, বেশ জায়গাটা তো!"

রিকশাওয়ালা বলল, "এ দিকটা তো বাবু কুঞ্জবন। কাছেই পুরনো রাজবাড়ি আছে।"

কাকাবাবু বললেন, 'রাজবাড়ি আছে থাক, সেদিকে যাবার দরকার নেই, আরও ফাঁকার দিকে চলো।"

"জোরে বৃষ্টি এসে যাবে যে বাবু!"

"ও, বৃষ্টি আসবে বলছ! তা হলে তো আর তোমার সাইকেল রিকশায় চলবে না!"

কাকাবাবু রিকশা থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। যেন তিনি কোনও চেনা লোককে খুঁজছেন। কিন্তু কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। তবে দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে।

রিকশা-চালককে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "তুমি এবারে যেতে পারো।"

রিকশাচালক তবু চিন্তিতভাবে বলল, "জোর বর্ষা আসছে, আপনি এখান থেকে ফিরবেন কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি এখন ফিরব না।"

মোষের গাড়িটা কাছে আসতেই কাকাবাবু হাত তুলে সেটাকে থামালেন। গাড়োয়ান ছাড়া সে গাড়িতে আর কেউ নেই। মাঝখানের ছাউনিতে রয়েছে কয়েকটা বস্তা।

কাকাবাবু সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ দিকে যাচ্ছ গো কর্তা?"

গাড়োয়ান বলল, "যাচ্ছি তো বাবু, অনেক দূর। সেই কমলপুর।"

কাকাবাবু সন্তুষ্টভাবে বললেন, "বাঃ, বেশ! আমিও ওই দিকেই যাব। আমায় নিয়ে যাবে? চিন্তা কোরো না, যা ভাড়া লাগে তা আমি দেব। তুমি গাড়িটা একটু নিচু করো, নইলে তো আমি উঠতে পারব না!"

কাকাবাবু উঠে বসার পর মোষের গাড়িটা চলতে লাগল ঢিমেতালে। কাকাবাবু ছাউনির মধ্যে বসে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে।

সেই বৃষ্টি ভিজেই দু'জন সাইকেল-আরোহী আবার আস্তে আস্তে যেতে লাগল মোষের গাড়িটার পাশে পাশে। কাকাবাবুর দিকে তারা গভীর

মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তারা পালিয়ে গেল শাঁ-শাঁ করে।

কাকাবাবু বললেন, "আরেঃ!"

লোকদুটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই আবার সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে আসতে লাগল। তারা কাছাকাছি এসে পড়তেই কাকাবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, "এই যে, শোনো, শোনো!"

এবার তারা উল্টোদিক থেকে আসছে বলে গাড়ির পাশে পাশে চলতে পারে না। একজন থেমে পড়ল। কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, শোনো, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?"

লোকটি যেন কিছুই জানে না এইরকমভাবে শুকনো মুখে বলল, "রাজকুমার? কোন্ রাজকুমার?"

কাকাবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "আমি যে রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছি, তাকে তুমি চেনো না?"

লোকটি বলল, "কই, না তো!"

কাকাবাবু বললেন, "তবে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? যাও, ভাগো!"

ঠিক তক্ষুনি একটা জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সাইকেল-আরোহী আর কাকাবাবু দু'জনেই তাকালেন সেদিকে।

জিপটিও এসে থামল মোষের গাড়ির পাশে। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা লম্বামতন একজন লোক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

কাকাবাবু লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, তুমি জানো নাকি, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, জানি। আমি রাজকুমারের কাছেই যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই! বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

মোষের গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওহে, জিপগাড়ি পেলে কে আর মোষের গাড়িতে যেতে চায় বলো! তোমার গাড়িটা নিচু করো, আমি নেমে পড়ি! এই নাও, তুমি দশটা টাকা নাও!"

কাকাবাবু জিপগাড়িতে বসলেন সামনের সীটে। পেছন দিকে তিনজন গুণ্ডামতন চেহারার লোক বসে আছে গম্ভীরভাবে।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, ব্যবস্থা বেশ ভালই। আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে তোমরা কি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে?"

কালো শার্ট পরা লোকটি বলল, "আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এই রাস্তায় আসব!"

কাকাবাবু আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "বাঘ জঙ্গলে বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লাগে। আমি জানতুম, আমি যে-দিকেই যাই না কেন, তোমরা

ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে !”

কালো শার্ট পরা লোকটাও অকারণে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে ?”

লোকটি বলল, “অন্তত তিন ঘণ্টা তো বটেই। সন্ধে হয়ে যাবে।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে আমি এই সময়টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। পৌঁছে গেলে আমায় ডেকে দিও।”

তারপর কাকাবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল। গাড়ির লোকগুলো এই এতটা সময় কোনও কথা বলল না। তবে তারা কেউ ঘুমোল না।

জিপটা শেষ পর্যন্ত থামতে কাকাবাবু জেগে উঠলেন নিজে থেকেই।

সন্তুকে যে-বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু' জনের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। সেই আলোতে কাকাবাবু চিনতে পারলেন রাজকুমারকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে কাকাবাবু রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা হলে আবার দেখা হল ! এত শিগগিরই যে দেখা হবে তা ভাবিনি। আশা করি এবারে আর মারামারি করার দরকার হবে না। সন্তুর চিঠি আমি পেয়েছি। আমি জঙ্গলগড়ের ম্যাপ দিয়ে দিলে তোমরা সন্তুকে ছেড়ে দেবে। আশা করি ভদ্রলোকের মতন তোমরা কথা রাখবে। এই নাও জঙ্গলগড়ের ম্যাপ।

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু ম্যাপটা বার করে এগিয়ে দিলেন রাজকুমারের দিকে।

২৬

রাজকুমারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছ' সাত জন লোক। আজ আর এদের ছদ্মবেশ ধরার কোনও চেষ্টা নেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় এরা বেশ হিংস্র ধরনের মানুষ। ওদের পেছনে দেখা যাচ্ছে তিনটে ঘোড়া। সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে, আকাশ এখনও পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। মশালের আগুন কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

রাজকুমারের মুখখানা গম্ভীর, থমথমে। সে ম্যাপটা নেবার জন্য হাত বাড়াতেই কাকাবাবু নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, “উহুঁঃ। আগে সন্তুকে ডাকো। তুমি সন্তুকে ফেরত দেবে, তারপর আমি তোমায় ম্যাপটা দেব, এইরকমই তো কথা !”

রাজকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “রায়চৌধুরী, তোমার সাহস আছে বটে ! এ-কথা মানতেই হবে ! ভেবেছিলুম, তোমাকে তুলে আনবার জন্য আবার অনেক ঝামেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি নিজেই এসে ধরা দিয়েছ। তুমি

খোঁড়া, তাও একা। আমরা এখানে এতজন আছি। এবারে কিন্তু তোমাকে আর কেউ এখানে বাঁচাতে আসবে না ! সে ব্যবস্থা করা আছে !”

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, “বাঁচাবার প্রশ্ন উঠছে কী করে ? তোমরা আমাকে মারবে কেন ? তোমরা যা চেয়েছিলে, তা তো দিয়েই দিচ্ছি ! ম্যাপ নাও। সন্তুকে ফেরত দাও !”

“বাঃ ! তুমি কি আমাদের এতই বোকা পেয়েছ ? ওই ম্যাপটা যদি জাল হয় ? সন্তুকে আমরা এ বাড়িতে আটকে রেখেছি। সে ভাল আছে। এই ম্যাপ অনুযায়ী তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তারপর সন্তুকে ফেরত পাবে !”

“আমাকে আবার অতদূর নিয়ে যাবে ? তার চেয়ে এক কাজ করো না ! আমিও এখানে সন্তুর সঙ্গে থাকছি। তোমরা এই ম্যাপ নিয়ে চলে যাও। গেলেই বুঝতে পারবে আমি ঠিক ম্যাপ দিয়েছি, না ভুল দিয়েছি !”

“দেখি ম্যাপটা !”

“বললুম না, আগে সন্তুকে দেখাও, তারপর ম্যাপ পাবে ?”

“কেন পাগলামি করছ, রায়চৌধুরী ? আমরা তোমার কাছ থেকে ওটা জোর করে কেড়ে নিতে পারি না ? দেরি করে লাভ নেই ! চলো, রওনা হয়ে পড়া যাক !”

“আমাকে যেতেই হবে বলছ ? তবে সন্তুকে ডাকো। সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।”

“না ! সে ছেলেমানুষ, তাকে নিয়ে যাবার দরকার নেই !”

একটু আগে থেকেই চলন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এই সময় দু'জন অশ্বারোহী সেখানে এসে পৌঁছল। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ছুটে এল রাজকুমারের কাছে। একজন ফিসফিস করে বলল, “কোথাও পাওয়া গেল না ! সব জায়গায় তল্লাস করেছি—”

রাজকুমার সেই লোকটির ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলা মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “অপদার্থ ! উল্লুক !”

তারপর রাজকুমার চোখ ফেরাতেই দেখল কাকাবাবু তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন।

রাজকুমার বলল, “তোমার কাছে গোপন করে আর লাভ নেই। তোমার গুণধর ভাইপোটি পালিয়েছে। মহা বিচ্ছু ছেলে !”

কাকাবাবু বললেন, “পালিয়েছে ? এটা কি সত্যি কথা বলছ ?”

“হ্যাঁ। ভোরবেলা সে চম্পট দিয়েছে। সারাদিন ধরে খোঁজা হচ্ছে তাকে। শুধু শুধু পালিয়ে তার কী লাভ হল ? এই জঙ্গলের মধ্যে না খেয়ে থাকবে ! বেশি দূর তো যেতে পারবে না !”

“এই জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই ?”

"প্রায়ই ভাল্লুকের উপদ্রব হয়। বুঝতেই পারছ, আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। আমরা তাকে ভালভাবেই রেখেছিলাম এখানে, কোনও অত্যাচার করিনি !"

"ওর চিঠিতে এক ফোঁটা রক্ত দেখেছি। সেটা কার ?"

রাজকুমারের পাশ থেকে 'কর্নেল' বলল, "রাজকুমার, শুদুমুদু কথা বাড়িয়ে লাভ আছে ? এই বুড়োটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলুন না !"

রাজকুমার বলল, "রায়চৌধুরী, ঘোড়ায় ওঠো। ঘোড়া চালাতে জানো নিশ্চয়ই। এক পায়ে পারবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পারব। চলো তা হলে ! কিন্তু তোমরা কথা রাখতে পারলে না !"

মোট পাঁচটা ঘোড়া। সেগুলোর পিঠে চড়ে পাঁচজন যাত্রা শুরু করল, আর বাকিরা রয়ে গেল সেখানেই।

কাকাবাবু ম্যাপটা রাজকুমারের হাতে দিয়ে বললেন, "এ সব রাস্তা তোমরাই ভাল চিনবে। তোমরাই পথ ঠিক করো। আসল জায়গায় পৌঁছে তারপর আমি দেখব।"

রাজকুমার আবার ম্যাপটা 'কর্নেল'-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এটা দেখে আগে আগে চলো !"

'কর্নেল' পকেট থেকে একটা টর্চ বার করে সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "এ জায়গাটা তো আমার চেনা !"

রাজকুমার বলল, "জায়গাটা তো আমিও আগে দেখেছি। কিন্তু সেখানে গোপন একটা দরজা আছে। তার সন্ধান শুধু এই রায়চৌধুরীই জানে।"

তারপর শুরু হল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। মশালগুলো ওরা নিভিয়ে ফেলেছে। আকাশে অল্প জ্যোৎস্না আছে। জঙ্গলটাকে মনে হচ্ছে ছায়ার রাজ্য।

'কর্নেল' চলেছে আগে আগে। কাকাবাবুকে মাঝখানে রেখে ঠিক তার পেছনেই রয়েছে রাজকুমার। তার হাতে রিভলভার।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ 'কর্নেল'-এর ঘোড়াটা চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক তুলে সামনের দু-পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কর্নেল' টর্চের আলো ফেলল সামনে। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ঘোড়াটা আর যেতে চায় না।

রাজকুমার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

'কর্নেল' বলল, "মনে হচ্ছে কোনও বড় জানোয়ার আছে। ঘোড়া ভয় পেয়েছে।"

রাজকুমার বলল, "গুলি চালাও ! যাই থাক না কেন, সরে যাবে !"

'কর্নেল' বলল, "যদি হাতির পাল থাকে ? তা হলে গুলি চালালে তো আরও বিপদ হবে !"

রাজকুমার বলল, "না, না, এ জঙ্গলে হাতির পাল নেই, আমি জানি ! চালাও গুলি !"

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পরপর দু'বার গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ হল। অনেক দূরে যেন একটা হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল। আর কিছু না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার এগোতে লাগল ওরা। এক জায়গায় নদী পার হতে হল। 'কর্নেল' মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ম্যাপ দেখে নিচ্ছে। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তারা পৌঁছে গেল জঙ্গলগড়ে। সবাই ঘোড়া থেকে নামবার পর আবার জ্বালানো হল মশাল।

রাজকুমার বলল, "এ জায়গাটায় আমি আগে অন্তত তিনবার এসেছি। তন্নতন্ন করে খুঁজে কিছু পাইনি। রায়চৌধুরী, তুমি ধোঁকা দিচ্ছ না তো ? এটাই আসল জঙ্গলগড় ? উদয়পুরের কাছে যেটা সেটা নয় ?

কাকাবাবু বললেন, "এক সময় এখানেই আমি তাঁবু গেড়ে ছিলাম কয়েকদিন।"

রাজকুমার বলল, "সে খবর আমরা রাখি। কিন্তু তুমি আরও অনেক জায়গায় ঘুরেছ। স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোথায় পেয়েছিলে ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "এখানেই !"

"তবে গুপ্তধন কোথায় আছে, চটপট দেখিয়ে দাও !"

"গুপ্তধনের সন্ধান আমি জানতে পারলে এখানে ফেলে রেখে যাব কেন ? সেবারেই তো নিয়ে যেতে পারতুম !"

"গুপ্তধনের সন্ধান তুমি পেয়েছিলে ঠিকই। তুমি চেয়েছিলে একলা তা উদ্ধার করতে। তোমার সঙ্গে যারা ছিল, তাদের জানতে দিতে চাওনি। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে—"

এই সময় কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে দপ্‌ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। তারপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ঠিক আগেকার দিনের সৈন্যের মতন সাজপোশাক পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তাদের হাতে লম্বা বর্শা। আর তাদের পেছনে দেখা গেল আর একজন লোককে। এর গায়ে মখমল আর জরির পোশাক। মাথায় মুকুট। অনেকটা যাত্রাদলের রাজা কিংবা সেনাপতির মতন দেখতে। হাতে খোলা তলোয়ার।

সেই লোকটিকে দেখেই রাজকুমারের সঙ্গীরা সম্মান দেখিয়ে মাথা নিচু করল। রাজকুমার বলল, "আসুন স্যার !"

কাছে আসার পর লোকটিকে চিনতে পেরে কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "শিশির দত্তগুপ্ত !"

পুলিশের বড়সাহেব শিশির দত্তগুপ্ত এই রকম পোশাক পরার পর তাঁর চেহারাটাই যেন বদলে গেছে। মুখের হাসিটাও অন্যরকম। এক দিকের ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে তিনি বললেন, "আমি সেনাপতি দেবেন্দ্র বর্মার বংশধর ! রাজা

অমরমাণিক্যের লুকনো ধনসম্পদের আমিই উত্তরাধিকারী !

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। যেন এমন মজা তিনি বহুদিন পাননি !

রাজকুমার কাকাবাবুর গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বলল, "চুপ কর, বেয়াদপ ! ওঁর সামনে তুই হাসছিস !"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "এই ! ওঁর গায়ে হাত তুলো না ! উনি ভদ্দরলোক। উনি নিজেই সব দেখিয়ে দেবেন ! মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বিদেশি ! আমাদের ধনসম্পদের ওপর আপনার কোনও অধিকার নেই। আপনি জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিন। তারপর আপনাকে আমরা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেব !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? আপনার পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি, তারপরও আপনি আমায় বাঁচিয়ে রাখবেন ? আপনি এত বোকা ? আপনি পুলিশের বড়কর্তা, তাই এইসব গুণ্ডা বদমাইশগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। সেইজন্যই এরা এত বেপরোয়া !"

শিশির দত্তগুপ্ত বললেন, "আমরা বনেদি বংশের লোক। কথা দিলে আমরা কথা রাখি। আমি ত্রিপুরেশ্বরীর নামে শপথ করেছি, আপনার কোনও ক্ষতি করা হবে না। আমাদের কাজ উদ্ধার হলেই আপনাকে আমরা সসম্মানে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "আর যদি কাজ উদ্ধার না হয় ?"

শিশির দত্তগুপ্ত এবারে তাঁর তলোয়ারটা কাকাবাবুর বুকের কাছে তুলে কর্কশভাবে বললেন, "তা হলে এক কোপে আপনার মুণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দেব। তারপর আমার কপালে যা-ই থাক !"

২৭

কাকাবাবু হঠাৎ ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারতেই তলোয়ারটা শিশির দত্তগুপ্তর হাত থেকে উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

রাজকুমার আর অন্যরা দৌড়ে এসে কাকাবাবুকে চেপে ধরল। 'কর্নেল' কাকাবাবুকে মারবার জন্য ঘুঁষি তুলতেই কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দাঁড়াও ! আমি তোমাদের গুপ্তধনের গুহা দেখিয়ে দিচ্ছি !"

রাজকুমারের দিকে ফিরে তিনি ধমকের সুরে বললেন, "তোমরা কথা রাখতে শেখোনি ! সন্তুকে ফেরত দেবার কথা ছিল তোমাদের !"

শিশির দত্তগুপ্তর দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি সেনাপতি বংশের ছেলে ! সেনাপতির মতন পোশাক পরলেই সেনাপতি হওয়া যায় না। তলোয়ারটা শক্ত করে ধরতেও শেখেননি ?"

রাজকুমার বলল, "তোমার চালাকি অনেক দেখেছি ! আর বেশি বকবক

করতে হবে না ! এবারে ভালয়-ভালয় জায়গাটা দেখাও !"

শিশির দত্তগুপ্ত হুকুম দিল, "ক্রাচ দুটো কেড়ে নাও ওর কাছ থেকে !"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আমি শুধু আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে, তলোয়ার ঠিকমতন ধরতে না শিখলে ও জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই। এখান থেকে আরও খানিকটা দূরে যেতে হবে।"

একটা ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন কাকাবাবু। একজন মশালধারী চলল তাঁর আগে আগে। আর বাকি সবাই পেছনে পেছনে। শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিয়ে খাপে ভরে নিয়েছে। এখন তার হাতে একটা রিভলভার। সেই রিভলভারের নল কাকাবাবুর পিঠে ঠেকানো।

কাকাবাবু বললেন, "সেই গুপ্তধন পেলে কে নেবে ? আপনি, শিশিরবাবু, সেনাপতির বংশ। আর, রাজকুমার বলেছে, সে রাজবংশের ছেলে। তা হলে ?"

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, "সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "রাজা অমরমাণিক্য বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি তাঁর জিনিসপত্র এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেউ তার সন্ধান না পায়। সকলেই ভাবে যে, দেয়ালের গায়ে বা পাথরের ওপরে কোথাও কোনও বোতাম-টোতাম থাকবে, সেটা টিপলেই দরজা খুলে যাবে। সেইরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজতে এসে বহুলোক এখানকার বাড়িঘর সব ভেঙেই ফেলেছে। এই যে ডান দিকের বড় পাথরটা, এর গায়েও গাঁইতির দাগ। আসলে এখানে সেরকম কিছুই নেই। যা কিছু আছে, সবই মাটির নীচে। মশালটা নীচের দিকে দেখাও, এখানে কোথাও একটা ঈগলপাখি আঁকা আছে !"

অমনি দু'দুটো মশাল নীচে নেমে এল, সবাই এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু সেখানে কোনও পাখিটাখির ছবি পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। মশালের আলোতে যে-টুকু দেখা যায়, তা ছাড়া আর সব দিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের চাঁদও মেঘে ঢাকা পড়েছে।

কাকাবাবু বললেন, "পেলে না ? তাহলে কি ছবিটা মুছে গেল ? না। তা তো হতে পারে না ! ভাল করে দেখো তো এখানে একটা বড় তেঁতুলগাছও আছে কি না ?"

কিন্তু সেখানে কোনও তেঁতুলগাছও নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে, গাছটা কেউ কেটে নিয়ে গেছে। জঙ্গলের গাছ তো অনবরতই লোকরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে। তা হলে চলো তো পাথরটার ওদিকে।"

কাছাকাছি কোনও পাহাড় না থাকলেও সেখানে একটা বেশ বড় পাথরের

চাই পড়ে আছে।

সেই পাথরের ওদিকটায় যেতেই মশালের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল একটা সাদা রুমাল।

একজন লোক দৌড়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিল। শিশির দত্তগুপ্তর কাছে এনে সে বলল, "স্যার, এই রুমালটা টাটকা। আজই কেউ ফেলে গেছে!"

শিশির দত্তগুপ্ত রুমালটা মেলে ধরল। তার এক কোণে ইংরিজি অক্ষরে 'ভি' লেখা।

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে আরও কেউ আজ এখানে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল। দ্যাখো, সে আবার কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না!"

চারদিকে মশাল ঘুরিয়ে দেখা হল, মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু একদিকে একটা তেঁতুলগাছ আছে। রুমালটা পড়ে ছিল সেই গাছটার কাছেই।

কাকাবাবু সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছটার গোড়ার কাছে বসে পড়ে বললেন, "এই তো ঈগলপাখির ছবি!"

সবাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে।

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে শিশির দত্তগুপ্তকে বললেন, "দেখি আপনার তলোয়ারটা।"

শিশির দত্তগুপ্ত তলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে দিতেই কাকাবাবু সেটা তুলে ধরে বললেন, "আপনারা জঙ্গলগড়ের চাবি খুঁজছিলেন, এই দেখুন, এটাই জঙ্গলগড়ের চাবি। দেখবেন?"

শুধু মাটির ওপরেই বেশ বড় একটা ঈগলপাখি আঁকা। মাটি কেটে কেটে তার ওপর চুন বা ওই জাতীয় কিছু ছড়িয়ে ছবিটা আঁকা হয়েছিল, বৃষ্টির জলে রং টং ধুয়ে মুছে গেলেও এখনও পাখির আকারটা বোঝা যায়। পাখির চোখ দুটো পাথরের।

কাকাবাবু তলোয়ারের খোঁচা দিয়ে পাখিটার ডান চোখটা তোলার চেষ্টা করলেন। সেটা সহজেই উঠে এল। সেই ফুটো দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে কাকাবাবু গর্তটাকে বড় করতে লাগলেন। তাতেও বিশেষ অসুবিধে হল না। গর্তটা হাত ঢোকাবার মতন বড় হতেই কাকাবাবু তার ভেতর থেকে একটা তামার নল টেনে বার করলেন।

তারপর বললেন, "সেই অতদিন আগেও কী রকম চমৎকার কপিকল ব্যবস্থা ছিল দেখো! এটা দিয়ে কাজ সারতে বেশি গায়ের জোর লাগে না। একটা বাচ্চা ছেলেও পারবে।

কাকাবাবু সেই তামার নলটা ধরে ঘোরাতে লাগলেন। কয়েক পাক ঘুরিয়েই বললেন, "কাজ হয়ে গেছে। এবারে দ্যাখো!"

সবাই হাঁ করে ঈগলপাখির ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কিছুই ঘটল না।

শিশির দত্তগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ওই পাথরটার কাছে আলো নিয়ে দেখুন ! এখানে কী দেখছেন !"

মশালের আলো সেদিকে নিতেই দেখা গেল যে, পাথরের চাঁইটা খানিকটা সরে গেছে, সেখানে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়েছে।

সবাই ছুটে গেল সেদিকে। গর্তটার ভেতরে অন্ধকার। ভেতরে কিছুই দেখা যায় না।

কাকাবাবু সেখানে গিয়ে বললেন, "এটা হল সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ। সুড়ঙ্গটা সোজা নয়। এখান থেকে নীচে নামলেই সামনের দিকে আসল সুড়ঙ্গটা দেখা যাবে।

সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে সেই গর্ত দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, শিশির দত্তগুপ্ত রিভলভার তুলে বলল, "খবর্দার ! আর কেউ যাবে না। প্রথমে শুধু আমি যাব !"

"কর্নেল' বলল, "স্যার, প্রথমেই আপনি যাবেন ? ভেতরে যদি সাপখোপ থাকে ?"

শিশির দত্তগুপ্ত বলল, "যাই থাকুক, প্রথমে আমি গিয়ে দেখব। দরকার হলে তোমাদের ডাকব। কারুর কাছে টর্চ আছে ?"

কেউ টর্চ আনেনি। কাকাবাবু নিজেই তাঁর পকেট থেকে একটা সরু টর্চ বার করে বললেন, "এটা দিতে পারি। এবারে আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।"

শিশির দত্তগুপ্ত কাকাবাবুর কাছ থেকে টর্চটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে কঠোরভাবে বলল, "একে ধরে রাখো। পালাবার যেন চেষ্টা না করে। ফিরে এসে এর ব্যবস্থা করব। আমি ভেতর থেকে যদি ডাকি, তা হলে তোমরা কেউ যাবে।"

টর্চের আলোয় দেখা গেল, সেই গর্তটা এক-মানুষের চেয়ে কিছুটা বেশি গভীর ! ওপর থেকেই সবাই দেখতে পেল, শিশির দত্তগুপ্ত সেই গর্তের মধ্যে নেমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

সেই কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটা নিয়ে কাকাবাবু হাওয়া খেতে লাগলেন। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল, এখন মুখখানা বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা। তবু প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, শিশির দত্তগুপ্তর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

গর্তটার মুখের কাছে মুখ দিয়ে রাজকুমার চিৎকার করে ডাকল, "স্যার ! স্যার !"

কোনও উত্তর এল না।

রাজকুমার এইরকম ডেকে চলল অনেকবার। তার ডাকেরই খানিকটা প্রতিধ্বনি শোনা গেল কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই।

রাজকুমার বলল, "কী হল ? স্যার কোনও উত্তরও দিচ্ছেন না কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কী জানি ! সে তোমাদের স্যারের ব্যাপার ।"

'কর্নেল' বলল, "আর একজন কারুর ভেতরে গিয়ে দেখা দরকার ।"

রাজকুমারও গর্তে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে । ওপর থেকে 'কর্নেল' জিজ্ঞেস করল, "কী হল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, রাজকুমার ?"

ভেতর থেকে শোনা গেল, "বড্ড অন্ধকার । কিছু দেখতে পাচ্ছি না ।"

'কর্নেল' বলল, "আমরা ডাকলে সাড়া দেবেন । স্যারের টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন না ?"

রাজকুমারের কাছ থেকে আর কোনও উত্তর এল না ! এবার 'কর্নেল' শুরু করল ডাকাডাকি । রাজকুমার একেবারে নিশ্চুপ ।

'কর্নেল' মুখ তুলে বলল, "কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছে । সেইজন্য সাড়া দিচ্ছে না । সাপ-টাপ থাকলেও সঙ্গে-সঙ্গেই তো কিছু একটা হয়ে যায় না !"

কাকাবাবু বললেন, "এবারে তুমি নেমে দেখবে নাকি ?"

'কর্নেল' বলল, "নিশ্চয়ই । আমি কি ভয় পাই ?"

'কর্নেল'-এর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, সেটা খুলে নামিয়ে রেখে সে গর্তটার মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিল । তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে প্রথমেই সুড়ঙ্গে না ঢুকে সেখান থেকেই ডাকতে লাগল, "স্যার ! রাজকুমার ! আপনারা কোথায় ?"

কোনও উত্তর না পেয়ে সে সুড়ঙ্গে মাথা ঢোকাতেই কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে ।

অন্য যারা ছিল, তারা দারুণ ভয় পেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে । কাকাবাবু তাদের বললেন, "ওহে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তো পালাও ! ভেতরে জুজু আছে মনে হচ্ছে ।"

লোকগুলো কী করবে ঠিক করতে পারছে না । তখুনি দেখা গেল গর্তটার ভেতর থেকে কার মাথা বেরিয়ে আসছে । কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "হাতটা দাও, আমি টেনে তুলছি !"

গর্ত থেকে উঠে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা । তাঁকে দেখেই 'কর্নেল'-এর দলবল দৌড় মারল ।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "যাক, ওগুলো যাক । আসলি চাঁইগুলো ধরা পড়ে গেছে ! খুব বুদ্ধি বার করেছিলে তুমি, রাজা !"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, শিশির দত্তগুপ্তই নাটের গুরু ! লোকটা ভালই অভিনয় করে । পুলিশের কর্তা বলেই ও বড় বড় সব ক্রিমিনালকে নিজের কাজে লাগিয়েছে । তোমার রুমালটা প্রথমে না দেখতে পেয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম ।"

নরেন্দ্র ভার্মা গর্তের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কেয়া হুয়া ? উ লোগকো বাঁধকে উপারে লে আও !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে থাকতে তোমার কষ্ট হয়নি তো ? দুটো বেশ বড় বড় ঘর।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে এবারে সারপ্রাইজ দেব, রাজা ! বলো তো ভিতরমে কে কে আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা এক্‌গাল হেসে বললেন, "সণ্টু ! দ্যাট নটি বয় !"

কাকাবাবু সত্যিকারের অবাক হয়ে বললেন, "সন্তু ! ওর ভেতরে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ ! কেয়া আজিব বাত্ ! ও ছেলেটার কিন্তু বুদ্ধি সাঙ্ঘাতিক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু এখানে ? এ সুড়ঙ্গের পথই বা কী করে জানল ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "জানেনি। লেকিন, আর একটু হলেই জেনে ফেলত। তোমার ম্যাপ পেয়ে তো আমি দলবল নিয়ে বিকালেই এখানে পঁহুছে গেছি। তুমি শর্টকাট রাস্তা বাতলে দিয়েছিলে। এখানে এসে দেখি, ওই ঈগলের পাথরের আঁখ নিয়ে সন্তু নাড়াচাড়া করছে। পাশে অন্য একটা লোক।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু কি রাজকুমারের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ। তারপর গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক এখানে হাজির হয়ে গেছে। ওদের দু'জনকেও আমরা সুড়ঙ্গের অন্দরমে নিয়ে গেলাম। ওই তো সন্তু উঠছে !"

তলা থেকে কেউ ঠেলে তুলেছে সন্তুকে, দু'হাতের ভর দিয়ে সে ওপরে উঠে এল। তারপর কাকাবাবুর দিকে চেয়ে সে লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছিস তো ? কোথাও লাগে-টাগেনি তো ?"

সন্তু বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "এবারে সত্যিই তোর জন্য চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলুম। এ লোকগুলো বড় সাঙ্ঘাতিক। চল্, কালই ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। তোর ইস্কুল খুলে গেছে না ?"

সন্তু বলল, "ইস্কুল না, কলেজ !"

রাজবাড়ির রহস্য

টুক করে একটা শব্দ হতেই শৈবাল দত্তর ঘুম ভেঙে গেল। এত সহজে তাঁর ঘুম ভাঙে না। শব্দটা ঠিক যেন কোনও ঘরের ছিটকিনি খোলার শব্দের মতন। তিনি বেডসাইড টেব্‌লের ঘড়িটা দেখলেন। অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটাগুলো জ্বলজ্বল করছে, এখন রাত দুটো বেজে কুড়ি মিনিট।

গতকাল রাতেও প্রায় এই সময়েই একটা গণ্ডগোলে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সিঁড়ির কাছে একটা জোর শব্দ হয়েছিল হুড়মুড় করে। শৈবাল ছুটে গিয়ে দেখেছিলেন, দোতলা থেকে একতলায় নামার সিঁড়ির মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে দেবলীনা।

কেওনঝড়ে একটা পুরনো রাজবাড়িতে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন শৈবাল দত্ত। দেবলীনার সঙ্গে তার বান্ধবী শর্মিলাও এসেছে। মস্ত বড় প্রাসাদ, অনেক ঘরই ফাঁকা পড়ে আছে। পাশাপাশি দু'খানা ঘর নিয়েছেন ওঁরা। শর্মিলাকে না ডেকে অত রাতে একা-একা বাইরে বেরিয়েছিল কেন দেবলীনা ? বাথরুমটা একেবারে পাশেই। তবু টানা লম্বা বারান্দা অনেকখানি হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়েছিল কেন সে ?

দেবলীনার মুখে খানিকটা জলের ছিটে দিতেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু সে বাবার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। শৈবাল দত্ত বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুই নীচে নামছিলি কেন, কোথায় যাচ্ছিলি ?" দেবলীনা মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজে বলেছিল, "জানি না। জানি না !"

শর্মিলার ঘুম খুব গাঢ়। সে এসব কিছু টেরই পায়নি। শৈবাল মেয়েকে ধরে-ধরে নিয়ে আবার শুইয়ে দিয়েছিলেন বিছানায়। কিন্তু তাঁর মনে একটা খটকা লেগেছিল, ব্যাপারটা খুব সাধারণ নয়।

আজ সকালে দেবলীনা আবার খুব হাসিখুশি। এ-বাড়ির একজন বুড়ো দরোয়ানকে নিয়ে ওরা দুই বান্ধবী জঙ্গলে বেড়াতে গেল। দুপুরবেলা ফিরে এসে দেবলীনা মহা উৎসাহে বাবাকে গল্প শোনাল যে, ওরা জলার পাশে হাতির পায়ের ছাপ দেখেছে ! দেবলীনার মুখ দেখলে মনে হয়, যেন কাল রাত্তিরের

ঘটনা তার মনেই নেই।

আজ রাতেও ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনেই শৈবালের কীরকম যেন সন্দেহ হল। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে তিনি প্রায় নিঃশব্দে নিজের ঘরের দরজা খুলে তাকালেন বাইরে। ঢাকা বারান্দাটায় কোনও আলো জ্বলছে না, তবে বেশ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সাদা একটা ফ্রক পরে হেঁটে যাচ্ছে দেবলীনা। সে খুব জোরেও যাচ্ছে না, আস্তেও না, সে যেন পা মেপে-মেপে হাঁটছে। মুখখানা একেবারে সামনের দিকে সোজা।

বুকখানা একবার ধক করে উঠল শৈবালের। এ কি তাঁর মেয়ে দেবলীনা, না অন্য কেউ? এরকম চুপিচুপি সে কোথায় যাচ্ছে? সে কি ঘুমের মধ্যে হাঁটছে? স্লিপ-ওয়াকার?

চটি না পরেই বেরিয়ে এলেন শৈবাল, পা টিপে-টিপে অনুসরণ করতে লাগলেন মেয়েকে। স্লিপ-ওয়াকারদের হঠাৎ ডেকে চমকে দিতে নেই। দেখাই যাক না ও কোথায় যায়। শৈবাল একবার ভাবলেন, ফিরে গিয়ে তাঁর রিভলভারটা নিয়ে আসবেন কি না! শর্মিলা একা রইল। সে আবার হঠাৎ জেগে উঠে ভয় পেয়ে যাবে না তো? কিন্তু দেবলীনা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। দেরি করলে যদি ও হারিয়ে যায়?

আজ দেবলীনা বেশ এক-পা এক-পা করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। একতলায় একটা গোল উঠোন, তারপর লোহার গেট। একতলায় কয়েকজন কর্মচারী থাকে, তারা সবাই এখন ঘুমন্ত। গেটে দরোয়ানের পাহারা দেবার কথা, কিন্তু সেখানে কেউ নেই, তবে গেটে একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

দেবলীনা সেই গেটের সামনে গিয়ে তালাটায় একবার হাত বুলোল। তারপর বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। আগেকার দিনের এই সব বড় গেটের মধ্যে আবার একটা ছোট গেট থাকে, সেটাতে শুধু ছিটকিনি দেওয়া তালা নেই। সেই ছোট গেটটা খুলে দেবলীনা বাইরে বেরিয়ে গেল।

একতলার বারান্দা থেকে দৌড়ে এলেন শৈবাল। ছোট গেটটা দিয়ে মাথা বার করে দেখলেন, দেবলীনা এখন ছুটছে। শৈবালও বাইরে এসে ছুটতে লাগলেন।

এখানে এককালে একটা বাগান ছিল, এখন কেউ যত্ন করে না বলে ঝোপঝাড় হয়ে গেছে। বাগানের কাঠের গেটটা ভেঙে পড়ে গেছে অনেকদিন, কোনও বেড়াও নেই। মাঝখান দিয়ে একটা লাল সুরকির রাস্তা। একটুখানি পরেই সেই রাস্তাটা নেমে গেছে নীচের দিকে। এখানকার মাটি ঢেউ-খেলানো। দেবলীনাকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে যেন মিলিয়ে গেছে জ্যোৎস্নায়।

বাগানের বাইরে লাল সুরকির রাস্তাটা বেঁকে গেছে ডান দিকে। এক পাশে একটা জঙ্গলের মতন। দেবলীনা কি রাস্তাটা ধরেই গেছে, না জঙ্গলের মধ্যে

ঢুকে পড়েছে, তা বুঝতে পারলেন না শৈবাল। কাল রাতে খুব কাছেই শেয়ালের ডাক শোনা গিয়েছিল। রাত্তিরের দিকে আরও কোনও জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে। শৈবাল ভয় পেয়ে গেলেন। দেবলীনা কি জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ? ও গাছপালা খুব ভালবাসে।

শৈবালও জঙ্গলের মধ্যেই দেখতে এলেন আগে। এখানে জ্যোৎস্নার আলো পড়েনি ভাল করে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, টিপটিপ করছে কয়েকটা জোনাকি। সঙ্গে টর্চ নেই, কোনও অস্ত্র নেই, দেবলীনাকে এতদূর আসতে দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু গেট দিয়ে বেরিয়েই যে দেবলীনা ছুটতে আরম্ভ করবে, তা ভাবতে পারেননি শৈবাল। তার ধারণা ছিল, স্লিপ-ওয়াকাররা আস্তে-আস্তে হাঁটে, তারা দৌড়য় না।

শুকনো পাতার ওপর কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেইদিক লক্ষ্য করে খানিকটা এগিয়েও শৈবাল কাউকে দেখতে পেলেন না। এবারে তিনি দেবলীনার নাম ধরে ডাকতে যেতেই কার যেন কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন।

কয়েক মুহূর্ত তিনি থমকে দাঁড়িয়ে শব্দটা ভাল করে শুনলেন। প্রথমে কান্নার মতন মনে হলেও পরে গানের মতন শোনাল। গানের কোনও কথা নেই, শুধু একটা টানা সুর।

শৈবাল পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে একটা উঁচু টিবি। তার ওপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে দেবলীনা। আঙুল দিয়ে কী যেন লিখছে মাটিতে, সে-ই গান গাইছে।

শৈবাল অপলকভাবে চেয়ে রইলেন সেদিকে। দৃশ্যটা খুবই সুন্দর, তবু গা-ছমছম করে। মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে এই জঙ্গলের মধ্যে একা-একা গান গাইছে কেন দেবলীনা ? এ কী মাথা-খারাপের লক্ষণ ?

হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠল। শোঁশোঁ আওয়াজ, গাছগুলো দুলতে লাগল, পাতা ঝরতে লাগল ঝাঁক-ঝাঁক। ঝড়ের শব্দটাও অন্যরকম, ঠিক যেন মানুষের গলায় প্রচণ্ড হাসির আওয়াজ।

দেবলীনার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একইরকমভাবে বসে আছে।

শৈবাল চিৎকার করে ডাকলেন, "খুকি, খুকি !"

দেবলীনা কোনও সাড়া দিল না, পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত, হয়তো ঝড়ের আওয়াজের জন্য সে তার বাবার ডাক শুনতে পায়নি।

শৈবাল 'খুকি খুকি' বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে উঠতে লাগলেন টিবির ওপর। এখানে মাটির বদলে বালি বেশি, তাঁর পা পিছলে যেতে লাগল, তবু তিনি উপরে উঠে এসে দেবলীনার হাত ধরে বললেন, "অ্যাই খুকি, এখানে কী করছিস ?"

দেবলীনা খুব চমকে গিয়ে বলল, "কে ? আপনি কে ?"

শৈবাল বললেন, "খুকি, আমি তোর বাবা! ঝড় আসছে, শিগগির বাড়ি চল্।"

উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেবলীনা একটা দৌড় লাগাল, দৌড়তে-দৌড়তে চিৎকার করতে লাগল, "না, না, না, না..."

শৈবাল তাকে ধরার চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না।

২

দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন কাকাবাবু, এমন সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। এখন বম্বে থেকেও স্পষ্ট কথা শোনা যায়। কাকাবাবু ফোন তুলে বলেন, "ইয়েস, রাজা রায়চৌধুরী স্পিকিং...কে, বলবন্ত্ রাও?...হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলো...সেই মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারটা...হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি, জানি,...না, না, আমি যেতে পারব না, আরে চোর-ডাকাত ধরা কি আমার কাজ নাকি?...হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি, তোমার কথা শুনছি...মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন? শোনো বলবন্ত্, মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলো, আমার শরীর খারাপ, এখন আমার পক্ষে বম্বে যাওয়া সম্ভব নয়।...হ্যাঁ সত্যিই আমি ক্লান্ত, এখন কোথাও যাব না..."

টেলিফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "উফ্, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। চোর ধরতে আমাকে বম্বে দৌড়তে হবে! আমি কি গোয়েন্দা নাকি?"

উপস্থিত দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বললেন, "কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী আমাদের বর্ধমানে একবার আপনাকে যেতেই হবে। বেশি তো দূরে নয়, আপনাকে গাড়িতে নিয়ে যাব, মহারাজার গেস্ট হাউসে থাকবেন, কোনও অসুবিধে হবে না, আগুন লাগার ব্যাপারটা আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে মাফ্ করতে হবে। এখন আমি কোথাও যেতে পারব না। এই তো দু'দিন আগে মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরেছি, একটা নীলমূর্তির জন্য সেখানে পাহাড়ে-জঙ্গলে এত ছোটাছুটি করতে হয়েছে...এখন কিছুদিন আমি বিশ্রাম চাই।"

অন্য ভদ্রলোকটি বললেন, "বর্ধমানে তো আপনার বিশ্রামই হবে। গেস্ট হাউসে থাকবেন কেউ আপনাকে ডিসটার্ব করবে না, শুধু রাত্তিরে যদি আগুনটা জ্বলে..."

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "আমাকে সত্যিই ক্ষমা করুন। আমার শরীর-মন খুবই ক্লান্ত, এখন আমি কিছুদিন একা থাকতে চাই।"

এই সময় শৈবাল দত্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কাকাবাবু, কেমন আছেন?"

কাকাবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "আরে শৈবাল, এসো, এসো ! কবে ফিরলে ?"

শৈবাল দত্ত এসে বসলেন কাকাবাবুর পাশের একটা চেয়ারে। ভদ্রলোক দু'জন কাকাবাবুকে বর্ধমানে নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করলেন আরও কিছুক্ষণ। কাকাবাবু কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। নিরাশ হয়ে তাঁরা উঠতে বাধ্য হলেন।

ওঁরা বেরিয়ে যাবার পরই সন্তু এসে বলল, "কাকাবাবু, এইমাত্র তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

হাত বাড়িয়ে কাকাবাবু টেলিগ্রামটা নিয়ে বললেন, "কে পাঠিয়েছে ? ও, নরেন্দ্র ভার্মা। সে আবার কী চায় ?...ইয়োর প্রেজেন্স ইজ আর্জেন্টলি নিডেড ইন ডেল্হি। কাম বাই দা ইভনিং ফ্লাইট টু-ডে ! টপ সিক্রেট !"

কাগজটা মুড়ে গোল্লা পাকাতে পাকাতে কাকাবাবু বললেন, "টপ সিক্রেটের নিকুচি করেছে ! কিছু একটা হলেই আমাকে দিল্লি যেতে হবে ? অসম্ভব, এখন অসম্ভব !"

সন্তু বলল, "দিল্লির থেকে বম্বে ভাল। আমি দিল্লিতে দু'বার গেছি, বম্বে যাইনি।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "অ্যাই, সামনেই তোর পরীক্ষা না ? তোর এখন কোথাও যাওয়া চলবে না। আমিও যাব না। কী ব্যাপার বলো তো শৈবাল, সবাই মিলে আমাকে এত ডাকাডাকি শুরু করেছে কেন ? হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে গেলাম নাকি ?"

শৈবাল বললেন, "আপনি বিখ্যাত তো বটেই। গত মাসেই টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় একটা বড় লেখা বেরিয়েছে আপনাকে নিয়ে !"

"নিশ্চয়ই অনেক কিছু বানিয়ে বানিয়ে লিখেছে ! সন্তু, তুই টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা উত্তর পাঠিয়ে দিয়ে আয় !"

"কী লিখব ?"

"শুধু লিখে দিবি, 'কাউন্ট মি আউট।' তার তলায় আমার নাম।"

শৈবাল বললেন, "টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে দিল্লি থেকে উনি ফোন করলেই তো পারতেন। আপনিও ফোনে উত্তর দিতে পারতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই ফোনে লাইন পায়নি। একটু আগে আমি বম্বে থেকে একটা কল পেলাম। বম্বে-দিল্লি এইসব লাইনই একসঙ্গে ভাল থাকবে, এ-রকম কখনও হয় আমাদের দেশে ? যাকগে, ফোন করেনি ভালই হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ঝুলোঝুলি করত ! তোমার কথা বলো শৈবাল, কেমন বেড়িয়ে এলে ? কোথায় যেন গিয়েছিলে, ময়ূরভঞ্জ ?"

শৈবাল বললেন, "না, কেওনঝড়। আমার অফিসের এক কলিগের ওখানে একটা বাড়ি আছে। খুব নির্জন জায়গায় বাড়িটা, চুপচাপ বিশ্রাম নেবার পক্ষে

চমৎকার। আমার বন্ধুর ঠাকুর্দা কেওনঝড় নেটিভ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন, এককালে ওই বাড়িটা রাজাদেরই ছিল। রাজারা ওখানে শিকার করতে যেতেন।"

"এখনও কিছু জন্তু-জানোয়ার আছে ওদিকে ?"

"হরিণ তো আছেই। লেপার্ড দেখা যায় মাঝে-মাঝে। শেয়ালের ডাক শুনেছি খুব। আজকাল তো এদিকে শেয়ালের ডাক শোনাই যায় না। পাখি আছে অনেকরকম। কত জাতের যে পাখি, নামই জানি না।"

"বাঃ, শুনে তো বেশ লোভ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে ওখানে গিয়ে কাটিয়ে আসি কয়েকদিন। চোর-ডাকাত আর বদমাস লোকেদের পেছনে ছুটোছুটি করতে আর ভাল লাগে না, তার চেয়ে পাখি দেখা অনেক ভাল।"

"আপনি যাবেন ? যে-কোনও সময়ে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। একটাই শুধু অসুবিধে, ওই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। সন্ধেবেলা হ্যাজাক জ্বালতে হয়।"

"সেটা এমন-কিছু অসুবিধের ব্যাপার নয়। দেবলীনা কেমন আছে ? ওকে নিয়ে এলে না কেন ? অনেকদিন দেখিনি ওকে !"

একটু চুপ করে গিয়ে শৈবাল একটা সিগারেট ধরাবার সময় নিলেন। কাকাবাবু তাঁর সামনে অন্য কারও সিগারেট টানা পছন্দ করেন না আজকাল, কিন্তু শৈবালের মনে থাকে না সে-কথা।

মুখ তুলে শৈবাল বললেন, "খুকি এল না...মানে, ওর একটু শরীর খারাপ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে দেবলীনার ?"

"সে-রকম কিছু হয়নি, এমনিতে ভালই আছে, তবে...কাকাবাবু, আপনার সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই, আপনার হাতে কি একটু সময় আছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক সময় আছে। এখন তো কোনও কাজই নেই। দাঁড়াও, একটু কফি খাওয়া যাক।"

সন্তু একটু আগেই চলে গেছে এ-ঘর থেকে। এখন সে বাইরে যাবার পোশাক পরে দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে মুচকি হেসে বলল, "কাকাবাবু, তোমার কাছে আবার একজন লোক এসেছে।"

কাকাবাবু ভয় পাবার ভঙ্গি করে বললেন, "আবার লোক ? একটু নিরিবিলিতে গল্প করছি শৈবালের সঙ্গে। তুই কথা বলে দ্যাখ না লোকটি কী চায় ?"

সন্তু বলল, "লোকটি তোমার জন্য কী যেন একটা জিনিস নিয়ে এসেছে। সেটা সে নিজে তোমার হাতে দেবে।"

"তা হলে ডেকে নিয়ে আয় লোকটাকে !"

খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লম্বা লোক ঢুকল, কোনও অফিসের দরোয়ান

বলে মনে হয়। হাতে বেশ বড় একটা চৌকো কাগজের বাক্স, রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়া। সে সোজা কাকাবাবুর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, "আপ রাজা রায়চৌধুরী ? ইয়ে আপকে লিয়ে হ্যায়।"

খুব সাবধানে জিনিসটি টেবিলের ওপর রেখে লোকটি কাকাবাবুকে দিয়ে সই করাবার জন্য একটা রসিদ বার করল বুক-পকেট থেকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিসনে ভেজা ?"

লোকটি বলল, "আর. কে. দত্তা সাহাব।"

কাকাবাবু রসিদটা ভাল করে পড়ে দেখলেন, তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল, তবু তিনি সই করে ফিরিয়ে দিলেন সেটা। লোকটি সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "কে পাঠিয়েছে কিছুই বোঝা গেল না। আর. কে. দত্ত যে কে, তা তো মনে পড়ছে না আমার। কিন্তু আমারই নাম-ঠিকানা লেখা। যাকগে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওটা খুলে দেখবে না ?"

কাকাবাবু চওড়াভাবে হেসে বললেন, "তোর বুঝি খুব কৌতূহল হচ্ছে ? অনেক ডিটেকটিভ-গল্পের বইতে থাকে যে, কোনও রাজা-মহারাজার কেস সল্ভ করে দেবার পর তিনি এরকম একটা বিরাট কিছু উপহার পাঠান। আমি তো কোনও রাজা-মহারাজার কেস করিনি ! আজকাল সে-রকম রাজা-মহারাজাই বা কোথায় ? আর-একটা হয়, শত্রুপক্ষের কেউ এইরকম বেশ সুন্দর মোড়কে মুড়ে একটা টাইম বোমা পাঠিয়ে দেয়। খুলতে গেলেই মুখের উপর ফাটবে।"

শৈবাল বললেন, "আমারও বেশ কৌতূহল হচ্ছে। তবে, সত্যিই যদি টাইম বোমা হয়...আপনার শত্রুর তো অভাব নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো কেউ শত্রু আছে বলে মনে পড়ে না !"

শৈবাল বললেন, "ওই লোকটাকে তক্ষুনি ছেড়ে না দিয়ে ওকে একটু জেরা করে দেখলে হত !"

কাকাবাবু বাক্সটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, কোনও শব্দ হল না। তিনি সন্তু ও শৈবালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জয় মা কালী বলে খুলে ফেলা যাক, কী বলো ? টাইম বোমার অনেক দাম, আমাকে মারবার জন্য কেউ অত টাকা খরচ করবে না।"

সুতোর বাঁধন টেনে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি, তারপর বাক্সটার মুখ খুলে দেখলেন, ভেতরে অনেকটা তুলো। খুশি মনে কাকাবাবু বললেন, "মনে হচ্ছে কেউ একটা ঘড়ি বা দামি কাচের জিনিস পাঠিয়েছে।"

তুলোটা তুলতে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। মুখের হাসিটা মুছে গেল, কুঁচকে গেল ভুরু। বাক্সটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না রে, কোনও দামি জিনিস আমার ভাগ্যে নেই। যে

পাঠিয়েছে, সে একটা ব্যাপার জানে না। আমার পা খোঁড়া কিন্তু আমার ঘ্রাণশক্তি সাঙ্ঘাতিক, অন্য অনেকের চেয়ে আমি চোখে বেশি দেখতে পাই, কানে বেশি শুনতে পাই। এমনকী, কেউ আমার সামনে মিথ্যে বললেও সেটা আমি ধরে ফেলতে পারি। এই বাক্সটায় আমি কোনও জ্যান্ত প্রাণীর গন্ধ পাচ্ছি!"

সঙ্গে-সঙ্গে শৈবাল আর সন্তু খানিকটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, চট করে রান্না ঘরে গিয়ে বউদির কাছ থেকে একটা সাঁড়াশি চেয়ে আন তো!"

সন্তু দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

শৈবাল বললেন, "জ্যান্ত প্রাণী মানে...সাপ?"

"খুব সম্ভবত। যেমনভাবে প্যাক করা হয়েছে, অন্য কোনও প্রাণী বাঁচবে না।"

"কী ডেঞ্জারাস ব্যাপার! যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে?"

"সাধারণত সাপ তেড়ে এসে কাউকে কামড়ায় না। তবে তুলোর মধ্যে আমি হাত ঢোকালে বিপদের সম্ভাবনা ছিল।"

শুধু সাঁড়াশি নয়, সন্তু একটা লাঠিও নিয়ে এসেছে।

কাকাবাবু সাঁড়াশি দিয়ে বাক্সটা চেপে ধরে, এক বগলে ক্রাচ নিয়ে চলে এলেন বারান্দায়। বাক্সটা মেঝেতে উলটে দিয়ে কয়েকবার ঠুকে-ঠুকে তুলে নিলেন।

তুলোর মধ্যে সত্যিই একটা কুণ্ডলি-পাকানো সাপ। সেটা বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ দেখেও মাথা তুলল না, ফোঁস করল না, কয়েকবার চিড়িক-চিড়িক করে জিভ বার করল শুধু।

সন্তু দমাদম লাঠির বাড়ি মারতে লাগল সেটার ওপরে। কাকাবাবু হাত তুলে বাধা দিতে গিয়েও বললেন, "এটা তো আগেই প্রায় আধমরা হয়ে আছে, মেরে ফেলাই ভাল।"

রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ছুটে এসে সন্তুর মা বললেন, "কী সাঙ্ঘাতিক কথা! একটা জ্যান্ত সাপ পাঠিয়েছে? যদি সন্তু আগেই এটা খুলে ফেলত?"

কাকাবাবু বললেন, "যে পাঠিয়েছে, সে আমাদের ঠিক মারবার জন্য পাঠায়নি, ভয় দেখাবার জন্য পাঠিয়েছে। একেই তো সাপটা নির্জীব, তাতে ওর বিষ আছে কি না সন্দেহ!"

মা চোখ কপালে তুলে বলবেন, "সাপকে কখনও বিশ্বাস আছে? এইটুকু পুঁচকে সাপেরও দারুণ বিষ থাকে। কে এমন সাঙ্ঘাতিক জিনিস পাঠাল?"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইটাই তো কথা বউদি! সে কি আর নিজের পরিচয় জানাবে? বাজে একটা নাম লিখে দিয়েছে। কিন্তু সে

তো একটা পাঠিয়েই থামবে না, আবার কিছু পাঠাবে ! তার পেছনে আমাকে দৌড়তে হবে, তাকে ধরতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। একের পর এক ঝামেলা !"

মা বললেন, "রাজা, তুমি চোর-ডাকাতদের পেছনে ছোটা ছেড়ে দাও এবার !"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ বউদি ! এসব এবার ছেড়ে দেব ভাবছি। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও যে ওরা ছাড়তে চায় না !"

মা বললেন, "কেউ এলে তুমি আর দেখা কোরো না। শুধু-শুধু শত্রু বাড়িয়ে চলেছ ! এরপর হঠাৎ যে কোন্‌দিন কী হয়ে যাবে..."

সন্তু মরা সাপটাকে লাঠির ডগায় তুলে বলল, "এবার এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নইলে আবার বেঁচে উঠতে পারে !"

শৈবাল বললেন, "রাস্তায় ফেলে দাও বরং, গাড়ির চাকার তলায় একেবারে চেপ্টে যাবে !"

মা বললেন, "কী অলক্ষুণে ব্যাপার ! বাক্সতে ভরে যে সাপ পাঠায়, সে কতখানি অমানুষ !"

কাকাবাবু বললেন, "বউদি, আমাদের দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দাও, শৈবালের সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। সন্তু, তুই পড়তে বোস গিয়ে।"

সন্তু বলল, "আমি টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিয়ে আসছি !"

কাকাবাবু আবার শৈবালকে নিয়ে ঘরে এসে বসলেন। শৈবাল আবার ফস করে জ্বাললেন একটা সিগারেট। তারপর এক হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "আপনার এখানে এরকম প্রায়ই হয় বুঝি ? বাক্সটা খুলেই যদি হাত ঢুকিয়ে দিতেন ?"

কাকাবাবু হাল্‌কাভাবে বললেন, "চার্মড লাইফ কাকে বলে জানো নিশ্চয়ই ? আমার হচ্ছে সেইরকম, মৃত্যু সব সময় আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় ! যাকগে, আজকে এমন কিছু হয়নি। শোনো শৈবাল, তুমি কিন্তু আজ ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছ !"

শৈবাল লজ্জা পেয়ে বললেন, "ওহ্‌, আই অ্যাম সরি। কাকাবাবু, ফেলে দিচ্ছি !"

"শোনো, ওটা ধরিয়েছ যখন, শেষ করতে পারো। ব্যাপার কী জানো, আমি তো চুরুট খেতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও তামাকের ধোঁয়া নাকে এলে মনটা চনমন করে।"

"ঠিক আছে, আপনার সামনে আর কোনওদিন খাব না।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব, শৈবাল ? আজ তোমাকে একটু যেন নার্ভাস মনে হচ্ছে, সিগারেট ধরাবার সময় তোমার হাতটা একটু-একটু কাঁপছিল !"

"একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তিতই আছি, কাকাবাবু ! আপনাকে সেটা

বলতেই এসেছিলাম, কিন্তু অন্য লোকজন ছিল, তারপর এই ব্যাপারটা হল !"

"এবার বলো।"

কফি এসে গেল, কফির কাপে প্রথমে দু'জনে চুমুক দিলেন। তারপর শৈবাল আস্তে-আস্তে কেওনঝড়ে দেবলীনার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সব ঘটনাটা খুলে বললেন।

মন দিয়ে শুনলেন কাকাবাবু। একেবারে শেষের দিকে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর ঘটনাটা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। এ-রকম আগে শুনেছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তোমার বর্ণনার একটা অংশ শুনে। তুমি যখন দেবলীনাকে টিলার উপর দেখতে পেলে, তখনই ঝড় উঠেছিল ?"

"হ্যাঁ, খুব ঝড় উঠেছিল !"

"তোমার ঠিক মনে আছে ? আগেই একটু-একটু ঝড় হচ্ছিল সেই সময় বাড়ল, না হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেল ?"

"আচমকা ঝড় উঠে গেল।"

"তুমিও তো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিলে, তাতে অনেক সময় মাথাটা ঠিক কাজ করে না। তোমারও ভুল হতে পারে। পরদিন সকালে তুমি ঝড়ের চিহ্ন কিছু দেখেছিলে ?"

"সেটা ঠিক খেয়াল করিনি। পরের দিনই ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম। কাকাবাবু, আপনি বলছেন, স্লিপ-ওয়াকিং আশ্চর্য কিছু নয়। আমিও তা জানি। কিন্তু দেবলীনাকে যখন ডাকলুম, ও আমাকে চিনতে পারল না কেন ? যেন ভয় পেয়ে আমার হাত ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেল !"

"সেইসময় বোধহয় কোনও স্বপ্ন দেখছিল দেবলীনা। তুমি ওকে কোথায় খুঁজে পেলে ?"

"ওর নিজের বিছানায়। আমি তো আগে সেই জঙ্গলের খানিকটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম। কোথাও ওকে না পেয়ে আমার তো পাগলের মতন অবস্থা। তখন ভাবলুম, বাড়ি ফিরে টর্চ আর রিভলভার নিয়ে আসি। ও দুটো নিয়ে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর একবার ভাবলুম, ওর বন্ধু শর্মিলাকে ডাকি। সে ঘরে উঁকি মেরে দেখি, দুটি মেয়ে পাশাপাশি ঘুমোচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দেবলীনাকে ভাল করে দেখলুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ও যে উঠে বাইরে অতদূরে গিয়েছিল, তা যেন বিশ্বাসই করা যায় না।"

"তোমার নিজের চোখের ভুল হয়নি তো ? তুমিই যদি স্লিপ-ওয়াকার হও ? তুমিই স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিলে, দেবলীনা মোটে যায়ইনি !"

"না, কাকাবাবু, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। খুকিও খালি পায়ে গিয়েছিল, আমি ঘুমন্ত খুকির পায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, পায়ের তলা ভিজে-ভিজে, বেশ

ধুলো-বালিও লেগে আছে। ও বাইরে গিয়েছিল ঠিকই, আমি ভুল দেখিনি। পরদিন সকালে ওকে যেই জিজ্ঞেস করলুম, 'খুকি, তুই কাল রাত্তিরে বাইরে গিয়েছিলি ?' ও অবাক হয়ে বলল, 'কই, না তো ?' ওর মুখ দেখেই বুঝলুম, ওর কিছুই মনে নেই। আমি আর জেরা করলুম না।"

"দিনেরবেলা সেই জায়গাটা আবার গিয়ে দেখেছিলে ?"

"না, আর দেখা হয়নি। সকাল দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম।"

"তুমি যে বললে, দেবলীনার এখন শরীর খারাপ, ওর ঠিক কী হয়েছে ?"

"সে-রকম কিছু নয়। প্রায়ই খুব মন-মরা হয়ে থাকে। একা-একা কী যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে পারে না। আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন, ওকে আমি কোনওদিন গান গাইতে শুনিনি আগে। ওর গানের গলা নেই, আর একটু যখন ছোট ছিল, তখন কিছুদিন নাচ শিখেছিল। কিন্তু সেই রাতে ও জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটা গান গাইতে শুরু করেছিল। এখনও মাঝে-মাঝে সেই গানটা গায়।"

"কী গান সেটা ?"

"কাকাবাবু, আমারও গানের গলা নেই, আমি গেয়ে শোনাতে পারব না। তবে অচেনা গান। এই ক'দিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। ডাক্তার দেখিয়েছি, আমার বন্ধু ডাক্তার, সে বলল, কিচ্ছু হয়নি। কথায়-কথায় ওষুধ খাওয়াবার দরকার নেই।"

"তুমি গাড়ি এনেছ তো শৈবাল ? চলো, তোমাদের বাড়িতে একটু ঘুরে আসি, দেবলীনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে।"

এতক্ষণ বাদে শৈবালের মুখে খুশির ঝলক দেখা গেল। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বললেন, "ঠিক এইটাই আমি চাইছিলুম, কাকাবাবু। আপনি খুকির সঙ্গে কথা বললে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। আপনি ব্যস্ত মানুষ..."

"চলো চলো, বেরিয়ে পড়া যাক !"

শৈবালের গাড়িটা পুরনো মরিস। ছোট গাড়ি, কিন্তু চলে দারুণ। বেলা এখন এগারোটা, আকাশে ঘন মেঘ। কয়েকদিন ধরেই মেঘ জমছে, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই।

বাড়ির সামনে রাস্তার ঠিক উলটো দিকে দাঁড়িয়ে দুটো লোক গল্প করছে আপন মনে। তাদের দিকে ইঙ্গিত করে কাকাবাবু বললেন, "ওই যে লোক দুটিকে দেখছ শৈবাল, ওরা নিরীহ লোক হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, ওরা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।"

শৈবাল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "দুটো লোকই বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান। পুলিশের লোক বলে মনে হয় !"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশ আর গুণ্ডাদের চেহারায় খুব মিল থাকে। লোক দুটো একবারও মুখ তুলে এদিকে তাকাচ্ছে না, তাতেই সন্দেহ হচ্ছে। ওরা

জেনে গেল যে সাপের কামড়ে আমি মরিনি। এবারে আর-একটা কিছু মতলব ভাঁজবে!"

শৈবাল গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "লোক দুটি সত্যিই কিন্তু এখন এই গাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা অন্য গাড়িতে ফলো করে কি না, সেটা একটু লক্ষ রাখো। তোমার বাড়িটা চিনে না যায়। ওরা তোমার বাড়িতে গিয়ে হামলা করুক, আমি তা চাই না।"

গাড়িটা হুশ করে খানিকটা ছুটেই ডান দিকে বেঁকল। তারপর নিউ আলিপুর ঘুরে, টালিগঞ্জের মোড় দিয়ে এসে আনোয়ার শা রোডে ঢুকল। এর মধ্যে কেউ কোনও কথা বলেননি।

শৈবাল এবার বললেন, "আমি যেভাবে চালিয়েছি, কোনও গাড়ি আমার পেছন-পেছন আসতে পারবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "এক-এক সময় কী হয় জানো তো? দুটো শত্রুপক্ষের লোক আমার ওপর নজর রাখে, তখন একজন অন্য জনকে সন্দেহ করে কিংবা পুলিশ ভেবে ভয়ও পেয়ে যায়। তখন বেশ মজার ব্যাপার হয়!"

"আপনি বলছেন মজার ব্যাপার? বাপরে বাপ, আমার যদি এরকম হত, সব সময় শত্রুপক্ষ নজর রাখছে জানতে পারলে তো আমি নাজেহাল হয়ে যেতাম! আপনি এত ধীরস্থির, হাসিখুশি থাকেন কী করে?"

"কী জানি, বোধহয় অভ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা শৈবাল, তোমরা কেওনঝড়ের ঠিক কোথায় ছিলে? ওই নামে তো একটা শহরও আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ছোট শহর। আপনি কখনও যাননি কেওনঝড়ে?"

"গিয়েছিলুম, অনেক আগে, প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর আগে। ভাল মনে নেই।"

"আমরা ছিলুম কেওনঝড়ে শহর থেকে বেশ কয়েকমাইল দূরে। সেখানে লোকজন বিশেষ থাকে না, জঙ্গল-জঙ্গল জায়গা। ওদিকে গোনাসিকা নামে একটা পাহাড় আছে। আপনি বৈতরণী নদীর নাম শুনেছেন তো? লোকে বলে, বৈতরণী নদীর জন্ম ওই পাহাড় থেকে। আমি অবশ্য পাহাড়ের ওপরে উঠিনি। নদীর উৎসের জায়গাটা নাকি ঠিক একটা গোরুর নাকের মতন দেখতে!"

"বৈতরণী মানে স্বর্গে যাবার নদী। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই এই নামের নদী আছে। অবশ্য যে-কোনও সুন্দর জায়গাই তো স্বর্গ হতে পারে। তাই না?"

গাড়িটা এসে থামল শৈবাল দত্তের বাড়ির সামনে। মাত্র বছর দু'য়েক আগে

তৈরি নতুন বাড়ি। বাড়ির প্রধান দরজার পাশে একটা চৌকো সাদা পাথরে বাড়ির নাম লেখা 'বৈতরণী'।

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "একি, তোমার বাড়ির নাম 'বৈতরণী' নাকি ? আগে তো দেখিনি ! অবশ্য তোমার বাড়িতে আমি মোটে একবারই এসেছি। সে-সময় আবার লোডশেডিং ছিল।" (লেখকের 'কলকাতার জঙ্গলে' বইতে এই প্রসঙ্গ আছে।)

শৈবাল লাজুকভাবে বললেন, "না, আগে আমার বাড়ির কোনও নামই ছিল না। এবার ফিরে এসে, কেন জানি না, ওই নামটা খুব পছন্দ হল। তাই নামটা বসিয়ে দিলুম। একটু আগে আপনি তো বললেন যে, যে-কোনও সুন্দর জায়গাই স্বর্গের মতন মনে হতে পারে। নিজের বাড়ির চেয়ে আর সুন্দর জায়গা কী হতে পারে, বলুন ? সেই ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলুম। চড়ুইপাখি আর বাবুইপাখির ঝগড়া ? চড়ুইপাখি মানুষের বাড়ির এক কোণে বাসা বেঁধে থাকে, ঝড়-জলে কষ্ট পেতে হয় না। আর বাবুইপাখির নিজের তৈরি বাসা তালগাছ-টালগাছে ঝোলে, খুব বেশি ঝড়বৃষ্টি হলে খসে পড়ে যায়। সেইজন্যেই ওই কবিতাটিতে চড়ুইপাখি বলছে, 'আমি থাকি মহা সুখে অট্টালিকা 'পরে।' আর বাবুইপাখি বলছে, 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।' আপনি পড়েননি ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি বটে।"

"আমার বাড়িটাও বাবুইয়ের বাসা বলতে পারেন। একেবারে নিজ হাতে গড়া। এ-বাড়ির নকশা, ব্লু-প্রিন্ট থেকে শুরু করে মিস্তিরি খাটিয়ে একটার পর একটা ইট গাঁথা, সবই আমি নিজে করেছি। কিন্তু বাড়িটা শেষ হবার আগেই দেবলীনার মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। দেবলীনাও এ-বাড়িটা তেমন পছন্দ করে না। এখন ভাবছি, কী করি এই বাড়িটা নিয়ে !"

সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শৈবাল চেঁচিয়ে ডাকলেন, "খুকি, খুকি, নীচে নেমে আয়। দ্যাখ, কে এসেছেন !"

দু'তিনবার ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা।

শৈবাল ব্যস্তভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পিসিমা, খুকি কোথায় ? বেরিয়ে গেছে নাকি ?"

পিসিমা বললেন, "কই, না তো ! আমাকে তো কিছু বলে যায়নি !"

শৈবাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "তা হলে সাড়া দিচ্ছে না কেন ? সদর-দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। রঘুটাই বা কোথায় গেল ?"

পিসিমা বসলেন, "এই মাত্র আমি রঘুকে একটু বাজারে পাঠালুম। এতক্ষণ দরজা বন্ধই ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, শৈবাল ? দ্যাখো, দেবলীনা

হয়তো বাথরুমে গেছে, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে, তোমার ডাক শুনতে পায়নি।"

শৈবাল বললেন, "আপনি বসুন, কাকাবাবু, আমি ওপরে গিয়ে দেখছি! মেয়েটার ধরন-ধারণ দেখে আমার সত্যি চিন্তা হয়!"

দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেলেন শৈবাল। বারবার ডাকতে লাগলেন, "খুকি, খুকি!"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে বসবার ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললেন। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন দেবলীনাকে। সে একটা খোলা জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরে। লাল রঙের ফ্রক পরা, তার সারা মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

কাকাবাবু নরম করে ডাকলেন, "দেবলীনা!"

দেবলীনা চমকে মুখ ফেরাল। কয়েক মুহূর্ত সে যেন চিনতে পারল না কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কেমন আছিস রে, দেবলীনা?"

দেবলীনা চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বলল, "কাকাবাবু? আমাকে ও ডাকছে, আমাকে ও ডাকছে! ওই যে, ওই যে..."

৩

সন্তু দারুণ রাগারাগি করতে লাগল। এ-পর্যন্ত প্রত্যেকবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে গেছে। এবারে সে বাদ পড়ে যেতে কিছুতেই রাজি নয়।

কাকাবাবু এক কথা বলে দিয়েছেন, এবারে সন্তু তাঁর সঙ্গে যাবে না। আর মাত্র সাতদিন বাদে সন্তুর পরীক্ষা। তার পড়াশুনো নষ্ট করা চলবে না।

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "ভারী তো পরীক্ষা! টিউটোরিয়াল টেস্ট, ওটা না দিলেও এমন কিছু ক্ষতি হয় না!"

কাকাবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "উঁহু, তোর ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন এই পরীক্ষা দেবে, তখন তোকেও দিতে হবে। তোর বন্ধু জোজো, অরিন্দম, এরা সব পরীক্ষা দেবে, আর তুই ফাঁকি মারবি, তা কি হয়? তা ছাড়া, এবার তো আমি কোনও রহস্যের সন্ধানে যাচ্ছি না, যাচ্ছি বিশ্রাম নিতে। তুই সেখানে গিয়ে কী করবি?"

মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথা শুনছেন। কাকাবাবুর খোঁড়া পা নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে অসুবিধে হতে পারে বলেই প্রথম-প্রথম সন্তুকে তাঁর সঙ্গে পাঠানো হত। এই প্রথম কাকাবাবু একা যেতে চাইছেন।

মা বললেন, "রাজা, তুমি বলছ তো বিশ্রাম নিতে যাচ্ছ। কিন্তু তোমার কথায় কি বিশ্বাস আছে? ওখানে গিয়ে আবার কী একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে বসবে! সেই যে কথায় আছে না, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "বঙ্গে তো যাচ্ছি না। যাচ্ছি ওড়িশায়। খুব নিরিবিলি জায়গা। দিন-পনেরো থেকে ফিরে আসব!

মা বললেন, "পড়াশুনো ফেলে সন্তুটাকে এবার তোমার সঙ্গে জোর করে পাঠাতেও পারছি না! রাজা, তুমি কিন্তু সত্যি এবারে সাবধানে থেকো। সেবারে আফ্রিকাতেও তো তুমি বিশ্রামের নাম করে গিয়েছিলে। তারপর সে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, প্রাণে বেঁচে গেছ নেহাত ভাগ্যের জোরে!"

কাকাবাবু বললেন, "ভাগ্য নয় বউদি, মনের জোর। তোমার ছেলেরও খুব মনের জোর। যাই হোক, এবারে সন্তু যাচ্ছে না, এবারে কোনও বিপদের ঝুঁকিই নেব না আমি। সন্তু সঙ্গে না থাকলে সত্যি আমার অসুবিধে হয়। এবারে সেইজন্যে শুধু খাব-দাব আর বই পড়ব। দেখছ না, কুড়িখানা বই নিয়ে যাচ্ছি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি সঙ্গে ওই পুঁচকে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছ, দেখো, ওই মেয়েটাই তোমাকে কোনও গণ্ডগোলে ফেলবে!"

কাকাবাবু বললেন, "পুঁচকে মেয়ে বলছিস কী? দেবলীনার পনেরো বছর বয়েস হল! ওর খুব বুদ্ধি!"

"বুদ্ধি মানে শুধু দুষ্টু বুদ্ধি! আমি না থাকলে তুমি ওকে সামলাতেই পারবে না!"

"একটা কাজের কথা শোন্, সন্তু। আমাকে যারা উপহার পাঠিয়েছিল, তারা আরও হয়তো ওই রকম কিছু পাঠাবার চেষ্টা করবে। ওই রকম প্যাকেট-ট্যাকেট এলে নিবি না। ফিরিয়ে দিবি। যদি পোস্টে আসে কিংবা কেউ বাড়ির দরজার কাছে রেখে চলে যায়, না-খুলে এক বালতি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিবি।"

মা বললেন, "ওই রকম প্যাকেট আবার কেউ নিয়ে এলেই আমি তাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব!"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝে-মাঝে বুকপোস্টে আমার বইপত্র আসে বিদেশ থেকে। তা বলে তুমি আবার পোস্টম্যানদের পুলিশে ধরিয়ে দিও না, বউদি! সন্তু, বইয়ের প্যাকেট এলে তুই যেন সেটাকেও জলে ডুবিয়ে দিস না!"

সন্তু বলল, "বইয়ের প্যাকেট দেখে আমি ঠিকই চিনতে পারব।"

মা কাকাবাবুর বাক্স গুছোতে বসে গেলেন।

শৈবাল গাড়ির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাকাবাবুর ট্রেনে যাবার ইচ্ছে। কাউকে তো আর তাড়া করে যাওয়া হচ্ছে না, বেড়াবার পক্ষে ট্রেনই ভাল। আজকাল সহজে ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা যায় না, কাকাবাবুর নাম করে ভি. আই. পি. কোটা থেকে চেয়ার কার-এ দু'খানা টিকিট পাওয়া গেল।

জানলার ধারে মুখোমুখি দু'খানা সিট। এখন সকাল দশটা। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দেবলীনাকে আজ দারুণ খুশি দেখাচ্ছে। তার ফ্রকটা সোনালি রঙের, মাথায় একটা ওই রঙের রিবন। সেও সঙ্গে অনেকগুলো বই এনেছে।

দু'তিনটে স্টেশন যাবার পরেই কাকাবাবু একটি বাদামওয়ালাকে ডেকে দু'ঠোঙা বাদাম কিনলেন। দেবলীনাকে একটা ঠোঙা দিয়ে বললেন, "ট্রেনে যাবার সময় আমার কিছু-না-কিছু খেতে ইচ্ছে করে। কতদিন বাদে এরকম নিশ্চিন্ত মনে ট্রেনে করে বেড়াতে যাচ্ছি!"

দেবলীনা বলল, "আমার ঝাল-নুনটা বেশি ভাল লাগে। আর-একটু ঝাল-নুন চেয়ে নাও না, কাকাবাবু!"

বাদাম ভাঙতে-ভাঙতে কাকাবাবু বললেন, "ঝাল-নুনে আর সেরকম ঝাল থাকে না আজকাল! আগে একটুখানি মুখে দিলেই 'উঃ আঃ' করতে হত।"

কাকাবাবুর পাশের সিটে একজন কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। লোকটির বয়েস খুব বেশি মনে হয় না। তার গায়ের জামাটি বিচিত্র, অনেকগুলি নানা রঙের টুকরো-টুকরো ছিটকাপড় সেলাই করে জোড়া। মাথায় বাবরি চুল। সেই লোকটি কাকাবাবুর কথা শুনে বলল, "ঠিক বলেছেন! আজকাল কাঁচালঙ্কাতেও সেরকম ঝাল নেই। আমরা ছেলেবেলায় যেসব ধানিলঙ্কা খেয়েছি, সে-রকম তো আর দেখাই যায় না!"

নতুন লোকের সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে নেই কাকাবাবুর, তাই তিনি লোকটির কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

একটু বাদে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তারের ওপর ওই যে কালো-কালো পাখি দেখছি, মাঝে-মাঝে, ল্যাজটা মাছের মতন, ওগুলো কী পাখি?"

কাকাবাবু বললেন, "ওইগুলো হচ্ছে ফিঙে। মজার ব্যাপার কী জানিস, আমি তো অনেক বনে-জঙ্গলে ঘুরেছি, কোথাও ফিঙে দেখিনি। শুধু রেললাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারের ওপরেই এই পাখিগুলো দেখা যায়!"

পাশের দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, "অনেকটা ঠিক বলেছেন। তবে আর কোথায় ফিঙে দেখা যায় জানেন? গণ্ডারের শিঙে। গণ্ডারের সঙ্গে এই পাখিগুলোর খুব ভাব। ইচ্ছে করলে পদ্য বানানো যায়:

গণ্ডারের শিঙে
নাচছে একটা ফিঙে।
গণ্ডারের সর্দি হল,
ফিঙে কোথায় উড়ে গেল!"

দেবলীনা হেসে ফেলল ফিক করে।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "মশায়ের তো অনেক কিছু জানা আছে দেখছি। গণ্ডারের সর্দি পর্যন্ত দেখে ফেলেছেন?"

লোকটি খুব অবাক হয়ে বলল, "অবশ্যই দেখেছি। আপনি দ্যাখেননি? এই

যে বললেন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছেন ? গণ্ডারের সর্দি অতি আশ্চর্য ব্যাপার। গণ্ডারের কাতুকুতুর কথা জানেন তো ? কাতুকুতুতে গণ্ডারের খুব সুড়সুড়ি লাগে। আজ আপনি কাতুকুতু দিলে গণ্ডার সাত দিন পরে হাসবে। সর্দির ব্যাপারটাও তাই। গণ্ডার যদি জুন মাসে খুব বৃষ্টিতে ভেজে, সর্দি হবে সেপ্টেম্বর মাসে।"

কাকাবাবু স্বীকার করলেন, গণ্ডার সম্পর্কে তাঁর এত জ্ঞান নেই।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "গণ্ডার আমার খুব ফেভারিট প্রাণী। ইচ্ছে আছে, বাড়িতে একটা গণ্ডার পুষব।"

দেবলীনার পাশে একজন বৃদ্ধ চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে বসে আছেন। তিনি কাগজটা নামিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটাকে চশমার ওপর দিয়ে একবার দেখে নিয়ে আবার কাগজ পড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি গণ্ডার এত স্টাডি করলেন কোথায় ?"

"ওড়িশায়। বাড়ি থেকে প্রায়ই তো জঙ্গলে যাই।"

"ওড়িশার জঙ্গলে গণ্ডার আছে নাকি ?"

"কেন থাকবে না ? আসামে থাকতে পারে, বেঙ্গলে থাকতে পারে, তবে ওড়িশা কী দোষ করল ? আপনি সিমলিপাল ফরেস্ট দেখেছেন ?"

"তা দেখিনি বটে, কিন্তু সেখানে গণ্ডার আছে, এমন কখনও শুনিনি।"

"লোকে অনেক কিছু জানে না। ইন্ডিয়ার কোথায় জিরাফ আছে জানেন ? শোনেননি নিশ্চয়ই ! ওই সিমলিপাল ফরেস্টেই আছে। তাই নিয়েও পদ্য আছে আমার :

সিমলিপালের জিরাফ
লম্বা গলায় টানছে শুধু সিরাপ !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, আপনি তো বেশ পদ্য বানাতে পারেন দেখছি। ওড়িশায় থাকেন কোথায় ?"

লোকটি হঠাৎ একগাল হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, "জিজ্ঞেস তো করলেন কথাটা ! এখন আমি কোথায় থাকি, সে-জায়গাটার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন ? আমি থাকি কিচিংয়ে। কিচিং কোথায় জানেন, নাম শুনেছেন ? মুখ দেখেই বুঝতে পারছি শোনেননি। তা বলে কিচিং বলে কি কোনও জায়গা নেই ? এককালে ময়ূরভঞ্জের রাজাদের রাজধানী ছিল এই কিচিং !"

কাকাবাবুও হেসে ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, প্রথমে নামটা শুনে বুঝতে পারিনি। কিচিং শুনে মনে হচ্ছিল আপনি ঠাট্টা করছেন। এখন মনে পড়ছে, কিচিং নামে একটা জায়গা আছে ওড়িশায়। অনেক ভাঙা-চোরা মন্দির আছে সেখানে, তাই না ?"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "হুঁ। তবে আমি অবশ্য ওখানে বিশেষ থাকি না। কাজের জন্য সব সময় নানা জায়গায় দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। একবার বাংলা, একবার বিহার, কখনও কখনও রাজস্থান। পাঞ্জাব থেকেও ডাক আসে।

"কী কাজ করেন আপনি ?"

"আমার কাজ...আমার কাজ...ইয়ে...সেটা ঠিক যেখানে সেখানে বলা যায় না ! তবে আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনাকে বলা যেতে পারে। কিন্তু কানে-কানে বলতে হবে !"

লোকটি কাকাবাবুর কানের কাছে নিজের মুখখানা আনবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বিব্রতভাবে বললেন, "না, না, গোপন কথা যদি কিছু হয়, আমি শুনতে চাই না !"

লোকটি তবু কাকাবাবুর কাঁধ চেপে ধরে বলল, "আরে না, না, শুনুন, আমার গুরুর নিষেধ আছে বলেই কানে-কানে ছাড়া বলতে পারি না !"

কানে-কানে বলা মানে কিন্তু আস্তে বলা নয়। লোকটি কাকাবাবুর কানের কাছে মুখ এনে পাঁচজনকে শুনিয়ে বলল, "আমার কাজ হচ্ছে ভূত ধরা। বুঝলেন ?"

কাকাবাবু নিজের মাথাটাকে মুক্ত করে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বুঝলুম। বাঃ, ভাল কাজই তো করেন আপনি !"

দেবলীনার পাশের বুড়ো লোকটি এবারে খবরের কাগজ নামিয়ে বললেন, "ভূত ধরেন মানে, আপনি কি ওঝা ? ভুতুড়ে বাড়ি থেকে আপনি ভূত তাড়াতে পারেন ?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সেটাই আমার পেশা।"

বুড়ো লোকটি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তা হলে...তা হলে...আপনাকে তো আমার খুবই দরকার। চন্দননগরের গঙ্গার ধারে আমার একটা বাড়ি আছে, বুঝলেন। মাঝে-মাঝে এক-একটা রাত্তিরে সেখানে একটা অদ্ভুত খারাপ গন্ধ বেরোয়। সে যে কী বিশ্রী পচা গন্ধ, কী বলব ! সে-গন্ধের চোটে কিছুতেই টেকা যায় না। লোকে বলে, ওটা নাকি ভূতের গায়ের গন্ধ ! বাড়িটা খালি রাখতে হয়েছে।"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হয়, এরকম হয়। ওরা আছে এক জাতের ওই রকম গন্ধওয়ালা ! গন্ধটা অনেকটা পচা তেঁতুলের মতন না !"

বৃদ্ধটি বললেন, "অ্যাঁ, মানে, পচা তেঁতুলের গন্ধ কী রকম হয় ঠিক জানি না। তবে খুবই খারাপ গন্ধ। আপনি পারবেন ব্যবস্থা করে দিতে ? তা হলে খুবই উপকার হয়।"

"পারব না কেন, এইসবই তো আমার কাজ। আমি গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করি, তারপর পয়সা নিই।"

"তা হলে কবে আসবেন বলুন ! আপনার যা ফি লাগে আমি দেব !"

লোকটি এবার দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, "কবে ? সেই তো মুশকিল। আমি এখন হেভিলি বুক্‌ড। অন্তত এগারোটা কেস হাতে আছে। প্রত্যেকটা কেসে যদি পাঁচদিন করে লাগে, তা হলে পাঁচ-এগারোং সাতাত্তর দিন লাগবে..."

কাকাবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "পাঁচ-এগারোং পঞ্চান্ন হয় বোধহয়..."

লোকটি বলল, "ওই একই হল। মোট কথা, দু'তিন মাস আমি ব্যস্ত। তারপর আপনার কেসটা নিতে পারি। আপনার নাম-ঠিকানা দিন, আমি পরে জানিয়ে দেব।"

বৃদ্ধ লোকটি পকেট থেকে কাগজ বার করে ঠিকানা লিখতে লাগলেন।

দেবলীনা এতক্ষণ সব শুনছিল। এবারে সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "ভূত কীরকম দেখতে হয় ?"

লোকটি একগাল হেসে বলল, "ভূত তো দেখাই যায় না। তার আবার কীরকম সে-রকম নাকি ? গন্ধ শুঁকে, আওয়াজ শুনে বুঝতে হয় !"

দেবলীনা আবার জিজ্ঞেস করল, "ভূত কখনও মানুষ সেজে আসে না ?"

লোকটি বলল, "ওইটি একদম বাজে কথা ! গাঁজাখুরি গল্প যতসব ! যারা ওইসব রটায়, তারা সব বুজরুক, বুঝলে মামণি ? আমি ওই সব নকল ভূতের কারবার করি না !"

কাকাবাবু এবারে লোকটির পিঠ চাপড়ে বললেন, "আপনি খুব গুণী লোক দেখছি। আপনার নামটা জানতে পারি ? আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী।"

লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী ! নামটা কেমন যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি বলুন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "খুব কমন নাম। আরও অনেকের হতে পারে। অন্য কোথাও শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই।"

"তা হতে পারে। আমার নাম দারুকেশ্বর ওঝা। আসল পদবি কিন্তু উপাধ্যায়। যেমন চতুর্বেদী এখন হয়ে গেছে চৌবে, সেইরকম উপাধ্যায় থেকে ওঝা ! আমার নাম আপনি আগে শুনেছেন কখনও ?"

"আপনি খুব বিখ্যাত লোক বুঝি ?"

"আমার লাইনে আমি অল ইন্ডিয়া ফেমাস। যদিও খবরের কাগজে নাম ছাপা হয় না। গুরুর নিষেধ আছে।"

"এদিকে কতদূর যাচ্ছেন ? নিজের বাড়ি ফিরছেন ?"

"না, মশাই, বাড়ি যাবার টাইমই পাই না। এখন যেতে হচ্ছে কেওনঝড়, ওখানে একটা কেস আছে। খুব শক্ত কেস।"

জায়গাটার নাম শুনে কাকাবাবুর সঙ্গে দেবলীনার চোখাচোখি হল। জ্বলজ্বল

করে উঠল দেবলীনার চোখ।

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তো ভালই হল। আমরাও ওখানে বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে থেকে আপনার কাজের পদ্ধতিটা দেখার সুযোগ পেতে পারি কি ?"

দেবলীনা বলল, "আমি দেখব, আমি দেখব।"

দারুকেশ্বর বলল, "তা যদি ভয়-টয় না পাও, তা হলে দেখাব তোমাকে, মামণি !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলুম, দারুকেশ্বরবাবু। আপনি ভূত-প্রেত ধরার কাজ করেন, আবার বনে-জঙ্গলেও প্রায়ই যান বললেন। আপনার দেখছি অনেক দিকে উৎসাহ।"

দারুকেশ্বর বলল, "বনে-জঙ্গলে আমাকে যেতে হয়, নানারকম শিকড়-বাকড়ের সন্ধানে। আমার কাজের জন্য লাগে। আমি জন্তু-জানোয়ারও খুব ভালবাসি। ওদের স্টাডি করি। ওদের নিয়ে ছড়া বাঁধি। আর-একটা শুনবেন ?"

"শোনান।"

"মুখখানা কালো ল্যাজের বাহার
ওর নাম কী ?
গন্ধমাদন কাঁধে তুলেছিল
হনুমাঙ্কি !"

"বাঃ বাঃ ! হনুমাঙ্কি ! এই শব্দটা আপনার নিজস্ব ?"

"এরকম কত শব্দ আমি বানিয়েছি ! একটা আশ্চর্য ব্যাপার কী জানেন মশাই, গন্ধমাদন পাহাড়ে গেলে এখনও দেখবেন, সেখানে অনেক হনুমান ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা সেই আসল হনুমানের বংশধর।"

কাকাবাবু সত্যিই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গন্ধমাদন পাহাড় ? সেটা আবার কোথায় ? সে-রকম কোনও পাহাড় আছে নাকি ?"

দারুকেশ্বর ভুরু তুলে বলল, "সে কী মশাই, আপনি কেওনঝড় যাচ্ছেন, আর গন্ধমাদন পাহাড়ের কথা জানেন না ? কেওনঝড় টাউন থেকে মাইল দশেক দূরেই তো এই পাহাড়। রাম-লক্ষ্মণের চিকিৎসার জন্য অরিজিনাল হনুমান এই গোটা পাহাড়টা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ওষুধ পত্তরের খোঁজ করতে আমাকে ওই পাহাড়ে প্রায়ই যেতে হয়।"

কাকাবাবুর চোখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠতে দেখে দেবলীনার পাশের বুড়ো ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, "আছে, আছে, ওড়িশায় গন্ধমাদন পাহাড় আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, অনেক কিছু শেখা যাচ্ছে। আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনি জন্তু-জানোয়ারের নামে ছড়া বানান, ভূতদের নিয়ে কোনও ছড়া

খানাননি ?"

দারুকেশ্বর এবার চোখ কুঁচকে রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "আছে, আছে। অনেক আছে। কিন্তু সেসব শুধু ওদের জন্য। ওগুলোই তো আমার মন্ত্র। আপনারা সেগুলো শুনলে কিসে কী হয় বলা যায় না! এ তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়!"

দারুকেশ্বরের সঙ্গে গল্প করতে-করতে চমৎকার সময় কেটে গেল। লোকটার কোন্ কথাটা যে সত্যি আর কোন্টা গুল, তা বোঝা শক্ত, কিন্তু গল্প করতে পারে বেশ জমিয়ে। দেবলীনারও বই পড়া হল না, সে আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল দারুকেশ্বরের কথা।

মাঝখানে যখন দুপুরের খাবার দিয়ে গেল, তখন দারুকেশ্বর তার খাবারের প্লেটটা কোলের ওপর নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বার করল, তার মধ্যে জলের মতন কী যেন রয়েছে। শিশির ছিপি খুলে সেই জল খানিকটা ছড়িয়ে দিল তার খাবারের ওপর।

কাকাবাবু কৌতূহলের সঙ্গে তাকালেন সে-দিকে, কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

দারুকেশ্বর নিজেই বলল, "এটা কী জানেন? এটা হল বরেহিপানি জলপ্রপাতের মন্ত্রঃপূত জল। এটা ছিটিয়ে নিলে খাবারের সব দোষ কেটে যায়। আমার শত্রুর তো অভাব নেই, কে কখন খাবার নষ্ট করে দেয় বলা তো যায় না!"

শিশিটা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি নেবেন একটু?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমার দরকার নেই। আমার তো শত্রু নেই কেউ।"

দারুকেশ্বর বলল, "আমার শত্রুদের আবার চোখে দেখা যায় না। এখন এই ট্রেনের কামরার মধ্যেও দু'একটা ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। আচ্ছা ওরা কেউ আছে কি না একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

অন্য পকেটে হাত দিয়ে দারুকেশ্বর একটা শুকনো হরীতকী বার করল। সেটা দু'আঙুলে ধরে অন্যদের দেখিয়ে বলল, "এই যে দেখছেন, এটা কী? একটা হর্তুকি, এটা ওই অশরীরীদের খুব প্রিয় খাদ্য। আমি এটা ছুঁড়ে দিচ্ছি, যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হলে বুঝবেন, এক ব্যাটা রয়েছে এখানে।"

আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন দারুকেশ্বরের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। দারুকেশ্বর হাতটা একবার মুঠো করে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েই আবার মুঠো খুলল। হাতে কিছু নেই, হরীতকীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে!

দারুকেশ্বর বলল, "দেখলেন? আছে এখানে এক ব্যাটা। তবে খুব নিরীহ আর হ্যাংলা। যারা ট্রেনে কাটা পড়ে মরে, তারা অনেক সময় চলন্ত ট্রেনের কামরায় ঘুরঘুর করে। তবে কারও ক্ষতি করে না। এই, যা, যা, তোকে খেতে

তো দিয়েছি, এবার যা ! নইলে কিন্তু বেঁধে ফেলব !”

ভূত থাক বা না থাক, কাকাবাবু বুঝলেন, দারুকেশ্বর হরীতকীটা নিয়ে যা করল, সেটা একটা সরল ম্যাজিক। একসময় তিনিও কিছু শখের ম্যাজিক শিখেছিলেন। ছোটখাটো জিনিস অদৃশ্য করার খেলা তিনিও দেখাতে পারেন। একবার ভাবলেন, পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তিনিও সেটাকে অদৃশ্য করে দেবেন অন্যদের সামনে।

তারপর ভাবলেন, না থাক। দারুকেশ্বরের খেলা দেখে অন্যরা বেশ মুগ্ধ হয়েছে। কী দরকার সেটা ভাঙার ! লোকটিকে তাঁর বেশ পছন্দই হয়েছে। আর যাই হোক, লোকটা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন নয় !

যাজপুর-কেওনঝড় রোড রেল স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছল সন্ধের সময়। এখান থেকে কেওনঝড় শহর একশো কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দূর। বাসে প্রচণ্ড ভিড়, তাতে কাকাবাবু উঠতে পারবেন না। শৈবাল বলে দিয়েছিলেন, স্টেশনেই জিপ বা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

একটা গাড়ি ভাড়া করার পর কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে বললেন, “আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি ? আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।”

দারুকেশ্বর বলল, “তা হলে তো ভালই হয়। আমাকে স্টেশনে নিতে আসার কথা ছিল। কই, তাদের তো দেখছি না। হয়তো আরও তিনঘন্টা পরে আসবে। এখানকার লোকেরা ভাবে কী জানেন, সব ট্রেনই তিন-চার ঘন্টা লেট করে !”

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “আপনারা কেওনঝড়ে কোথায় উঠবেন ? সার্কিট হাউসে ?”

কাকাবাবু বললেন, “না, আমাদের জন্য একটা বাড়ি ঠিক করা আছে। শহর থেকে খানিকটা দূরে, গোনাসিকা পাহাড়ের দিকে। আগেকার রাজাদের আমলের বাড়ি।”

দারুকেশ্বর চমকে উঠে বলল, “আগেকার রাজাদের আমলের বাড়ি ? স্বর্ণ-মঞ্জিলে ?”

দেবলীনা বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়িটার নাম ‘স্বর্ণ-মঞ্জিল’। গেটের সামনে যেখানে নামটা লেখা, সেখানে ‘ম’-টা উঠে গেছে, স্বর্ণ-ঞ্জিল হয়ে আছে !”

দারুকেশ্বর বলল, “আজ রাতে আপনারা সেই হানাবাড়িতে গিয়ে থাকবেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “হানাবাড়ি কেন হবে ? ওখানে তো লোকজন থাকে ! পাহারাদার আছে।”

“ও-বাড়ির কাছে দিনের বেলাই তো ভয়ে অনেকে যেতে পারে না।”

“সে কী ? এই দেবলীনাই তো কয়েকদিন আগে ওখানে থেকে গেছে !”

“সত্যি ? মামণি, তুমি ওখানে কোনও খারাপ গন্ধ পাওনি ?”

দেবলীনা মাথা নেড়ে বলল, “কই, না তো !”

দারুকেশ্বর বলল, “গন্ধ পাওনি ? তা হলে বিচ্ছিরি শব্দ শুনেছ নিশ্চয়ই ?”

দেবলীনা বলল, “না, সেরকম কোনও শব্দও শুনিনি।”

“হায়নার কান্নার মতন শব্দ শোনোনি রাত্তিরের দিকে ?”

“হায়নার কান্না কীরকম, তা তো আমি জানি না !”

কাকাবাবু বললেন, “আমি হায়নার হাসির কথা জানি, হায়নার কান্নার কথা আমিও কখনও শুনিনি !”

দারুকেশ্বর প্রায় ধমক দিয়ে বলল, “যে হাসতে পারে, সে কি কখনও কাঁদে না ? হায়নারা শুধু সারাজীবন হেসেই যাবে ? যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা। হায়নারা আলবাত কাঁদে।”

দেবলীনা বলল, “আমি কোনও কান্নার আওয়াজই শুনিনি !”

দারুকেশ্বর বলল, “হায়নার কান্না হচ্ছে কলাগাছের সঙ্গে কলাগাছের ঘষা লাগার শব্দের মতন। এই শব্দটা চিনতে হয়, সহজে বোঝা যায় না।”

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত ভেবে দেখলেন, কলাগাছ কি দোলে যে ঘষা লাগবে ? কে জানে !

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি ওই বাড়িটার কথা শুনে চমকে উঠলেন কেন দারুকেশ্বরবাবু ? ওই বাড়িটা সম্পর্কে আপনি কিছু শুনছেন ?”

দারুকেশ্বর বলল, “শুনেছি মানে, ও-বাড়ি সম্পর্কে কত গল্প আছে, তা এদিককার কে না জানে ? ও-বাড়িতে অশরীরীরা গিসগিস করছে।”

“বাঃ, তা হলে তো আপনার পোয়া বারো ! আপনি টপাটপ তাদের ধরে ফেলবেন।”

“আমি কেন ধরতে যাব ! ও বাড়ির মালিক কি আমাকে কল্ দিয়েছেন ? আমাকে কাজের জন্য কল্ না দিলে আমি ওদের ডিসটার্ব করি না। আপনাদের পক্ষে ও-বাড়িতে রাত কাটানো উচিত হবে না। আপনারা সার্কিট হাউসে থাকুন। ওখানে জায়গা না পান, হোটেল আছে।”

দেবলীনা বলল, “না, আমরা ওখানেই থাকব। খুব ভাল বাড়ি। হোটেল-টোটেলে থাকতে আমার পচা লাগে !”

কাকাবাবু বললেন, “হায়নার কান্না কিংবা কলাগাছের হাসি তো দেবলীনা...”

দারুকেশ্বর বলল, “কলাগাছের হাসির কথা আমি বলিনি, দুই কলাগাছের ঘর্ষণ...”

“হ্যাঁ, ওরকম কোনও শব্দই তো দেবলীনা শুনতে পায়নি। আমি চেষ্টা করে দেখি শোনা যায় কি না ! যদি ওরা কেউ আসে, রামনাম করার বদলে আপনার নাম করব। আপনাকে নিশ্চয়ই ওরা সবাই চেনে !”

“তা চিনবে না কেন ? তবে আপনারা যদি থাকতেই চান ওখানে, তা হলে দোতলার দক্ষিণ কোণে একটা ঘর আছে, সেটাতে অন্তত রাত্তিরে ঢুকবেন না।

ও-ঘরটা খুবই খারাপ !”

“কেন, কী হয়েছে সে-ঘরে ? সেখানে কিছু আছে ?”

“সে-কথা আজ রাত্তিরে আপনাদের বলতে চাই না। পরে তো আবার দেখা হবেই, তখন সব খুলে বলব।”

শহরে ঢুকে দারুকেশ্বর নেমে গেল একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে। সেখানে দু'তিনটে হোটেল আছে। সাড়ে আটটা বাজে, এর মধ্যেই রাস্তায় মানুষজন অনেক কম। রাস্তায় আলো নেই, তবে আকাশে কিছুটা জ্যোৎস্না আছে।

গাড়িতে পেট্রোল নিতে হবে, তাই খানিকটা দেরি হল। তারপর ড্রাইভারটি কাকাবাবুর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করল। 'স্বর্ণ-মঞ্জিল' আরও অনেক দূর, সেখানে যাবার জন্য তাকে আরও বেশি টাকা দিতে হবে। ফেরার সময় তাকে একা আসতে হবে, এই রাস্তায় ডাকাতের ভয় আছে।

কাকাবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশি দেব, তা হলেই ডাকাতের ভয় কমে যাবে। এবার চলো।”

শহর ছাড়াবার পরই পাতলা-পাতলা জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে রাস্তা। বড় রাস্তা ছেড়ে আর-একটি সরু রাস্তায় ঢুকল গাড়িটা। এদিকে আর একটাও গাড়ি নেই। এখানে ডাকাতি করতে গেলেও খুব ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে ডাকাতদের। কখন একটা গাড়ি আসবে তার ঠিক নেই, হয়তো সারা সন্ধেতে একটা গাড়িও এল না।

একসময় দেবলীনা বলে উঠল, “ওই যে !”

বাড়ি তো নয় একটা প্রাসাদ। এই আধো-অন্ধকারে সেটাকে দেখাচ্ছে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মতন। সে-বাড়ির কোথাও এক বিন্দু আলো নেই।

গেটের খুব কাছ পর্যন্ত গাড়িটা যাবে না, বেশ কিছু আগাছা জন্মে গেছে সেখানে। গাড়িটা থামবার পরই দেবলীনা ছুটে গেল গেটের কাছে। কাকাবাবু মালপত্র নামাতে লাগলেন, ড্রাইভারটি ব্যস্তভাবে বলল, “আমায় ছেড়ে দিন, স্যার। এই রাস্তায় একলা ফিরতে হবে... দেরি হলে খুব মুশকিলে পড়ে যাব...”

কাকাবাবু তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। গাড়িটা চলে যেতেই পুরো জায়গাটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার !

৪

দেবলীনা বড় গেটটার গায়ে দুমদুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, “দুর্যোধন ! গেট খোলো ! মনোজবাবু ! শশাবাবু ! গেট খুলে দিতে বলুন !”

কেউ সাড়া দিল না। কাকাবাবু একটা একটা করে সুটকেস বয়ে নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার, এরা টেলিগ্রাম পায়নি না কি ? দুটো টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে !”

দেবলীনা বলল, "নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। এরা বড্ড তাড়াতাড়ি ঘুমোয় !"

"সে কী, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে ? ওদের যে রান্না করে রাখতে বলা হয়েছে। আমরা আসবার আগেই ঘুমোবে ?"

"সন্ধের পর এক ঘন্টা জেগে থাকতেও এদের কষ্ট হয়। আগেরবার দেখেছি তো !"

এবার দু'জন মিলে ধাক্কা দিতে লাগলেন গেটে। চতুর্দিকে এমন নিস্তব্ধ যে, এই শব্দ বেশ ভয়ঙ্কর শোনাল, তবু কোনও মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না।

মিনিটদশেক বাদে কাকাবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা বোধহয় টেলিগ্রাম পায়নি !"

দেবলীনা বলল, "বাবা নিজে আর বাবার বন্ধুও একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, তার একটাও পাবে না ?"

"টেলিগ্রাম না পাওয়ার একটা কারণ হতে পারে, হয়তো পোস্টম্যান এসে ফিরে গেছে। এ-বাড়িতে কোনও মানুষই থাকে না !"

"হ্যাঁ, থাকে ! একজন দরোয়ান, একজন কেয়ারটেকার আর একজন পুরনো কর্মচারী। আমি আগেরবার এসে দেখেছি তাদের !"

"তখন তারা ছিল, এখন নেই ! আমরা এত চ্যাঁচামেচি করছি, এতে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যাবার কথা !"

"তা হলে কী হবে, কাকাবাবু ?"

"ড্রাইভারটা তাড়াহুড়ো করে চলে গেল, না হলে আজকের রাতের মতন শহরে ফিরে যাওয়া যেত। দারুকেশ্বর ঠিক পরামর্শই দিয়েছিল। যাই হোক, এখন তো আর ফেরা যাবে না ! হ্যাঁ রে দেবলীনা, এ-বাড়িতে ঢোকার দরজা নেই ?"

"পেছন দিকে আর-একটা দরজা দেখেছি। সেটা সবসময় বন্ধ থাকে। একবার দেখব সেখান থেকে ডাকলে কেউ শুনতে পায় কি না ?"

কাকাবাবু পকেট থেকে টর্চ বার করে বললেন, "এটা নিয়ে যা ! দেখিস, সাবধান, সাপ-টাপ থাকতে পারে !"

দেবলীনা চলে যাবার পর কাকাবাবু দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলেন। পুরনো আমলের দরজা হলেও বেশ মজবুত। বাইরে তালা নেই, ভেতর থেকে বন্ধ। তা হলে ভেতরে নিশ্চিত কোনও মানুষ থাকার কথা !

কাকাবাবু পেছন ফিরে দেখলেন। খানিকটা ফাঁকা জায়গার পরেই জঙ্গলের রেখা। এককালে রাজারা নিরিবিলিতে থাকার জন্য এই জায়গায় বাড়ি বানিয়েছিলেন। নিরিবিলিতে থাকার জন্যও রাজারা সঙ্গে অনেক লোকজন নিয়ে আসতেন। এখন এইরকম জায়গায় এত বড় বাড়ি কে দেখাশুনো করবে ?"

শেষ পর্যন্ত গেট না খুললে কি সারারাত বাইরে কাটাতে হবে ? একটু শীত-শীত করছে !

বড় গেটটার এক পাশে, নীচের দিকে একটা ছোট দরজা খুলে গেল, সেখান থেকে মুখ বার করে দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, এইদিক দিয়ে এসো !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ভেতরে ঢুকলি কী করে ?"

"পেছন দিকে দেখি যে, এক জায়গায় পাঁচিল একদম ভাঙা ! এই গেটে তালা দেবার কোনও মানেই হয় না ।"

কাকাবাবু মাথা নিচু করে সেই ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। সুটকেসগুলো ভেতরে আনলেন। তারপর দু'হাত ঝেড়ে বললেন, "কী চমৎকার অভ্যর্থনা রে ! এই বাড়িতে থাকতে হবে ?"

"আগের বারে কিন্তু খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। কোনও অসুবিধে হয়নি !"

কাকাবাবু টর্চটা নিয়ে আলো ফেলে সারা বাড়িটা দেখলেন। এত বড় বাড়িতে দু'চারটে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকলে বোঝার সাধ্য নেই। এ-বাড়ি পাহারা দেবার জন্য অনেক লোক দরকার, সেইজন্যই বোধহয় কেউই পাহারা দেয় না।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবু জোর-গলায় বললেন, "বাড়িতে কেউ আছে ?"

দেবলীনা ডাকল, "দুর্যোধন ! শশাবাবু !"

এবারে একটা কোণ থেকে শব্দ শোনা গেল...উঁ উঁ উঁ উঁ !

দেবলীনা কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল।

কাকাবাবু বললেন, "ভূত নাকি রে ? দারুকেশ্বরকে জোর করে ধরে আনা উচিত ছিল। আমি কোনওদিন ভূত দেখিনি, এবারে সেটা ভাগ্যে ঘটে যাবে মনে হচ্ছে।"

দু'তিন ধাপ সিঁড়ির পর লম্বা টানা বারান্দা। আওয়াজটা আসছে ডান দিকের একটা কোণ থেকে, সেই দিকেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। টর্চটা জ্বেলে রেখে কাকাবাবু সেই দিকে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই ভূতের ভয় পাস নাকি ?"

কাকাবাবুর হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে দেবলীনা বলল, "না !"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ? কে ওখানে ?"

এবারে উঁউঁ শব্দটা আরও বেড়ে গেল। বোঝা গেল, শব্দটা আসছে সিঁড়ির পাশের একটা ঘর থেকে। একটা ক্রাচ তুলে তিনি ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন।

ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন লোক, ধুতি আর গেঞ্জি পরা। লোকটির মাথায় একটাও চুল নেই। টাক না ন্যাড়ামাথা, তা ঠিক বোঝা যায় না।

দেবলীনা বলে উঠল, "এ তো শশাবাবু !"
কাকাবাবু বললেন, "ভূত নয় তা হলে ? এঃ হে !"
দেবলীনা লোকটির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, "শশাবাবু ! ও শশাবাবু ! কী হয়েছে আপনার ?"
লোকটি এবারে মুখ ফিরিয়ে বলল, "মেরে ফেললে ! মেরে ফেললে ! ওগো, আমাকে বাঁচাও ! বাঁচাও !"
দেবলীনা বলল, "আপনাকে কে মেরে ফেলবে ? এখানে তো আর কেউ নেই !"
লোকটি বলল, "কে ! তুমি কে মা ?"
"আমি দেবলীনা ! মনে নেই আমাকে ? কয়েকদিন আগেই তো আমি এসেছিলুম !"
"তুমি...তুমি সেই সুন্দর দিদিমণি ? তুমি এসে আমাকে বাঁচালে। ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করেনি তো ?"
"ওরা মানে কারা ?"
"কী জানি, দিদিমণি, তা কি জানি ! ওরা আমার গলা টিপে মারতে এসেছিল। আমি আর এখানে চাকরি করব না। ওরে বাপ রে বাপ, প্রাণটা বেরিয়ে যেত আর একটু হলে !"
"দুর্যোধন, মনোজবাবু, এঁরা সব গেলেন কোথায় ?"
"পালিয়েছে বোধহয়। আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আমি রান্না করছিলুম, বুঝলে দিদিমণি, হঠাৎ ওপরতলায় ধুড়ুম-ধাড়াম, ধুড়ুম-ধাড়াম ! ওরে বাপ, ঠিক যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ! সে কী আওয়াজ ! আমি 'কে রে, কে রে' বলে উঠতেই দেখি মনোজবাবু দৌড়ে পালাচ্ছে। দুর্যোধন ব্যাটা বোধহয় আগেই লম্বা দিয়েছিল। তারপর ওপর থেকে কারা যেন দুদ্দাড় করে নেমে এল...এই দ্যাখো, এখনও আমার বুকটা হাপরের মতন ধড়াস-ধড়াস করছে !"
"তারপর ? তারপর কী হল ?"
"আমাকে গলা টিপে মারতে এল গো দিদিমণি ! মনোজবাবু কীরকম নিমকহারাম বলো ! ওকে আমি কতরকম রান্না করে খাওয়াই, আর সেই লোক কিনা বিপদের মুখে আমায় ফেলে পালিয়ে গেল !"
"আমরা যে আসব, আপনারা জানতেন না ? টেলিগ্রাম পাননি ?"
"হ্যাঁ, পেয়েছি। তোমাদের জন্যেই তো আমি রান্না করছিলুম গো !"
কাকাবাবু বললেন, "যাক, এতক্ষণে একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। রান্নাটান্নাগুলো আছে তো ? নাকি ওই শুম্ভ-নিশুম্ভরা খেয়ে গেছে ?"
দেবলীনা বলল, "শশাবাবু, ইনি কাকাবাবু ! এবারে কাকাবাবু এসেছেন, আর কোনও ভয় নেই।"

শশাবাবু উঠে বসে চোখ গোল-গোল করে বলল, "নমস্কার ! আপনারা এ-বাড়িতে থাকতে এলেন, হায় পোড়াকপাল, এখানে যে আপনাদের যত্ন-আত্তি করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। আগে কত কিছু ছিল ! তার ওপর এখন আবার এইসব উপদ্রব !"

দেবলীনা বলল, "আমরা যে গত মাসে এলুম, তখন তো ওপরে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ শুনতে পাইনি ?"

শশাবাবু বলল, "মাঝে-মাঝে হয়। এই তো মাস-ছয়েক বাদে আবার শুরু হল। সেবারে তোমাদের বলিনি, ভয়-টয় পাবে...কলকাতার দাদাবাবুকে চিঠি লেখা হয়েছে, উনি কিছুই করছেন না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা আপনাকে গলা টিপে মারতে এসেছিল বললেন। তারপর কী হল, আপনাকে মারল না কেন ?"

শশাবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "অ্যাঁ ? কী বললেন ?"

"ওরা আপনাকে গলা টিপে মারতে এসেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল কেন ?"

"ছেড়ে দিল...মানে...আপনি চান ওরা আমাকে মেরে ফেললেই ভাল হত ?"

"না, না, আমি তা চাইব কেন ? আমি জানতে চাইছি যে, কারা সব যেন আপনাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে এল, তারপর কী হল ? তারা এমনি-এমনি চলে গেল ?"

"তা জানি না। তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম !"

"তাদের চোখে দেখেছেন ? কীরকম দেখতে ?"

"অন্ধকার হয়ে গেল যে ! সব বাতি নিভে গেল। শুধু আওয়াজ শুনেছি, বিকট আওয়াজ ! ওঃ, ওঃ, কানে তালা লেগে গিয়েছিল..."

কাকাবাবু দু'বার জোরে-জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, "ঘরের মধ্যে একটা গন্ধ পাচ্ছিস, দেবলীনা ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি ! কিসের গন্ধ বলো তো !"

"গন্ধ আর আওয়াজ ! তাই দিয়েই ওদের চেনা যায়, দারুকেশ্বর এই রকমই বলেছিল না ? তা হলে, শশাবাবু, আপনি দয়া করে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কাল বাজার থেকে কয়েক প্যাকেট ধূপ কিনে আনবেন। ধূপের গন্ধ অনেক গন্ধ ঢেকে দেয়। আমরা কোন্ ঘরে থাকব ?"

"ঘর তো অনেকই আছে। যে-ঘরে ইচ্ছে থাকতে পারেন। তবে ওপরতলায় কী হয়ে গেছে, তা জানি না !"

"দেখুন, আমার একটা পা খোঁড়া। বারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে আমার অসুবিধে হয়। আমি একতলাতেই থাকতে চাই। একতলায় যদি পাশাপাশি দু'খানা ঘর থাকে, তাতে আমি আর দেবলীনা থাকতে পারি।"

দেবলীনা বলল, "না, কাকাবাবু, একতলার ঘরগুলো কীরকম দিনের বেলাতে অন্ধকার। ওপরের বারান্দা থেকে চমৎকার বৃষ্টি দেখা যায়। আমরা ওপরেই

থাকব। তুমি বেশি ওপর-নীচ করবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "শশাবাবু, আপনাদের লণ্ঠন, বা হ্যাজাক কিছু নেই? অন্ধকারের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?"

শশাবাবু বলল, "হ্যাঁ, হ্যারিকেন, হ্যাজাক, সবই তো থাকার কথা। দুর্যোধন ব্যাটা কোথায় যে গেল! দেখছি, রান্নাঘরের আলোটা যদি জ্বালা যায়!"

"আপনি আলো জ্বালান। ততক্ষণ দেবলীনা আর আমি ওপরতলাটা দেখে আসি!"

শশাবাবু আবার ভয় পেয়ে বলল, "না স্যার, আমায় একা ফেলে যাবেন না! একা থাকলেই আমার মাথা ঘুরবে!"

হঠাৎ ওপরতলায় ঘট-ঘট-ঘট-ঘট করে একটা আওয়াজ হল। যেন একটা ভারী কিছু জিনিস গড়াচ্ছে। সেই আওয়াজে শশাবাবু ভয় পেয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "ওই যে, শুনলেন? শুনলেন? আবার শুরু হল!"

দেবলীনা অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে বলল, "আমি ওপরে যাব। আমি ওপরে গিয়ে দেখব!"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ওপরে তো একবার যেতেই হয়। দেবলীনা, তুই টর্চটা ধর্। আমার ঠিক ডান পাশে থাকবি। শশাবাবু, আপনি তো একা নীচে থাকতে পারবেন না। আপনি আমাদের পেছনে পেছনে আসুন!"

শশাবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এখন ওপরে যাবেন না! ওরা বড় সাঙ্ঘাতিক...কী থেকে কী হয়ে যায় বলা যায় না!"

কাকাবাবু বললেন, "কী থেকে কী হয়, সেটাই তো আমার খুব দেখার ইচ্ছে। নিন, চলুন!"

হাতব্যাগ থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে, তার ডগায় দু'বার ফুঁ দিয়ে বললেন, "অশরীরীদের গায়ে তো গুলি লাগে না। তবে মানুষের মূর্তিধারী যদি কেউ থাকে, তাদের জন্য এটা হাতে রাখা দরকার! সিঁড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠবি, তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই!"

বেশ চওড়া কাঠের সিঁড়ি, একপাশে কারুকার্য করা রেলিং। একসময়ে পুরো সিঁড়িতেই কার্পেট পাতা ছিল, এখন তা ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে, কয়েক জায়গায় তার চিহ্ন দেখা যায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওদের পায়ের শব্দ হতে লাগল।

ওপরের আওয়াজটা থেমে গেছে।

দোতলায় ওঠবার ঠিক মুখে কাকাবাবু থমকে গিয়ে দেবলীনাকে বললেন, "আলো ফেলে আগে গোটা বারান্দাটা দেখে নে।"

অনেকটা লম্বা বারান্দা, টর্চের আলো শেষ পর্যন্ত ভাল করে পৌঁছয় না। তারই মধ্যে যতদূর মনে হল, বারান্দায় কেউ নেই। খানিকটা দূরে কিছু একটা গোল-মতন জিনিস পড়ে আছে।

শশাবাবু বলল, "মু-মু-মু-মু-মুণ্ডু! ওই যে একটা মু-মু-মুণ্ডু!"

কাকাবাবু বললেন, “কার মুণ্ডু বলুন তো। চলুন, দেখা যাক!”

সে-দিকে পা বাড়াবার আগে কাকাবাবু রিভলভারটা উঁচু করে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, “এখানে যদি কেউ লুকিয়ে থাকো, সামনে এগিয়ে এসো! কোনও ভয় নেই! আমরা কোনও শাস্তি দেব না!”

তারপর তিনি দেবলীনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, “ভূত-টুত যদি থেকেও থাকে, অনেক সময় তারাও মানুষকে ভয় পায়, বুঝলি! সব মানুষ যেমন সাহসী হয় না, সেইরকম সব ভূতও সাহসী হতে পারে না!”

তারপর তিনি শশাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভয় পেলে মানুষের চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে যায় বুঝি? ওই জিনিসটাকে আপনি একটা মুণ্ডু বললেন কী করে? ওটা তো একটা ফ্লাওয়ার ভাস!”

বারান্দাটার রেলিংয়ের দিক ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন কাকাবাবু। সারি-সারি ঘরগুলির সব ক'টারই দরজা বন্ধ। দেওয়াল থেকে দুটো ছবি খসে পড়ে গেছে, এখানে-ওখানে ভাঙা কাচ ছড়ানো। মেঝেতে যেটা গড়াচ্ছে, সেটা একটা নীল রঙের গোল চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস, তার পাশে আর-একটা ফুলদানি ভাঙা।

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে এই ব্যাপার!”

শশাবাবু বলল, “ওরা ভেঙেছে! ওরা এখানে দাপাদাপি করেছে!”

“সেই ওরা-দেরই তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধের দিকে এখানে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল?”

“আজ্ঞে না! বৃষ্টি মাত্র কয়েক ফোঁটা, আর একটু জোরে হাওয়া দিয়েছিল শুধু!”

এই সময় একতলায় কে যেন ডেকে উঠল, “শশাদা! ও শশাদা! বাবুরা এসেছেন?”

দেবলীনা বলল, “ওই তো দুর্যোধন! দুর্যোধনের গলা!”

রেলিংয়ের কাছে গিয়ে বলল, “এই যে, আমরা ওপরে। দুর্যোধন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?”

তলা থেকে উত্তর এল, “দিদিমণি, তোমরা এসে গেছ! আমি তোমাদের গাড়ি দেখবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ!”

কাকাবাবু বললেন, “ওকে বল্, একটা বাতি জ্বেলে নিয়ে ওপরে আসতে। আমাদের গাড়ি দেখতে গিয়ে ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল!”

তারপর তিনি শশাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “গেট বন্ধ থাকতেও আপনার ওই দুর্যোধন আর মনোজবাবু বাইরে চলে গেল কী করে?”

শশাবাবু এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে। সে বলল, “বড় গেট তো বরাবরই বন্ধ থাকে, স্যার। পেছন দিক দিয়ে যাওয়া-আসার ব্যবস্থা আছে।”

“তা হলে বাইরের যে-কোনও লোকও পেছন দিক দিয়ে এ-বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে?”

"বাইরের লোক এদিকে কেউ আসে না, স্যার ! আমরা ক'জন আছি শুধু চাকরির দায়ে ।"

দেবলীনা একটা ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে বলল, "আমি আর শর্মিলা এই ঘরে ছিলাম । আর পাশের ঘরটায় বাবা ।"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ তো ঘরের মধ্যে চেয়ার আছে কি না । তা হলে বারান্দায় একটু বসা যাবে !"

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেবলীনা দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে ? ওখানে...ওরে বাবা, ওরে বাবা..."

কাকাবাবু এক লাফে দরজার কাছে এসে দেখলেন, ঘরের মধ্যে এক কোণে দুটো আগুনের ভাটার মতন জ্বলন্ত চোখ । তিনি আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে পরপর দুটো গুলি চালালেন । সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল ।

শব্দটি শুনেই কাকাবাবু আফশোসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইস, ছি ছি ছি ছি, একটা প্যাঁচাকে মেরে ফেললাম ! দেবলীনা, তুই এমন ভয় পেয়ে চ্যাঁচালি, তোর হাতে টর্চ রয়েছে, ভাল করে দেখে নিতে পারলি না ?"

ঘরের এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষা একটা বড় আলমারি, সেই আলমারির মাথায় বসে ছিল প্যাঁচাটা। কাকাবাবু কাছে গিয়ে দেখলেন, মেঝেতে পড়ে তখনও পাখিটা ছটফট করছে । বেশ বড় আকারের একটা ভুতুমপ্যাঁচা, দু'দিকে অনেকখানি ডানা ছড়ানো ।

দেবলীনা প্যাঁচাটাকে ধরতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তাকে সরিয়ে এনে বললেন, "এখন আর ওর গায়ে হাত দিস না । মরণ-কামড় দিতে পারে । ওর আর বাঁচার আশা নেই !"

এক হাতে একটা লণ্ঠন, অন্য হাতে একটা লাঠি নিয়ে একজন রোগা, লম্বা লোক ঘরে ঢুকে বলল, "কেয়া হুয়া ? কেয়া হুয়া ?"

দেবলীনা বলল, "দুর্যোধন, ঘরের মধ্যে একটা মস্ত বড় প্যাঁচা ঢুকে বসে ছিল কী করে ?"

দুর্যোধন কাছে গিয়ে বলল, "আহা রে ! এ বেচারি তো ছাদে থাকে !"

কাকাবাবু বললেন, "বৃষ্টির সময় ঘরে ঢুকে এসেছে । জানলা তো খোলাই দেখছি । মেঝেতে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে ।"

দুর্যোধন এগিয়ে এসে ডানা ধরে প্যাঁচাটাকে উঁচু করে তুলল । এর মধ্যেই তার স্পন্দন থেমে গেছে ।

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "দুর্যোধন, মনোজবাবু কোথায় ?"

"মনোজবাবু তো সাতদিনের ছুটিতে গেছেন । কাল বিকেলে আসবেন ।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? এই যে শশাবাবু বললেন, কারা সব ওপরে মারামারি করছিল, তাই দেখে তুমি আর মনোজবাবু ভয়ে পালিয়েছ শশাবাবুকে

একা ফেলে। তারা শশাবাবুর গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল!"

দুর্যোধন বলল, "শশাদা, তুমি আজ আবার অনেক গাঁজা খেয়েছ?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, নীচের ঘরে সেই গন্ধটাই পেয়েছিলাম!"

শশাবাবু বলল, "মোটেই খাইনি, দুটো টান মোটে দিয়েছি। তোকে যে দেখলুম দৌড়ে চলে যেতে!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা এমন প্যানিক সৃষ্টি করেছিলেন, যার জন্য প্যাঁচাটা মরল। আমি পাখি মারা মোটেই পছন্দ করি না। ভুতুমপ্যাঁচার চোখ অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে সবারই ভয় লাগে।...শুধু শুধু দুটো গুলিও খরচ হয়ে গেল!"

দুর্যোধন প্যাঁচাটাকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। কাকাবাবু শশাবাবুকে বললেন, "আপনি এবার খাবার গরম করুন। কয়েকটা ঘরে তালা বন্ধ দেখলাম। চাবিগুলো কার কাছে আছে?"

শশাবাবু টাক-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "সে-সব ওই দুর্যোধনের কাছে থাকে। আমি রান্নাবান্না করি। দুর্যোধন মিথ্যে কথা বলেছে, ও ভয় পেয়েই পালিয়েছিল! ওপরে ছবির কাচগুলো ভাঙল কে? ফুলদানিটা কি আপনা-আপনি বারান্দায় গড়াচ্ছিল!"

একটু বাদে দুর্যোধনকে ডেকে সব ক'টা ঘরের দরজা খুলে দেখা হল। কোনও ঘরেই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। ঘরগুলোতে অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি বোঝা যায়। কাকাবাবু প্রত্যেকটি ঘরের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

দক্ষিণ দিকের একেবারে কোণের ঘরটির সামনে এসে দুর্যোধন বলল, "এটা বাবু তোশক-ঘর!"

কাকাবাবু বললেন, "তালাটা খোলো।"

"কত্তাবাবুরা এই ঘর খুলতে বারণ করেছেন। এর চাবি আমার কাছে নাই, মনোজবাবুর কাছে আছে বোধকরি।"

"তোমার কলকাতার বাবু যে আমাদের বলে দিয়েছেন, আমরা এ-বাড়ির যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারি? আমি এই ঘরটাও দেখতে চাই। মনোজবাবু কি চাবি সঙ্গে নিয়ে গেছেন? তাঁর ঘরে চাবি আছে কি না দেখে এসো!"

দুর্যোধন খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে নীচে চলে গেল।

কাকাবাবু দেবলীনাকে বললেন, "এ যেন ঠিক রূপকথার মতন। দক্ষিণের কোণের ঘরে যাওয়া নিষেধ! দারুকেশ্বরও এই ঘরটা সম্পর্কে আমাদের সাবধান করেছিল না রে?"

"হ্যাঁ, এই ঘরটা! আমরা আগেরবার এসেও এই ঘরটা খোলা দেখিনি।"

"দারুকেশ্বর ওই কথাটা কেন বলেছিল জানিস? যাতে আমরা এই ঘরটাই

ভাল করে দেখি। বারণ করলেই বেশি করে কৌতূহল জাগে তাই না ?”

“থাকার জন্য এই ঘরটাই তো সবচেয়ে ভাল মনে হচ্ছে। বারান্দার এই পাশটা থেকে দেখা যায় একটা পুকুর, তার ওপারে একটা শিবমন্দির। বেশ বড় মন্দিরটা, ভেতরে অন্ধকার-অন্ধকার।”

“পুকুর আছে, বাঃ ? এদের কাছে যদি বঁড়শি পাওয়া যায়, তা হলে আমি কাল দুপুরে মাছ ধরতে বসব ! আচ্ছা দেবলীনা, এই বাড়িটার উলটো দিকে যে জঙ্গলটি রয়েছে, তার মধ্যে একটা বালির টিলা আছে। তাই না ?”

“জঙ্গলের মধ্যে টিলা আছে ? তুমি কী করে জানলে ?”

“তোর বাবার কাছে শুনেছি। তুই সেই টিলাটার ওপরে উঠেছিস ?”

“না তো !”

“আগেরবার এসে উঠিসনি ? সেখান থেকে কি অনেক দূর দেখা যায় ?”

“আমি দেখিনি তো টিলাটা !”

“দেখিসনি ? ও, ঠিক আছে, তুই আর আমি দু'জনে মিলে এবারে দেখতে যাব।”

এই সময় দুর্যোধন আর-একটি চাবির গোছা নিয়ে এল। তার মধ্যে থেকে একটা চাবি বেছে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “আপনি খুলুন, বাবু !”

“কেন, তোমার আপত্তি কিসের ?”

“এই ঘরে আমাদের মেজো-রাজাবাবুর মেয়ে চম্পা...সে মরে গেল তো ! সোনার প্রতিমা ছিল, বড় সুন্দর ছিল...অনেকটা এই দিদিমণির মতন দেখতে...”

“কী হয়েছিল তার ?”

“আর বাবু বলবেন না সে-কথা। মনে পড়লেই বড় কষ্ট হয় ! তারপর থেকে মেজো-রাজাবাবু আর এলেনই না এ-বাড়িতে।”

কাকাবাবু তালাটা খুললেন। দুর্যোধনের কাছ থেকে আলোটা নিয়ে পা বাড়ালেন ভেতরে। ঘরটা লেপ, তোশক, বালিশে প্রায় ভর্তি। অনেকগুলো ঘরের বিছানা এখানে জড়ো করে রাখা আছে। খুব ন্যাপথলিনের গন্ধ।

কাকাবাবু বেশ নিরাশই হলেন ঘরটা দেখে। এই ? অন্তত কিছু চামচিকেও যদি ওড়াউড়ি করত, তা হলেও গা'টা একটু ছমছম করতে পারত।

দেবলীনা আর দুর্যোধন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কাকাবাবু বললেন, “এই ঘরটায় শোওয়া যাবে না রে ! এখানে যে বিছানার পাহাড়। এত বিছানা সরাবে কে ?”

দেবলীনাও খানিকটা হতাশভাবে বলল, “এ-ঘরে আর কিছু নেই ?”

কাকাবাবু বললেন, “দক্ষিণের কোণের ঘরে শুধু কতকগুলো বিছানা-বালিশ ? ছি ছি ছি ! চল দেবলীনা, এখানে আর থাকার দরকার নেই !”

দুর্যোধন কাকাবাবুদের শোওয়ার ঘরটা খানিকটা গোছগাছ করে দিল। কয়েকখানা চেয়ার এনে পাতা হল বারান্দায়। দেবলীনা ও কাকাবাবু পোশাক

বদলে এসে বসলেন সেখানে। এখন দোতলায় একটি জোরালো হ্যাজাকবাতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আকাশে কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে জ্যোৎস্না। রাত্তিরে আবার বৃষ্টি হবে মনে হয়।

শশাবাবু একটু পরেই খাবার নিয়ে এল ওপরে। ভাত, ডাল, পটলের তরকারি আর ডিমের ঝোল। রান্নার স্বাদ অবশ্য মন্দ নয়। দেবলীনা ডিম পছন্দ করে না, সে বেশি ভাত খেতে চাইল না।

দোতলাতেই বাথরুম, জলের কল আছে, কিন্তু কলে জল নেই। ওপরের ট্যাঙ্কে জল ভরা হয়নি। দুর্যোধন মগে করে জল নিয়ে এসেছে।

হাত-টাত ধুয়ে কাকাবাবু দু'শো টাকা বার করে একশো একশো করে দিলেন দুর্যোধন আর শশাবাবুকে। দু'জনকেই বললেন, "কালই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে জল ভরা চাই। ভাল করে বাজার করে আনবে। ডিম দেবে শুধু ব্রেকফাস্টের সময়। দুপুরে মাছ আর রাত্তিরে মাংস। বাজার কত দূরে?"

দুর্যোধন বলল, "বাজার তো বাবু ছ'মাইল দূরে। সাইকেলে যেতে হয়।"

শশাবাবু মিনমিন করে বলল, "আপনি টাকা দিচ্ছেন? বাজারের টাকা স্যার মনোজবাবু দিয়ে গেছেন। অতিথিদের খরচ এস্টেট থেকে দেওয়া হয়! অনেক ডিম আর আলু কেনা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "টাকাগুলো রাখো তোমাদের কাছে। আমি সঙ্গে কফি এনেছি। শিশিটা নিয়ে যাও, রাত্তির বেলা খাওয়ার পর আমার এক কাপ কফি লাগে।"

দুর্যোধন আর শশাবাবু চলে যাওয়ার পর দেবলীনা একখানা বই খুলে বসল। কাকাবাবু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ, তার মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল শেয়ালের ডাক। একটা শেয়াল সামনের জঙ্গলের একদিক থেকে ডাকল, অন্যদিক থেকে আর-একটা শেয়াল যেন তার উত্তর দিল।

একটু বাদে কাকাবাবু বললেন, "দেবলীনা, তোকে একটা কথা বলি। আগেরবার যখন এসেছিলি, তখন পর-পর দু'দিন তুই মাঝরাতে জেগে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলি। সে-কথা তোর একটুও মনে নেই, তাই না?"

দেবলীনা একটু চমকে উঠে বলল, "না। বিশ্বাস করো, কিচ্ছু মনে নেই। বাবা আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার নিজেরই তো বিশ্বাস হচ্ছে না। ঘুমের মধ্যে কেউ হাঁটতে পারে? চোখ খোলা থাকে, না চোখ বোজা?"

"চোখ বুজে হাঁটা অসম্ভব! চোখ খুলেই হাঁটে, তবে ঘুমের ঘোর থাকে। আচ্ছা, সেবারে এসে তুই এখানে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলি? কোনও কারণে ভয় পেয়েছিলি?"

"না, কিচ্ছু হয়নি। খুব ভাল লেগেছিল। সে জন্যই তো আবার আসতে ইচ্ছে হল।"

"সেবারে ওই দক্ষিণের কোণের ঘরটা খুলিসনি ? চম্পা বলে যে একটি মেয়ে ওই ঘরে মারা গিয়েছিল, সে-কথাও শুনিসনি ?"

"না, কেউ বলেননি। সেবারে মনোজবাবু অনেক শিকারের গল্প বলেছিলেন আমাদের। মনোজবাবুর সঙ্গেই আমরা জঙ্গলে গেলুম বেড়াতে। এই শশাবাবু মনোজবাবুকে খুব ভয় পায়। মনোজবাবু থাকলে কাছে আসে না।"

"তা হলে তুই যে সেদিন বললি, তোর মাঝে-মাঝে মনে হয়, কেউ তোকে হাতছানি দিয়ে মাঝে-মাঝে ডাকে, তাকে তুই প্রথমে কোথায় দেখলি ?"

"সে একটা মেয়ে, মনে হয় ঠিক আমারই বয়েসি। সাদা ফ্রক পরা। হাসি-হাসি মুখে হাতছানি দিয়ে বলে, 'এসো, এসো !' তাকে আমি প্রথমে দেখি, এ-বাড়ির পেছনে পুকুরের পাশে যে শিবমন্দিরটা, তার দরজার কাছে। আমাকে হাতছানি দিয়ে সে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে আর তাকে দেখতে পেলুম না। সেবারে তো আমার সঙ্গে আমার বন্ধু শর্মিলা ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিস ?' ও বলল, 'কই না তো ?' তা হলে নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আমি আরও তিন-চারবার দেখেছি। কলকাতাতেও দেখেছি। একটা মেয়ে সত্যি-সত্যি আমায় ডাকে, একটু পরেই মিলিয়ে যায়।"

"কোনও গল্পে এরকম কোনও মেয়ের কথা পড়েছিস ? অনেক সময় গল্পের চরিত্রও খুব সত্যি মনে হয়। আমি যখন ছোট ছিলুম, আমার খুব প্রিয় বই ছিল 'দ্য হাঞ্চব্যাক অফ নত্‌রদাম'। ওর মধ্যে কোয়াসিমোদো বলে যে চরিত্রটা আছে, তার কথা আমি প্রায়ই ভাবতুম, তারপর সত্যি-সত্যি একদিন জগুবাবুর বাজারে যেন মনে হল, কোয়াসিমোদোকে দেখতে পেলুম ভিড়ের মধ্যে। আর একদিন তাকে দেখলুম ব্যাণ্ডেল চার্চে। একটু উঁকি মেরেই সে পালিয়ে গেল। আরও কয়েকবার এরকম দেখেছি। তোরও সেরকম হচ্ছে না তো ?"

"কী জানি, তা হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু, ওই মেয়েটিকে দেখলে আমার একটুও ভয় করে না। বরং ও কী দেখাতে চায়, সেটা দেখতে ইচ্ছে করে।"

"ঠিক আছে, আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমিয়ে রেস্ট নেওয়া যাক, কাল সন্ধেবেলা আমি তোর ওপর একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট ?"

"একসময় আমি শখ করে কিছুটা ম্যাজিক, হিপনোটিজ্‌ম এই সব শিখেছিলুম। লন্ডনে যখন পড়াশুনো করতে গিয়েছিলুম, তখন একবার ভিয়েনায় বেড়াতে গিয়ে ডঃ যোহান এঙ্গেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি কে জানিস ? ফ্রয়েডের নাম শুনেছিস ? সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মানুষের মনের চিকিৎসার যুগান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ-যুগের একজন প্রধান মানুষ। ওই যোহান এঙ্গেল হলেন সেই ফ্রয়েড সাহেবের এক

মেয়ের ছেলে, সাক্ষাৎ নাতি যাকে বলে ! ভদ্রলোক তখনই বেশ বুড়ো, কিন্তু হিপনোটিজ্‌ম জানেন খুব ভাল। মানুষকে আস্তে-আস্তে ঘুম পাড়িয়ে তার মনের কথা বার করে আনেন। আমি তাঁর চ্যালা হয়ে গিয়েছিলুম কিছুদিনের জন্য। সত্যি হিপনোটাইজ করলে মানুষ ঘুমের মধ্যে এমন সব কথা বলে, যা তার অন্য সময় মনে থাকে না। কাল তোকে আমি হিপনোটাইজ করে দেখব। তুই ভয় পাবি না তো ?"

"না, ভয় পাব কেন ?"

এই সময় শশাবাবু কাকাবাবুর জন্য এক কাপ কফি নিয়ে এল। দেবলীনার জন্য এক গেলাস দুধও এনেছে।

দেবলীনা দুধ দেখে হেসে ফেলল। বলল, "আমি কচি খুকি না কি, যে রাত্তিরে দুধ খাব ?"

শশাবাবু বলল, "খেয়ে নাও দিদিমণি, এখানকার দুধ খুব খাঁটি, কলকাতায় এরকম পাবে না। রাত্তিরে ভাল ঘুম হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা শশাবাবু, তুমি এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছ ?"

কিছু একটা চিন্তা করতে হলেই শশাবাবু মাথায় হাত বুলোয়। তাতে যেন তার বুদ্ধি নাড়াচাড়া খায়। কয়েকবার মাথায় হাত বুলিয়ে হিসেব করে সে বলল, "তা বাবু, হল ঠিক সাতাশ বছর। প্রথমে কাজ পেয়েছিলুম রাজাবাবুদের কটকের বাড়িতে। তারপর বড়-রাজাবাবু বুড়ো বয়েসে এই বাড়িতেই এসে ছিলেন, তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। বড়-রাজাবাবু তো মারা গেলেন এ-বাড়িতেই !"

"রাজারা ক'ভাই ছিলেন ?"

"পাঁচ ভাই। তার মধ্যে বেঁচে আছেন মাত্র দু'জন। ছোট-রাজাবাবু থাকেন ভুবনেশ্বরে আর মেজো জন কলকাতায়। এখন তো আর প্রায় কেউ আসেই না। শুধু-শুধু বাড়িটা ফেলে রেখেছেন আর আমাদের মাইনে গুনছেন।"

"বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন না কেন ?"

"এত বড় বাড়ি এই জঙ্গলের দেশে, কে কিনবে ? মেজো রাজাবাবু চেয়েছিলেন বাড়িটা গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে, কলেজ বা হাসপাতাল করার জন্য। ছোট-রাজাবাবু তাতে রাজি নন। তাঁর টাকা চাই।"

"দুই ভাইতে ভাব আছে ?"

"রাজাবাবুদের মধ্যে খুব ভাব। ছোট-রাজাবাবু টাকা চাইলে মেজো-রাজাবাবু দিতে কখনও আপত্তি করেন না শুনেছি। বড়-রাজাবাবুর ছেলে, তিনিও থাকেন কলকাতা, সেই বড়-কুমারবাবুও মেজো-রাজাবাবুকে খুব ভক্তি করেন। তবে মেজো-রানীমা আর ছোট-রানীমার মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। একবার হয়েছিল কী জানেন, ছোট-রানীমার এক ভাই এখানে দলবল নিয়ে শিকার করতে এসেছিল। তারপর এই বাড়িতে সে খুন হয়ে গেল !"

"তাই নাকি ? কে খুন করল ?"

"ধরা তো কেউ পড়েনি। লোকে বলে, মেজো-রাজাবাবুর ছেলে তখন এখানে ছিল, তার সঙ্গে ওই শালাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল খুব, ওই মেজো-কুমারটি খুন করেছে।"

"পুলিশ-কেস হয়নি ?"

"এই সব বড়-বড় লোকদের ব্যাপারে কি পুলিশ কিছু করতে পারে, স্যার ? গল্প শুনেছি, কয়েক পুরুষ আগে, এই রাজাদেরই বংশের একজন তরোয়াল দিয়ে একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের মুণ্ডু কেটে ফেলেছিলেন এক কোপে। তাঁরও কোনও শাস্তি হয়নি। তিনি চলে গিয়েছিলেন গোয়াতে।"

"এই বাড়িতে তা হলে অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে বলো !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার, খুন-জখম তো লেগেই ছিল এককালে !"

কাকাবাবু দেবলীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাজাবাবু, রানীমা, বড়কুমার, এই সব শুনলে কীরকম মজা লাগে, না রে ? জমিদারি, নেটিভ স্টেট কবে উঠে গেছে, তবু এখনও অনেকে রাজা-রাজকুমার টাইটেল রেখে দিয়েছে। কলকাতার মতন শহরে এই সব লোকেরা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ পাত্তা দেবে না ! সেজো-রাজাবাবুর ছেলেই তো তোর বাবার অফিসে চাকরি করে !"

শশাবাবু বলল, "এখানকার লোকেরা কিন্তু রাজাবাবুদের দেখলেই প্রণাম করে।"

কাকাবাবু বললেন, "এই বাড়িটায় এলে অনেকটা পুরনো আমলে ফিরে গেছি মনে হয়।"

এই সময় হঠাৎ একটা দরজা খোলার শব্দ হতেই সবাই চমকে তাকাল।

সেই দক্ষিণের কোণের ঘরটার দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। পায়ে বোধহয় খড়ম পরা, খটখট শব্দে এদিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

কাকাবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। দক্ষিণের ঘরটা তালা দেওয়া ছিল, তবে কি তিনি পরে আবার তালা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন ? কিংবা দুর্যোধনকে বলেছিলেন বন্ধ করতে ?"

তিনি নিজে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানা-বালিশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কোনও মানুষজনের চিহ্নই ছিল না। কেউ কি লুকিয়ে ছিল ? প্রায় অসম্ভব সেটা। কেউ লুকিয়ে থাকলেও এখন এরকমভাবে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবে কেন ?

রিভলভারটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। কাকাবাবু চট করে সেটা নিয়ে আসবেন ভেবেও থেমে গেলেন। যে-লোকটি এগিয়ে আসছে, তাকে এবার অনেকটা স্পষ্ট দেখা গেল। একজন বেশ লম্বা, বৃদ্ধ লোক। মাথার চুল ও মুখের দাড়ি

ধপধপে সাদা। মনে হয় কোনও সন্ন্যাসী। লাল টকটকে ধুতি পরা, গায়ে একটা লাল চাদর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

কাকাবাবু এক নজর তাকিয়ে দেখলেন, দেবলীনার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর শশাবাবু চোখ দুটো গোল-গোল করে বলছে, "গু-গু-গু-গু-গুরুদেব !"

কাকাবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে ইনি ? তুমি জানো ?"

শশাবাবু বলল, "রা-রা-রা-রা-জাদের গুরুদেব ! মাঝে-মাঝে আসেন। একশো বছরের বেশি বয়েস।"

"ওই ঘর থেকে কী করে এলেন ?"

"জা-জা-জা-জা-নি না ! ওরে বা-বা-বা-বা..."

বৃদ্ধটি অনেক কাছে চলে এসেছেন। তাঁর চোখ সামনের দিকে। এই তিনজনকে যেন তিনি দেখতেই পাচ্ছেন না।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার !"

বৃদ্ধটি একটি হাত তুলে কাকাবাবুর দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গি করলেন। কিন্তু থামলেন না। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নামতে লাগলেন। নীচে যাবার সিঁড়ি দিয়ে। তাঁর খড়মের শব্দ হতে লাগল খট্ খট্ খট্ খট্।

কাকাবাবুও এমন অবাক হয়ে গেছেন যে, তাঁর গলা দিয়েও আর কোনও শব্দ বেরোল না।

৫

সকাল আটটার সময় কাকাবাবু দেবলীনাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যে কাকাবাবুর স্নান করা, দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। আগে নিজে এক কাপ চা-ও খেয়েছেন। আবার এক পট চা দিয়ে গেছে দুর্যোধন।

কাকাবাবু বললেন, "ওঠ দেবলীনা, দ্যাখ কী সুন্দর সকাল ! উঠোনের দেবদারু গাছে একঝাঁক টিয়াপাখি এসে বসেছে !"

দেবলীনা চোখ খুলল, তার এখনও ঘুমের ঘোর লেগে আছে। সে যেন মনে করতে পারছে না কোথায় আছে। তারপরই ধড়ফড় করে উঠে বসল।

কাকাবাবু বললেন, "ট্যাঙ্কে জল ভরে দিয়েছে। বাথরুমে কলে জল পাবি। মুখ-টুক ধুয়ে আয়। তুই চা খাস তো ?"

"হ্যাঁ খাব !"

"শশাবাবুকে ব্রেকফাস্ট বানাতে বলেছি, একটু বাদেই এসে যাবে !"

দেবলীনা বাথরুমে ঢুকতেই কাকাবাবু ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বাড়ির পেছন দিকেও অনেক দেবদারু গাছ। রাজাদের বোধহয় এই গাছের শখ ছিল। এখান থেকেও পুকুরটার একটা অংশ দেখা যায়। প্রায়

কুড়ি-পঁচিশটা বক বসে আছে সেখানে।

এক সময় তাঁর চোখে পড়ল মেঝেতে খানিকটা রক্ত শুকিয়ে আছে। কালকের সেই প্যাঁচাটার রক্ত। তিনি ভাবলেন, দুর্যোধনকে ডাকিয়ে জায়গাটা মুছিয়ে ফেলতে হবে। শোবার ঘরের মেঝেতে রক্ত পড়ে থাকা খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার।

প্যাঁচাটার জন্য তাঁর আবার দুঃখ হল। তিনি নিজেই যদি একটু ভাল করে দেখে নিতেন, তা হলে প্যাঁচাটা মরত না।

দেবলীনা মুখ ধুয়ে আসার পর কাকাবাবু চা ছেঁকে দিলেন তাকে। চামচে ভর্তি চিনি নিয়ে গুলতে লাগলেন টুং-টুং শব্দ করে।

দেবলীনা একটুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কাল রাত্তিরে কী হল ? আমরা কী দেখলুম ?"

কাকাবাবু বেশ হালকা মেজাজে বললেন, "কেন রে, কী দেখলি, তোর মনে নেই ? ভুলে গেলি এর মধ্যে ? কাল তো তুই জেগেই ছিলি !"

"ভুলিনি, মনে আছে। কিন্তু...কিন্তু ওই লোকটা কোথা থেকে এল ?"

"দক্ষিণের কোণের ঘরটা থেকেই তো বেরোতে দেখলাম, তাই না ?"

"কী করে বেরোল ? ও ঘরে কেউ ছিল না। সত্যিই তা হলে ভূত..."

কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন।

কাল রাতে সেই বৃদ্ধকে দেখার পর শশাবাবু শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোধনকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যায়নি। শশাবাবুর চোখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার পরেও সে আর ভয়ের চোটে নীচে যেতে চায়নি। সে শুয়েছিল কাকাবাবুর পাশের ঘরে। দেবলীনাকেও একা ঘরে শুতে দেওয়া হয়নি।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ভূত, তার সত্যি-মিথ্যে কী ? ভূত হলে ভূত, না হলে নয় ! আজ তোকে আমি ওর থেকে অনেক আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাব ! সেটা দেখলে তুই এমন অবাক হয়ে যাবি..."

"না কাকাবাবু, তুমি বলো, ওই বুড়োটা কি মানুষ না ভূত ?"

"তা বলা শক্ত। তবে, ভূত কি কখনও সন্ন্যাসী সাজে ? রুদ্রাক্ষের মালা পরে ? আর যদি তা-ও হয়, একটা বুড়ো-সন্ন্যাসীর ভূত আমাদের কী ক্ষতি করবে ? তাকে দেখে আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে ?"

"আমি ভয় পেয়েছিলুম। আমি এখনও বুঝতে পারছি না।"

"তবে তোকে সত্যি কথা বলি। আমারও এক সময় ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। আমি, রাজা রায়চৌধুরী, জীবনে কত বিপদে-আপদে পড়েছি, কখনও ঠিক ভয় পাইনি, অথচ কাল রাত্রে ওই সন্ন্যাসীকে দেখে আমারও প্রায় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল !"

"দক্ষিণের কোণের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল না ?"

"হ্যাঁ, বন্ধ তো ছিল ঠিকই !"

খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে এসে শশাবাবু বলল, "স্যার, আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে এসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, এখানে আমার কাছে কে আসবে ? নিশ্চয়ই দারুকেশ্বর। পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও !"

দারুকেশ্বর আজ পাজামার ওপর একটা সুবজ পাঞ্জাবি পরে এসেছে, সেই পাঞ্জাবির গায়ে সংস্কৃতে কীসব যেন লেখা। তার মুখের দাড়ি ও মাথার বাবরি চুল বেশ তেল-চুকচুকে ও সুন্দরভাবে আঁচড়ানো।

একগাল হেসে সে বলল, "এই যে রায়চৌধুরীবাবু, কেমন আছেন ? কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ? আপনাদের খবর নিতে এলাম। ...কেমন আছ মামণি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আসুন, আসুন, এখানে এসে বসুন। চা খাবেন তো ? কাল রাত্তিরেই ভূতদর্শন হয়ে গেল।"

"তাই নাকি ? কী রকম, কী রকম ? শুনি শুনি।"

"একেবারে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ভূত দেখেছি। অবিশ্বাস করার কোনও উপায় নেই। আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনার ভূত ধরার ফি কত ? মনে হচ্ছে, আপনাকে কাজে লাগাতে হবে।"

দারুকেশ্বর প্রাণখোলা দরাজ গলায় হেসে নিল খানিকটা। তারপর বলল, "কাল ট্রেনে কীরকম জমিয়েছিলুম, সেটা বলুন ! আমি মশাই ট্রেনে চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসি না। আপনি কি ভেবেছিলেন আমি সত্যি-সত্যি ভূত ধরার ব্যবসা করি ? আমার পদবি ওঝা শুনলেই সবাই ভাবে, হয় আমি ভূতের ওঝা, কিংবা সাপের ওঝা। তাই আমি কখনও ভূতের গল্প, কখনও সাপের গল্প শুরু করি। আসলে আমি ওষুধের ফেরিওয়ালা। আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রি করি, তাই প্রায়ই ট্রেনে যেতে হয় এখানে-সেখানে। তবে আমি ভূতের গন্ধ পাই ঠিকই।"

দেবলীনা বলল, "কিন্তু কাল আমরা সত্যিই যে একজনকে দেখলুম।"

"কী দেখলে বলো তা মামণি।"

"দক্ষিণের কোণের ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। সেখান দিয়ে একটি বুড়ো সন্ন্যাসী বেরিয়ে এল রাত্তিরবেলা, আমাদের চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং ! ভেরি ইন্টারেস্টিং ! চোরেরা অনেক সময় সাধু সাজে শুনেছি, কিন্তু ভূতও যে সাধু হয়, তা কখনও শুনিনি !"

কাকাবাবু বললেন, "শশাবাবুদের মতে, ওই বৃদ্ধটি হচ্ছেন এই রাজবংশের গুরুদেব। একশো বছরের বেশি বয়েস। উনি মরে গেছেন না বেঁচে আছেন,

তা কেউ জানে না। তবে উনি নাকি সশরীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। হঠাৎ দেখা দেন, হঠাৎ মিলিয়ে যান। একে ঠিক ভূত বলা যায় কি?"

দারুকেশ্বর বলল, "স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক বেশি লেখাপড়া জানেন। আপনিই বলুন, জ্যান্ত মানুষ কি কখনও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?"

কাকাবাবু এ-কথার উত্তর না দিয়ে পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা দারুকেশ্বরবাবু, আপনি যে আমাদের দক্ষিণের কোণের ঘরটা সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন, তার কারণ কী?"

"ওই ঘরটা সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে। বছর পনেরো আগে রাজাদের এক মেয়ে, তার নাম ছিল চম্পা, ওই ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"সেই মেয়েটিও অদৃশ্য হয়ে যায়? মারা যায়নি ওই ঘরে?"

"কেউ বলে মরে পড়ে ছিল। কেউ বলে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। অথচ দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। অনেকদিন আগের কথা তো! একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল ঠিকই। তারপরেও নাকি অনেকদিন ওই ঘরের মধ্যে একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেছে রাত্তিরবেলা। ধুপধাপ শব্দও শোনা গেছে।"

"আপনি এ-বাড়িতে এসেছেন কখনও?"

"হ্যাঁ, এসেছি কয়েকবার! এক সময় অনেক মানুষের আনাগোনা ছিল। বছর দশ-বারো হল বিশেষ কেউ আর আসে না।"

"চলুন, তা হলে দক্ষিণের কোণের ঘরটা একবার দেখা যাক।"

তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট শেষ করে কাকাবাবু উঠে পড়লেন। বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বার করে ভরে নিলেন পকেটে। ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

লম্বা টানা বারান্দা। সাদা ও কালো পাথরে চৌখুপি কাটা। এখন ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে সেখানে। কাকাবাবুর ক্রাচের তলায় রবার লাগানো, তাই শব্দ হয় না। কাল রাতে সেই বৃদ্ধ সাধু যখন এখান দিয়ে গিয়েছিল, তখন খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছিল। এখন শুধু কাকাবাবু ও দারুকেশ্বরের চটির শব্দ, দেবলীনা খালি পায়ে এসেছে।

দক্ষিণের কোণের ঘরটার দরজায় এখন তালা লাগানো।

কাকাবাবু সেই তালাটা ধরে বললেন, "এটা একটা টিপ-তালা। খুলতে চাবি লাগে। বন্ধ করার সময় লাগে না। কাল আমি নিজের হাতে চাবি দিয়ে তালাটা খুলেছিলুম। তারপর বন্ধ করেছি কি করিনি, তা মনে নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক পুরনো তালা, এর ভেতরের কলকব্জা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই দেখুন।"

কাকাবাবু দরজার পাল্লা দুটো ধরে জোরে টানলেন। তালাটা আপনিই খুলে

গেল।

তিনি দেবলীনাকে বললেন, "বুঝলি, দরজায় এই তালা লাগানো আর না-লাগানো সমান! সুতরাং দরজাটা খুলে যাওয়া আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু এরপর তোদের সত্যিকারের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব!"

কাকাবাবুই আগে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, দেবলীনা আর দারুকেশ্বর দরজার কাছ থেকে উঁকি মারল।

কাল সন্ধেবেলা যে-রকম দেখা গিয়েছিল, ঘরটা এখনও ঠিক সেই রকমই আছে। দু'দিকের দেওয়ালে লেপ-তোশক-বালিশের পাহাড়।

কাকাবাবু বললেন, "রাত্তিরে আমি আর এ-ঘরে আসিনি। বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারছিলুম না ঘটনাটার। সারা রাত ভাল করে ঘুমই হল না। সকালবেলা মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিজের চোখে যা দেখেছি, তা কক্ষনো ভুল হতে পারে না। ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। এবং তার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকতেই হবে! তাই ভোরবেলা আমি এই ঘরে এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। একটা জিনিস দেখে আরও বেশি চমকে উঠেছি। এবার তোমাদের সেটা দেখাব।

কাকাবাবু একদিকের দেওয়ালের বালিশ-তোশক টেনে নামাতে লাগলেন। তাঁর পাশে এসে দারুকেশ্বরও হাত লাগাল, সব জমা হতে লাগল পায়ের কাছে। একটু বাদে দেখা গেল দেওয়ালের গায়ে একটি ছবির ফ্রেম। বেশ বড়। আস্তে আস্তে দেখা গেল ছবিটা। একটি কিশোরী মেয়ের অয়েল পেইন্টিং। লাল রঙের ফ্রক পরা চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, মাথার চুলে রিবন বাঁধা, অবাক-অবাক চোখের দৃষ্টি।

দারুকেশ্বর অস্ফুট গলায় বলল, "চম্পা! চম্পার ছবি!"

দেবলীনা বলল, "এ কী! এ তো আমার ছবি!"

দারুকেশ্বর পাশ ফিরে দেবলীনাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বলল, "তাই তো! এ-ছবি তো হুবহু এই মামণির মতন। এ কী করে সম্ভব হল?"

কাকাবাবু বললেন, "পনেরো বছর আগে মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে যে চম্পা, তার সঙ্গে দেবলীনার মুখের কী আশ্চর্য মিল! ঠিক যেন দেবলীনারই ছবি এঁকে রেখেছে কেউ!"

দারুকেশ্বর বলল, "ছবিটা পুরনো, অনেকদিন আগে আঁকা।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-বাড়ির অন্য ঘরেও বেশ-কিছু ছবি আছে, আমি দেখেছি। আমরা যে-ঘরে শুয়েছি, সে-ঘরের দেওয়ালেও একটা সাদা চৌকো জায়গা, সেখানে একটা ছবি টাঙানো ছিল মনে হয়। কেউ খুলে নিয়েছে। রাজাদের কারও ছবির শখ ছিল।

দারুকেশ্বর বলল, "চম্পাকে আমিও দু'একবার দেখেছি। অনেকদিন আগের কথা, এখন মনে পড়ছে। ঠিকই তো, এই মামণির চেহারার সঙ্গে খুব মিল

ছিল। যেন দুটি যমজ বোন, কিংবা এই দেবলীনা-মামণিই সেদিনের চম্পা !"

কাকাবাবু বললেন, "চম্পা বেঁচে থাকলে এখন তার বয়েস অন্তত তিরিশ বছর হবার কথা।"

দেবলীনার ঠোঁট কাঁপছে। ছবিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "কাকাবাবু, এই মেয়েটা, এই মেয়েটাই আমায় মাঝে-মাঝে ডাকে।"

দারুকেশ্বর বলল, "আশ্চর্য ! এরকম কী করে হয় ! এমন হতে পারে ?"

কাকাবাবু শেকস্‌পিয়ারের হ্যামলেট নাটক থেকে আবৃত্তি করলেন, "দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, হোরেসিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অব ইন ইয়োর ফিলসফি !' জীবনে এরকম কিছু-কিছু আশ্চর্য ব্যাপার আজও ঘটে। এক কোটি বা দশ কোটি মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর-একজনের চেহারার হুবহু মিল থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু চম্পা যে-ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেই ঘরে চম্পারই মতন দেখতে দেবলীনা ফিরে এসেছে এতদিন বাদে, এটাই একটা মহা আশ্চর্যের ব্যাপার !"

দারুকেশ্বর বলল, "আমি এখনও যে বিশ্বাস করতে পারছি না।"

কাকাবাবু ছবিটার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, ছবিটা পুরনো, এটা দেবলীনাকে দেখে আঁকা হয়নি। চম্পারই ছবি।"

দারুকেশ্বর বলল, "চোখ দুটো দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন জীবন্ত !"

কাকাবাবু বললেন, "আপাতত ছবিটা ঢেকে রাখাই ভাল। দুর্যোধন আর শশাবাবুকে কিছু বলবার দরকার নেই। শশাবাবু চম্পাকে কখনও দ্যাখেনি। দুর্যোধন দেখেছে বটে, সে একবার বলেওছিল, চম্পার সঙ্গে দেবলীনার মিল আছে, কিন্তু ঠিক কতখানি যে মিল, তা তার মনে নেই।"

কাকাবাবু ছবিটাকে দেওয়াল থেকে একবার খুলে নিলেন, তারপর পেছনের দেওয়ালে টোকা মারলেন কয়েকবার। নিরেট দেওয়াল, কোনও শব্দ হল না।

কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আগেকার দিনে এইসব পুরনো রাজবাড়িতে হঠাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে পালাবার ব্যবস্থা রাখার জন্য গুপ্ত-ঘর বা গোপন সুড়ঙ্গ থাকত। এ-বাড়িতে সে-রকম কিছু আছে কি না, জানেন কি ?"

দারুকেশ্বর ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাঃ, সেরকম কিছু শুনিনি।"

"চম্পা যদি এ-ঘর থেকে উধাও হয়ে থাকে, তা হলে এই ঘরেরই কোথাও কোনও গোপন সুড়ঙ্গ-পথে এসে কেউ তাকে নিয়ে গেছে, এরকম মনে করাই তো স্বাভাবিক তাই না ? তখন খোঁজাখুঁজি করে দেখা হয়নি ?"

"এই ঘরের সঙ্গে একটা বাথরুম আছে। তার জানলা ভাঙা ছিল। পুলিশ এসে বলেছিল, ওই জানলা দিয়েই কেউ ঢুকে চম্পাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে, তারপর মেরে ফেলেছে। আবার কারও-কারও ধারণা, যুগলকিশোরের

প্রেতাত্মাই চম্পাকে ভুলিয়েভালিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে, প্রতিশোধ নেবার জন্য।"

"যুগলকিশোর কে?"

"ছোট-রানীমার ভাই। সে খুন হয়েছিল এই বাড়িতেই!"

"হুঁ! চম্পার দেহ আর পাওয়া যায়নি?"

"নাঃ! অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে, পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে, জঙ্গলে একশোজন লোক লাগানো হয়েছিল। এই রাজবংশের একজন গুরুদেব চম্পাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি এ-বাড়িতে উপস্থিত থাকতেও চম্পার ওরকম পরিণতি হল বলে তিনি দুঃখে, অনুশোচনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা কাল বোধহয় তাঁকেই দেখেছেন। জীবিত না প্রেতাত্মা দেখেছেন, তা বলতে পারব না!"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। চম্পার ছবিটাকে একটা তোশকের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেললেন, বাথরুমের দরজাটা।

পেছন ফিরে বললেন, "ভোরবেলা আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে গেছি। বাথরুমের জানলা এখন আর ভাঙা নয়, তাতে শিক বসানো আছে। জানলা ভেতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে যে-বৃদ্ধটি এ-ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সে জানলা দিয়ে ঢোকেনি। সে অন্য কোনও পথে এসেছিল। যাকগে, ব্যস্ততার কিছু নেই, সেটা পরে দেখলেও চলবে!"

দেবলীনা থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওই মেয়েটা সত্যি মরে গেছে? ওকে কেন মেরে ফেলেছিল?"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো জানি না। অনেকদিন আগেকার ব্যাপার, এখন আর বোধহয় জানাও যাবে না! চল্, এ-ঘর থেকে বাইরে যাই!"

বারান্দার চেয়ারে এসে বসবার পর দারুকেশ্বর বলল, "এর পরেও আপনারা এ-বাড়িতে থাকবেন?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন, থাকব না কেন? না থাকার কী আছে? বেশ তো চমৎকার বাড়ি। কী রে, দেবলীনা, তোর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না?"

"দেবলীনা বলল, "হ্যাঁ, থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার তো দারুণ এক্সাইটিং লাগছে, আজ রাত্তিরে যদি সেই বুড়ো সন্ন্যাসীকে দেখা যায়, তা হলে আজ আর ঘাবড়ালে চলবে না, সোজা গিয়ে পা চেপে ধরব। দেখতে হবে সে সত্যি-সত্যি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কি না!"

দারুকেশ্বর বলল, "আপনার সাহস আছে দেখছি! দিনের বেলা ভয় কিছু নেই, কিন্তু রাত্তির হলে এসব জায়গায় আমার গা-ছমছম করে। আমি লোকের

কাছে ভূত ধরার গল্প করি বটে, কিন্তু নিজে বেশ ভূতের ভয় পাই। এক-এক সময় এমন বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ে এরা...”

“আপনি ওই দক্ষিণের ঘরটায় কিছু গন্ধ-টন্ধ পেলেন?”

“না, তা পাইনি। দিনের বেলা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। তা হলে আমি এখন উঠি। আমাকে একটু জঙ্গলের দিকে যেতে হবে শেকড়-বাকড় খুঁজতে। আমি তো ভেষজ ওষুধ বানাই!”

“কিসের ওষুধ বানান?”

“এই পেটের অসুখ, মাথা গরম, বুক ধড়ফড়, কান কটকট, আরও অনেক রোগের ওষুধ আছে।”

“চলুন তা হলে আপনার সঙ্গে আমরাও একটু জঙ্গলে ঘুরে আসি। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থেকে কী করব?”

“কিন্তু আমি সাইকেলে এসেছি। আমার সঙ্গে আপনারা কী করে যাবেন?”

“তা হলে তো মুশকিল! হাঁটা-পথে অনেক দূর হবে, তাই না? আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে রাখা উচিত ছিল। আপনাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিলে আপনি শহর থেকে আমাদের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?”

“আজ তো আর হবে না। কাল সকালে আমি নিজেই একটা গাড়ি জোগাড় করে আনব।”

দারুকেশ্বরের সঙ্গে দেবলীনা আর কাকাবাবুও নীচে নেমে এলেন। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক রান্নার আওয়াজ আসছে। উঠোনে মাটি কোপাচ্ছে দুর্যোধন। দেবদারু গাছের মাথায় এখনও অনেক টিয়াপাখি টিটি করে ডেকে খেলা করছে নিজেদের মধ্যে। বড় গেটটার ওপরে বসে আছে একটা শঙ্খচিল।

কাকাবাবু দুর্যোধনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “ও-ই এখানকার দরোয়ান-কাম মালি-কাম জল তোলার লোক। তবে ওর নাম দুর্যোধন না হয়ে কুম্ভকর্ণ হওয়া উচিত ছিল। কাল রাতে ওকে এত ডাকলুম, কিছুতেই উঠল না! যে-দরোয়ান এত ঘুমোয়, সে কী করে বাড়ি পাহারা দেবে?”

দারুকেশ্বর বলল, “এ-বাড়ি থেকে কী-ই বা নেওয়ার আছে? টাকা-পয়সা তো কিছু নেই, বড়-বড় খাট, চেয়ার, টেবিল, কে-ই বা বয়ে নিয়ে যাবে! রাজারা বাড়িটা বিক্রি করতে চান, কিন্তু খদ্দের পাচ্ছেন না। একেই তো এত বড় বাড়ি, তার ওপর বদনাম আছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানেন, আর দু'চার বছরের মধ্যেই দেখবেন, এটা একেবারে পোড়োবাড়ি হয়ে গেছে। বেশির ভাগ রাজবাড়িগুলোর এই দশাই হয়। কুচবিহারের রাজবাড়ি দেখেছেন? দেখলে চোখে জল আসে!”

বড় গেটের মধ্যে ছোট গেট দিয়েই ওদের বেরোতে হল বাইরে। বড় গেটটা

যে বহুদিন খোলা হয়নি, তা বোঝা যায়। দারুকেশ্বর সাইকেলে উঠে পড়ে হাত নেড়ে চলে গেল।

কাকাবাবু জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করে বললেন, "দুর্যোধনেরও একটা সাইকেল আছে না? ইস, এককালে আমিও খুব ভাল সাইকেল চালাতুম রে, দেবলীনা! এখন খোঁড়া পায়ে আর পারি না। না হলে তোকে ক্যারি করে আমরা সাইকেলেই ঘুরে আসতে পারতুম জঙ্গলে।"

"আমি সাইকেল চালাতে জানি, কাকাবাবু। আমি তোমাকে ক্যারি করে নিয়ে যাব?"

"যাঃ, তুই আমার এত বড় শরীরটা টানবি কী করে? সে হয় না।"

"আমার সাইকেল চলাতে ইচ্ছে করছে। আমি তা হলে একটু একা ঘুরে আসব, কাকাবাবু?"

কাকাবাবু দেবলীনার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "যেতে নিষেধ করা আমার স্বভাব নয়। তুই একলা যেতে চাইছিস, কোনও বিপদে-টিপদে পড়বি না তো?"

"দিনের বেলা আবার কী বিপদ হবে? বেশি দূরে যাব না!"

"ঠিক আছে. ঘুরে আয়। একটা কথা শোন, সেই যে মেয়েটা তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তাকে কি সত্যি চম্পার মতন দেখতে?"

"এক ঝলকের জন্য শুধু দেখতে পাই। অনেকটা ওই রকম।"

"এবারে যদি সেরকম দেখতে পাস, তুই একলা একলা তার পেছনে ছুটে যাবি না। আমাকে ডাকবি। কী, মনে থাকবে তো?"

"হ্যাঁ, তোমায় ডাকব।"

"তুই কী রকম সাইকেল চালাতে পারিস, দেখি!"

দুর্যোধনের সাইকেলটা গেটের পাশেই হেলান দিয়ে রাখা। দেবলীনা বেশ সাবলীলভাবে তাতে চেপে এক পাক ঘুরে এল। কাকাবাবু প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ ভালই চালাতে পারিস রে। ঘুরে আয় তা হলে। দেরি করে আমায় চিন্তায় ফেলিস না যেন! আমি ততক্ষণ পুকুরধারটা ঘুরে আসি।"

দেবলীনা জঙ্গলের পাশের রাস্তাটা দিয়ে একটু বাদেই চলে গেল চোখের আড়ালে।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির পেছন দিকে। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও কোথাও মাটি বেশ নরম, তাঁর ক্রাচ বসে যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে কিছু অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। দুর্যোধন শশাবাবুরা বাড়ির পেছন দিক দিয়েই যাতায়াত করে। পেছন দিকে অনেক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। একতলার একটা ঘরের দরজা আধখানা ভাঙা। কুকুর-বেড়াল-শেয়াল অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

পুকুরটা চৌকো, কিন্তু খুব বেশি বড় নয়। বহুদিন পরিষ্কার করা হয়নি, জলের মধ্যে শ্যাওলা আর শাপলা অনেক। মাঝপুকুরে একটা মাছ ঘাই মারল, তা দেখে কাকাবাবুর মনে পড়ল, ছিপ-বঁড়শি আছে কি না তা খোঁজ করা হয়নি শশাবাবুদের কাছে। এত বক বসে আছে যখন, তখন পুকুরটায় নিশ্চয়ই বেশ মাছ আছে।

একটা বড় বাঁধানো ঘাট, তার দু'পাশে পাথরের নারীমূর্তি বসানো। দুটো মূর্তিরই নাক ভাঙা, হাত ভাঙা। ঘাটের সিঁড়িগুলোও ভেঙে পড়েছে অনেক জায়গায়। দারুকেশ্বর ঠিকই বলেছে। আর কিছুদিন পরেই এই রাজবাড়িটা পোড়োবাড়ি হয়ে যাবে।

পুকুরের এক ধারে সাত-আটখানা মাটির বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায়, ওই সব বাড়িতে এখন কোনও লোক থাকে না। রাজারা যখন নিয়মিত আসতেন, তখন তাঁদের ঠাকুর-চাকর-ধোপা-নাপিত লাগত নিশ্চয়ই, তাদের জন্য ওইসব বাড়ি বানানো হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই তারা শহরে চলে গেছে। এখন যে তিনজন কর্মচারী আছে, তারাও ঠিকমতন মাইনে পায় কি না কে জানে! মাইনে বন্ধ হলেই ওরাও পালাবে!

শিবমন্দিরটা পুকুরের ঠিক ডান কোণে। পুজো-টুজো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিনই। মন্দিরের গা দিয়ে একটা বটগাছের চারা উঠে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই বটগাছটাই একদিন মন্দিরটা গুঁড়ো করে ফেলবে।

মন্দিরের চাতালে উঠে ভেতরে তাকিয়ে কাকাবাবু অবাক হলেন। মন্দিরটার তুলনায় শিবলিঙ্গটা বিরাট। প্রায় দু'জন মানুষের সমান গোল আর ছ'ফুটের মতন লম্বা। মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার। জানলা-টানলা কিছু নেই।

কাকাবাবু মন্দিরের মধ্যে ঢুকে ভাল করে দেখলেন। এককালে একটা জানলা ছিল, পরে কোনও কারণে ইট দিয়ে গেঁথে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে একটা টকটক গুমোট গন্ধ। মেঝেতে এখানে-সেখানে জল, হয়তো বৃষ্টির সময় কোনও ফাটল দিয়ে জল পড়ে।

খানিকক্ষণ শিবলিঙ্গটা দেখার পর কাকাবাবু তার সামনে বসে পড়লেন। কী ভেবে সেটার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলেন শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে। খুব জোরে একটা চাপ দিতেই শিবলিঙ্গটা সরে গেল পেছনের দিকে। তার নীচে দেখা গেল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবুর মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তাঁর অনুমান ঠিক হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে তিনি গোপন সুড়ঙ্গটা খুঁজে পাননি বটে, কিন্তু এটাই সেই সুড়ঙ্গের বেরোবার পথ! পালাবার পক্ষে এই তো আদর্শ জায়গা!"

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, পরে এক সময় দেবলীনা আর দারুকেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে এসে, ওদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, তারপর তিনি এই সুড়ঙ্গের ভেতরটায় ঢুকে দেখবেন। এই রকম অন্ধকার ঠাণ্ডা জায়গায় সাপ থাকতে

পারে। আরও কিছু গণ্ডগোল থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। একা-একা ঢোকা ঠিক হবে না।

কিন্তু তিনি কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। এক্ষুনি দেখতে ইচ্ছে হল। ক্রাচ দুটো রেখে দিয়ে তিনি সুড়ঙ্গের মধ্যে পা বাড়ালেন।

৬

ঢং ঢং ঢং ঢং করে ছুটির ঘন্টা বেজে গেল। সন্তুর তখনও তিন-চার লাইন লেখা বাকি। সন্তু মুখ তুলে একবার দেখে নিল, প্রোফেসর সেন সব ছাত্রদের কাছ থেকে খাতা নিয়ে নিচ্ছেন। সন্তু বসেছে একেবারে পেছনে, তার কাছে পৌঁছতে এক-দু' মিনিট সময় লাগবে। সে ঝড়ের বেগে লিখতে লাগল।

প্রোফেসর সেন যখন তার কাছে এসে বললেন, "টাইম ইজ ওভার," সন্তু বলল, "এই যে হয়ে গেছে, স্যার !" শেষ বাক্যটা লিখে সে তলায় একটা জোরে দাগ কাটল ! বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, শেষ করা গেছে !

জোজো দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তার শেষ হয়ে গেছে মিনিট-পাঁচেক আগেই। সে সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন হল রে ?"

সন্তু বলল, "মোটামুটি ! তোর ?"

জোজো বলল, "সব কোশ্চেনগুলো তো আমার জলের মতন জানা। একশোর মধ্যে একশো নম্বর পাওয়া উচিত। অরিন্দম বেচারির ভাল হয়নি, ও মন খারাপ করে বাড়ি চলে গেছে।"

সন্তু বলল, "অরিন্দমটা বরাবরই নার্ভাস টাইপের। এইসব পরীক্ষা নিয়ে এত ঘাবড়াবার কী আছে ?"

"তুই গুড নিউজ শুনেছিস, সন্তু ? আমাদের বাকি পরীক্ষাগুলো বারো দিন পিছিয়ে গেছে !"

"পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে ? তার মানে ?"

"দ্যাখ না, বাইরে নোটিস দিয়েছে। কাল শুক্রবার, কাল আমাদের কিছু নেই। শনিবার অন্য কী একটা ছুটি। সোমবার থেকে এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার সিট পড়েছে। ওদেরটা সেই গত মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল না ? সেটা এখন হবে, আমাদেরটা পিছিয়ে গেল !"

জোজোর কথায় চট করে বিশ্বাস করা যায় না। সন্তু নিজের চোখে নোটিস বোর্ড দেখতে গেল। জোজো এটা বানিয়ে বলেনি, নোটিস বোর্ডের সামনে অনেক ছাত্র ভিড় করে আছে, অনেকেই বেশ খুশি হয়েছে।

সন্তুর বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে গেল। পরীক্ষা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গেলে তার মোটেই ভাল লাগে না। শেষ হলেই চুকে যায়। তা ছাড়া, এই পরীক্ষার

কারণে তার এবার কাকাবাবুর সঙ্গে যাওয়া হল না ! কোনও মানে হয় !

জোজো বলল, "আমার ভালই হল, বাবা পরশুদিন দামাস্কাস যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল, পরীক্ষার জন্য যাওয়া হচ্ছিল না। এবারে ঘুরে আসব।"

"তুই এই ক'দিনের জন্য দামাস্কাস যাবি ?"

"হ্যাঁ। প্লেনে যাব, প্লেনে ফিরব, মাঝখানে থাকব তিনদিন। দামাস্কাসের শেখ বাবাকে হাত দেখাতে চেয়েছেন। বাবার দেওয়া আংটি পরে এই শেখ জগলুল পাশা তার ভাইয়ের হাতে গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছিল। বাবাকে খুব ভক্তি করে। ফেরার পথে লণ্ডনেও থেকে আসতে হবে দু'দিন।"

"দামাস্কাস থেকে ফেরার পথে বুঝি লন্ডন পড়ে ?"

"একটু ঘুরে আসতে হবে অবশ্য। কিন্তু উপায় নেই। ইংল্যান্ডের প্রিন্স চার্লস আমার বাবার কাছে জানতে চেয়েছেন, উনি কবে সিংহাসনে বসবেন। ওঁর মায়ের তো রিটায়ার করার কোনও লক্ষণ নেই ! তুই জানিস, উইম্বলডনে খেলতে যাবার আগে প্যাট ক্যাশ আমার বাবার কাছ থেকে একটা মাদুলি নিয়ে গেছেন ? সেইজন্যই তো জিতলেন। ওঁর মা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের বাড়িতে এক গাদা কনডেন্সড মিল্ক-এর টিন পাঠিয়েছেন।"

"শুধু কনডেন্সড মিল্ক ?"

"অস্ট্রেলিয়াতে তো আর কিছু পাওয়া যায় না। আর একজোড়া ক্যাঙারু পাঠাতে চেয়েছিলেন, তা নিয়ে আমরা কী করব !"

"চল জোজো, আজ আমরা একটা সিনেমা দেখি। ই. টি. দেখবি ?"

"ই. টি. ? ও তো পুরনো ছবি। আমার তিনবার দেখা। এখানে নয়, ফরেনে। প্রথমবার যখন কনকর্ড প্লেনে চেপে ফ্রান্স থেকে আমেরিকা যাই, ওরা বাবাকে আর আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল, তখন প্লেনেই ই. টি. দেখাল। তারপর আর একবার মস্কো ওলিম্পিকের বছরে..."

সন্তু বুঝল, আজ জোজোর কল্পনাশক্তি ওভারটাইম খাটতে শুরু করেছে। মাঝপথে তাকে বাধা দিয়ে সন্তু বল, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু তুই আজ আমার সঙ্গে যাবি কি না, সেটা বল !"

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলল, "যেতে পারি। আর একবার দেখলে ক্ষতি নেই। কোন্ হলে হচ্ছে। গ্লোবে ? ঠিক আছে, তোকে টিকিটও কাটতে হবে না। ওই হলের ম্যানেজার আমার ছোটকাকার আপন বন্ধু !"

"ওসব চলবে না, জোজো। তোর ছোটকাকার আপন বন্ধু বা পরের বন্ধু যা-ই হোন, কারও কাছে অকারণ ফেভার চাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমার কাছে পয়সা আছে, টিকিট কাটব !"

বড় রাস্তায় এসে ওরা ট্রামে চাপল। খানিকটা ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তায় লোকের খোলা ছাতা হাত থেকে উড়ে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল

মাটিতে। একটা বেলুনওয়ালার হাত ফসকে চলে গেল এক গোছা বেলুন। কোনও একটা দোকানের সাইনবোর্ড খসে পড়ল ঝনঝন শব্দে।

সন্তুদের সামনের সিটে একজন লোক আর-একজনকে বলল, "গত সপ্তাহে ওড়িশায় গিয়ে কী ঝড়ের মুখে পড়েছিলুম রে বাবা! যাজপুর থেকে কেওনঝড় যাচ্ছিলুম বাসে, রাস্তায় এমন ঝড় উঠল, বড়-বড় গাছ ভেঙে পড়ল..."

সন্তু চমকে উঠল। সেই মুহূর্তে সে কাকাবাবুদের কথা ভাবছিল, আর ঠিক তখনই আর-একটা লোকের মুখে কেওনঝড়ের নাম শোনা গেল।

কাকাবাবুরা এখন কেওনঝড়ে কী করছেন কে জানে! কাকাবাবু এবার সঙ্গে অনেক বই নিয়ে গেছেন। বলেছেন যে, গাছতলায় শুয়ে-শুয়ে বই পড়বেন। দেবলীনাটা দিব্যি সঙ্গে চলে গেল, সন্তুর যাওয়া হল না! কেওনঝড়ে রোজ ঝড়বৃষ্টি হলে অবশ্য আর ওঁদের গাছতলায় শুয়ে বই পড়া হবে না!

এসপ্লানেড পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নেমে গেল বড়-বড় ফোঁটায়। ট্রাম থেকে নেমে জোজো আর সন্তু দৌড় মারল সিনেমা হলের দিকে। কাউন্টারের সামনে যখন পৌঁছল, তখন দুটো মাত্র টিকিটই বাকি আছে।

সিনেমাটা দেখতে দেখতে সন্তুর আরও মন খারাপ হয়ে গেল। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলেই ওইসব জায়গায় চলে যেতে ইচ্ছে করে। অন্য কোনও গ্রহের এরকম একটি প্রাণীর সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়, যদি তার সঙ্গে একবার মহাশূন্যে চলে যাওয়া যায়...মানুষ আর কতদিন বাদে অন্য-অন্য গ্রহে সহজে যাতায়াত করতে পারবে?"

শো ভাঙবার পর সে জোজোকে বলল, "কাকাবাবুরা কেওনঝড়ে গেছেন, জানিস? এবারে আমার আর যাওয়া হল না!"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "কেন যাওয়া হল না? পরীক্ষার জন্য? পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, চল, তুই আর আমি ঘুরে আসি!"

"তুই যে বললি তুই পরশু দামাস্কাস যাবি?"

"তা হলে সেখানে যাব না। কেওনঝড় খুব চমৎকার জায়গা। রাজস্থানে তো! ওর পাশেই জয়সলমিরে আমার বড়-জামাইবাবু থাকেন। কোনও অসুবিধে নেই। বড়-জামাইবাবু গাড়ি দিয়ে দেবেন!"

"শোন্ জোজো, জয়সলমিরে তোর বড়-জামাইবাবু থাকতে পারেন, কিন্তু কেওনঝড় ওড়িশায়। কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

ঠিক আছে, সেইখানেই যাব।"

"তুই দামাস্কাস, লন্ডন ছেড়ে কেওনঝড়ে যেতে চাস?"

"ওসব জায়গায় যে-কোনও দিন যাওয়া যায়। বাবা কত নেমন্তন্ন পাচ্ছেন। প্লেনে উড়ে গেলেই হল। কেওনঝড়ে একলা-একলা গেলে বিপদে পড়ে যেতে পারিস, তোকে তো একটা প্রোটেকশান দেওয়া দরকার।"

সন্তু হেসে ফেলল। কোনও ব্যাপারেই জোজো দমে যাবার পাত্র নয়। সে

বলল, "কেওনঝড়ে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই রে। ছোট নিরিবিলি জায়গা, কাকাবাবু বিশ্রাম নিতে গেছেন। দেখি, মাকে বলে দেখি, মা যেতে দিতে রাজি হন কি না !"

জোজোর বাস আগে এসে যেতে উঠে পড়ল সে। সন্তু দাঁড়িয়ে রইল লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড়ের স্টপে। সন্ধেবেলা খুব এক-চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা এখন প্রায় ফাঁকা। এখনও বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি। বাস আসছে অনেকক্ষণ বাদে বাদে।

একটা সবুজ রঙের মারুতি গাড়ি থেমে গেল তার সামনে। গাড়িতে মোট তিনজন লোক। তাদের একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, "আরে, তুমি সন্তু না ? এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ, কোথায় যাবে ? এসো এসো, উঠে এসো, তোমায় পৌঁছে দেব !"

সন্তু লোকটিকে চেনে না, জীবনে কখনও দেখেইনি। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা, হলুদ রঙের হাফশার্ট পরা, কলারটা ওলটানো। বছর চল্লিশেক বয়স হবে।

সন্তু বলল, "না, ঠিক আছে। আমি বাসেই যাব !"

লোকটি বলল, "তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো তো ? কালকেই সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে দেখা হল নিউ আলিপুরে, সেখানে তোমার সম্পর্কেও কথা হচ্ছিল। এসো, উঠে এসো, বৃষ্টিতে ভিজবে কেন শুধু-শুধু ?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল।

লোকটি এবার বিদ্রূপের সুরে বলল, "তুমি গাড়িতে উঠতে ভয় পাচ্ছ নাকি ? আমি তো শুনেছিলাম তুমি খুব সাহসী ছেলে ! তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইছি।"

একটা দোতলা বাস এসে গেছে। সেদিকে একবার দেখে নিয়ে সন্তু হাসিমুখে বলল, "আমি বৃষ্টির দিনে বাসে চাপতেই ভালবাসি !"

গাড়িটার পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে উঠে পড়ল বাসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায়।

ওই গাড়ির লোকটার চেহারা দেখলেই সুবিধের মনে হয় না। কাকাবাবু কাল সকালের ট্রেনে চলে গেছেন কেওনঝড়, আর সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে দেখা হল নিউআলিপুরে ? লোকটার মতলব ভাল ছিল না। কাকাবাবুর শত্রুর সংখ্যা সত্যিই খুব বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবুরও খানিকটা দোষ আছে। অসম্ভব সব পাজি, শয়তান লোকগুলোকে তিনি নিজে খানিকটা শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেন, পুলিশে ধরিয়ে দেন না। সেই লোকগুলো কয়েকদিন পরেই সুস্থ হয়ে ফিরে আসে, তারপর তারা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে না ? বারুইপুরের অংশু চৌধুরীর মাথায় লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শুধু। লোকটাকে জেলে পাঠানো উচিত

ছিল। অংশু চৌধুরী নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক খেপে আছে।

এরা কি অংশু চৌধুরীর লোক, না অন্য কারও ? ঠিক বোঝা গেল না। কাকাবাবু যে কলকাতায় নেই, তা এরা জানে না।

বাস থেকে নামবার আগে সন্তু সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে নিল। একটা পার্কের পাশ দিয়ে তাদের বাড়ির রাস্তায় যেতে হয়। রাত মোটে ন'টা, এর মধ্যেই পাড়াটা ফাঁকা হয়ে গেছে। পার্কটা একেবারে নির্জন। রাস্তার আলোগুলো নেভানো।

অন্যদিন সন্তু পার্কের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে। আজ আর সে ভেতরে ঢুকল না। বৃষ্টিতে পার্কের মাটি কাদা-কাদা হয়ে আছে। সে হাঁটতে লাগল রেলিং ধরে-ধরে।

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো লোক এসে দাঁড়াল তার দু'পাশে। একজন তার কাঁধে হাত দিয়ে গম্ভীর কড়া গলায় বলল, "চ্যাঁচামেচি করে কোনও লাভ নেই, চুপচাপ গাড়িতে উঠে পড়ো।"

একটু দূরেই একটা গাড়ির পেছনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে।

সন্তু বেশ বিরক্ত হল। পাড়ার মধ্যেও গুণ্ডামি ? এরা ভেবেছেটা কী, সন্তু কি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ নাকি ? খুব কাছেই বিমানদার বাড়ি, দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। পাইলট বিমানদা বাড়িতে আছেন।

সন্তু স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে পার্কের রেলিংটা ধরে সামারসল্ট খেয়ে চলে গেল পার্কের মধ্যে। তাকে ধরবার জন্য একটা লোক হাত বাড়াতেই সন্তু তার বগলের তলা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, লোকটাও উলটে চলে এসে পড়ল মাটিতে।

সন্তু চিৎকার করে বলল, "বিমানদা, বিমানদা, একবার চট করে আসুন তো ! শিগ্‌গির !"

অন্য লোকটা পার্কের মধ্যে চলে আসার চেষ্টা করছিল, তখনই থেমে থাকা গাড়িটা স্টার্ট দিল। দ্বিতীয় লোকটা একটু দ্বিধা করে, পার্কের মধ্যে আর না ঢুকে দৌড়ে গেল গাড়ির দিকে। সন্তু প্রথম লোকটার মুখ কাদার মধ্যে চেপে ধরে তার ঘাড়ের ওপর মারতে লাগল রদ্দা। লোকটা উঠতে পারল না।

কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ির বারান্দায় লোক এসে গেছে। বিমানদা জানলা দিয়ে বলল, "কে ? কী হয়েছে ?"

গাড়িটাতে উঠে পড়ল অন্য লোকটা, সেটা হুশ্‌ করে বেরিয়ে গেল। সন্তু গাড়িটার নম্বর দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু নজর করতে পারল না।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা একটা প্রচণ্ড ঝটকানি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এবার। সঙ্গে-সঙ্গে সে কোমর থেকে একটা ছুরি বার করল। প্রায় আধ হাত লম্বা একটা ভোজালি। সন্তু এবার আর লোকটির সঙ্গে লড়তে গেল না, সে উঠে দৌড় মারল।

কাদায় পিছল হয়ে গেছে মাঠ, পা হড়কাতে হড়কাতে কোনও রকমে সামলে নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল সন্তু। ভোজালি হাতে লোকটা তাকে তাড়া করে আসছে। সন্তু কোনও রকমে বিমানদার বাড়ির কাছে পৌঁছতে চায়। সে চিৎকার করছে, "বিমানদা ! বিমানদা !"

সন্তু আবার পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে এসে পড়ল রাস্তায়। ভোজালি হাতে লোকটাও এসে রেলিংটা ধরতেই দেখতে পেল একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জন লোককে। ভোজালি দেখে কয়েকজন একটু পিছিয়ে গেল। কাছেই একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, রাস্তার ওপর ইট জড়ো করা। বিমানদা একটা আস্ত ইট তুলে নিয়ে হুকুমের সুরে বলল, "ছুরি ফেলে দাও ! না হলে মাথা ভেঙে দেব !"

সন্তুও একটা ইট কুড়িয়ে নিয়েছে।

লোকটা কটমট করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ইটের সঙ্গে সে লড়তে পারবে না বুঝতে পেরে উলটো দিকে ফিরে দৌড় লাগাল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ধর ধর, ধর ধর ! কিন্তু একটা সশস্ত্র লোককে ধরার জন্য কেউ অবশ্য পেছন পেছন ছুটে গেল না। লোকটা একবার আছাড় খেয়ে পড়ল, আবার উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বিমানদা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে রে ? তোকে মারতে এসেছিল কেন ?"

সন্তু বলল, "আমি জীবনে ওকে দেখিনি। আর-একজন ছিল, আমার পাশে এসে বলল, একটা গাড়িতে উঠতে। ভেবেছিল, আমি ভয় পেয়ে অমনি সুড়সুড় করে উঠে পড়ব।"

বিমানদা বলল, "কাকাবাবু কলকাতায় নেই, এখন তুই বুঝি সর্দারি করে বেড়াচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "লোকটাকে আর-একটু হলে ঘায়েল করে দিতুম। ইস, পালিয়ে গেল ! ওকে ধরে রাখলে ওদের মতলবটা বোঝা যেত !"

বিমানদা বলল, "দেখে তো মনে হল ভাড়াটে গুণ্ডা ! কেউ পাঠিয়েছিল তোকে ধরে নিয়ে যেতে।"

সন্তু বলল, "পুলিশে ধরিয়ে দিলে তারা ঠিক ওর কাছ থেকে কথা বার করে নিতে পারত !"

বিমানদা বলল, "সাবধানে ঘোরাফেরা করিস সন্তু। এখন কাকাবাবু নেই...চল, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব ?"

সন্তু হেসে বলল, "আমাকে এ-পাড়া থেকে ধরে নিয়ে যাবে এমন সাধ্য কারও নেই। এরা তো একেবারে নভিস গুণ্ডা ! সঙ্গে রিভলভার পর্যন্ত আনেনি !"

বাড়ির সদর দরজার কাছে পৌঁছে সন্তু ভাবল, লোক দুটোকে বাধা না দিয়ে ওই গাড়িটায় উঠে পড়লে বোধহয় মন্দ হত না। দেখা যেত, ওরা কী করে।

অন্তত ওদের পরিচয়টা তো জানা যেত!

ওরা নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দেবে না, আবার ফিরে আসবে!

৭

রাত সাড়ে এগারোটার সময় কাকাবাবু বললেন, "তা হলে দেবলীনা, এবারে সেই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাক?"

দেবলীনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ!"

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে ছিল ওরা দু'জন। আজ ঝড়-বৃষ্টি নেই, আকাশ পরিষ্কার। সন্ধে থেকে কিছুই ঘটেনি। আজ আর কোনও ঘর থেকে কোনও রহস্যময় ব্যক্তি বেরিয়ে এল না, কোনও বিকট শব্দ কিংবা অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া গেল না, কোনও ঘটনাই ঘটল না। সব চুপচাপ।

ওরা দু'জনে বই পড়লেন অনেকক্ষণ ধরে, কাকাবাবু মাঝে-মাঝেই চোখ তুলে দেখছিলেন দক্ষিণের কোণের ঘরটার দিকে। এর মধ্যে শশাবাবু এসে খাবারদাবার দিয়ে গেছে, তারপর এঁটো বাসনপত্র নিয়ে যাবার সময় বলেছে, "এবার আমি ঘুমোতে চললাম, আর কিছু দরকার নেই তো?" কাকাবাবু তাকে কফির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সে কফিও দিয়ে গেল। এখন নীচে আর কোনও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই।

অন্য একটা ঘর থেকে আজ একটা মস্ত বড় ইজিচেয়ার বার করা হয়েছে। সেটা এতই পেল্লায় যে, দেখলে ঠাকুর্দা-চেয়ার বলতে ইচ্ছে করে। বসবার জায়গাটা খানিকটা ছিঁড়ে গেছে বটে, কিন্তু তার ওপরে একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে কাজ চালানো যায়।

কাকাবাবু নিজে সেই চেয়ারটায় বসে ছিলেন এতক্ষণ, এবারে দেবলীনাকে সেখানে বসালেন। পেট্রোম্যাক্সটা খুব কমিয়ে রেখে দিলেন সেই চেয়ারের পেছন দিকে। সামনের বারান্দাটা আবছা অন্ধকার হয়ে গেল।

কাকাবাবু ঘরে গিয়ে একটা কালো রঙের ড্রেসিংগাউন পরে এলেন। হাতে একটা বড় টর্চ। দেবলীনার সামনে দাঁড়িয়ে সেই টর্চটা জ্বেলে আলো ফেললেন দেবলীনার চোখে। দেবলীনা চোখ পিটপিট করতে লাগল। কাকাবাবু বললেন, "একটুক্ষণ জোর করে চেয়ে থাক। চোখ বন্ধ করিস না।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে টর্চটা এগিয়ে আনতে লাগলেন দেবলীনার মুখের কাছে। তাঁর ডান হাতের তর্জনীটা রইল টর্চের গায়ে লাগানো। একেবারে কপালের কাছে টর্চটা এসে পড়লে দেবলীনা বলল, "আমি আর তাকাতে পারছি না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু তাঁর তর্জনী দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিলেন দেবলীনার দুই ভুরুর ঠিক মাঝখানের জায়গাটা!

দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, আমার কপালের ভেতরটা ঝনঝন করে উঠল। এটা কি ম্যাজিক ?"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে টর্চটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ঠিক একইভাবে তর্জনী এগিয়ে আনলেন, আবার ছুঁয়ে দিলেন কপালের সেই একই জায়গা।

পাঁচবার এরকম করার পর দেবলীনা আর চোখ মেলতে পারল না।

কাকাবাবু এবারে খুব টেনে-টেনে সুর করে বলতে লাগলেন, "ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম-ঘুম..."

দেবলীনার চোখের পাতা দুটি বন্ধ, কিন্তু কাঁপছে, যেন সে চেষ্টা করেও খুলতে পারছে না চোখ। তার মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব।

কাকাবাবু তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

"আমি দেবলীনা দত্ত। আমার বাবার নাম শৈবালকুমার দত্ত, আমরা প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে থাকি..."

"তোমার কি কিছু কষ্ট হচ্ছে, দেবলীনা ?'

"না। একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আমার ভাল লাগছে।"

"তুমি এখন কোথায় ?"

"আমি কেওনঝড়ে বেড়াতে এসেছি।"

"তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছ, তাই না ? সঙ্গে তোমার বান্ধবী শর্মিলা রয়েছে ?"

"হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে, শর্মিলা..."

"তোমরা জঙ্গলে বেড়াতে গেলে, কার সঙ্গে গেলে ?"

"মনোজবাবুর সঙ্গে। জঙ্গলে কত পাখি, টিয়া, বুলবুলি, ঘুঘু..."

"রাত্তিরবেলা তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠলে, একা-একা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে।"

"না তো, একা-একা বেরিয়ে আসিনি, একজন আমায় ডাকল।"

"কে তোমায় ডাকল, দেবলীনা ?"

"একজন বুড়ো লোক, তার সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সন্ন্যাসীর মতন দেখতে। সে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। সে বলল, "চম্পা, এসো, এসো এসো..."

"কিন্তু তুমি তো দেবলীনা, তুমি তো চম্পা নও !"

"হ্যাঁ, আমি দেবলীনা, দেবলীনা। আমি চম্পা নই !"

"তবে সে তোমায় চম্পা বলল কেন ?"

"সে বলল, চম্পা, এসো, এসো, এসো..."

"তুমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ? সে তোমাকে কোথায় নিয়ে গেল ?"

"সে চলে গেল। তারপর আমি...তারপর আমি...তারপর আমি..."

হঠাৎ চোখ খুলে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল দেবলীনা। কপালের ওপর থেকে কাকাবাবুর হাতখানা এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, দেবলীনা, ঘুম ভেঙে গেল ?"

দেবলীনা কটমট করে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে ? কেন এখানে এসেছ ? আমি রাজকন্যা চম্পা, আমাকে বিরক্ত কোরো না..."

কাকাবাবু আর কিছু বলবার আগেই দেবলীনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আসছি···আমি আসছি···"

তারপর কাকাবাবুকে সে এক ঠেলা দিল। তার গায়ে এখন এত জোর যে, কাকাবাবু তার হাতটা ধরবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তিনি বারান্দার রেলিং ধরে ব্যালান্স সামলালেন।

দেবলীনা দৌড়ে বারান্দার খানিকটা পেরিয়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

কাকাবাবু বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর এক্সপেরিমেন্টের যে এরকম ফল হবে, তা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। আগে তিনি যে-কয়েকজনের ওপর হিপনোটিজম্ পরীক্ষা করেছেন, কখনও তো এমন কিছু ঘটেনি।"

এই সময় তিনি সন্তুর অভাবটা খুব অনুভব করলেন। দেবলীনা দৌড়ে চলে গেল। তাঁর দৌড়বার ক্ষমতা নেই। ক্রাচ বগলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দেবলীনা অনেক দূর চলে যাবে। সন্তু থাকলে ছুটে গিয়ে দেবলীনাকে আটকাতে পারত। সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে আসাটা খুব ভুল হয়েছে।

দেবলীনার যদি এখন কোনও বিপদ হয়, তা হলে তিনিই দায়ী হবেন।

তক্ষুনি দেবলীনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা না করে তিনি বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

দেবলীনা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে নেমে পড়েছে। কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে ডাকলেন, "দেবলীনা ! দেবলীনা !"

দেবলীনা শুনতে পেল না, কিংবা শুনেও গ্রাহ্য করল না। উঠোন দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে বড় গেটটার তলায় ছোট গেটটা খুলে ফেলল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

দুর্যোধন বা শশাবাবুকে ডেকে কোনও লাভ নেই। ওরা জাগবে না। জোর করে জাগালেও ওদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে না। রিভলভারটা পকেটে নিয়ে, টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন সাবধানে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তিনি যদি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যান, তা হলে কোনওই কাজ হবে না। একটা পা খোঁড়া বলেই তিনি অন্য পা-টা সম্পর্কে এখন বেশি সাবধান। তিনি ভাবতে লাগলেন, দেবলীনাকে নিয়ে এরকম পরীক্ষা করার ঝুঁকি নেওয়াটা তাঁর ঠিক হয়নি। দেবলীনা কেন বলল, আমি

চম্পা ! আগেই কেউ এই কথাটা ওর মনে গেঁথে দিয়েছে !

গেট পেরিয়ে বাইরে এসে কাকাবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। চতুর্দিকে একেবারে শুনশান। আজ শেয়ালরাও ডাকেনি। তবে চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়, খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে আকাশে।

সামনের জঙ্গলের মধ্যে বালিমাটির টিলাটা তিনি দুপুরে এক সময় দেখে এসেছেন। দেবলীনা যদি সেখানে যায়, তা হলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে চারদিক দেখে নিলেন ভাল করে। মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই, তবু তাঁর মনে হল, দু'একজন বোধহয় লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখছে আনাচ-কানাচ থেকে। কেন তাঁর এরকম মনে হচ্ছে ? কেউ হঠাৎ পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করবে ?

এই চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে এগোতে লাগলেন দৃঢ় পায়ে। দেবলীনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি, দেবলীনার কোনও রকম বিপদ-আপদ হলে শৈবাল দত্তের কাছে তিনি মুখ দেখাবেন কী করে ?

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি শুনতে পেলেন একটা গানের সুর। দেবলীনার গলা। দেবলীনা গান গাইছে। শৈবাল বলেছিলেন যে, দেবলীনাকে তিনি আগে কোনওদিন গান গাইতে শোনেননি। কাকাবাবুও শোনেননি।

সেই গানের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন কাকাবাবু। জঙ্গলের শুকনো পাতায় তাঁর ক্রাচ ফেলার শব্দ হচ্ছে। আরও একটা ওই রকম শব্দ যেন কানে আসছে। কেউ কি তাঁকে অনুসরণ করছে ? এক-একবার থেমে তিনি অন্য শব্দটা বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু থামলে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তবে কি তাঁর মনের ভুল ? টর্চের আলোতেও দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বালিয়াড়িটা এক সময় তিনি দেখতে পেলেন। মস্ত বড় একটা উই-ঢিপির মতন। সেটা দেখেই তাঁর মনে হল, এক সময় কেউ বালি-পাথর ফেলে-ফেলে এটাকে বানিয়েছিল। হয়তো শিকার করার সময় ওর ওপর শিকারিরা বসত । এখন সেটার গায়ে অনেক আগাছা জন্মে গেছে।

টিলাটার চূড়ার প্রায় কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দেবলীনা। মাথাটা ঝুঁকে গেছে সামনের দিকে। ঠিক যেন পুজো করার ভঙ্গি। সে যে গানটা গাইছে, তার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। একটানা সুর, তার মধ্যে যেন মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে, 'ওমা, ওমা, মা গো মা...'

শৈবাল দত্ত বলেছিলেন যে, ঠিক এই সময় ঝড় উঠেছিল, কিন্তু আজ ঝড় নেই। শৈবাল দত্ত আরও বলেছিলেন যে, তিনি দেবলীনার গায়ে হাত দিতে যেতেই সে ছুটে পালিয়েছিল। কাকাবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা যায়। আজও যদি দেবলীনা দৌড়ে পালায়, আর বাড়ি না-ফিরে চলে যায় আরও

দূরে ?

দেবলীনার নাম ধরে ডাকলে কি কোনও লাভ হবে ? বরং তিনি ভাবলেন, দেখাই যাক না এর পর কী হয় । এখন দেবলীনার বিপদে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তিনি পাহারা দিচ্ছেন । তাঁর বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল ।

দেবলীনার গান শুনতে শুনতে একদৃষ্টিতে সে-দিকে তাকিয়ে ছিলেন কাকাবাবু, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে তিনি চমকে উঠলেন ।

টিলাটার গা ফুঁড়ে যেন উঠে এল একজন মানুষ । জ্যোৎস্নায় দেখা গেল তার মাথার চুল আর মুখের লম্বা দাড়ি ধপধপে সাদা । পরনে রক্তাম্বর । এক-পা এক-পা করে সে এগিয়ে আসতে লাগল কাকাবাবুর দিকে ।

এই সেই কাল রাতে দেখা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ! কাকাবাবু আজ আর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন না । ভূত নয়, মানুষ ! আজ এর সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে ।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার !"

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন । হাত বাড়ালেই তাঁকে ছোঁয়া যাবে । এমনকী তাঁর লাল রঙের চাদর উড়ে এসে লাগল কাকাবাবুর গায়ে ।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ?"

বৃদ্ধটি ডান হাত তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, "তুই যা ! তোর এখানে থাকার দরকার নেই ! তুই যা, তুই যা !"

কাকাবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "আমি চলে যাব ? কেন ? আপনি কে, আগে বলুন !"

বৃদ্ধটি কাকাবাবুর মুখের সামনে হাতখানা দোলাতে-দোলাতে বলতে লাগলেন, "তুই যা ! তুই যা ! তুই যা ! চলে যা !"

কাকাবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল । এ কী ! এই বৃদ্ধ তাকে হিপনোটাইজ করছে নাকি ? এ যে খোদার ওপর খোদকারি ! তিনি নিজে পয়সা খরচ করে অস্ট্রিয়া গিয়ে এই বিদ্যে শিখেছেন, আর তাঁর ওপরেই কেরদানি দেখাতে এসেছে একটা গ্রাম্য বুড়ো ?

কাকাবাবু হেসে বলতে গেলেন, আমার ওপর ওসব চালাকি চলবে না । আপনি কে, কী চান, আগে বলুন...

কিন্তু এই কথা বলতে-বলতে কাকাবাবুর জিভ জড়িয়ে গেল, চোখ টেনে এল । মাথা ঘুরছে । তিনি নিজেকে ঠিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন । তবু চোখটা বন্ধ হয়ে আসছে । তিনি পকেট থেকে রিভলভারটা বার করার কথা ভাবলেন, কিন্তু তাঁর হাত অবশ হয়ে গেছে । তিনি শুধু শুনতে পাচ্ছেন বৃদ্ধের গমগমে গলা, "তুই যা···তুই যা···চলে যা···চলে যা !"

সেই আওয়াজে যেন তাঁর কানে তালা লেগে গেল, তিনি সম্পূর্ণ চেতনা হারিয়ে ফেললেন । কিন্তু মাটিতে পড়ে গেলেন না । বৃদ্ধ তাঁর কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে

দিতেই তিনি কাঠের পুতুলের মতন ঘুরে গেলেন উলটো দিকে। হাঁটতে আরম্ভ করলেন অন্ধের মতন। তাঁর বগল থেকে ক্রাচ দুটো খসে পড়ে গেল। তবু তিনি হাঁটতে লাগলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

কয়েকটা গাছে ধাক্কা খেতে-খেতে এক সময় তিনি পড়ে গেলেন ঝপাস করে। তাঁর শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন হাত তুলে। এবারে তিনি পেছন ফিরে ডাকলেন, "চম্পা, চম্পা !"

দেবলীনা সঙ্গে-সঙ্গে গান থামিয়ে বলল, "কী গুরুদেব ?"

বৃদ্ধ আদেশ করলেন, "এসো, আমার কাছে চলে এসো !"

চম্পা টিলার ওপর থেকে নেমে এসে বৃদ্ধের কাছে বসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

জঙ্গল থেকে আর-একটি লোক এবার বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধ তাকে দেখে বললেন, "মনোজ, চম্পাকে কোলে তুলে নাও। তারপর চলো..."

সে লোকটি বলল, "গুরুদেব, ওই খোঁড়া লোকটি কি জঙ্গলে পড়ে থাকবে ?"

"ও এখন থাক। ওর কোনও ক্ষতি হবে না। পরে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসো। এখন চম্পাকে ভেতরে নিয়ে চলো..."

মনোজ নিচু হয়ে দেবলীনার হাত ধরতে যেতেই দেবলীনা ছটফট করে উঠে বলল, "না, আমি চম্পা নই। আমি দেবলীনা ! আমার কাকাবাবু কোথায় ?"

বৃদ্ধ বললেন, "তোমার কাকাবাবু কেউ নেই। তুমি চম্পা, তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় যাবে !"

দেবলীনা চেঁচিয়ে উঠল, "না, আমি দেবলীনা। আমি দেবলীনা !"

চেঁচাতে চেঁচাতে সে এক ছুট লাগাল। নেমে গেল জঙ্গলের দিকে।

মনোজ বলল, "গুরুদেব, ওর ঘোর কেটে গেছে। ও জেগে উঠেছে। এখন কী হবে ?"

বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বললেন, "মূর্খ, ওকে ধরো। আমার চোখের সামনে নিয়ে এসো। আমি ওকে আবার মন্ত্র দিয়ে দিচ্ছি। শিগগির যাও !"

মনোজ ছুটল দেবলীনার পেছনে-পেছনে। তারপর চলল একটা লুকোচুরি খেলা। মনোজের বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। এক-একটা বড়-বড় গাছ ঘুরে-ঘুরে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল দেবলীনা। কাকাবাবু কাছেই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না !

হঠাৎ দেবলীনা তরতর করে চড়তে লাগল একটা গাছে। মনোজ ছুটে এসে তার একটা পা চেপে ধরলেও দেবলীনা অন্য পা দিয়ে একটা জোর লাথি মারল

তার মাথায়। তারপর উঠে গেল গাছের ওপরে। একেবারে মগডালে গিয়ে বসল।

দেবলীনার পায়ের একটা আঙুল লেগে গেছে মনোজের বাঁ চোখে। সে চোখ চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতর গলায় বলল, "গুরুদেব, মেয়েটা গাছে উঠে গেছে। এখন কী করব ?"

দূর থেকে গুরুদেব বললেন, "ওকে গাছ থেকে নামিয়ে আনো !"

মনোজ বলল, "কী করে নামাব ? আমি গাছে চড়তে গেলে ও আমায় লাথি মারবে ! অতি দস্যি মেয়ে ! কুড়ল এনে গাছটা কেটে ফেলব ?"

ওপর থেকে দেবলীনা বলল, "ছিঃ মনোজবাবু ! আগেরবার আপনি আমার সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করেছিলেন !"

এবার গুরুদেব চলে এলেন গাছটার কাছে। মনোজকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন, "ছিঃ, চম্পার সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। সোনার মেয়ে চম্পা, গাছ কেটে ফেললে ওর চোট লাগবে না ! ও এমনিই নেমে আসবে !"

ওপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দু'হাত তুলে মিষ্টি করে বললেন, "এসো, চম্পা, নেমে এসো, এসো..."

দেবলীনা বলল, "আমি চম্পা নই। কে চম্পা ? সে তো মরে গেছে অনেকদিন আগে। আমি দেবলীনা !"

গুরুদেব এক সুরে আবার বললেন, "এসো, চম্পা, নেমে এসো, এসো, এসো, এসো, এসো..."

দেবলীনা আবার বলল, "আমি, আমি, আমি, আমি, হ্যাঁ, আমি চম্পা। গুরুদেব আমি আসছি..."

তার চোখ বুজে এল, হাতের মুঠি আলগা হয়ে গেল। ওপরের ডাল ছেড়ে সে পড়ে গেল নীচের ডালে, তারপর মাটিতে পড়ে যাবার আগেই তাকে লুফে নিলেন গুরুদেব। অত বৃদ্ধ হলেও তাঁর শরীরে প্রচুর শক্তি।

তিনি স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "চম্পা, তোমার লাগেনি তো ?"

দেবলীনা আচ্ছন্ন গলায় বলল, "না, আমার একটুও লাগেনি !"

গুরুদেব বললেন, "ঘুমিয়ে পড়ো, চম্পা। ঘুমোও, চম্পা, ঘুমোও, ঘুমোও, ঘুমোও..."

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল দেবলীনা। গুরুদেব এবার তাকে দিয়ে দিলেন মনোজের হাতে। মনোজ তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে মনোজ জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব, মেয়েটা হঠাৎ জেগে উঠল কী করে ? এই একটু আগে ও ঠিক চম্পার মতন সুরে গান গাইছিল। আমি ভাবলুম, ও সত্যি চম্পা হয়ে গেছে।"

গুরুদেব বললেন, "মানুষের মন যে কী বিচিত্র, তা বোঝা দায় ! সব কিছু তো আমিও বুঝতে পারি না। এক-এক দিন ঘুম ভেঙে এই দুনিয়াটা সম্পূর্ণ

অচেনা মনে হয় না ? নিজেরই ঘরে শুয়ে আছ, অথচ চোখ মেলে তুমি মনে করতে পারবে না তোমার ঘরের দরজাটা কোন্ দিকে। হয় না এরকম ? সে-সব দিনে মনটা অন্য কোনও জগতে ভ্রমণ করে আসে ! বুঝলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি !"

"ছাই বুঝেছ ! এসব কথা বুঝলে আর সবসময় ছটফট করতে না। এই মেয়েটির মন বড় পবিত্র, কোনও দাগ পড়েনি। এরকম মেয়ের মনের জোর অনেক তাগড়া জোয়ানের চেয়েও বেশি। আরও একটা কথা শুনে রাখো, একই মানুষের মনের জোর সব দিন সমান থাকে না। কম-বেশি হয়। আমারই তো এরকম হয়। যেমন ধরো, গতকালই আমি তেমন জোর পাইনি। না হলে কালই আমার চম্পা-মাকে নিয়ে যাওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু কাল আমি ওর কাকাটিকে দেখে একটু যেন ভয় পেয়ে গেলাম !"

"আপনি ভয় পেলেন ? বলেন কী ?"

"সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জা কিসের ? কাল ওর কাকাটির দিকে এক নজর চেয়েই আমার মনে হল, এই মানুষটিরও যথেষ্ট পরাক্রম আছে। আমাকে দেখে সে ভয় পায়নি। তাকে কি কাবু করতে পারব ? ব্যস, একবার যে-ই ওরকম সন্দেহ হল, অমনি আমার শক্তি কমে গেল।"

"কিন্তু আজ তো ওর কাকা আপনার সামনে দাঁড়াতেই পারল না ?"

"ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, ও আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। সামান্য এক বৃদ্ধ ভেবেছে। ওর নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না।"

"আমি অবশ্য পেছন দিকে তৈরি ছিলাম। ও যদি তেড়িবেড়ি করত, আমি আঘাত করতুম ওর মাথায়।"

"ওহে মনোজ, আমি যখন সঠিক তেজে থাকি, তখন আমার চোখের সামনে পঞ্চাশ মুহূর্তের বেশি সজ্ঞানে থাকতে পারে, এমন মানুষ ভূ-ভারতে নেই। বৃথা কি এত বছর সাধনা করেছি ?"

কথা বলতে বলতে ওরা ঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধটি দু'হাতে ঝোপটা ফাঁক করতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ। মনোজ আগে দেবলীনাকে নিয়ে ঢুকে গেল তার মধ্যে, পরে ঢুকলেন গুরুদেব।

গুহার মধ্যে কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন অন্ধকার নয়। দূরে একটা মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। গুহাটি বেশি চওড়া নয়। দেবলীনার যাতে মাথায় গুঁতো না লাগে, সেজন্য অতি সাবধানে হাঁটতে লাগল মনোজ। পেছন থেকে গুরুদেব বলতে লাগলেন, "আস্তে, আস্তে..."

যেখানে মশাল জ্বলছে, সেখানটা একটা ঘরের মতন। মশালটা একটা দেওয়ালে গোঁজা। মেঝেতে পাতা একটা বাঘছালের আসন, সামনে পোঁতা একটা ত্রিশূল। অনেক শুকনো ফুল-পাতা সেখানে ছড়ানো। এক পাশে একটা

বিছানা পাতা, সেখানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে।

মনোজ দেবলীনাকে শুইয়ে দিল বিছানার পাশে।

বাঘছালটির সঙ্গে বাঘের মুণ্ডুটি পর্যন্ত এখনও রয়েছে। বৃদ্ধটি এসে বসলেন সেই আসনে। একটা কমণ্ডলু থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "আঃ!"

তারপর কমণ্ডলুটা নামিয়ে রেখে দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে আবেগের সঙ্গে বললেন, "মা চম্পা, মা চম্পা, এবার তুই মুক্তি পাবি! এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মনোজ, সব উপকরণ জোগাড় করো!"

মনোজ বলল, "সবই নিয়ে আসব প্রভু। আপনি কাজ শুরু করুন।"

মনোজ পাশের বিছানা থেকে চাদরটা তুলে নিতেই দেখা গেল, সেখানে শোওয়ানো রয়েছে একটি কঙ্কাল! তার গায়ে একটা নতুন লালপাড় শাড়ি জড়ানো!

৮

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে। কেউ তাঁর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলছে তবু তাঁর চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। আরও ঘুম পাচ্ছে। ঘুম কী আরামের!

তারপর তিনি সন্তুর গলার আওয়াজ চিনতে পারলেন। একবার চোখ মেললেন অতিকষ্টে। হ্যাঁ, সন্তুই তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বিছানার কাছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এটা তাঁদের কলকাতার বাড়ি, তাঁর নিজের বিছানা। এখন অনেক রাত, শুধু-শুধু সন্তু এই সময় তাঁর ঘুম ভাঙাল কেন? তবে বোধহয় সন্তু তাঁর জন্য কফি এনেছে।

তিনি ঘুম-চোখেই একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে, কফিটা দে!"

সন্তু মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে ব্যাকুলভাবে বলল, "কাকাবাবু, তোমার কী হয়েছে? শরীর খারাপ?"

কাকাবাবু কপাল কুঁচকে বললেন, "নাঃ, আমার কেন শরীর খারাপ হবে? তুই তো আমায় ডেকে তুললি। তোর কী হয়েছে?"

"কাকাবাবু, দেবলীনা কোথায়?"

"দেবলীনা? কে দেবলীনা? ও হ্যাঁ? শৈবাল দত্তের মেয়ে। সে এখানে কী করে আসবে? কেন, সে নিজের বাড়িতে নেই?"

"কাকাবাবু, ভাল করে তাকাও। দেবলীনা তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিল! সে কোথায়? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!"

এবারে কাকাবাবু ভাল করে চোখ মেলে ঘরের ছাদ ও দেওয়াল দেখে বেশ অবাক হয়ে বললেন, "আরে, কোথায় শুয়ে আছি আমি? এটা কোন্ বাড়ি?"

সন্তু বলল, "এটা কেওনঝড়ের সেই রাজবাড়ি। তোমার কী হয়েছে, তোমাকে কেউ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে ?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ঘুমের ওষুধ ? না তো ? এটা কেওনঝড়ের সেই রাজবাড়ি ? তা হলে তুই কী করে এখানে এলি ?"

"আমি আর জোজো সকালের বাসে এখানে চলে এলুম। বাসটা লেট করেছিল, পৌঁছল বিকেলবেলায়। এখানে আসতে আসতে সন্ধে। তখন থেকে দেখছি তুমি ঘুমোচ্ছ। কিছুতেই জাগানো যাচ্ছে না। দেবলীনাকেও দেখতে পাচ্ছি না !"

"রাত্তির হয়ে গেছে...আজ ক'তারিখ ?"

"আজ ন' তারিখ। তোমরা এখানে এসেছ তিনদিন আগে !"

"তিনদিন ? না দু' দিন ?"

"তিনদিন ! তোমাকে আমি একটা খুব জরুরি খবর দিতে এসেছি !"

"তিনদিন, তুই কী বলছিস রে, সন্তু ! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তা হলে মাঝখানে একটা দিন কোথায় গেল ?"

"নীচে একটা লোক বলল, তুমি সারাদিন ধরে ঘুমোচ্ছ ! তোমাকে খাবার দেবার জন্য ডাকতে এসেছিল, তুমি তাও জাগোনি !"

"সারাদিন ঘুমিয়েছি ? যাঃ ! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না !"

"আমরা প্রথমে ডাকাডাকি করে কারও সাড়াশব্দ পাইনি। তারপর বাড়ির পেছন দিকের একটা ভাঙা জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়লুম। একতলায় একটি ঘরে দেখি একজন লোক ঘুমোচ্ছে। তার নাম শশধর দাস। সে কোনও কথারই জবাব দিতে পারে না !"

"শশধর দাস। মানে, শশাবাবু ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, শশাবাবু। মাথাজোড়া টাক তো ! সন্তু, ওকে বল না আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে দিতে !"

সন্তু চেঁচিয়ে ডাকল, "জোজো, এই জোজো, শোন !"

জোজো একটা টর্চ নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সন্তুর ডাক শুনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "একেবারে সিনেমার ভুতুড়ে বাড়ি রে, সন্তু ! কতগুলো ঘর ! সব ফাঁকা ! কাকাবাবু জেগেছেন ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, তুই একটা কাজ কর তো !"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমরা আবার সেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের টিম ! এবারে ওড়িশার জঙ্গলে অভিযান ! এবারে হাতির পিঠে চড়ব।...কই রে সন্তু, কাকাবাবু যে এখনও ঘুমিয়ে আছেন দেখছি !"

সত্যিই, কাকাবাবুর মাথাটা আবার ঘুমে ঢুলে পড়ছে। চক্ষু বোজা !

সন্তু বলল, "এইমাত্র যে জেগে কথা বললেন !"

জোজো বলল, "সেটসি মাছি কামড়েছে। আমি আফ্রিকায় দেখেছি, সেটসি

মাছির কামড় খেয়ে অনেকের এইরকম ঘুম-রোগ হয়। ভেরি ডেঞ্জারাস!"

সন্তু বলল, "যাঃ, আফ্রিকার সেটসি মাছি এখানে আসবে কী করে?"

"এখানকার জঙ্গলে থাকতে পারে। কিংবা কেউ আফ্রিকা থেকে নিয়ে এসে কাকাবাবুর গায়ে ছেড়ে দিয়েছে। একটা ঘরে কতবড় একটা মাকড়সা দেখলুম জানিস? এই আমার হাতের সমান!"

"তুই এক কাজ কর তো, জোজো! নীচে যে লোকটা আছে, তাকে গিয়ে বল, খুব কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে দিতে। দুধ-চিনি বাদ!"

"আমি একলা-একলা যাব? সিঁড়িটা বড্ড অন্ধকার!"

"এই জোজো, তোর এরকম করলে চলবে না বলে দিচ্ছি। আমি তোর সঙ্গে গেলে কাকাবাবুর কাছে কে থাকবে? টর্চটা নিয়ে যা!"

জোজো চলে যাবার পর সন্তু তখন আর কাকাবাবুকে জাগাবার চেষ্টা করল না। তার সারা মুখে দুশ্চিন্তা। দেবলীনা কোথায় গেল? নীচের লোকটা বলেছে যে, সেও সারাদিন দেবলীনাকে দ্যাখেনি। তবে কে একজন মনোজবাবু নাকি বলেছে যে, দেবলীনা নিজে-নিজে কলকাতায় ফিরে গেছে। তা কখনও হয়! দেবলীনা কাকাবাবুকে এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাবে?"

সন্তু বাইরে বারান্দায় এসে দেখল, একটা চেয়ারের ওপর দেবলীনার একখানা বই খোলা অবস্থায় ওলটানো। ঠিক যেন সে বইটা পড়তে-পড়তে উঠে গেছে। সেই চেয়ারের কাছে পড়ে আছে দেবলীনার চটি। ঘরের মধ্যে সে দেবলীনার স্যুটকেস, জামাকাপড়ও দেখতে পেয়েছে। দেবলীনা একটু পাগলি-পাগলি আছে ঠিকই, একদিন সন্তুদের বাড়ি থেকে রাগ করে চটি ফেলে রেখেই খালি পায়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখান থেকেও সে ওইভাবে চলে যেতে পারে?

জোজো কফি নিয়ে আসবার পর সন্তু কাকাবাবুর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল কয়েকবার।

কাকাবাবু একটুখানি চোখ মেলে বললেন, "অ্যাঁ? কী হয়েছে?"

"কাকাবাবু, তোমার কফি!"

"কফি? ও, আচ্ছা!"

এবারে ভাল করে উঠে বসে কাকাবাবু খুব গরম ধোঁয়া-ওঠা কফি তিন-চার চুমুকে খেয়ে ফেললেন। তারপর আপন মনে বললেন, "তিনদিন? মাঝখানের একটা দিন কোথায় গেল?"

জোজো বলল, "আমিই শশধরবাবুকে রাত্তিরের খাবার অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। বলল, ভাত আর ডিমের ঝোল ছাড়া কিছু হবে না। লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কবে যাব! আরে, এই তো সবে এলুম!"

সন্তু বলল, "ওই লোকটার কথা পরে হবে। তার আগে দেবলীনাকে খুঁজে বার করা দরকার। কাকাবাবুর যে কিছুতেই ঘুম ছাড়ছে না!"

কাকাবাবু নিজের চুল মুঠি করে চেপে ধরে বললেন, "আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না রে সন্তু ! কী হল বল তো !"

তারপর নিজের কালো ড্রেসিং গাউনটা একটু তুলে বললেন, এটাতে জল-কাদা মাখা ! এই নোংরা পোশাকটা না খুলেই আমি শুয়ে পড়েছিলুম ? কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ? আমার এখনও ঘুম পাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "আর-এক কাপ কফি আনব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, একটু হাঁটাহাঁটি করে দেখি তো ! আমার ক্রাচ দুটো কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "এই তো, খাটের পাশেই রয়েছে !"

কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে অবাকভাবে বললেন, "ক্রাচ দুটো রয়েছে ? সব কিছু ঠিকঠাক আছে ? তবু আমি ঘুমোচ্ছি কেন ?"

বিছানা থেকে নেমে তিনি ক্রাচ বগলে নিয়ে বারান্দায় এলেন। বেশ জোরে-জোরে চলে গেলেন খানিকটা। আবার ফিরে এসে বললেন, "নাঃ, মনে পড়ছে না ! কাল রাত্তিরে আমি আর দেবলীনা বসে ছিলাম এখানে, একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছিল, আকাশে মেঘ ছিল না, বই পড়ছিলাম দু'জনে...তারপর কী হল ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দেবলীনা কাল রাত্তির থেকেই নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, তা কি হয় ? দেবলীনার কোনও বিপদ হলে আমি কি বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমোতে পারি ? আমি যখন খাটে গিয়ে শুয়েছি, তখন দেবলীনাও নিশ্চয়ই আগে শুতে গিয়েছিল। ঠিক কি না বল ?"

সন্তু চুপ করে রইল।

জোজো বলল, "দেবলীনা কোথাও লুকিয়ে থেকে আমাদের সঙ্গে মজা করছে না তো ? এতগুলো ঘর, কেউ লুকিয়ে থাকলে ধরবার উপায় নেই !"

সন্তু বলল, "তা হয় নাকি ? কাকাবাবুকে অসুস্থ দেখেও দেবলীনা এতক্ষণ ইচ্ছে করে বাইরে থাকতে পারে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অসুস্থ ? কিসের অসুখ ? তবে কিছু মনে করতে পারছি না, এটাও ঠিক !"

এই সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। এই নিস্তব্ধ জায়গায় গাড়ির আওয়াজ এমনই অস্বাভাবিক যে, চুপ করে গেল সবাই। গাড়িটা এদিকেই আসছে। গেটের বাইরে এসে থামল। তারপর একজন কেউ ডাকল, "রায়চৌধুরীবাবু ! রায়চৌধুরীবাবু !"

সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই কাকাবাবু বললেন, "এ তো মনে হচ্ছে দারুকেশ্বর ওঝা ! সন্তু, যা তো, দ্যাখ, ওই বড় গেটটার নীচে একটা ছোট গেট আছে, সেটা খুলে দিয়ে আয়। ওই দারুকেশ্বর কিছু জানতে পারে।"

তারপর তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "যাচ্ছে, দরজা খুলে দিচ্ছে !"

সন্তু জোজোর কাছ থেকে টর্চ নিয়ে ছুটে গেল। কাকাবাবু রেলিংয়ের কাছে এসে ওদের দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আবার ঘুমে ঢলে পড়লেন।

দারুকেশ্বর ওপরে উঠে এসে বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, কী হয়েছে ? কী সব শুনছি !"

কাকাবাবু চোখ মেলে বললেন, "কে ? কে আপনি ?"

দারুকেশ্বর খানিটা থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, "সে কী, আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি দারুকেশ্বর !"

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে এসে দারুকেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে অতিকষ্টে চোখ খুলে বললেন, "হ্যাঁ, দারুকেশ্বর, দেবলীনা কোথায় ?"

দারুকেশ্বর বলল, "দেবলীনা-মামণি কোথায় তা তো আমি জানি না ! আপনি একটা গাড়ি ভাড়া করে আনতে বলেছিলেন, সকালে গাড়ি নিয়ে এসে শুনলুম আপনি ঘুমোচ্ছেন। এক ঘন্টা বাদে ঘুরে এসে দেখি তখনও আপনি ঘুমোচ্ছেন ! আমার জঙ্গলে একটু কাজ ছিল, সেখানে চলে গেলুম গাড়িটা নিয়ে। দুপুর দেড়টার সময় আবার এসে দেখি, তখনও আপনার ঘুম ভাঙেনি। আমি আর ডিসটার্ব করলুম না। দেবলীনাকেও দেখতে পাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কাল রাত্তির থেকে আজ এই এত রাত্তির পর্যন্ত ঘুমিয়েছি ? এ-কখনও সম্ভব ? আমার জীবনে কক্ষনো এমন হয়নি ! ওই শশাবাবুকে ডাকুন তো !"

দারুকেশ্বর বলল, "ও ব্যাটাকে তো এখান থেকে ডাকলে আসবে না। ধরে আনতে হবে। রোজ এই সময় গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। দুর্যোধন কোথায় ?"

দারুকেশ্বর বারান্দা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "দুর্যোধন ! দুর্যোধন !"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

সন্তু বলল, "চল তো জোজো, তুই আর আমি ওই শশাবাবুকে ধরে নিয়ে আসি !"

ওরা ছুটে চলে যাবার পর দারুকেশ্বর বলল, "কাল রাত্তিরে আবার কিছু ভয়-টয় পাননি তো ? আমি বলেছিলাম সার্কিট হাউসে থাকতে। বেশ চারদিকে বেড়াতে যেতে পারতেন। এ-বাড়িটা ভাল না !"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে ? কী হয়েছিল কাল রাত্তিরে ? আঃ ! কিছু মনে পড়ছে না ! মাথাটায় কে যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই বুদ্ধি খুলছে না।"

কাকাবাবুর যেন দারুণ কষ্ট হচ্ছে, কুঁকড়ে গেছে মুখটা। তিনি এক হাতে নিজের মাথার চুল ধরে এমন জোরে টানলেন, যেন সব চুল উপড়ে আসবে !

দারুকেশ্বর চমকে গিয়ে বলল, "মনে পড়ছে না ? আপনাকে কেউ শল্যকরণী খাইয়ে দেয়নি তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "শল্যকরণী ? সে আবার কী ?"

"আছে, আছে, সে একটা বড় সাঙ্ঘাতিক গাছের বীজ। যদি কেউ খাইয়ে দেয়, তা হলে মনে হবে আপনার গায়ে শত-শত বাণ বিঁধছে! তারপর আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন! সে বড় ভয়ঙ্কর ঘুম! থাক ভয় নেই। আমার কাছে বিশল্যকরণী ওষুধ আছে, গন্ধমাদন পাহাড় থেকে জোগাড় করেছি। সে ওষুধের খোঁজ এখন কেউ রাখে না, শুধু আমি জানি। আজ রাতেই আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেব!"

"দেবলীনা কোথায় গেল?"

"আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে কী জানেন? এই রাজবাড়ির একজন গুরুদেব ছিলেন, আপনাকে বলেছিলাম। তাঁর নাম খগেশ্বর আচার্য। লোকে বলে তিনি এখনও দেখা দেন মাঝে-মাঝে, তিনি দিব্য-দেহ ধারণ করতে পারেন, তাঁর বয়েস একশো বছরের বেশি। আমি হিসেব করে দেখলুম, অত বয়েস হবে না, আমি তো এক সময় দেখেছি তাঁকে, এখন বেঁচে থাকলে তাঁর বয়েস পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর হত। লোকে যখন মাঝে-মাঝে তাঁকে দেখতে পায়, তা হলে তিনি বোধহয় বেঁচেই আছেন। আপনারাও তো পরশু রাতে তাঁকে একবার দেখেছিলেন। সেই গুরুদেবই দেবলীনাকে ধরে নিয়ে গেছেন হয়তো! তিনি চম্পাকে খুব ভালবাসতেন!"

"পরশু রাতে দেখেছিলুম। কাল রাতে কী হল? সেই বুড়োটা চম্পাকে ধরে নিয়ে কোথায় যাবে?"

"তা জানি না। গুরুদেব যদি বেঁচেই থাকেন, তা হলে কোনও একটা জায়গায় তাঁকে থাকতে হবে নিশ্চয়ই। খাওয়াদাওয়া করতে হবে। শুধু হাওয়া খেয়ে তো মানুষ দেহ ধরে বাঁচতে পারে না? কী বলেন! আমি কাল জঙ্গলে একটা আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে শুনলাম, গোনাসিকা পাহাড়ে নাকি এক সাধুর আশ্রম আছে। সেই সাধুকে সহজে কেউ দেখতে পায় না, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তিনি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, তিনি কখনও-কখনও স্বর্গ থেকে ঘুরে আসেন, এইসব আর কী! আদিবাসীরা রোজ তাঁর আশ্রমের সামনে ফলমূল রেখে আসে। এখন জঙ্গলের সেই সাধু আর রাজাদের গুরুদেব একই নন তো? চম্পার মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পাগলের মতন হয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন কেউ জানে না!"

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, "চম্পা আর দেবলীনা। দেবলীনা আর চম্পা! মাঝখানে পনেরো বছর! দক্ষিণের ঘর থেকে সেই সাধু বেরলো কী করে!"

জোজো আর সন্তু দু' হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল শশাবাবুকে। সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমি তো রান্না করে দিচ্ছি বাবু! দেব না সে-কথা তো বলিনি!"

দারুকেশ্বর তাকে ধমক দিয়ে বলল, "রান্নার কথা কে জিজ্ঞেস করছে!

দেবলীনা-দিদিমণি কোথায় গেল ?”

শশাবাবু মাথা টিপে ধরে বলল, “আজ্ঞে, উনি কোথায় গেছেন, তা কি আমার জানার কথা ? আমায় তো কিছু বলে যাননি। তবে সকালবেলা ম্যানেজারবাবু এসেছিলেন, তিনি বললেন, দিদিমণিটি বড়-রাস্তায় গিয়ে বাস ধরে টাউনে চলে গেছেন। ওপরে যে-বাবু ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে খবর দিতে বলেছেন !”

“ম্যানেজারবাবু মানে মনোজবাবু ? তিনি এসেছিলেন, আবার কোথায় গেলেন ?”

“তিনি বললেন, তাঁর বাড়িতে কার অসুখ, তাই তিনি আবার চলে যাচ্ছেন। থাকতে পারবেন না।”

“মেয়েটা এমনি-এমনি শহরে চলে গেল, একলা-একলা ?”

“মনোজবাবু তো সেই কথাই বললেন। তার বেশি তো আমি কিছু জানি না, বাবু !

“দুর্যোধন কোথায় ?”

“সে ব্যাটার কখনও পাত্তা পাওয়া যায় ? সে সাইকেল নিয়ে বাজারে চলে গিয়ে গাঁজা খায় !”

“দুর্যোধন বলে, তুমি গাঁজা খাও। আর তুমি বলছ সে গাঁজা খায়। বাঃ, বেশ বেশ !”

কাকাবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিলেন, আবার ঘুমে ঢুলে আসছিল তাঁর চোখ। এবারে তিনি সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর পাঞ্জাবির এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে রিভলভারটা পেয়ে গিয়ে বার করে আনলেন।

শশাবাবুই প্রথম সেটা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠে বলল, “ও কী, বাবু, আমায় মারবেন না। আমায় মারবেন না। আমি কিছু মিছে কথা বলিনি ! মনোজবাবু যা বলেছেন...”

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ, সবাই চুপ ! একটু দূরে সরে যাও !”

তিনি রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খুলে, চেম্বারটা একবার দেখে নিয়ে, নলটা ধরলেন নিজের কানের কাছে। তারপর ট্রিগারে আঙুল দিলেন।

সন্তু ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, “কাকাবাবু, ও কী করছ ? ও কী ?”

দারুকেশ্বর ফিসফিস করে বলল, “এই রে ! শল্যকরণী ! শল্যকরণী ! বোধবুদ্ধি সব লোপ পায়।”

কাকাবাবু অন্য একটা হাতের আঙুল ঠোঁটের কাছে নিয়ে বললেন, “চুপ। কোনও কথা নয়। সবাই একটু দূরে সরে যাও !”

তারপর তিনি ট্রিগার টিপলেন। প্রচণ্ড জোরে শব্দ হল, গুলিটা লাগল বারান্দার সিলিংয়ে, অনেকটা সুরকি ইট-বালির চাপড়া খসে পড়ল।

কাকাবাবু এবারে রিভলভারটা পকেটে ভরে দু' হাতে কান চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন জোরে জোরে।

সন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "এবারে কাকাবাবুর ঘুম কেটে যাবে।"

জোজো বলল, "বাপ রে, আমারই কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম।"

এতক্ষণ পরে কাকাবাবুর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "এতক্ষণ এই বুদ্ধিটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। শব্দই একমাত্র ওষুধ! খুব জোর শব্দ শুনলে ঘোর কেটে যায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এবারে সব মনে পড়েছে?'

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, একটু একটু করে মনে করছি। দুপুরবেলা পুকুরধারে...শিবমন্দির...সেখানে সুড়ঙ্গ...তার মধ্যে কিছু নেই। এক জায়গায় বন্ধ! দারুকেশ্বর, ওই শিবমন্দিরের তলায় যে সুড়ঙ্গ আছে, তা আপনি জানতেন?"

"না, স্যার। শুনিনি কখনও।"

"শশাবাবু, তুমি জানতে?"

"আজ্ঞে না। কোনও সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গের কথা তো আমি জানি না!"

"ঠিক আছে, শশাবাবু, তুমি যাও!"

শশাবাবু চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "সুড়ঙ্গ একটা আছে ঠিকই। আমি নিজে তার মধ্যে ঢুকে দেখেছি। সেটা বেশ লম্বা, তবে মাঝখানটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত অনেক পুরনো আমলের সুড়ঙ্গ, এখন সবাই ভুলে গেছে সেটার কথা। সেই সুড়ঙ্গের সঙ্গে ওই দক্ষিণের কোণের ঘরে কোথাও যোগ আছে নিশ্চয়ই, সেটা আমি খুঁজে পাইনি! তারপর কী হল?" দেবলীনা একা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল, আমি তাকে বারণ করিনি। সে কিন্তু ঠিক ফিরে এসেছিল, কোনও বিপদ হয়নি তার! শুধু সে জঙ্গলে কোনও একটা লোককে দেখতে পেয়েছিল, লোকটা দেবলীনাকে দেখেই লুকিয়ে পড়ে। সে কিন্তু এই বুড়ো সাধু নয়। তারপর?"

সবাই ব্যগ্র হয়ে শুনছে। কাকাবাবু আবার দু' কানে হাত দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

"এরপর সন্ধেবেলা আর কিছু হয়নি। আমরা খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক করেছি। তারপর...তারপর... ওঃ হো, আমিই একটা দারুণ ভুল করেছিলুম। আমি দেবলীনার অবচেতন মনের কথা বার করবার জন্যে ওকে হিপনোটাইজ করতে গেলুম। তাতে ফল হল উলটো, দেবলীনা হঠাৎ চম্পা হয়ে গেল, আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল দৌড়ে। কোথায় যেন গেল, কোথায় যেন...ওঃ হো, জঙ্গলের মধ্যে একটা বালির ঢিপির ওপরে। সেখানে সে বারবার যায় কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। সন্তু, সন্তু, চল্ তো, এক্ষুনি ওই জায়গাটা খুঁজে দেখতে হবে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, কাল রাত আর আজ রাত..."

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করলেন। সন্তু, জোজো, দারুকেশ্বর, সবাই তাঁর সঙ্গ নিল। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা জিপগাড়ি। তার ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে। দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করল, "রায়চৌধুরীবাবু, গাড়িটায় যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "না, গাড়িটা থাক। ওই জঙ্গলে গাড়ি ঢুকবে না। ইস, এখনও কেন মনে করতে পারছি না যে, ওই পর্যন্ত যাবার পর আমার কী হল? কী করে আমি ফিরে এলাম নিজের বিছানায়?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "দেবলীনা চম্পা হয়ে গেল, তার মানে কী?"

কাকাবাবু বললেন, "সে-সব তুই পরে শুনবি। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, এ-বাড়িতে চম্পা নামে এক রাজকন্যা ছিল, সে খুব রহস্যময়ভাবে মারা যায়। পনেরো বছর আগে। আমাদের দেবলীনাকে ঠিক সেই চম্পার মতন দেখতে।"

জোজো বলল, "গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ আছে, আমেরিকার মেমফিস শহরের একটা মেয়ে আর পাপুয়া নিউগিনির একটা মেয়েকে হুবহু একরকম দেখতে। গলার আওয়াজ পর্যন্ত একরকম। অথচ দু'জনের বাড়ির মধ্যে হাজার হাজার মাইল তফাত! আমি ওদের দু'জনের ছবি দেখেছি, ওদের দু'জনকে চম্পার মতনই দেখতে। গিনেস বুককে খবরটা জানানো উচিত, তিনটি মেয়েই একরকম চেহারার!"

সন্তু বলল, "তিনজন না, চারজন!"

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কাকাবাবু বললেন, "এইবার আর-একটা কথা মনে পড়ল। এখানে এসে আমি দেবলীনার গান শুনতে পেয়েছিলাম। অথচ এমনিতে দেবলীনা গান করে না। গানের শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছিল। ওই ডান দিক থেকে! দারুকেশ্বরবাবু, আপনি এই জঙ্গলে কখনও ওষুধ খুঁজতে আসেননি?"

"দারুকেশ্বর বলল, "না! এখানে সেরকম কিছু নেই, বড়-বড় গাছ শুধু!"

সন্তু আর জোজো আগে-আগে দৌড়ে যাচ্ছে। সকলের হাতে টর্চ। ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে সামনে সেই বালির টিলাটা দেখে কাকাবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চিবুক কঠিন হয়ে গেল, চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল।

তিনি দারুকেশ্বরের দিকে ফিরে বললেন, "আরও খানিকটা মনে পড়ে গেছে। এইখানে, ঠিক এইখানে সেই বুড়ো সাধুটা হঠাৎ এসে উদয় হয়েছিল। চমকে দিয়েছিল আমাকে, আমি সাবধান হবার সময় পাইনি। বুড়োটা আমাকে হিপনোটাইজ করল, আমি কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। তারপরেই নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে গেছি।"

দারুকেশ্বর বলল, "সাধু-সন্ন্যাসীদের এ-রকম অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। রাজাদের সেই গুরুদেব যদি হন..., আমি শুনেছি, তিনি খুব বড় তান্ত্রিক

ছিলেন !”

“অলৌকিক ক্ষমতা না ছাই ! আমিও ইচ্ছে করলে লোককে অজ্ঞান করে দিতে পারি। কিন্তু বুড়োটা আমাকে তৈরি হবার সময় দেয়নি। যদি আর-একবার তার দেখা পাই...”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু, দেবলীনা কোথায় ছিল ?”

কাকাবাবু বললেন, “এই ছোট টিলাটার মাথার কাছে তাকে শেষ দেখেছি। এই বালির টিলাটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। লোকজন জোগাড় করে এটা খুঁড়ে দেখতে হবে !”

সন্তু দৌড়ে টিলাটার মাথায় উঠে গেল, তারপর নেমে গেল উলটো দিকে। জোজোও গেল তার পেছনে। তারপর দু'জনে টিলাটার এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে লাগল। দু'জনের হাতে টর্চ জ্বলছে।

এক সময় সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, “কাকাবাবু, এখানে একটা লাল রিবন ! ঝোপে আটকে আছে। দেবলীনা মাথায় রিবন বাঁধে না ?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, কাল ওর মাথায় রিবন ছিল। ওই জায়গাটা ভাল করে খুঁজে দ্যাখ তো !”

সন্তু আবার বলল, “ঝোপের মধ্যে একটা আলগা বড় পাথর, মনে হচ্ছে একটা গুহার মুখে চাপা দেওয়া।”

জোজো বলল, “এই, সাবধান। এইসব গুহার মধ্যে বড়-বড় মাকড়সা থাকে !”

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো দারুকেশ্বরকে দিয়ে বললেন, “আপনি এগুলো ধরুন তো। এখানে আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে ! বালিতে ক্রাচ বসে যাবে।”

সন্তু আর জোজো ততক্ষণে ঝোপের আড়ালের পাথরটা সরিয়ে ফেলেছে। কাকাবাবু সেখানটায় এসে ভেতরটায় একটু উঁকি মেরে বললেন, “গুহা নয়, সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের আর-একটা মুখ। এটাকে লুকোবার জন্যই এককালে এখানে বালি-পাথর এনে টিলাটা তৈরি করা হয়েছিল। এখানে বসে কেউ গান গাইলে ভেতর থেকে শুনতে পাওয়া যাবে, তাই না ?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু দেবলীনা এখানে এসে শুধু-শুধু গান গাইবে কেন ? ওর কি মাথায় বুদ্ধি নেই ?”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক বুদ্ধির ব্যাপার নয় রে। সব রহস্য আমিও জানি না, বুঝতে পারিনি এখনও। খুব সম্ভবত ওই বুড়ো সন্ন্যাসীটা কোনও সময় দেবলীনার কাছে এসে ওকে হিপনোটাইজ করে ওর মনের মধ্যে চম্পার ছবিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। যাতে ওর মধ্যে চম্পার চরিত্রের লক্ষণগুলো আস্তে-আস্তে ফুটে ওঠে।

“দেবলীনা সে-কথা বলেনি তোমাকে ?”

"সজ্ঞান অবস্থায় তো এসব মনে থাকে না। দ্যাখ না, আমিই তো সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও মনে করতে পারছি না, কী করে এখান থেকে ফিরে গেলাম বিছানায়।"

"কাকাবাবু, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে আমি ঢুকি ?"

"তুই না, আগে আমি। সেই বুড়োটার শক্তি সাঙ্ঘাতিক। শোন্, একটা কথা বলে রাখি। যদি পাকা-চুল আর দাড়িওয়ালা কোনও বুড়োকে দেখতে পাস, সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ঢাকা দিয়ে ফেলবি। ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু ওর দিকে তাকাবি না !"

জোজো বলল, "আমার বাবা ওয়ার্ল্ড হিপনোটিজম কমপিটিশনে পরপর দু'বার ফার্স্ট হয়েছেন। আমি ওসব বুড়ো-ফুড়ো গ্রাহ্য করি না !"

সন্তু বলল, "তোর বাবা ফার্স্ট হয়েছেন, তুই তো ফার্স্ট হোসনি ! তুই আমার পেছনে থাকবি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই টর্চ ধর। আমাকে হাতে ভর দিয়ে নামতে হবে।"

কাকাবাবু সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আজ আর এর মধ্যে মশাল জ্বলছে না। টর্চের আলোয় পা টিপে-টিপে এগোতে হচ্ছে। কাকাবাবুর হাতে রিভলভার। আজ তিনি ঠিক করেই ফেলেছেন যে, সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখলেই তার পায়ে গুলি করবেন। লোকটি জীবিত, না প্রেতাত্মা, তা আজ জানতেই হবে !"

দারুকেশ্বর হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, "গন্ধ পাচ্ছি। আমি গন্ধ পাচ্ছি ! খুব খারাপ গন্ধ ! সেই গন্ধ !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই গন্ধ মানে ? কিসের গন্ধ ?"

দারুকেশ্বর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ওনাদের গন্ধ। রাত্তিরে নাম করতে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আস্তে, কেউ কথা বলবে না। সামনে কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।"

দারুকেশ্বর বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, ফিরে চলুন। আমার অনুরোধ, আর যাবেন না। এখানে জ্যান্ত মানুষ কেউ নেই, শুধু ওনারা রয়েছেন !"

কাকাবাবু বললেন, "এটা কী দেখুন তো ? চিনতে পারেন ? সন্তু, আমার হাতে এবার টর্চটা দে !"

সেই ঘরের মতো জায়গাটায় পৌঁছে গেছে ওরা। মেঝেতে ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে, শুকনো ফুল-পাতা ছড়ানো, সেইখানে অনেক আতপ চাল, অর্ধেক পোড়া ধূপকাঠি, এক হাঁড়ি দই, অনেকগুলো টাটকা জবাফুল, একটা আস্ত কাতলা মাছ, কয়েকটা মাটির প্রদীপ।

কাকাবাবুর টর্চটা যেখানে থেমে গেল, সেটা একটা কঙ্কাল, তার গায়ে

লালপাড় শাড়ি জড়ানো। তার করোটিতে মাখানো রয়েছে চন্দন।
জোজো সন্তুর হাত চেপে ধরে বলল, "ভূ-ভূ-ভূ-ভূত!"
সন্তু বলল, "চুপ!"
কাকাবাবু দারুকেশ্বরকে বললেন, "আপনি যে গন্ধ পেয়েছিলেন, সেটা ধূপের গন্ধ। একটু আগে এখানে মানুষজন ছিল। এখন যেটা পড়ে আছে, সেটা একটা কঙ্কাল। কঙ্কাল আর ভূত কি এক?"
দারুকেশ্বর দু'দিকে মাথা দোলাল।
কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার কঙ্কাল, তা আন্দাজ করতে পারেন?" গায়ে যখন শাড়ি জড়ানো, তখন কোনও মেয়ের বলেই মনে হয়!"
দারুকেশ্বর বলল, "খুব সম্ভবত এই হচ্ছে চম্পা। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাকে কেউ এই সুড়ঙ্গ-পথে নিয়ে এসেছিল!"
কাকাবাবু বললেন, "আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। এই সুড়ঙ্গটা সামনের দিকে আরও গেছে। ওদিকটাও দেখতে হবে।"
জোজো অনেকটা সামলে নিয়ে পকেট থেকে একটা ক্যামেরা বার করে বলল, "কাকাবাবু, এই জায়গাটার একটা ছবি তুলতে পারি? আমার ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ আছে। ছবিটা গিনেস বুক অব রেকর্ডসে পাঠাব। শাড়ি-পরা কঙ্কালের ছবি ওয়ার্ল্ডে আগে কেউ তুলতে পারেনি।"
কাকাবাবু আর দারুকেশ্বর এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। অনেক যত্ন নিয়ে এই সুড়ঙ্গটা কাটা হয়েছিল, তা বোঝা যায়। দু'দিকের দেয়াল বেশ মসৃণ। কোথাও মাকড়সার জাল নেই। দেখে বোঝা যায় যে, সম্প্রতি এটা ব্যবহার করা হয়েছে। খানিকটা এগোবার পর কাকাবাবু দেখতে পেলেন, এক জায়গায় অনেকগুলো লম্বা লম্বা রঙিন কাঠের টুকরো পড়ে আছে।
কাকাবাবু বললেন, "খুব সম্ভবত এগুলো ছবির ফ্রেম। চোরেরাও এই সুড়ঙ্গটা ব্যবহার করে মনে হচ্ছে। রাজবাড়িতে অনেক ঘরের দেয়ালে আমি চৌকো-চৌকো সাদা দাগ দেখেছি, বোধ হয় সেখানে কিছু মূল্যবান ছবি ছিল। চোরেরা ফ্রেম খুলে ছবি নিয়ে গেছে।
দারুকেশ্বর বলল, "চোরেরা ছবিও নেয় বুঝি?"
কাকাবাবু হাসলেন। তারপর বললেন, "অবশ্য, সেই সব চোরদের ছবির সমঝদার হতে হবে। সাধারণ চোরে নেবে না।"
এক জায়গায় সুড়ঙ্গটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। সামনে একটা দরজা। ডান দিক দিয়ে আর-একটা সুড়ঙ্গ ওপরের দিকে উঠে গেছে, ছোট-ছোট সিঁড়ি রয়েছে সেদিকে।
কাকাবাবু বললেন, "শিবমন্দিরের দিক দিয়ে ঢুকে আমি একটা দরজা দেখেছিলাম। মনে হচ্ছে এইটাই। দরজাটা এদিক থেকে শেকল তোলা। এ-দরজা দিয়ে কেউ যায়নি। আমি ডান দিকটা দিয়ে যেতে চাই।"

দারুকেশ্বরের কাছ থেকে ক্রাচ দুটো চেয়ে নিয়ে কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কুড়ি-পঁচিশটা সিঁড়ির পরেই আর-একটা দরজা। এটাও ভেতর দিক থেকেই শেকল তোলা। কাকাবাবু শেকল খুলে দরজাটায় একটা ধাক্কা দিলেন। তারপর টর্চ ফেলে দেখলেন সেটা একটা বাথরুম।

ভুরু কুঁচকে তিনি বললেন, "এ আবার কোথায় এলাম ?"

বাথরুমের পরে একটা খালি ঘর। তারপর একটা বারান্দা। এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। ওঁরা রাজবাড়ির দোতলায় উঠে এসেছেন। যে-ঘরটা থেকে এইমাত্র কাকাবাবুরা বেরিয়ে এলেন, সেটা দক্ষিণের কোণের ঘরের দুটি ঘর আগে।

কাকাবাবু অনুচ্চ গলায় হেসে বললেন, "এবার বোঝা গেল! দক্ষিণের কোণের ঘর সম্পর্কে এমন একটা গুজব ছড়ানো আছে যে, আমরা শুধু ওখানেই পথ খুঁজেছি। কিন্তু অন্য কোনও ঘর থেকেও তো দক্ষিণের ওই কোণের ঘরে যাওয়া যায়!"

দারুকেশ্বর বলল, "চম্পাকেও বোধহয় এইরকম কোনও পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রায়চৌধুরীবাবু, এবার আমাদের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত!"

৯

একটা সুন্দর লাল রঙের বেনারসি পরানো হয়েছে দেবলীনাকে। সে ঘুমিয়ে আছে একটা ধপধপে সাদা চাদরের ওপর। একটা মস্ত বড় ধুনুচি থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। তার সামনেই সেই মুণ্ডুসমেত বাঘছালটার ওপর চোখ বুজে বসে আছেন গুরুদেব।

পাহাড়ের গায়ে এই আশ্রম-ঘর। ছোট্ট একটা গুহার সামনে খড়ের ছাউনি। তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝরনা। সেই ঝরনা থেকে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে মনোজ এসে ঢুকল আশ্রমের মধ্যে।

তার পায়ের শব্দ শুনে গুরুদেব চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, "এবার সময় হয়েছে।"

ঝরনার জল দেবলীনার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিয়ে তিনি কোমল স্বরে বললেন, "চম্পা জাগো, চম্পা জাগো!"

চম্পার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তিনি বারবার ওই কথা বলতে লাগলেন। আস্তে চোখ মেলে দেবলীনা বলল, "আমার চোখ জ্বালা করছে!"

গুরুদেব বললেন, "মনোজ, ধুনুচিটা বাইরে নিয়ে যাও!"

তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ, চম্পা ?"

দেবলীনা বলল, "আমি ভাল আছি গুরুদেব। আমার আর কোনও কষ্ট

নেই। আমি এখন বাড়ি যাব।"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে। উঠে বোসো, মনোজ তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমার বাবার নাম কী, মনে আছে তো?"

দেবলীনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। আমার বাবার নাম রণদুর্মদ ভঞ্জদেও।"

গুরুদেব মনোজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর আবার দেবলীনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাকে মনে পড়ে তোমার? কী ছিল মায়ের নাম?"

"রানী হর্ষময়ী। আমার একটা ছোট্ট ভাই ছিল, তার নাম রণদুর্জয়, সে বাচ্চা-বয়েসে স্বর্গে চলে গেছে। আমার মা-ও সেখানে চলে গেছে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, তোমার ছোট ভাই তোমার মায়ের কাছে আছে। কিন্তু তোমার বাবা তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। তোমাকে দেখলে তিনি কী খুশিই হবেন! চম্পা, বলো তো তোমার কী হয়েছিল?"

"চোরেরা আমাকে চুরি করে নিয়ে মেরে ফেলেছিল। আপনি মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমাকে এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন।"

"বেঁচে উঠে তোমার ভাল লাগছে?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে, গুরুদেব। আমি এখন স্বর্গে মায়ের কাছে যেতে চাই না। আমি এখন বাবার কাছে যাব।"

"হ্যাঁ, তা-ই যাবে। তুমি তোমাদের কটকের বাড়িটা চিনতে পারবে? মনে আছে সে-বাড়ির কথা?"

"হ্যাঁ, সব মনে আছে। আমাদের বাগানে একটা পাথরের মূর্তির মুখ দিয়ে জল পড়ে। একটা ছোট চৌবাচ্চায় লাল-নীল মাছ আছে। দোতলার সিঁড়ির সামনে মস্ত বড় ঘড়ি। আমার বাবার ঘরে একটা রাধাকৃষ্ণের ছবি। সেই ছবির পেছনে লোহার সিন্দুক!"

"বাঃ, বাঃ, সব মনে আছে দেখছি! তোমার বাবাকে তুমি যে-গানটা শোনাতে, সেই গানটা একটু গাও তো।"

দেবলীনা চোখ বুজে একটু মনে করার চেষ্টা করে গান ধরল :

প্রভু মেরে অবগুণ চিক ন ধরো
সমদরশী হৈ নাম তিহারো,
চাহে তো পার করো ॥...

গুরুদেবের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন, "ধন্য, ধন্য! আজ আমার সাধনা ধন্য! সেই পনেরো বছর আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চম্পাকে আমার সিদ্ধি দিয়ে, আমার আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে তুলব, তা যে এমনভাবে সার্থক হবে ভাবিনি! করুণাময়ের কী বিচিত্র লীলা! রাজা রণদুর্মদ তার মেয়েকে আবার ফিরে পাবে। এই চম্পা আর হারিয়ে যাবে না। মনোজ,

তুই ঠিকমতন একে এর বাবার কাছে পৌঁছে দিবি !"

মনোজ হাত জোড় করে বলল, "নিশ্চয়ই গুরুদেব, আমি অতি সাবধানে নিয়ে যাব।"

"তুই ব্যাটা অর্থলোভী, তা আমি জানি। চম্পার বাবা তোকে বখশিস দেবেন, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবি, আর বেশি কিছু লোভ করবি না ! মনে রাখিস, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করলে তুই সারা পৃথিবীর কোথাও লুকোবার চেষ্টা করে নিষ্কৃতি পাবি না। আমি তোকে ঠিক টেনে নিয়ে আসব এখানে।"

মনোজ জিভ কেটে বলল, "সে কী কথা গুরুদেব ! আমি কখনও আপনার কথার অবাধ্য হতে পারি ? বুড়ো মেজোবাবু একলা থাকেন, আমি মনপ্রাণ দিয়ে ওঁদের সেবা করব।"

"রাজকুমারী চম্পা রাজেন্দ্রাণী হবে একদিন। এই আমি বলে গেলাম। সব সময় খেয়াল রাখবি, ওর যেন অযত্ন না হয়। পুলিশ দেখে ভয় পাবি না। হাজারটা পুলিশও প্রমাণ করতে পারবে না যে, ও চম্পা নয়। মা চম্পা, তোমাকে যদি কেউ কখনও তোমার বাবাকে ছেড়ে যেতে বলে, তুমি কি চলে যাবে ?"

দেবলীনা বলল, "না, কোনওদিন যাব না !"

"তুমি দেবলীনা নামে কারুকে চেনো ?"

"কে দেবলীনা ?"

"সে একটা মেয়ে, হারিয়ে গেছে। তুমি কলকাতা শহর দেখেছ কোনওদিন ?"

"সেই পাঁচ বছর বয়েসে একবার বাবা-মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, তার কাছে একটা হোটেল..."

"আর-একবার যাওনি ?"

"আর একবার হাওড়া স্টেশনে নেমে দার্জিলিংয়ের ট্রেনে উঠেছি।"

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ ! মা চম্পা, তোমার বাবার পিঠে কী দাগ আছে ?"

"পিঠে নয়, কাঁধে। চিতাবাঘে থাবা মেরেছিল।"

"শুনলি মনোজ, শুনলি ? চম্পা কিছুই ভোলেনি। সোনার মেয়ে চম্পা, ওকে ছেড়ে দিতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে ওকে দেখে আসব। এবারে চম্পাকে আমি সাজিয়ে দিই।"

গুরুদেব উঠে গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে একটা কুলুঙ্গি থেকে একটা ছোট পুঁটুলি নিয়ে এলেন। সেটার গিঁট খুলতে খুলতে বললেন, চম্পার দেহটা যখন আমি সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসি, তখন চম্পার গায়ে এই গয়নাগুলো ছিল। ওকে যারা মেরেছিল, তারা গয়নার জন্য মারেনি। এইগুলো আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কাছ থেকে তো কেউ চুরি করতে আসবে না। আজ এইগুলো কাজে লেগে গেল।"

গয়নাগুলো চম্পার হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "এগুলো পরে নাও তো মা ! বাবার কাছে যাবে, একেবারে নিরাভরণ হয়ে যেতে নেই।"

দু' হাতের চার গাছা করে সোনার চুড়ি, দু' কানের দুটি হীরের দুল, গলায় একটা মুক্তোর মালা, সব পরে নিল দেবলীনা। গুরুদেব মুগ্ধভাবে বললেন, "কী রকম ঠিক-ঠিক লেগেছে এতদিন পরেও ! এই তো আমাদের রাজকুমারী চম্পা !"

মনোজ বলল, "গুরুদেব, এবার ওকে নিয়ে যাই ? রাত অনেক হল।"

গুরুদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আমার বুকটা খালি-খালি লাগবে। তুই ওকে কী করে নিয়ে যাবি ?"

মনোজ বলল, "পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাড়ি লুকিয়ে রেখে এসেছি। কেউ টের পাবে না।"

গুরুদেব ধমক দিয়ে বললেন, "কেউ টের পেলেই বা ক্ষতি কী ! লুকোবার দরকার নেই। চম্পা আর কারুর কাছে যাবে না। আর কারুকে চিনবে না !"

মনোজ বলল, "ওঠো চম্পা, গুরুদেবকে প্রণাম করো !"

গুরুদেব চম্পার মাথায় হাত রেখে বললেন, "রাজ-রাজেশ্বরী হও, মা। সুখী হও। সবাইকে সুখী করো।"

মনোজও গুরুদেবকে প্রণাম করল। তারপর বলল, "চম্পা, এসো।"

চম্পা দু' এক পা এগিয়ে, আবার গুরুদেবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "যাই গুরুদেব..."

মনোজ আর গুরুদেব দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন, "কী হল ? কী হল ?"

চম্পা অজ্ঞান হয়ে গেছে। গুরুদেব ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললেন, "বেটির এখান থেকে চলে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু, রাজার মেয়ে, সে কি এই আশ্রমে থাকতে পারবে ? যেতে তো ওকে হবেই।"

তিনি আবার চম্পার মুখেচোখে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলেন, "চম্পা, জাগো...চম্পা, জাগো..."

আবার চম্পা বড়-বড় চোখ মেলে তাকাল। খুব যেন অবাক হয়ে সে দেখল গুরুদেব আর মনোজকে।

গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, চম্পা ? শরীর খারাপ লাগছে ? আজ সারাদিন খাওয়াও তো হয়নি কিছু। এ-সময় যে কিছু খেতে নেই।"

চম্পা উঠে বসে বলল, "এখন ঠিক আছি। কিছু হয়নি।"

"শরীর দুর্বল লাগছে না ?"

"না। আমি এখন যেতে পারব।"

"কোথায় যাবে মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, কটকে আমার বাবা রাজা রণদুর্মদ ভঞ্জদেও-র কাছে।"

"মনোজ, শহরে নিয়ে গিয়েই আগে ওকে কিছু খেতে দিবি। এসো মা চম্পা।"

চম্পা বলল, "গুরুদেব, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো?"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, হবে। নিশ্চয়ই হবে। আমি যাব তোমার বাড়িতে।"

চম্পা আর মনোজ আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে আসার পর গুরুদেব দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। তাঁর হাই উঠল। হঠাৎ যেন শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাঁর, ঘুম পাচ্ছে।

চম্পা আর মনোজ নামতে লাগল ঝরনাটার গা দিয়ে দিয়ে। চম্পা যাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়, সেইজন্য তার হাত ধরতে যেতেই চম্পা কড়া গলায় বলল, "না, আমার হাত ধরবে না। তুমি কর্মচারী, আমার হাত ধরছ কোন্ সাহসে?"

মনোজ থতমত খেয়ে বলল, "না, না, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলুম, তুমি যদি পড়ে যাও...।"

চম্পা বলল, "না, আমি ঠিক যেতে পারব!"

একটু পরে মনোজ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। গুরুদেবের সামনে সে সিগারেট খেতে পারেনি। সেও খুব ক্লান্ত। কাল রাত থেকে অনেক ধকল গেছে।

মনোজ সিগারেট ধরাতেই চম্পা ধমক দিয়ে বলল, "তুমি আমার সামনে সিগারেট খাচ্ছ, তোমার এত সাহস?"

মনোজ এবার রীতিমত হকচকিয়ে বলল, "সিগারেট খাব না?"

চম্পা বলল, "রাজকুমারীর সামনে সিগারেট খাবার আস্পর্ধা হয়েছে তোমার? বাবাকে বলে দেব! সিগারেট ফেলে দাও, মনোজ!"

মনোজ তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ঝরনার জলে ছুঁড়ে দিল। তারপর সে অনুনয় করে বলল, "রাজকুমারী চম্পা, আমি একটা কথা বলব? নীচে যে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, তার ড্রাইভার নতুন লোক। ভাড়া-গাড়ি। তুমি এত গয়নাগাঁটি পরে থাকলে সে-লোকটার যদি মাথায় বদ মতলব আসে? দিনকাল ভাল নয়। গয়নাগুলো খুলে আমার কাছে দাও!"

চম্পা বলল, "না!"

"শোনো রাজকুমারী, আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, এখন গয়নাগুলো খুলে রাখো।"

"না!"

"লক্ষ্মী মেয়ে, অবুঝ হয়ো না। গয়নাগুলো এখন দাও, তুমি বাড়িতে পৌঁছলেই তোমাকে আবার দিয়ে দেব। বাড়িতে তোমার আরও কত গয়না আছে!"

"আমি ওই ভাড়া-করা গাড়িতে যাব না !"

"তা হলে এখান থেকে কটক যাব কী করে ? অনেক দূর।"

"আমি আমার বাবার গাড়িতে যাব। বাবার গাড়ি নিয়ে এসো।"

"তোমার বাবার এখন কোনও গাড়ি নেই। রাজবাড়ির আর কোনও গাড়ি নেই। এই ভাড়া-করা গাড়িতেই যেতে হবে।"

"তা হলে আমি যাব না। আমি গুরুদেবের কাছে ফিরে যাব !"

মনোজ খপ করে চম্পার হাত চেপে ধরে বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না, চম্পা। যা বলছি তা-ই শোনো। ড্রাইভারটা নতুন, না হলে তোমাকে গয়নাগুলো খুলতে বলতুম না !"

চম্পা খুব জোরে ঠাস করে মনোজের গালে একটা চড় কষাল। নিজের হাতটা টেনে নিয়ে বলল, "তোর এত সাহস ! বলেছি না, আমার গায়ে হাত দিবি না ?"

মনোজ নিজের গালে হাত বুলোতে-বুলোতে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক পলক। চম্পা কিংবা দেবলীনা দু'জনেই নরম স্বভাবের মেয়ে। এই মেয়ে যে তাকে এত জোরে চড় মারতে পারবে, সে কল্পনাই করতে পারেনি। কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথায় রাগ চড়ে গেছে।

সে এবার গম্ভীর গলায় বলল, "দ্যাখো, মেয়ে, আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করো না ? মনে রেখো, আমার জন্য তুমি রাজকুমারী হতে যাচ্ছ। এরপর মহা সুখে থাকবে !"

চম্পার দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "দ্যাখ মনোজ, আমি কে তুই জানিস ? আমি পনেরো বছর আগে মরে গিয়ে ভূত হয়েছিলাম। এখন অন্য-একটা মেয়ের শরীরে ঢুকে পড়েছি। ফের যদি আমার গায়ে হাত দিস তুই, আমি তোর চোখ খুবলে নেব। তোর রক্ত চুষে খাব !"

মনোজ চম্পার এই মূর্তি দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে দু'এক পা পিছিয়ে গেল। তারপর সে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে উঁচু করে বলল, "কী, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ? আমি গুরুদেবের চ্যালা, আমি অত সহজে ভয় পাই না !"

চম্পা এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তুই আমাকে মারবি ? মার তো দেখি তোর কত সাহস ! আমার গায়ে মারলেই তা গুরুদেবের গায়ে লাগবে, তুই জানিস ! আয়, ওই পাথর ছুঁড়ে মার আমাকে। দ্যাখ, আমি ওই পাথরটা খেয়ে ফেলব !"

মনোজ আস্তে পাথরটা ফেলে দিয়ে বলল, "না চম্পা, আমি কি তোমাকে মারতে পারি ? তুমি আমাদের রাজকন্যা, তোমাকে আমরা সবাই ভালবাসি..."

চম্পা বলল, "তুই আমাকে মারতে পারলি না তো, তবে দ্যাখ !"

চম্পা চোখের নিমেষে নিজে দু'হাতে দুটো পাথর তুলে নিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সে দুটি ছুঁড়ে মারল মনোজের দিকে। মনোজ দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা

করার চেষ্টা করল। চম্পার একটা পাথর লাগল তার পিঠে, বড় পাথরটাই লাগল তার মাথার খুলিতে।

খুব জোরে আঘাত পেয়ে মনোজ বসে পড়ল মাটিতে। চম্পা সঙ্গে-সঙ্গে ছুট দিল বনের মধ্যে।

মিনিট-খানেক ঝিম মেরে বসে রইল মনোজ। তারপরেই তার খেয়াল হল যে, চম্পা পালিয়ে যাচ্ছে, চম্পা হাতছাড়া হয়ে যাবে। যন্ত্রণা সহ্য করেও সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল চম্পার পেছনে-পেছনে।

জঙ্গলের মধ্যে চম্পার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল মনোজ। এক-একবার সে দেখতেও পাচ্ছে। পাহাড় দিয়ে তরতর করে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে চম্পা। মনোজ তার নাগাল পাচ্ছে না। কিন্তু সে ভাবল পাহাড় থেকে নীচে নামলেই সে চম্পাকে ধরে ফেলবে।

চম্পা এক সময় ঝরনার মধ্যে নেমে পড়ল। এ ঝরনায় মাত্র হাঁটু-জল, তবু চম্পা ওপারে না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঝরনার মাঝখানে। মনোজ সেই ঝরনার ধারে পৌঁছতেই চম্পা তার দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, "আয় মনোজ, আয়, তোকে খাব!"

মনোজ হাত জোড় করে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "রাগ করো না, চম্পা, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর তোমার গায়ে হাত দেব না। তোমার গয়না খুলতে বলব না। তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব!"

চম্পা বলল, "না, আমি তোর সঙ্গে যাব না। আমি বাবার কাছে একলাই যেতে পারব!"

এবারে সে ঝরনাটা পার হয়ে আবার ছুটল।

পাহাড় ফুরিয়ে গেলে সমতলেও বেশ খানিকটা জঙ্গল আছে। চম্পা আর মনোজ দু'জনেই নেমে এসেছে সেখানে। মনোজ এবার প্রাণপণে ছুটে কমিয়ে আনল দূরত্ব। এক সময় সে ধরে ফেলল চম্পার শাড়ির আঁচল। চম্পা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গিয়ে হাতের দুটো আঙুল বসিয়ে দিল মনোজের চোখে।

তারপর সে হাহা করে হেসে উঠে বলল, "তোকে অন্ধ করে দেব!"

সঙ্গে-সঙ্গে জঙ্গলের রাস্তার বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল এক জিপগাড়ি। তার হেডলাইটের আলো পড়ল ওদের ওপর। মনোজ একবার মুখ তুলে দেখল জিপগাড়িটা। এটা তার গাড়ি নয়। বুঝতে পেরেই সে চম্পাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড় লাগাল পাশের জঙ্গলের মধ্যে।

জিপগাড়িটার সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন কাকাবাবু আর দারুকেশ্বর। পেছনে সন্তু আর জোজো।

দারুকেশ্বর বলল, "ওই তো চম্পা! ওই তো চম্পা!"

কাকাবাবু বললেন, "ওই তো দেবলীনা!"

সন্তু আর জোজো গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গেল চম্পার দিকে।

সন্তু কখনও দেবলীনাকে শাড়ি-পরা অবস্থায় দ্যাখেনি, তাই প্রথমটা সে চিনতে পারেনি। একেবারে কাছে এসে মুখখানা দেখে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কাকাবাবু, এই তো দেবলীনা !"

চম্পা সন্তুর বুকে একটা জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই, তুই কে রে ? রাজকুমারীর সামনে জোরে কথা বলছিস ! সরে যা !"

জোজো দেবলীনাকে দ্যাখেইনি, সে বলল, "এই, তোমার সঙ্গে যে লোকটা ছিল, সে গেল কোথায় ? সে তোমার বন্ধু না শত্রু ?"

চম্পা বলল, "চুপ ! কোনও কথা বললে চোখ গেলে দেব ! ওই গাড়িটার আলো নেভাতে বল !"

জিপটা থেমে গেছে। কাকাবাবু আর দারুকেশ্বরও নেমে এগিয়ে এলেন। এখন দারুকেশ্বরের হাতে টর্চ, সে আড়ষ্ট গলায় বলল, "যা ভয় করেছিলুম, তা-ই হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী গুরুদেব আপনাদের দেবলীনা দিদিমণির শরীরের মধ্যে চম্পার আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু সে-কথা গ্রাহ্য করলেন না। এগিয়ে এসে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী রে, দেবলীনা ? তোর কোনও ক্ষতি হয়নি তো ?"

চম্পা বলল, "তোমাদের এত সাহস, গাড়ি দিয়ে আমার রাস্তা আটকেছ ! সরে যাও, সবাই সরে যাও, আমি এখন কটকে যাব।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, এই-ই তো দেবলীনা। ও এরকমভাবে কথা বলছে কেন ?"

দেবলীনা সন্তুর দিকে ফিরে প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ ! কথা বলতে বারণ করেছি না ? এবার তোর গলা আটকে যাবে !"

কাকাবাবু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ? চম্পা না দেবলীনা ?"

চম্পা বলল, "আমি রাজকুমারী চম্পা। রাজা রণদুর্মদ ভঞ্জদেও-র মেয়ে। তোমরা এলেবেলে লোক, আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

সন্তু বলল, "এই, তুই কাকাবাবুর সঙ্গে ওরকমভাবে কথা বলছিস যে ?"

দেবলীনা এবার দুটো হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে বলল, "চোখ গেলে দেব, চোখ গেলে দেব !"

কাকাবাবু সন্তুকে থামতে ইঙ্গিত করে আবার চম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যদি চম্পা হও, তা হলে দেবলীনা কোথায় গেল ? আমরা দেবলীনাকে খুঁজতে এসেছি।"

চম্পা এবার হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠল। হাসির দমকে দুলতে লাগল তার শরীর !

গুরুদেবের আশ্রমের দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন কাকাবাবু। ভেতরে মশাল জ্বলছে। বাঘছালটার ওপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছেন গুরুদেব। তাঁর সবেমাত্র তন্দ্রা এসেছে। তিনি এখনও ঘুমোননি। কাকাবাবুর পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি চোখ না খুলেই বললেন, "ওরে ঝমরু, এবার মশালটা নিবিয়ে দিয়ে যা!"

কাকাবাবু বললেন, "ঝমরু এখানে নেই। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে এলাম।"

গুরুদেব তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। কাকাবাবুও ক্রাচ দুটো দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসলেন গুরুদেবের সামনে!

গুরুদেব বললেন, "তুই আবার এখানে এসেছিস? তুই কি এবার মরতে চাস?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "না, সন্ন্যাসীবাবা, আমার মরার জন্য তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কোনও এক সময় মরলেই হবে! এখন আপনার সঙ্গে কিছু বলতে চাই।"

গুরুদেব এক হাত উঁচু করে বললেন, "তুই যা, তুই যা! তুই ভুলে যা সব কিছু! ভুলে যা, ভুলে যা।"

কাকাবাবুও একটা হাত উঁচু করে বললেন, "আমি যাব না, আমি যাব না। তুমি সন্ন্যাসী, আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। উত্তর দেবে..."

দু'জনেই হাত তুলে পরস্পরের চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দু'জনেই সম্পূর্ণ মনের জোর নিয়ে এসেছেন চোখে। কেউ কাউকে টলাতে পারলেন না। এক সময় গুরুদেব বললেন, "তুমি কী করতে চাইছ, তা আমি বুঝেছি। শোনো বৎস, দুনিয়ার কারও এমন শক্তি নেই আমাকে সম্মোহিত করতে পারে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আপনিও আজ আমাকে সম্মোহিত করতে পারেননি, সাধুবাবা! কাল রাত্রে আপনি এমনভাবে আমার সামনে এসে হাজির হলেন, যে আমি তৈরি হবার সুযোগ পাইনি।"

গুরুদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি এখন খুব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। আমি চম্পাকে জাগাবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছি, নিজের আয়ুক্ষয় করেছি। তাই এখন আমি দুর্বল হয়ে আছি। নইলে, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে আমার কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগত না! তা বলে তুমি আমাকে অবশ করতে পারবে না। তোমাকে আমি কিছুই বলব না, তুমি দূর হয়ে যাও! ইচ্ছে হয় তো পুলিশের কাছে যাও!"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সঙ্গে বললেন, "আপনি হঠাৎ পুলিশের কথা বললেন

কেন ? তার মানে আপনি কিছু অন্যায় করেছেন, তা স্বীকার করছেন ? আপনি সাধুবেশে এক পাপী ?”

গুরুদেব জ্বলে উঠে বললেন, “অন্যায় ! তুমি নিমকহারাম ! অকৃতজ্ঞ !”

এবার কাকাবাবুর অবাক হবার পালা। তিনি বললেন, “আমি নিমকহারাম ? আমি অকৃতজ্ঞ ? কার কাছে অকৃতজ্ঞ ? আপনার কাছে ?”

“কাল রাতে জঙ্গলের মধ্যে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ মুহূর্তও স্থির থাকতে পারোনি ! সেই অবস্থায় যদি আমি তোমাকে ফেলে রেখে দিতাম, তোমাকে শেয়ালে-কুকুরে খেয়ে নিত। আমিই মনোজকে বুঝিয়ে, দু'জনে ধরাধরি করে তোমাকে জঙ্গল থেকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছিলাম ! কাল ওই জঙ্গলে হায়নার ডাক শোনা গিয়েছিল। আমি না বাঁচিয়ে রাখলে তুমি এখন কোথায় থাকতে ?”

“আপনারাই আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছেন ? ধন্যবাদ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনি মানুষ খুন করেন না !”

“আমি মানুষকে মারি না, আমি মানুষকে বাঁচাই ! আমি চম্পাকে বাঁচিয়ে তুলেছি !”

“পনেরো বছর বাদে ? চম্পার দেহ যখন শুধু একটা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয় ?”

“চম্পা অন্য ঘরে জন্মেছে। আমার টানে সে আবার এখানে চলে এসেছে। সে আসতই। আমি সেই মেয়েটির শরীরে চম্পার আত্মাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এখন সে-ই চম্পা !”

“একটি মেয়ের সঙ্গে আর-একটি মেয়ের চেহারার মিল একটা নিছক আকস্মিক ব্যাপার। একজন মরে গেছে অনেকদিন আগে, আর-একজন বেঁচে আছে। এই দু'জনে মিলে এক কি হতে পারে ? অসম্ভব !”

“মূর্খ তুমি কিছুই জানো না। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে তোমরা সবজান্তা হয়ে যাও ! তবে শোনো, সব ঘটনা ! ছোট-রানীর ভাইয়ের সাঙ্গোপাঙ্গরা এক রাত্তিরে বীভৎসভাবে খুন করেছিল চম্পাকে। ওই বাড়ির রাজাদের আর কারও মেয়ে ছিল না, চম্পা একমাত্র মেয়ে। ওই বয়েসেই আমার প্রতি চম্পার খুব ভক্তি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল। আমি তার মৃত্যু সহ্য করতে পারিনি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে বাঁচিয়ে তুলবই। তার দেহটা নিয়ে গিয়ে রেখে দিলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে গোপন করে। বহুকাল ওই সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ। বড়-রাজা আর আমি ছাড়া ওই সুড়ঙ্গের কথা আর কারও জানা ছিল না। যেখানে বসে আমি দিনের পর দিন শবসাধনা করেছি, আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছি। তবু তখন আমি চম্পাকে বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু আমি জানতাম, চম্পা একদিন অন্য ঘরে জন্ম নেবেই, আমার টানে সে ঠিকই ছুটে আসবে। সে এসেছে কি না ? আমার প্রতিজ্ঞা সার্থক হয়েছে কি না বলো ? অস্বীকার করতে পারবে ?”

"যে এসেছে, সে চম্পা নয়, সে দেবলীনা। সে তার বাবার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিল। তার চেহারার সঙ্গে চম্পার চেহারার খানিকটা সাদৃশ্য দেখে ওখানকার কোনও লোক আপনাকে খবর দিয়েছে। তারপর আপনি ওই দেবলীনা নামের মেয়েটিকে সম্মোহিত করেছেন। প্রথমবারই দেবলীনাকে ধরে নিয়ে গেলেন না কেন ? দ্বিতীয়বার সে আমার সঙ্গে না-আসতেও পারত ?"

"ধরে নিয়ে আসব কেন ? তাকে নিজের থেকে আসতে হবে। ওই মেয়েটিকে তো কেউ জোর করে ধরে আনেনি। সে আগের জন্মের চম্পা। তাই সে নিজের থেকে আমার কাছে এসেছে। প্রথমবার সে ফিরে গেলেও আমি নিশ্চিত জানতাম, তাকে আসতেই হবে !"

"সাধুবাবা, আমার মতে এটা কাকতালীয় ছাড়া আর কিছুই না ! আমি দেবলীনাকে নিয়ে এসেছি এবার। আমি তাকে ফিরিয়েও নিয়ে যাব !"

"তুমি পারবে না ! সে এখন পুরোপুরি চম্পা। সে চিনতেই পারবে না তোমাকে। আমাকে আর তার বাবাকে ছাড়া সে আর কাউকেই মানবে না।"

"চম্পার বাবা মেজো-রাজা একা-একা থাকেন। শুনেছি, তিনি অনেকটা পাগলের মতন হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলেমেয়ে নেই ! একটি মেয়েকে চম্পা সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি হয়তো তাকেই আঁকড়ে ধরবেন। তারপর সেই বৃদ্ধ রাজার টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, সব ওই মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনারাই গ্রাস করবেন। এই তো মতলব ?"

গুরুদেব এবারে ঝুঁকে এসে কাকাবাবুর নাকটা চেপে ধরে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "পামর ! তুই এই কথা বললি, তোর এত বড় সাহস ? আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, টাকা-পয়সা ছুঁই না, কোনও কিছু সঞ্চয় করি না, লোকেরা ফল-মিষ্টি দিয়ে গেলে খাই, যেদিন দেয় না, সেদিন কিছুই আহার করি না। তুই আমাকে বললি লোভী ? আজ তোকে এমন শাস্তি দেব..."

বৃদ্ধের আঙুলগুলো লোহার মতন শক্ত। এত জোরে নাক টিপে ধরেছেন যে কাকাবাবু সহজে ছাড়াতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই তিনি বৃদ্ধের ঘাড়ে বাঁ হাত দিয়ে জোরে এক কোপ মারলেন।

একটা কাতর শব্দ করে বৃদ্ধ হাত আলগা করে দিলেন।

কাকাবাবু একটু সরে গিয়ে বললেন, "আমার পা খোঁড়া তো, সেইজন্য হাতে জোর বেশি। আপনি শারীরিক শক্তিতে আমার সঙ্গে পারবেন না। আমাকে সম্মোহন করেও বশ করতে পারেননি। বরং আমি আপনাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারি। গুলি করে আপনার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারি। মন দিয়ে আমার কথা শুনুন !"

গুরুদেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবু আবার বললেন, "একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, আপনি মানুষ খুন করেন না। আপনি আমাকে জঙ্গলে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রাখেননি,

বাঁচিয়েছেন। এটাও বুঝলুম যে, আপনার টাকা-পয়সার প্রতি লোভও নেই। কিন্তু আপনার চ্যালাদের সে-লোভ থাকতে পারে। সে ঠিক আছে, আপনার চ্যালাদের ধরে গারদে পোরা হবে। তবে আপনিও একটা গভীর অন্যায় করেছেন। রাজার মেয়ে চম্পাকে বাঁচাবার জন্য অন্য একজনের মেয়েকে কেড়ে নিয়েছেন। চম্পা না-হয় বেঁচে উঠল, কিন্তু শৈবাল দত্তের মেয়ে দেবলীনা কোথায় গেল ?"

গুরুদেব বললেন, "পৃথিবীতে কত মেয়ে জন্মায়, কত মেয়ে হারিয়ে যায়, তার আমি কী জানি ! সেজন্য আমার কোনও দায়িত্ব নেই। আমার চম্পা ফিরে এসেছে, তাকে আমি পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে !"

"সাধুবাবা, রাজার কাছে তাঁর মেয়ে যেমন প্রিয়, একজন সাধারণ মানুষের কাছেও তো তার মেয়ে সমান প্রিয় ! একজন বাবার কাছ থেকে তার মেয়েকে কেড়ে নিয়ে অন্য একজন বাবাকে ফেরত দেবেন, এ কী রকম কথা ? এটা ঘোর অন্যায় নয় ?"

"তোমার ন্যায়-অন্যায় তোমার কাছে থাক। আমি জানি, চম্পাই আবার জন্মেছে। ও যারই মেয়ে হোক, ও আবার পুরোপুরি চম্পা হয়ে গেছে। আমি তাকে মন্ত্র দিয়েছি, পৃথিবীর আর কোনও শক্তি নেই, ওই মেয়ের দেহ থেকে চম্পাকে বার করে আনতে পারে।"

"ও এরপর থেকে চম্পাই থেকে যাবে ?"

"অবশ্যই ! অবশ্যই ! অবশ্যই ! তোমার পুলিশ, আদালত, যেখানে ইচ্ছে ওকে নিয়ে যাও, ও বরাবর নিজেকে চম্পাই বলবে। চম্পার সব লক্ষণ ওর চেহারায়, স্বভাবে ফুটে থাকবে।"

কাকাবাবুর সারা মুখে এবার হাসি ছড়িয়ে গেল। গুরুদেবের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "সাধুবাবা, বৃদ্ধ হলেই যে মানুষের সব কিছু সম্পর্কে জানা যায়, তা ঠিক নয়। সম্মোহনের শক্তি সারা জীবন তো দূরের কথা, একদিন দু'দিনের বেশি থাকে না। চম্পা হারিয়ে গেছে !"

গুরুদেব বললেন, "তুমি ছাই জানো ! ও-মেয়েকে তুমি যত-খুশি ডাক্তার-বদ্যি দেখাও, ও চম্পাই থাকবে। চম্পা আর কোনও দিন হারিয়ে যাবে না !"

কাকাবাবু গলা তুলে ডাকলেন, "দেবলীনা, দেবলীনা, একবার ভেতরে আয় তো !"

সঙ্গে-সঙ্গে দেবলীনা এসে ভেতরে ঢুকল। তাকে দেখে আবেগকম্পিত গলায় গুরুদেব বললেন, "এই যে মা চম্পা, তুই এসেছিস ? আয়, আমার পাশে বোস !"

দেবলীনা মুচকি হেসে বলল, "গুরুদেব, আমি চম্পা নই। আপনার ঘর থেকে বেরোবার সময় একবার যে আমি আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম, তখনই

আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি বুঝতে পেরে গেলুম, আপনারা আমাকে চম্পা সাজাচ্ছেন। আমি কিন্তু তখন আর আপনাদের বুঝতে দিইনি যে, আমি সব জেনে গেছি! তখন অভিনয় করতে লাগলুম! চম্পার অভিনয় করে আমি মনোজবাবুকে ভয় দেখিয়েছি। কাকাবাবু, সন্তুদেরও ঠকিয়ে দিয়েছিলাম। কাকাবাবু, আমি কেমন অভিনয় করেছি বলুন?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "একেবারে পাকা অভিনেত্রী! প্রথমটায় আমিও বুঝতে পারিনি।"

গুরুদেবের কপাল কুঁচকে গেছে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "তুই চম্পা নোস? এই লোকটা তোকে...চম্পা, চম্পা ফিরে আয় মা..."

কাকাবাবু একটা হাত গুরুদেবের চোখের সামনে ধরে দেবলীনাকে আড়াল করে বললেন, "আপনি আবার ওকে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করবেন না। তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার কাছে পিস্তল আছে, তার শব্দ করলে এক মুহূর্তে ওর ঘোর কেটে যাবে! আপনি বরং ওকে আশীর্বাদ করুন।"

গুরুদেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই সত্যি চম্পা নোস?"

দেবলীনা বলল, "না, গুরুদেব। আমি তো কলকাতায় থাকি, আমি দেবলীনা দত্ত। আমার বাবার নাম শৈবাল দত্ত!"

কাকাবাবু বললেন, "যারা মরে যায়, তারা আর ফিরে আসে না। যারা বেঁচে থাকে, তাদেরই ভালবাসতে হয়, স্নেহ-প্রেম দিতে হয়। সাধুবাবা, আপনি ভাল মন নিয়ে ওকে আশীর্বাদ করুন।"

গুরুদেবের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। তিনি কম্পিত ডান হাতখানা তুলে দেবলীনার মাথার ওপর রেখে বললেন, "সুখী হও মা! চিরায়ুষ্মতী হও!"

তারপরেই গুরুদেব অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক! দেবলীনা, তুই সাধুর মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দে। বুড়ো মানুষ, এতটা মনের চাপ সহ্য করতে পারেনি। একটু সেবা কর, একটু বাদেই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

বাইরে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। সন্তু, জোজো, দারুকেশ্বর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে উদগ্রীব হয়ে। কাকাবাবু তাদের বললেন, "সব ঠিক হয়ে গেছে। মনোজটা পালিয়েছে, ওকে ঠিক ধরা যাবে। এই সাধুবাবাকে আর এখান থেকে টানা-হ্যাঁচড়া করার দরকার নেই!"

দারুকেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, ওঁকে আর কিছু শাস্তি দেবেন না। বুড়ো মানুষ, ক'দিনই বা আর বাঁচবেন!"

কাকাবাবু সামনের দিকে তাকালেন। সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জঙ্গল, পাশের ঝরনাটা নেমে গেছে একটা রুপোর পাতের মতন।

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "এখানে বেড়াতে এসে এ-পর্যন্ত কিছুই দেখা হল না, ভাল করে। এবার দেখতে হবে।"

তারপর তিনি সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, সন্তু, তোরা দু'জনে এখানে হঠাৎ চলে এলি! তুই বললি, কী দরকারি কথা আছে না! কী কথা?"

সন্তু বলল, "কাল রাত্তিরে দিল্লি থেকে নরেন্দ্র ভার্মার স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন। খুবই কান্নাকাটি করছিলেন ভদ্রমহিলা।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"নরেন্দ্র ভার্মাকে চার দিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধেবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথেই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কোনও সন্ধান নেই। ওঁর স্ত্রী বললেন, আপনাকে একবার দিল্লি যেতেই হবে, আপনি না গেলে উনি ভরসা পাবেন না!"

কাকাবাবু ক্লান্তি ও বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, "আবার দিল্লি? আমার কি কিছুতেই ছুটি পাবার উপায় নেই রে, সন্তু! এখানে এসে দু'চারদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করব ভেবেছিলাম..."

এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবু ঝরনাটার পাশে বসে পড়লেন। আঁজলা করে জল তুলে মুখে ছেটাতে ছেটাতে বললেন, "আঃ!"

বিজয়নগরের হিরে

দু'পাশে ধুধু-করা মাঠ, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কোনও বাড়িঘর তো দেখাই যাচ্ছে না, মাঠে কোনওরকম ফসল নেই, গাছপালাও প্রায় নেই বলতে গেলে। অনেক দূরে দেখা যায় পাহাড়ের রেখা। এই অঞ্চলটাকে ঠিক মরুভূমি বলা যায় না, ভাল বাংলাতে এইরকম জায়গাকেই বলে 'ঊষর প্রান্তর'।

রাস্তাটা অবশ্য বেশ সুন্দর, মসৃণ, কুচকুচে কালো যত্ন করে বাঁধানো। গাড়ি চলার কোনও ঝাঁকুনি নেই, রাস্তার দু'পাশে কিছু দেখারও নেই, তাই সবারই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গাড়ি যে চালাচ্ছে, তাকে তো চোখ মেলে থাকতেই হবে, রঞ্জন সেইজন্য নস্যি নিচ্ছে মাঝে-মাঝে। আকাশে একটুও মেঘের চিহ্ন নেই, মধ্য গগনে গনগন করছে সূর্য। মাঝে-মাঝে দু-একটা লরি ছাড়া এ-রাস্তায় গাড়ি চলাচলও নেই তেমন।

সামনের সিটে বসে আছেন কাকাবাবু। চলন্ত গাড়িতেও তিনি বই পড়ছিলেন, একসময় হাত তুলে বললেন, "খাবার জল আর আছে, না ফুরিয়ে গেছে?"

পেছনের সিটের মাঝখানে বসেছে রঞ্জনের স্ত্রী রিঙ্কু, তার দু'পাশে জোজো আর সন্তু। দু'জনেই জানলার ধার চেয়েছিল, কিন্তু এখন ঘুমে ঢুলছে। রিঙ্কু সোজা হয়ে জেগে বসে আছে, তার কোলের ওপর একটা ম্যাপ ছড়ানো। রঞ্জন এর আগে দু-তিনবার ভুল করে অন্য রাস্তায় ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, রিঙ্কুই প্রত্যেকবার তাকে গাড়ি ঘোরাতে বলেছে।

কাকাবাবুর কথা শুনে রিঙ্কু পায়ের কাছ থেকে ওয়াটার বট্‌লটা তুলে নেড়েচেড়ে বলল, "শেষ হয়ে গেছে! আমাদের আরও দুটো-তিনটে জলের বোতল আনা উচিত ছিল!"

ওরা বেরিয়েছে বাঙ্গালোর থেকে খুব ভোরে। সেখানকার আবহাওয়া খুব সুন্দর, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, পথে যে এত গরম পড়বে সে-কথা তখন মনে আসেনি।

কাকাবাবু বললেন, "একটা কোনও নদী-টদিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে।"

রঞ্জন বলল, "এর পর যে পেট্রোল-পাম্প পড়বে, সেখানে আমরা জল খাব, গাড়িও জল-তেল খাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "এ-তল্লাটে কোনও পেট্রোল-পাম্প আছে কি? শুধুই তো মাঠের পর মাঠ দেখছি!"

রিঙ্কু বলল, "ম্যাপে দেখা যাচ্ছে, আর ১৪ কি... না, না, দাঁড়ান, হিসেব করে বলছি, উঁ, ইয়ে, প্রায়, তিন ক্রোশ পরে একটা বড় জায়গা আসছে, এর নাম চিত্রদুর্গা! সেখানে গাড়ির পে... মানে তেল আর খাবার-টাবার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই!"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "তিন ক্রোশ? কতক্ষণ লাগবে, পনেরো মিনিটে মেরে দেব! তোমরা সবাই এরই মধ্যে এত ঝিমিয়ে পড়ছ কেন, চিয়ার আপ!"

সন্তু ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "রঞ্জনদা দু'বার, কাকাবাবু একবার!"

রঞ্জন বলল, "এই রে, বিচ্ছুটা সব শুনছে? আমি ভেবেছিলুম ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি!"

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বার করে কী যেন লিখল, তারপর আবার চোখ বুজল।

রঞ্জন বলল, "আরে, এ-ছেলে দুটো এত ঘুমোয় কেন? আমরা কত ভাল-ভাল জিনিস দেখছি।"

সন্তু চোখ না খুলেই বলল, "কিছু দেখার নেই!"

রঞ্জন বলল, "একটু আগে রাস্তা দিয়ে দুটো ছোট-ছোট বাঘ চলে গেল। এখন হাতি দেখতে পাচ্ছি, একটা, দুটো, তিনটে... কাকাবাবু, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে, তাই তো! রঞ্জন কি ম্যা... ইয়ে জাদুবিদ্যে জানে নাকি? সত্যিই তো হাতি!"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল। কোনও সন্দেহ নেই, সোজা রাস্তাটার অনেক দূরে গোটাতিনেক হাতি দেখা যাচ্ছে। সন্তু ধাক্কা দিয়ে জাগাল জোজোকে।

জোজো সামনের দিকে চেয়েই বলল, "ওয়াইল্ড এলিফ্যান্টস!"

সন্তু পকেট থেকে ছোট খাতাটা বার করতে-করতে বলল, "জোজো এক!"

রঞ্জন বলল, "এই ধুধু-করা মাঠের মধ্যে বন্য হস্তী আসিবে, ইহা অতিশয় অলীক কল্পনা। আমার মনে হয়, এই হস্তীযূথ বিক্রয়ের জন্য হাটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সন্তু, একটা হাতি কিনবি নাকি?"

গাড়িটা আরও কাছে আসবার পর দেখা গেল হাতিগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু লোকজনও আছে, কয়েকজন সানাই বাজাচ্ছে। মাঝখানের হাতিটায় একজন প্যান্ট-কোট পরা লোক বসে আছে, তার গলায় অনেকগুলো মালা, মাথায় সাদা

জরি-বসানো পাগড়ি !

রিঙ্কু বলল, "ওমা, বর যাচ্ছে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বউ কোথায় ? প্যান্ট-কোট-পরা বর হয় নাকি ?"

রঞ্জন বলল, "হ্যাঁ, হয়। এখানে এরা সুট পরে, পাগড়ি মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যায়। এই লোকটা বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

রিঙ্কু বলল, "এদের দিনের বেলায় বিয়ে হয়। বাঙালিদের বিয়ের মতন আলো-টালো জ্বালার খরচ নেই !"

জোজো বলল, "এরা হচ্ছে গোন্দ নামে একটা ট্রা... মানে, উপজাতি। এদের মধ্যে নিয়ম আছে, হাতির বিয়ে দেওয়া খুব ধুমধাম করে। আজ হাতিগুলোরও বিয়ে হবে, তাই ওদের গলাতেও মালা পরানো হয়েছে, দেখেছিস সন্তু !"

রঞ্জন ভুরু কপালে তুলে বলল, "বাঃ, তোমার তো অনেক জ্ঞান দেখছি !"

সন্তু বলল, "ও আপনাকেও ছাড়িয়ে যাবে, রঞ্জনদা !"

জোজো বলল, "আমার মামাবাড়িতে দুটো হাতি ছিল কিনা ! সেখানে মাহুতের মুখে শুনেছি। আমার এক মামা সেই মাহুতকে অসম থেকে নিয়ে এসেছিল।"

রঞ্জন ঘ্যাঁচ করে গাড়িতে ব্রেক কষে বলল, "তা হলে জিজ্ঞেস করা যাক, আজ ওই লোকটার বিয়ে, না হাতিগুলোর বিয়ে ?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "এই রঞ্জন, পাগলামি করবে না !"

রঞ্জন গোঁফ-দাড়ির ফাঁক দিয়ে অনেকখানি হেসে বলল, "আমার নতুন-নতুন জিনিস শিখতে খুব ভাল লাগে। হাতির বিয়ে !"

বছরখানেক ধরে রঞ্জন দাড়ি রাখছে। শুধু রাখছে না, দাড়ি ইচ্ছেমতন বাড়তে দিচ্ছে, এখন তাকে প্রায় ইতিহাসের নানাসাহেবের মতন দেখায়। তার চেহারাটিও সেরকম বিরাট। কিন্তু তার হাসিতে এখনও একটা দুষ্টু ছেলের ভাব ফুটে ওঠে।

কিছু লোক হাতির পিঠে চেপেছে, কিছু লোক পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। সানাইওয়ালারা গাড়ি দেখে যেন বেশি উৎসাহ পেয়ে জোরে-জোরে বাজাতে লাগল।

রঞ্জন তাল দিতে-দিতে বলল, "এদের সঙ্গে বরযাত্রী হয়ে চলে যাব ? ভাল খাওয়াবে !"

কাকাবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন, "রঞ্জন, গাড়ি থামলেই গরম বেশি লাগছে। আগে আমার একটু জল খাওয়া দরকার।"

রঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়েই এই হাতির শোভাযাত্রাটাকে পাশ কাটিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল।

রিঙ্কু বলল, "এই কী করছ ? এত স্পিড দিও না !"

সন্তু খাতা বার করে বলল, "রিঙ্কুদি এক !"

রিঙ্কু বলল, "কেন ? আমি কী বলেছি ? ওঃ হো, স্পিড ! না বাপু, আমি এই খেলা খেলতে পারব না !"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। রঞ্জন একটা স্বরচিত গান ধরে দিল, "গতি ! গতি ! যার নাই কোনও গতি, সেই করে ওকালতি ! কিংবা সে পথ ভোলে, ভুলুক না, তাহে কী-বা ক্ষতি !"

সামনেই একটা মোড় এল, ডান দিকে বাঁ দিকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেছে। রিঙ্কু বলল, "পথ ভুল করলে চলবে না ! রঞ্জন, এবার লেফট টার্ন নাও, আমরা হাইওয়ে ছাড়ব না। ওইটা হাইওয়ে দেখতে পাচ্ছ না ?"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি দুই !"

জোজো বলল, "দুই না, তিন ! হাইওয়ে দু'বার বলেছে।"

রিঙ্কু বলল, "অ্যাই, হাইওয়ের বদলে কী বলব রে ?"

সন্তু বলল, "রাজপথ। বাকিগুলো শাখাপথ।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে ওই যে পাহাড়ের ওপর মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওইটাই খুব সম্ভবত চিত্রদুর্গা। অনেকদিন আগে এখানে একবার এসেছিলাম, ভাল মনে নেই। পাহাড়টার গায়ে একটা দুর্গ আছে। খুব সম্ভবত এই জায়গাটার আসল নাম চিত্র-দুর্গ, ইংরেজি বানান দেখে-দেখে লোকে এখন বলে চিত্রদুর্গা। এসব দিকে দুর্গা মন্দির থাকা অস্বাভাবিক। ওপরের মন্দিরটা বোধহয় শিবমন্দির।"

রঞ্জন বলল, "আর বেশিদূর গিয়ে কী হবে ? ওই পাহাড়টার তলায় যদি কোনও বাংলো-টাংলো পাওয়া যায়, তা হলে সেখানে থেকে গেলেই তো হয় !"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না ! রঞ্জন, আজ সন্ধের মধ্যেই আমরা হাম্পি পৌঁছতে চাই !"

জোজো বলল, "মধ্যপ্রদেশে এরকম একটা পাহাড়ের মাথায় মন্দির দেখেছিলুম, সে-পাহাড়টা অবশ্য আরও অনেক উঁচু, সেখানে নরবলি হয়।"

রিঙ্কু একটু চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি দেখেছ মানে ? তুমি সেই মন্দিরে নরবলি দিতে দেখেছ ?"

জোজো বলল "আমি যেদিন সেই পাহাড়টার ওপরে উঠি সেদিন শুধু মোষবলি ছিল। তবে আমার মামা নিজের চোখে নরবলি দেখেছে !"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "এটা তোমার কোন্ মামা ? যিনি অসম থেকে মাহুত আর হাতি এনেছিলেন ?"

জোজো বলল, "না, সে অন্য মামা !"

রঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার কতজন মামা ?"

জোজো উত্তর দেবার আগেই সন্তু বলল, "আমি এ-পর্যন্ত জোজোর এগারোজন মামা আর সতেরোজন পিসেমশাইয়ের হিসেব পেয়েছি।"

রঞ্জন একটুও অবাক না হয়ে বলল, "তা তো থাকতেই পারে। কারও কারও মামা-মামি, পিসে-পিসির ভাগ্য ভাল হয়। ভাবো তো, যার কোনও মামা নেই, মেসোমশাই কিংবা পিসেমশাই নেই, সে কত হতভাগ্য ! আমি মামি, মাসি আর পিসিদের কথা বাদ দিচ্ছি !"

রিঙ্কু বলল, "কেন, তুমি মাসি-পিসিদের কথা বাদ দিচ্ছ কেন ? মাসি-পিসি না থাকাটাও তো দুর্ভাগ্য !"

রঞ্জন বলল, "এইজন্যই বলি রিঙ্কু, যে-কোনও কথা বলার আগে একটু বুদ্ধি খাটাবে ! যে-লোকের মাসি নেই, তার কি মেসোমশাই থাকতে পারে ? মনে করো, আমার বাবার কোনও বোন নেই, তা বলে কি আমি যার-তার সঙ্গে পিসেমশাই সম্পর্ক পাতাতে পারি। হ্যাঁ, একটা কথা তুমি বলতে পারো বটে যে, মামিমা না থাকলেও মামা থাকতে পারে ! মামা-শ্রেণীর লোকেরা একটু স্বার্থপর হয়, মামিমা'কে বাদ দিয়েও তাদের মধ্যে কেউ-কেউ মামা হিসেবে টিকে যায়। কিন্তু পিসিমা-ই নেই অথচ পিসেমশাই, এ যে সোনার পাথরবাটি !"

কাকাবাবু এদের কথা শুনে মজা পেয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

এখন রাস্তার ধারে দু-চারখানা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বাস। তার কাছেই বাজার। রঞ্জন সেখানে গাড়ি না থামিয়ে, কয়েকবার বাঁক নিয়ে একেবারে পৌঁছে গেল পাহাড়ের গায়ে দুর্গের দরজায়।

দরজা মানে সিংহদরজা যাকে বলে, তিন-মানুষ উঁচু কাঠের পাল্লা, তার গায়ে লোহার বল্টু বসানো। দু'পাশে দুটি পাথরের সিংহ। তার মধ্যে একটা সিংহের অবশ্য মুণ্ডু নেই।

কাছেই একটা বাড়ির গায়ে লেখা আছে, 'হোটেল'।

রঞ্জন বলল, "আগে এখানে ভাত-মাংস খেয়ে নেওয়া যাক। ওঃহো, মাংস তো এ তল্লাটে পাওয়া যায় না। এটা নিরামিষের দেশ !"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, "আমার নিরামিষে আপত্তি নেই। তোমাদের কষ্ট হবে। দ্যাখো যদি ডিম পাওয়া যায়।"

হোটেল মানে অবশ্য পুরনো একটা চায়ের দোকানের মতন। তবে ভেতরটা খুব পরিষ্কার। পেতলের থালা-গেলাসে খাবার দেওয়া হয়। সেগুলি ঝকমকে করে মাজা। কয়েকজন লোক খেয়ে বেরোচ্ছে, টেবিল সাফ করা হচ্ছে, তাই ওরা অপেক্ষা করতে লাগল বাইরে।

দোকানের বাইরে কয়েকটা ফুলের গাছ। তার মধ্যে একটা বড় গাছ থেকে লম্বা-লম্বা লালচে ফুল ঝুলছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে রিঙ্কু বলল, "এগুলো কী ফুল জানিস সন্তু ? বল তো !"

সন্তু মুচকি হেসে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, "জানি না। তুমি বলো।"

"বট্‌ল ব্রাশ। এগুলোকে বলে বট্‌ল ব্রাশ।"

“জানতুম। আমি নামটা জানতুম। তবু তোমাকে দিয়ে বলালুম। তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল!”

“তার মানে? কেন জরিমানা হবে? বট্‌ল ব্রাশ একটা ফুলের নাম। তার কোনও বাংলা নেই।”

“কে বলল নেই? বট্‌ল-এর বাংলা বোতল আর ব্রাশ-এর বাংলা বুরুশ। এই ফুলটার নাম বোতল-বুরুশ!”

কাকাবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন। রঞ্জন বলল, “হ্যাঁ, সন্তু ঠিকই বলেছে, যেমন, টেব্‌ল-এর বাংলা টেবিল আর গ্লাস-এর বাংলা গেলাস!”

সন্তু পকেট থেকে ছোট্ট খাতাটা বার করল।

সেই খাতার এক-একটা পাতায় এক-একজনের নাম লেখা আছে। কাল রাত্তিরেই ঠিক হয়েছিল যে, আজ সকাল থেকে বেড়াতে বেরোবার পর কেউ একটাও ইংরেজি শব্দ বলবে না। কেউ ভুল করে বলে ফেললেই একটা ইংরেজি কথার জন্য দশ পয়সা জরিমানা। সন্তু খাতায় সেই হিসেব লিখে রাখছে। কাল সবাই এই খেলা খেলতে রাজি হয়েছিল।

রিঙ্কু বলল, “না, আমি আর এই পচা খেলা খেলব না! আই কুইট!”

রঞ্জন বলল, “অ্যাই, এখন ওসব বললে চলবে না। আজ রাত্তিরে সব হিসেব হবে, জরিমানার টাকাটা দিয়ে তারপর ছুটি। রিঙ্কু, তোমার আরও দু'বার জরিমানা হল।”

জোজো বলল, “ভেতরটা খালি হয়ে গেছে। চলো গিয়ে বসি। এবার আর-একটা মজা হবে মনে হচ্ছে!”

একটাই লম্বা টেবিল, সবাই মিলে কাছাকাছি বসল। একজন সাদা লুঙ্গি-পরা বেয়ারা সবাইকে জলের গেলাস দিয়ে অর্ডার নেবার জন্য দাঁড়াল।

রঞ্জন বলল, “ভাই আমরা ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছু খাদ্য দাও। ভাত, ডাল, মাংস, ডিম যা খুশি!”

লোকটি কিছু বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে রঞ্জনের কাছে ঝুঁকে এসে কী যেন বলল।

রঞ্জন বলল, “আমি ভাই তোমার সঙ্গে ইংরিজি বলে জরিমানা দিতে পারব না। খাবারের দাম সবাই মিলে দেবে, আর জরিমানা আমাকে একলা দিতে হবে। তুমি আমার বাংলা কথা শুনে যা বোঝো তাই দাও!”

লোকটি এবার ইংরেজিতে বলল, “হোয়াট ডিড ইউ সে সার?”

রঞ্জন সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “উঁহু, তুমি যতই ইংরেজি বলো, আমি বাংলা ছাড়া কিছু বলব না। আমাদের খাদ্য দাও, খাদ্য!”

রিঙ্কু বলল, “এইরকম করলে আমাদের আর কিছু খাওয়াই হবে না! আমরা কেউ কন্নড় ভাষা জানি না, এরা কেউ হিন্দিও বোঝে না! বাংলা তো দূরের কথা।”

কাকাবাবু উঠে গিয়ে একটা দেওয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। সেখানে খাবারদাবারের নামলেখা একটা তালিকা ঝুলছে। কন্নড় আর ইংরেজি দু' ভাষাতেই লেখা। কাকাবাবু বেয়ারাটির দিকে ইঙ্গিত করে কয়েকটা নামের ওপর আঙুল রাখলেন। তারপর হাত তুলে পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে বোঝালেন যে পাঁচজনের খাবার চাই।

বেয়ারাটি অদ্ভুত মুখের ভাব করে ভেতরে চলে গেল।

কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, "এতে মোটামুটি কাজ চালানো গেল, কী বলো ? কিন্তু সন্তু তোর নিয়মটা একটু পালটাতে হবে। আমরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজি বলব না, কিন্তু বাইরের লোকদের সঙ্গে বলতেই হবে ! অন্য লোকরা তো আমাদের সঙ্গে এ-খেলায় যোগ দেয়নি !

সন্তু বলল, "ঠিক আছে। অন্যদের বেলায় অ্যা-অ্যা-অ্যা, মানে অন্যদের সঙ্গে বলা যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "অন্যদের সঙ্গে অ্যালাউড ? বাঁচা গেল !"

তারপর কাউন্টারের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এক্সকিউজ মি, প্লিজ সেন্ড দা বেয়ারার এগেইন !"

সন্তু বলল, "রিঙ্কুদি, তুমি 'অ্যালাউড'টা আমাদের বলেছ ! তোমার আর একটা..."

সবাই হেসে উঠল আবার।

এই দোকানে ইডলি-ধোসা-বড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাংস তো দূরের কথা, ভাতও নেই। বেয়ারাটি খুব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, একটু আগে তার ইংরেজি কথা শুনেও এরা উত্তর দিচ্ছিল না, এখন এদের মুখে ইংরেজির বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

ওদের খাওয়ার মাঝখানে দোকানটির সামনে একটা বড় স্টেশন ওয়াগন থামল। তার থেকে নামল চারজন লোক, তাদের মধ্যে একজনের দিকেই বিশেষ করে চোখ পড়ে। এই গরমেও সেই লোকটি পরে আছে একটা চকচকে সুট, চেহারাটি ছোটখাটো একটি পাহাড়ের মতন, তার চোখে সান গ্লাস, মুখে লম্বা চুরুট।

দুপদাপ করে জুতোর শব্দ তুলে লোকগুলো ঢুকল ভেতরে। টেবিলে বসার আগেই একজন জিজ্ঞেস করল, "কফি হ্যায় ? কফি মিলেগা ?"

কাকাবাবু খাওয়া বন্ধ করে এই আগন্তুকদের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

পাহাড়ের মতন লোকটি কাকাবাবুর দিকে চোখ ফেলেই মহা আশ্চর্যের ভান করে বলল, "ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল, আপ রাজা রায়চৌধুরী হ্যায় না ? আপ ইধার ?"

বাংলা-অসম-ত্রিপুরা কিংবা বিহার-ওড়িশা বা দিল্লিতে কাকাবাবুকে অনেকে

চিনতে পারে, কিন্তু এই কর্ণাটকের একটা ছোট্ট জায়গাতেও যে কেউ তাকে চিনতে পারবে, তা যেন তিনি আশা করেননি। তিনি লাজুকভাবে একটু হেসে বললেন, "এই এদিকে একটু বেড়াতে এসেছি!"

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, "বেড়াতে এসেছেন? এখানে?"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু এখানে না। আশেপাশে কয়েকটা জায়গায়। সঙ্গে এই আমার ভাইপো, সন্তু। ওর কলেজের বন্ধু জোজো। আর ইনি রঞ্জন ঘোষাল আর ওঁর স্ত্রী রিঙ্কু ঘোষাল, আমার বিশেষ পরিচিত।"

লোকটি সকলের দিকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমার নাম মোহন সিং। আমাকে চিনেছেন তো? দিল্লিতে দেখা হয়েছিল একবার।"

তারপর সে কাকাবাবুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, সাচমুচ বলুন তো, আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেউ তো পাঠায়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি।"

মোহন সিং বলল, "নিজেরা এসেছেন তো ঠিক আছে, আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তখনও তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে আছে।

কাকাবাবু এবার একটু কড়া গলায় বললেন, "আপনি ওদিকে গিয়ে বসুন।"

মোহন সিং তবু সরল না। চওড়া করে হেসে বলল, "ঠিক আছে, আপনি অন্য কারও হয়ে কাজ না করেন তো খুব ভাল কথা। আমি আপনাকে একটা কাজ দেব। আপনার ফি কত?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আপনার চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধও আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি, প্লিজ, দূরে গিয়ে বসুন!"

মোহন সিং-এর সঙ্গীরা তিনটে চেয়ার টেনে বসে এদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকেরই বেশ গড়াপেটা চেহারা।

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিল, কিন্তু সরে গেল না। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বলল, "আরে মশাই, আপনাকে আমি এমপ্লয় করছি, কম সে কম পঞ্চাশ হাজার খরচ করতে রাজি আছি। আপনাকে এত টাকা কেউ দেবে?"

রঞ্জন বলল, "শুনুন, মিঃ সিং, কাকাবাবু এখন রিটায়ার করেছেন। আমি ওঁর অ্যাসিস্টান্ট। ওঁকে কী কাজ দেবার কথা বলছেন, সেটা আমাকে দিন না! আমার কিছু টাকা-পয়সার দরকার এখন। তা হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার পেলে মোটামুটি চলে যাবে।"

মশামাছি তাড়াবার মতন বাঁ হাতের ভঙ্গি করে মোহন সিং বলল, "আপ চুপ

রহিয়ে। আমি মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি। জরুরি কাজের কথা।"

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই না? আমি রিভলভার চালাতে জানি, দড়ির মই বেয়ে উঠতে পারি, গোপন ম্যাপ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারি, এমনকী আমি পিকক করতেও পারি। দেখবেন?"

তারপর রঞ্জন সত্যিই মাটিতে দুটো হাত দিয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে ফেলল। ঝনঝন করে তার পকেট থেকে খসে পড়ল অনেগুলো খুচরো পয়সা।

সেই অবস্থায় সে হাত দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করল। মোহন সিংয়ের তুলনায় রঞ্জনের চেহারাটাও নেহাত ছোট নয়। একটুখানি এগিয়েই তার পা শূন্যে টলমল করে উঠল, সে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল মোহন সিংয়ের ওপর। মোহন সিংও এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রঞ্জন খুবই কাচুমাচু গলায় বলল, "আরে ছি ছি, কী কাণ্ড। আউট অব প্র্যাকটিস, বুঝলেন! আবার দু-একদিন প্র্যাকটিস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আপনার লাগেনি তো? আমি খুবই দুঃখিত!"

রঞ্জন মোহন সিংয়ের হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল। তার সঙ্গের লোকেরাও ছুটে এল দু-দিকে।

মোহন সিং নিজেই উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে।

রঞ্জন বলল, "এক্সট্রিমলি সরি, আমায় মাপ করে দিন, এর পরের বার দেখবেন, কোনও ভুল হবে না!"

মোহন সিং কটমট করে তাকিয়ে বলল, "বেওকুফ!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে অবজ্ঞার সুরে বলল, "আপনি রিটায়ার করেছেন? একেবারে বুঢ়া বনে গেছেন! সে কথা আগে বললেই হত!"

মোহন সিংয়ের চুরুটটা ছিটকে চলে গেছে অনেক দূরে। সেটা আর না কুড়িয়ে সে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। বেয়ারা এর মধ্যেই কফি দিয়ে গেছে। সে কফিতে চুমুক দিতে লাগল ঘনঘন।

রঞ্জনের কাণ্ড দেখে সন্তু আর জোজোর খুব হাসি পেয়ে গেলেও হাসতে পারছে না। সন্তু হাসি চাপবার জন্য নিজের উরুতে চিমটি কেটে আছে। রিঙ্কুর মুখখানাও লালচে হয়ে গেছে, সেও আসলে প্রাণপণে হাসি চাপছে। রঞ্জনকে সে আগে কোনওদিন পিকক করতে দ্যাখেনি।

মোহন সিং আর কোনও কথা বলল না। কফি শেষ করে দলবল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পয়সা মিটিয়ে দিয়ে দরজার কাছে চলে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ।

কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাদের কি হামপির দিকে যাবার প্ল্যান আছে?"

কাকাবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ।"

মোহন সিং বলল, "বেলুড় যান, হ্যালিবিড যান, শ্রবণবেলগোলা যান, এই

কর্ণাটিকে অনেক দেখবার জায়গা আছে। লেকিন, হাম্পি যাবেন না এখন।”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আমি কোথায় যাব না যাব, তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো ? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি।”

মোহন সিং তবু বলল, “আর যেখানে খুশি যান, হাম্পি যাবেন না। তা হলে আপনাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে !”

এর উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

মোহন সিং পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল !

জোজো দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসে চোখ বড়-বড় করে বলল, “চম্বলের ডাকাত ! মোহন সিং ! এর নাম আমি অনেকবার আমার পিসেমশাইয়ের মুখে শুনেছি।”

রিঙ্কু বলল, “মোহন সিং তো কমন নাম। অনেকেরই হতে পারে। আমার মনে হল, সিনেমার ভিলেন ! আমজাদ খানের মতন চেহারা।”

সন্তু নিজের কাজ ভোলেনি। সে ছোট খাতাটা বার করে বলল, “রিঙ্কুদি, বাইরের লোক চলে গেছে, তুমি দুটো ইংরেজি শব্দ বলেছ !”

রিঙ্কু সে-কথা অগ্রাহ্য করে বলল, “রঞ্জন কী কাণ্ডটাই করল !”

এবার সকলের চেপে রাখা হাসি বেরিয়ে এল একসঙ্গে। শুধু রঞ্জন হাসল না। সে নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, “ইশ, পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজটা ফসকে গেল !”

কাকাবাবু বললেন, “কোথা থেকে লোকটা হঠাৎ এসে উদয় হল বলো তো ? আমাকে চেনে কিন্তু আমি ওকে চিনি না। ও গায়ে পড়ে আমাদের হাম্পি যেতে বারণ করলই বা কেন ? তা হলে কী করবে, হাম্পি যাবে, না অন্য কোথাও যাবে ?”

রিঙ্কু বলল, “আমরা হাম্পি দেখব বলে বেরিয়েছি, সেখানে তো যাবই। ওই লোকটা বারণ করেছে বলে আরও বেশি করে যাব। ও বারণ করবার কে ?”

॥ ২ ॥

বড় দরজাটা দিয়ে ঢোকার পর দেখা গেল, দুপাশে বিশাল উঁচু দেওয়াল, তার মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি। পাহাড়টা কেটে-কেটে দুর্গ বানানো হয়েছে, কিন্তু দূর থেকে শুধু পাহাড় বলেই মনে হয়।

পাহাড়ের ওপরটা পর্যন্ত ঘুরে আসতে কতক্ষণ লাগবে ? বড়জোর এক ঘন্টা।

জোজো বলল, “চল সন্তু, যাবি ?”

সন্তু কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "সিঁড়ি আর পাহাড়, এই দুটোই আমাকে বড় জব্দ করে দেয়। আমি যাব না, তোরা ঘুরে আয় ওপর থেকে।"

রঞ্জন বলল, "আমারও পাহাড়ে চাপার শখ নেই, আমিও ওপরে যাব না। ততক্ষণ গাছের ছায়ায় একটু ঘুমিয়ে নেব।"

রিঙ্কু বলল, "তোমরা কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক তিনটের সময় আমরা স্টা....স্টা....স্টা...ইয়ে, যাত্রা শুরু করব।"

আরও একটু ওপরে ওঠার পর একটা জায়গায় বড়বড় কয়েকটা গাছের তলায় চমৎকার সবুজ ঘাস। রঞ্জন সেখানে শুয়ে পড়েই চোখ বুজল।

রিঙ্কু বলল, "মোহন সিং-এর গাড়িটা নীচে দেখা যাচ্ছে। ওরা এখনও যায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা ওপরের মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। ওদের একজনের হাতে শালপাতায় মোড়া ফুলটুল দেখেছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "তা হলে তো সন্তুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ওই বিচ্ছিরি লোকটা যদি ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য চিন্তা নেই। সন্তু ওরকম লোক অনেক দেখেছে।"

রঞ্জন চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, "ওই সন্তু বিচ্ছুটা চলে গেছে? তা হলে এখন একটু প্রাণ খুলে ইংরেজি বলা যাক। হ্যাঁ, কী ইংরেজি বলব? কিছু মনে পড়ছে না যে!"

রিঙ্কু বলল, "সত্যি, আমাদের এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, ইংরেজি শব্দ বাদ দিয়ে কথাই বলতে পারি না। অন্য সময় খেয়ালই থাকে না।"

রঞ্জন বলল, "এখন তো তুমি দিব্যি বাংলা বলছ, রিঙ্কু। একটু আগে স্টার্ট বলে ফেলতে গিয়ে স্টা-স্টা-স্টা বলে এমন তোতলাতে শুরু করলে! তোমার অনেক ফাইন হয়ে গেছে এরই মধ্যে।"

রিঙ্কু বলল, "তোমারও কম হয়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও ইংরেজি বলেনি।"

রঞ্জন বলল, "ফাইন দেবার ভয়ে সন্তু তো কথাই বলছে না প্রায়। আজ রাত্তিরে যেখানে থাকব সেখানে বসে হিসেবটিসেব কষে, প্রত্যেকের ফাইন চুকিয়ে দিয়ে এ-খেলাটা শেষ করে দিতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমরা আজ রাত্তিরে কোথায় থাকব? তুঙ্গভদ্রা ড্যামের গেস্ট হাউসে?"

রঞ্জন বলল, "গিয়ে দেখা যাক। সেখানে জায়গা না পাওয়া গেলে কোনও হোটেল-টোটেল খুঁজতে হবে। এই রে, হোটেল কথাটা আবার সন্তুর কাছে উচ্চারণ করা যাবে তো? হোটেলের বাংলা কী, সরাইখানা?"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেল আর ট্যাক্সি, এই কথা দুটো এখন সারা

পৃথিবীতে চলে। এর আর বাংলা করার দরকার নেই।"

রিঙ্কু বলল, "এই জায়গাটা কী শান্ত আর নির্জন লাগছে। এক সময় এখানে কত সৈন্য-সামন্ত যাতায়াত করত, এখানে কত যুদ্ধ হয়েছে, এখন কিছু বোঝাই যায় না।"

রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি যেখানে বসে আছ, ওইখানেই যুবরাজ বিক্রম মাণিক্য, ইয়ে, খুন হয়েছিল। হ্যাঁ, চারজন বিদ্রোহী তার দেহটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলে, তার মুণ্ডুটা এখানে পড়েছিল অনেকদিন !"

রিঙ্কু একটু চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বলল, "কাকাবাবু, রঞ্জন কিন্তু যখন-তখন এই রকম ইতিহাস বানায়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

রঞ্জন বলল, "এই, আমি ক্লাস নাইন, মানে নবম শ্রেণীতে ইতিহাস পরীক্ষায় ফার্স্ট, মানে প্রথম হয়েছিলুম না ?"

কাকাবাবু বললেন, "এইসব দুর্গে ওরকম খুনোখুনি হওয়া অসম্ভব কিছু তো নয়। আমরা যেখানে যাচ্ছি..."

কাকাবাবুর কথা শেষ হবার আগেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে দু'বার দুমদুম শব্দ হল। ঠিক যেন বোমা ফাটার আওয়াজ। অনেকগুলো কাক একসঙ্গে ডেকে উঠে ছড়িয়ে গেল আকাশে।

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হল ? সন্তু আর জোজো গেছে ওদিকে। রঞ্জন, চলো আমরা গিয়ে দেখি !"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আওয়াজটা বেশি দূরে হয়নি। সন্তু আর জোজোর এর মধ্যে আরও উঠে যাবার কথা।"

রঞ্জন বলল, "খুব সম্ভবত ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছে। নতুন রাস্তা-টাস্তা বানাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি দেখে আসছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে ছুট লাগাল। রঞ্জন কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ভাবছেন তো যে, আমার বউ একা-একা গেল, আমারও ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল ? রিঙ্কুকে আপনি ভাল করে চেনেন না। ও একাই তিনশো !"

পাহাড়ের সিঁড়িটা এঁকেবেঁকে উঠেছে, একটু দূরেই একটা বাঁক নিয়েছে বলে ওপরের দিকটা দেখা যায় না। রিঙ্কুও তরতর করে ছুটতে ছুটতে সেদিকে মিলিয়ে গেল।

কাকাবাবু পেছন ফিরে বললেন, "মোহন সিং-র গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা এর মধ্যেই নেমে এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "গাড়িতে একটা বায়নোকুলার আছে, সেটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। মোহন সিং-রা নামল কোন্ দিক দিয়ে ? দেখতে পেলাম না তো।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আর একটা রাস্তা আছে অন্যদিক দিয়ে।"

একটু পরেই দেখা গেল রিঙ্কু আর সন্তু-জোজো একসঙ্গে নেমে আসছে। সন্তুর হাতে একটা পাতাওয়ালা গাছের ডাল, তার ডগায় কয়েকটা হলুদ রঙের ফুল। ওরা গল্প করতে-করতে নামছে আস্তে-আস্তে।

সেদিকে তাকিয়েই রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, শিগগির নেমে চলুন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না?"

রঞ্জন বলল, "ওদের দেখেই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ওরা কোনও বিপদে পড়েনি। এবার ওরা একটু আমাদের খোঁজাখুঁজি করুক!"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নামতে লাগলেন। রঞ্জন দৌড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল, তারপর কাকাবাবু এসে পৌঁছতেই তাঁকে তুলে নিয়ে স্টার্ট দিল।

বাজারের কাছে পেট্রোল-পাম্প। সেখানে মোহন সিংদের গাড়িটাও থেমে আছে। সামনের সিটে জানলার ধারে বসে আছে মোহন সিং, রঞ্জনকে দেখে সে ঘুরিয়ে নিল মুখখানা।

রঞ্জনই গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া সিংজি, আপলোগও কি হামপি যাতা হ্যায়?"

মোহন সিং রঞ্জনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল, কোনও কথা বলল না।

রঞ্জন আবার বলল, "আরে আপ রাগ করতা হ্যায় কাঁহে? আমি তো ইচ্ছে করে আপনাকে ফেলে দিইনি, ব্যালান্স সামলাতে পারিনি। আপনি কী কাজ দেবার কথা বলছিলেন, আমাকে দিন না।"

পেছন থেকে মোহন সিং-এর এক সঙ্গী রঞ্জনের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "আপনা কাম করো। ইধার ঝঞ্ঝাট মাত করো।"

তারপর সে রঞ্জনকে আস্তে করে ঠেলে দেবার একটা ভাব দেখাল। লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর, সেইটুকু ঠেলার চোটেই রঞ্জন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, গাড়িটাকে ধরে সামলে নিল। লোকটি হেসে উঠে বলল, "মোহন সিংজির সঙ্গে এবার থেকে সমঝে কথা বলবে।"

রঞ্জন একটুও রাগ না করে বলল, "উঃ, আপনার তো খুব গায়ের জোর! রোজ ব্যায়াম করেন বুঝি? আপনার নাম কী?"

লোকটি বলল, "বিরজু সিং।"

রঞ্জন বলল, "আপনারা দুজনেই সিং। বাঃ বাঃ! তা হলে হামপিতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে?"

মোহন সিং পিচ করে মাটিতে থুতু ফেলল। তাই দেখাদেখি বিরজু আরও থুতু ফেলে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "হুঁ।"

ওদের গাড়িতে তেল ভরা হয়ে গিয়েছিল, ওরা বেরিয়ে গেল আগে। রঞ্জন নিজের গাড়ির চাবি পাম্পের লোকের হাতে দিয়ে কাকাবাবুর কাছে এসে বলল,

হামপিতে গিয়ে বেশ মজা হবে মনে হচ্ছে। ঠিক যেন একটা গল্পের মতন শুরু।

কাকাবাবু বললেন, "এবার শুধু বেড়াতে বেরিয়েছি। এবার আর কোনও গল্প-টল্পর দরকার নেই। জলের বোতলটা ভরে নাও।"

পেট্রোল নিয়ে বেরিয়ে রঞ্জন কিছু কলা আর পেয়ারাও কিনে ফেলল। তখনই দেখা গেল রিঙ্কুরা জোরে হেঁটে আসছে এদিকে। গাড়িটা নজরে পড়তেই ওরা থেমে গিয়ে কী যেন বলাবলি করতে লাগল।

রঞ্জন বলল, "আমাদের দেখতে না পেয়ে ওরা অনেক দৌড়োদৌড়ি করেছে, কিন্তু সেকথা স্বীকার করবে না, বুঝলেন তো! আসলে কিন্তু বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "রিঙ্কুর বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। সে তো এত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়।"

রিঙ্কুরা কাছে এসে গাড়িতে উঠে পড়ে বলল, "আমরা এক ঘন্টার বেশি সময় নিইনি। এবার চলো।"

রঞ্জন বলল, "তোমরা আমাদের খুঁজতে কোথায়-কোথায় গিয়েছিলে?"

রিঙ্কু খুব অবাক হয়ে বলল, "খুঁজব কেন? তোমরা গাড়ির তেল নেবে, এ তো জানা কথাই! আমরা ভাল মিষ্টি কিনে আনলুম এই ফাঁকে। নিজেরা কয়েকটা খেয়েও এসেছি।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "পাহাড়ের ওপর আওয়াজটা হয়েছিল কিসের?"

রিঙ্কু পালটা প্রশ্ন করল, "বলো তো কিসের? আন্দাজ করো!"

রঞ্জন বলল, "আমি তো কাকাবাবুকে আগেই বলে রেখেছি। ডিনা... এই সন্তু, আমি কিন্তু ডিনামাইটের বাংলা বলতে পারব না। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছিল।"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না।"

রঞ্জন বলল, "তবে কি কেউ সত্যিকারের বোমা ছুঁড়েছিল? সন্তু, বোমা কথাটা কিন্তু বাংলা! আমি তো বম্ব্ বলিনি!"

রিঙ্কু বলল, "না, এবারও হল না। ওখানে একটা চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ হচ্ছিল।"

"কী হচ্ছিল? চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণ! তার মানে? সিনেমার শুটিং!"

সন্তু আর জোজো দুজনেই হাততালি দিয়ে উঠল। রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "আমরা ঠিক জানতুম, রঞ্জন ইংরেজি করে বলবেই।"

রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আসল ব্যাপারটা কী হয়েছে, তাই বলো না!"

সন্তু বলল, "ওখানে একটা চলচ্চিত্র তোলা হচ্ছে। দু'দলের ডাকাতের মারামারির দৃশ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ হল। ওখানে প্রচুর লোকের ভিড়।"

জোজো বলল, "ওখানে মোহন সিংকেও দেখলুম। সে ডাকাতের সর্দার হয়েছে। আমি যে ওকে চম্বলের ডাকাত বলেছিলুম, সেটা খুব ভুল ছিল না!"

রিঙ্কু বলল, "আমি আগেই ওকে চলচ্চিত্রের খলনায়ক বলেছিলুম!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু মোহন সিংকে যে একটু আগে এখানে দেখা গেল? এর মধ্যেই সে নেমে এল কী করে?"

সন্তু বলল, "আর একটা লোককে মোহন সিং-এর মতন সাজিয়েছে। তারও প্রায় ওইরকম চেহারা। আসল মারামারির দৃশ্যগুলো ওই নকল মোহন সিং করবে!"

জোজো বলল, "ওদের বলে স্টান... স্টান... থাকগে, ওর বাংলা করা যাবে না।"

গাড়িটা আবার ছুটতে লাগল বড় রাস্তা দিয়ে। রঞ্জন বলল, "এখন কিন্তু কেউ ঘুমোবে না, তা হলে আমারও ঘুম পেয়ে যাবে।"

সে এক টিপ নস্যি নিল নাকে।

রিঙ্কু ম্যাপটা বিছিয়ে বলল, "রঞ্জন, হামপির আগে হস্‌পেট বলে একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা একটা বড় জায়গা।"

কাকাবাবু বললেন, "ওই হসপেটেই আমাদের থাকতে হবে। হামপিতে কোনও থাকার জায়গা নেই।"

সন্তু বলল, "আমরা যে তুঙ্গভদ্রা নদীর ধারে অতিথিশালায় থাকব ঠিক ছিল? তুঙ্গভদ্রা নামটা কী সুন্দর।"

কাকাবাবু বললেন, "ওখানে বড় জোর রাতটা থাকা যাবে। ওখান থেকে হামপি বেশ দূর হবে, যাওয়া-আসা করা যাবে না।"

জোজো হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আমরা যে হামপি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে?"

সন্তু বলল, "হামপিতে হামপি আছে!"

জোজো বলল, "ও!"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই যে গম্ভীরভাবে ও বললি, হামপি মানে তুই কী বুঝলি রে, জোজো? পাহাড়, জঙ্গল, না সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ?"

জোজো বলল, "আমি একবার আমার ছোটমামার সঙ্গে কোকোডিমা বলে একটা দ্বীপে গেসলুম। সেই দ্বীপটা কোথায় তোমরা বলতে পারো?"

জোজোর কথা ঘোরাবার ক্ষমতা দেখে কাকাবাবু পর্যন্ত একটু হেসে উঠলেন।

গল্প করতে-করতে অনেকটা রাস্তা চলে আসা গেল। বিকেল হয়ে এল আস্তে। এখনও গরম কমবার নাম নেই। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে রঞ্জন গাড়িটা থামাল। এরপর কোনদিকে

যেতে হবে, রিঙ্কু ঠিক বুঝতে পারছে না ম্যাপ দেখে।

রঞ্জন বলল, "নেমে তা হলে জিজ্ঞেস করা যাক। কয়েকটা চায়ের দোকানও রয়েছে। ইচ্ছে করলে এখানে চা খাওয়া যেতে পারে।"

সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাশাপাশি তিনটে চায়ের দোকান। লম্বা-লম্বা বেঞ্চ আর খাটিয়া পাতা আছে বাইরে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি লরি আর একটি সাদা রঙের গাড়ি।

একটি খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ, তাঁর মাথার চুল, মুখের দাড়ি সব ধপধপে সাদা। বৃদ্ধটি বেশ অসুস্থ মনে হয়। তাঁর মাথার কাছে বসে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাওয়া করছে পাখা দিয়ে। একজন মাঝবয়েসী লোক বৃদ্ধটিকে খাইয়ে দিচ্ছে চা।

কাকাবাবু অন্য একটি দোকানে বসলেন। বৃদ্ধটিকে একবার দেখে তাঁর ভুরু একটু কুঁচকে গেল। তার চেনা কোনও একজন মানুষের সঙ্গে ওই বৃদ্ধটির মুখের মিল আছে, কিন্তু কার সঙ্গে যে মিল তা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তবে তা নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামালেন না।

একটু পরে সেই বৃদ্ধটিকে ধরাধরি করে তোলা হল সাদা গাড়িটিতে। সেখানেও তিনি বসতে পারলেন না, শুয়ে পড়লেন মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে।

রঞ্জন কয়েকজনকে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে এসে বলল, "কাকাবাবু, রাস্তা পেয়ে গেছি, আর বেশি দূর নেই, বড়জোর এক ঘন্টা। তবে তুঙ্গভদ্রা গেস্ট হাউসে নাকি এখন অনেক লোক। ওই যে থুরথুরে বুড়ো লোকটিকে দেখছেন, উনিও দলবল নিয়ে সেখানেই যাচ্ছেন শুনলুম।"

রিঙ্কু বলল, "অত বুড়োলোকের বেড়াবার শখ কেন ? দেখে তো মনে হয় যখন-তখন মরে যাবে ! আমাদের তো টেলিফোন করা আছে, আমরা তুঙ্গভদ্রা গেস্ট হাউসেই থাকব।"

সন্তু পকেট থেকে খাতা বার করল।

রিঙ্কু বলল, "এই, এই, টেলিফোন বলব না তো কী বলব রে।"

সন্তু বলল, "শুধু বাংলা বলতে চাইলে এইভাবে বলা যায়। আমাদের তো দূরভাষে বলা আছে, আমরা তুঙ্গভদ্রা অতিথি নিবাসে থাকব !"

রিঙ্কু বলল, "ধ্যাত, এইরকমভাবে কেউ কথা বলে ? আমাদের বাড়ির একজন পুরুতঠাকুর এইভাবে কথা বলতেন।"

সন্তু বলল, "মোটে তো একদিন। কাল থেকে আবার যে-যার নিজের মতন কথা বলবে। রঞ্জনদা, তোমারও একটা ফাইন হয়েছে।"

রঞ্জন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "অ্যাই, অ্যাই, পেয়েছি ! সন্তু 'ফাইন' বলেছে ! সন্তুরও এবার জরিমানা। তুই নিজেরটা লেখ্ সন্তু !"

জোজো বলল, "আচ্ছা সন্তু, আমি যদি পুরো ফরাসি ভাষায় কথা বলি, তাতে

তো কোনও আপত্তি নেই ? আজ তো শুধু ইংরিজি বলা চলবে না !"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "তুই ফরাসি জানিস বুঝি ?"

জোজো বলল, "খুব ভাল জানি। আমি যখন বাবার সঙ্গে চার মাস প্যারিসে ছিলুম, তখন গড়গড় করে ফ্রেঞ্চ বলতে শিখেছি। চোখ বুজে বলতে পারি। শুনবে ?"

রঞ্জন বলল, "শুনি, শুনি !"

জোজো সত্যি চোখ বুজে বলল, "উই, উই, পারদোঁ ম্যাসিও, ম্যার্সি বকু, জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে !"

রঞ্জন বলল, "হুঁ, ফ্রেঞ্চ ভাষা চোখ বুজেই বলতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার বলেছে ! কিন্তু জোজো, তোমার এই ভাষা যে আমরা কেউ বুঝতে পারব না !"

রিঙ্কু বলল, "আর দেরি করে কী হবে, এইবার চলো। চা খাওয়া তো হয়ে গেছে। চা-টা একেবারে অখাদ্য।"

এদিকটায় ছোট ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা। তুঙ্গভদ্রার বাঁধ অনেকটা উঁচুতে। সেই বাঁধের গায়ে বেশ বড় আর পুরনো আমলের দোতলা অতিথিশালা। সামনে আরও তিনখানা গাড়ি দাঁড়ানো। তার মধ্যে সেই সাদা গাড়িটাও রয়েছে। একতলা-দোতলায় অনেক লোকজনের ব্যস্ততা।

একজন কেয়ারটেকারকে খুঁজে বার করা গেল। সে রঞ্জনের কোনও কথায় পাত্তাই দিতে চায় না। প্রথম থেকেই বলতে লাগল, "জায়গা নেই, জায়গা নেই !" রঞ্জন বারবার জানাবার চেষ্টা করতে লাগল যে, বাঙ্গালোর থেকে টেলিফোন করা হয়েছে ঘর রাখবার জন্য, তবু লোকটি গ্রাহ্য করল না।

রঞ্জন বলল, "আপনি বলতে চান এত বড় ডাকবাংলোতে একটা ঘরও খালি নেই ? এখন আমাদের হোটেল খুঁজতে যেতে হবে ?"

লোকটি বলল, "একটাই মাত্র রুম রাখা আছে। সেটা রাজা রায়চৌধুরী নামে একজন ভি আই পি'র জন্য।"

রঞ্জন বলল, "উফ, আপনাদের নিয়ে আর পারা যায় না, মশাই ! নিন, খুলুন, খুলুন। এতক্ষণ আমার নাম জিজ্ঞেস করেছেন ? আমিই তো রাজা রায়চৌধুরী।"

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে জিভ কেটে বলল, "আরে ছি ছি, সে কথা বলেননি কেন ? আপনাদের জন্য দোতলায় ভাল ঘর রাখা আছে। তিনখানা খাট। আসুন, আসুন ! আমি চাবি আনছি !"

রঞ্জন সন্তুকে বলল, "এখানকার লোকগুলো কী রকম সৎ দেখলি ? কাউকে অবিশ্বাস করে না। যে-কেউ এসে নিজের নাম রাজা রায়চৌধুরী বললেই ঘর খুলে দিত।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে বললেন, "আমাদের পূর্ব পরিচিত একজন বন্ধুও

এখানে রয়েছে দেখছি।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দোতলার বারান্দায় একজন লোক রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে মুখটা দেখা না গেলেও কোনও সন্দেহ নেই, সে মোহন সিং।

কাকাবাবু বললেন, "ভালই হল, ওর সঙ্গে এবার ভাল করে আলাপ করা যাবে।"

ডাকবাংলোর দু'জন আর্দালি এসে মালপত্র ওপরে নিয়ে গেল। কেয়ারটেকার ঘরের চাবি খুলে দিয়ে বলল, "আপনারা রাত্তিরে খাবেন তো? খাবার অর্ডার এখনই দিয়ে দেবেন?"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কী কী পাওয়া যাবে?"

লোকটি বলল, "ভাত-রুটি, মুরগি, সব্‌জি, ডাল, ডিমের কারি।"

রঞ্জন বলল, "কফি আছে আপনাদের?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, কফি পাবেন।"

রঞ্জন বলল, "এখন আমাদের কফি আর ডিমের ওমলেট দিতে বলুন। রাত্তিরে আমরা মাংস-ভাত খাব।"

রিঙ্কুর দিকে ফিরে সে বলল, "আমরা তো ওবেলা নিরামিষ খেয়েছি, তাই আগে ডিম খেয়ে সেটা মেক-আপ করে নেওয়া যাক, তারপর মাংস হবে। ঠিক আছে?"

রিঙ্কু বলল, "সন্তু তুই লিখেনে, রঞ্জন আমাকে শুধু-শুধু মেক-আপ বলেছে।"

রঞ্জন বলল, "তাই তো! মুখ দিয়ে অটোমেটি....না, না, বলিনি, বলিনি, পুরোটা বলিনি, মুখ দিয়ে ফস করে এক-একটা ইংরেজি কথা বেরিয়ে আসে। ওর বদলে আমার কী বলা উচিত ছিল?"

রিঙ্কু বলল, "মিটিয়ে। মিটিয়ে বলা যেত।"

রঞ্জন বলল, "ডিম খেয়ে মিটিয়ে? যাঃ, এটা কীরকম যেন শুনতে লাগে!"

জোজো বলল, "ইয়ে বলতে পারতে, রঞ্জনদা! বাংলায় এই একটা চমৎকার শব্দ আছে, ইয়ে, এই ইয়ে দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায়। এভরিথিং?"

সন্তু বলল, "হুঁ! এভরিথিং শব্দটা কি ফরাসি?"

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি, মোহন সিংকে ঘরটায় আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের ঘরটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, একদম কোণের ঘরটায় অনেক লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি লোক সে-ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এদিকে আসতে আসতে সন্তুদের ঘরের সামনে থম্‌কে দাঁড়াল!

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন!"

রঞ্জন এমনভাবে লোকটিকে ডাকল যেন অনেক দিনের চেনা।

লোকটি ঘরের মধ্যে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল,

"একটা কথা জানতে চাই, আপনাদের মধ্যে কি কেউ ডাক্তার আছে ?"

রঞ্জন বলল, "না, পাশ করা ডাক্তার কেউ নেই, তবে আমার স্ত্রী আমার ওপরে প্রায়ই নানারকম ডাক্তারি করেন।"

লোকটি বলল, "আপনাদের কাছে থার্মোমিটার আছে ?"

রঞ্জন বলল, "ইশ, খুব দুঃখিত। বেড়াতে বেরোবার সময় থার্মোমিটার আনার কথা আমাদের মনেই পড়েনি। আনা উচিত ছিল নিশ্চয়ই !"

লোকটি বেশ নিরাশ হয়ে বলল, "আমাদের সঙ্গের একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠে গেছে। ইনি খুব নাম-করা, সম্মানিত লোক।"

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "কী নাম ?"

লোকটি বলল, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মা।"

রঞ্জন বলল, "আমি আবার এত মুখ্যু যে, অনেক বিখ্যাত লোকদেরই নাম শুনিনি।"

কাকাবাবু ঘরের জানলার পর্দা সরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে নদী দেখবার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ চমকে পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী নাম বললেন ? ভগবতীপ্রসাদ শর্মা ? মানে, হিস্টোরিয়ান ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বড় হিস্টোরিয়ান। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। আমি তাঁর ভাইয়ের ছেলে, আমি চাচাকে প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি, এখন যদি কিছু একটা বিপদ হয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মার তো অনেক বয়েস ! প্রায় পঁচাশি-ছিয়াশি হবেই। আমি একবার তাঁকে দেখতে যেতে পারি ?"

সেই লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান না। আমি দেখি, নীচে কেয়ারটেকারের কাছে খোঁজ করে কোনও ডাক্তার পাওয়া যায় কি না !"

লোকটি চলে যেতেই কাকাবাবু নিজের হাত-ব্যাগটা খুলে রিভলভার বার করলেন। স্টোর চেম্বার খুলে দেখে নিলেন ভেতরে গুলি আছে কি না ! তারপর সেটার ডগায় কয়েকবার ফুঁ দিয়ে পকেটে ভরলেন।

রঞ্জন আর জোজো অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবু হেসে ওদের বললেন, "ও ঘরে খুব সম্ভবত মোহন সিং আছে। লোকটা রেগে আছে আমাদের ওপর। তোমরা একটু সাবধানে থেকো।"

ক্রাচ খটখট করে কাকাবাবু বারান্দা পেরিয়ে এলেন কোণের ঘরটার কাছে। দরজা ভেজানো। তিনি আস্তে ঠেলে দরজাটা খুললেন।

অতি বৃদ্ধ ভগবতীপ্রসাদ একটা খাটে শুয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। তাঁর মাথায় জলপট্টি। তিন-চারজন লোক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে খাটের দু'পাশে। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং, তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার, সেটা সে ধরে আছে অসুস্থ বুড়ো লোকটির একেবারে মুখের কাছে।

কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখেই মোহন সিং কুটিলভাবে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

কাকাবাবু সেদিকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এলেন।

মোহন সিং জিজ্ঞেস করল, "আপ ডাগদার হ্যায় ? আপকো ইধার কেয়া চাইয়ে ?"

কাকাবাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে ক্রাচ দুটো খাটের পাশে দাঁড় করিয়ে বৃদ্ধলোকটির একটি হাত ধরলেন! তারপর মোহন সিং-দের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, "আপনারা এঁর কথা রেকর্ড করছেন, অথচ ইনি কী বলছেন, তা বুঝতে পারছেন না ?"

মোহন সিং-এর পাশের লোকটি বলল, "ইনি পণ্ডিত লোক, জ্বরের ঘোরে ইনি যে-সব কথা বলছেন, সব রেকর্ড করে রাখছি। পরে ভাল করে শুনব। এখন বোঝা যাচ্ছে না !"

কাকাবাবু বললেন, "ইনি ওষুধ চাইছেন ! সরবিট্রেট !"

লোকটি বলল, "এখানে আমরা কোথায় ওষুধ পাব ? সেইজন্যই তো ডাক্তার ডাকতে গেছে একজন।"

কাকাবাবু বললেন, "এঁর ব্যাগ কোথায় ? সেটা খুব ভাল করে দেখুন। এঁর এত বয়েস হয়েছে, নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু ওষুধ রাখেন।"

ওরা দু-তিনজনে মিলে একসঙ্গে ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তারপর প্রায় চার-পাঁচরকম ওষুধ বার করে আনল। কাকাবাবু তার মধ্য থেকে একটা শিশি নিয়ে খুব ছোট্ট একটা ট্যাবলেট বার করলেন, সেটাকে আবার ভেঙে আদ্ধেক করলেন। তারপর খুব যত্ন করে সেই টুকরোটা ঢুকিয়ে দিলেন বৃদ্ধের জিভের তলায়।

তারপর মুখ তুলে কাকাবাবু বললেন, "আপনারা মাথার কাছ থেকে সরে যান। জানলা খুলে হাওয়া আসতে দিন।"

বৃদ্ধের বিড়বিড় করা বন্ধ হয়ে গেল, এক মিনিট পরেই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। প্রথমেই কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন ?"

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। অনেকদিন আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দেরাদুনে। আপনি আমাকে চিঠিও লিখেছেন কয়েকটা।"

ভগবতীপ্রসাদ শর্মা কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর মুখের দিকে।

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমি...তুমি রাজা রায়চৌধুরী ? তুমি মহারাজ কণিষ্কের মুণ্ডু খুঁজে পেয়েছিলে, তাই না ?"

একে এত বৃদ্ধ, তার ওপর এমন অসুস্থ, তবু তাঁর এরকম স্মৃতিশক্তি দেখে কাকাবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধের চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি ঘরের অন্য সকলের দিকে তাকালেন, মোহন সিংকে জিজ্ঞেস করলেন, "শিবপ্রসাদ কোথায় ?"

মোহন সিং বলল, "তিনি ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আপনি কেমন আছেন, একটু ভাল বোধ করছেন কি ?"

বৃদ্ধ চুপ করে রইলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "শর্মাজি, আপনি এই বয়েসে এতদূর এসেছেন কেন ? আপনার বাড়িতে এখন বিশ্রাম নেওয়াই উচিত।"

মোহন সিং বলল, "আমরা ওনাকে নিয়ে এসেছি। আমরা ওঁর দেখভাল করব। এখনই ডাক্তার এসে যাবে। আপনি ওনাকে বেশি কথা বলাবেন না।"

বৃদ্ধ নিজের কম্পিত হাত তুলে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে অন্যদের বললেন, "তোমরা সবাই ঘরের বাইরে যাও ! রাজা রায়চৌধুরী, শুধু তুমি থাকো !"

মোহন সিং বলল, "চাচাজি, আমরা আপনার সেবা করব। এখন আপনি বেশি কথা বলবেন না।"

বৃদ্ধ আবার বললেন, "তোমরা সবাই বাইরে যাও। রাজার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

খুব অনিচ্ছের সঙ্গে মোহন সিং আর তার দলবল বাইরে চলে গেল। বৃদ্ধ কাকাবাবুকে ইঙ্গিত করলেন, দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য।

মোহন সিং টেপ রেকর্ডারটা চালু করে বিছানার ওপর রেখে গেছে। বৃদ্ধ নিজেই এবার উঠে বসে সেটা বন্ধ করে দিলেন। কাকাবাবুকে খুব কাছে ডেকে বললেন, "একটা বিশেষ কাজে এসেছি এখানে, রাজা। এই শরীর নিয়ে আমার এখানে আসা উচিত ছিল না। কিন্তু এটাই হবে আমার শেষ আবিষ্কার। যদি আমি হঠাৎ মরে যাই, তবে তোমাকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। তুমি ঠিক পারবে।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি উঠছেন কেন, শুয়ে থাকুন। আর কোনও ওষুধ খাবেন ?"

বৃদ্ধ বললেন, "না, এখন একটু ভাল বোধ করছি। শোনো, আগে কাজের কথা বলি। তুমি তোমার কানটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এসো, যেন আর কেউ শুনতে না পায় ! তোমার কানে কানে বলব।"

কাকাবাবু মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনলেন।

সেই বৃদ্ধ চোখের নিমেষে বালিশের তলা থেকে একটা রিভলভার বার করে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "সাবধান ! একটু নড়লেই তোমার জীবন শেষ ! এইবার বলো তো, রাজা রায়চৌধুরী, তুমি আমাকে ফলো করে এখানে

এসেছ কেন ? তোমার কী মতলব ?”

কাকাবাবু মাথা সরালেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই হেসে বললেন, “এ তো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি ! আমি আপনাকে ফলো করব কেন ? আপনি একটা দলবলের সঙ্গে এখানে এসেছেন, আর আমিও কয়েকজনকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছি। আমরা আলাদা আলাদাভাবে আসতে পারি না ?”

বৃদ্ধ বললেন, “তুমি সত্যি বেড়াতে এসেছ, না অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ ? তুমি তো এমনি-এমনি কোথাও যাও না !”

কাকাবাবু বললেন, “আমি এমনি কোথাও যাই না ! আমি কি ইচ্ছেমতন বেড়াতে পারব না ? আমি আজকাল আর অন্য লোকের কাজ নিই না। বেড়াতেই ভালবাসি।”

“সত্যি কথাটা বলো। নইলে, আমি ঠিক গুলি করব।”

“গুলি করুন ! আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারব না যে প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মানুষ খুন করতে পারেন !”

“সত্যি দেখতে চাও গুলি করতে পারি কি না ? আমি বলব, তুমি আমার গলা টিপে ধরতে এসেছিলে, তাই আমি সেল্‌ফ ডিফেন্সে গুলি করেছি !”

“আমি আপনার গলা টিপে ধরতে যাব কেন ? একটা কিছু মোটিভ তো থাকা দরকার। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার গায়ে হাত তোলার কথা আমি চিন্তাই করি না। আপনার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নেওয়া কি আমার পক্ষে খুব শক্ত হত ?”

বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন, “রাজা রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি, দরজার আড়াল থেকে মোহন সিং-রা দেখছে, তাই আমি এই অভিনয় করছি। মোহন সিং-এর দল তোমাকে দেখে চিন্তায় পড়ে গেছে। আমি এখন তোমাকে যে-কয়েকটা কথা বলছি, তা খুব মন দিয়ে শোনো। আর কেউ যেন জানতে না পারে। আমি হঠাৎ মরে গেলে তুমি আমার কাজটা সম্পূর্ণ করবে।”

এরপর বৃদ্ধ আরও আস্তে-আস্তে কয়েকটা কথা বললেন, শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল।

তারপর আবার গলা চড়িয়ে বৃদ্ধ বললেন, “এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তা হলে খবর্দার আমার সামনে তুমি আর আসবে না।”

এই সময় দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ল। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, “ডাক্তার আ গয়া। খোলিয়ে, খোলিয়ে !”

বৃদ্ধ চোখ টিপে বললেন, “মনে রেখো, আমার কথাগুলো।”

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন।

শর্মাজির ভাইপো কোথা থেকে একজন ডাক্তার জোগাড় করে এনেছে।

সবাই বৃদ্ধের খাটের দিকে এগিয়ে গেল। শুধু মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা খামচে ধরে বলল, "রায়চৌধুরী, প্রোফেসর-সাহেব তোমাকে কী কথা বললেন ? সাফ খুলে বলো !"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, তুমি বারান্দার ওই কোণে চলো। খুব জরুরি কথা।"

মোহন সিং কাকাবাবুর কাঁধটা ছাড়ল না, প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল। একটা ক্রাচ পিছলে গিয়ে কাকাবাবু প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন একবার। তবু রিভলভারটা বার করলেন না। তাঁর ক্রাচ দুটো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

বারান্দার এই কোণটা বেশ অন্ধকার মতন। দিনের বেলা এখান থেকে তুঙ্গভদ্রা নদীর বাঁধ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন সবকিছুই ঝাপসা।

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "তোমাদের প্রোফেসর-সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তিনি আমার কানে-কানে বললেন, তুমি ওই মোহন সিংকে একটু ভদ্রতা শিখিয়ে দিও তো ! ও সবসময় নিজেকে সিনেমার ভিলেইন মনে করে।"

মোহন সিং ধমক দিয়ে বলল, "তুমি আমার সঙ্গে মজা মারছ, ঠিক করে বলো।"

কাকাবাবু বললেন, "ভদ্রলোকের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে নেই, জানো না ? হাত সরাও !"

মোহন সিং আরও কিছু বলতে গেল, তার আগেই হঠাৎ কাকাবাবু একটু নিচু হয়ে তার ডান চোখে খুব দ্রুত একটা ঘুসি চালালেন। মোহন সিং একটা আর্ত চিৎকার করে কাকাবাবুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে চোখ চাপা দিল।

কাকাবাবু এবার মোহন সিং-এর কাঁধটা ধরে এক ঝটকায় তার শরীরটা উলটে দিলেন। মোহন সিং বারান্দার রেলিং-এর ওপারে শূন্যে ঝুলতে লাগল। এতই ভয় পেয়ে গেছে সে যে, মুখ দিয়ে শুধু আঁ-আঁ শব্দ করছে, আর কোনও কথা বলতে পারছে না। তার অত বড় শরীরটা যে কাকাবাবু অবলীলাক্রমে তুলে ফেলতে পারবেন, তা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার আমি তোমাকে নীচে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রলোকেরা মানুষকে চট করে এত কঠিন শাস্তি দেয় না। আর কখনও নিজের বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কারও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বোলো না। আর দু' নম্বর হল, ইন্ডিয়া ইজ আ ফ্রি কান্ট্রি, যার যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি হামপি-তে যাব কি যাব না, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?"

মোহন সিং দু' হাত দিয়ে রেলিংটা ধরার চেষ্টা করছে। কাকাবাবুর মুঠি একটু আলগা হয়ে গেলেই সে পড়ে যাবে। এর মধ্যেই সে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "বিরজু, বিরজু !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ওই বিরজু লোকটা পেট্রোল পাম্পে আমাদের রঞ্জনকে অকারণে একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তাকেও বলে দিও যেন যখন তখন সে গায়ের জোর না দেখায়।"

খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি মোহন সিংকে ফিরিয়ে আনলেন বারান্দায়। সেখানে তাকে ঠেসে ধরে কাকাবাবু আবার বললেন, "ভগবতীপ্রসাদ শর্মা আমার গুরুর মতন। উনি হুকুম করলে আমি ওঁর পা-ধোওয়া জলও খেতে পারি। উনি বুঝেছেন যে, আমরা শুধু ছুটিতে বেড়াতে এসেছি, আমাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। আমরা তোমাদের কোনও ব্যাপারে ডিসটার্ব করব না। তোমরাও আমাদের ডিসটার্ব কোরো না।"

মোহন সিংকে ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবু ক্রাচ দুটো তুলে নিলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন পেছন ফিরে।

মোহন সিং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে, কাকাবাবুর হাতে এত জোর। তার বুকের মধ্যে টিপটিপ শব্দ হচ্ছে।

॥৩॥

সন্তু চোখ মেলে দেখল, তার পাশে জোজো গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে। আলোয় ভরে গেছে ঘর। এখন ক'টা বাজে কে জানে? রোদ্দুরের রং দেখে মনে হয়, বেশ বেলা হয়েছে। রঞ্জন আগের রাত্রেই বলে রেখেছিল, আজ সে অনেক দেরি করে উঠবে। কোনও তাড়া তো নেই।

জোজোকে না ডেকে সন্তু বাইরে বেরিয়ে এল।

দোতলায় আর কোনও মানুষজনের চিহ্ন নেই। পাশের ঘরগুলো খালি। মোহন সিং-এর দলবল, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, সবাই উধাও।

হাওয়ায় একটু শীত-শীত ভাব। সন্তু পরে আছে শুধু পাজামা আর গেঞ্জি, সেই অবস্থাতে সে চলে এল বারান্দার একধারে। এখান থেকে তুঙ্গভদ্রা নদী ভাল করে দেখা যায় না, বাঁধটা অনেকটা উঁচু, তাতে খানিকটা ঢাকা পড়ে গেছে।

সন্তু উঁকি দিয়ে দেখল, নীচের বাগানে একটা লোহার বেঞ্চে বসে আছেন কাকাবাবু। গায়ে একটা চাদর। অন্যমনস্কভাবে আঙুল বোলাচ্ছেন গোঁফে।

সন্তু নেমে এল বাগানে। কাকাবাবুর পায়ের কাছে একটা চায়ের ট্রে, তাতে দুটি কাপ, দুটি কাপেই চা ঢালা হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবু ছাড়া বাগানে আর কোনও লোককে দেখতে পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু প্রথমটায় সন্তুকে দেখতে পেলেন না। কাকাবাবু কিছু একটা নিয়ে

চিন্তা করছেন, সন্তু তাই কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল বাঁধের দিকে। এখানে নদী বেশ চওড়া, সকালের আলোয় রুপোর মতন ঝকঝক করছে। নদী দেখতে সন্তুর সব সময়ই ভাল লাগে। কোনও নদীই একরকম নয়। কতদিন আগে থেকে বইছে এই নদী, এর দু'পারে কত মানুষ থেকে গেছে, কত গ্রাম-নগর ধ্বংস হয়েছে, তবু নদী ঠিক একইরকমভাবে বয়ে চলেছে।

সন্তুর ইচ্ছে হল—এই নদীতে নেমে একবার সাঁতার কাটবে। জোজোকে ডাকা দরকার। জোজো অবশ্য সাঁতার জানে না, জলকে ভয় পায়, তবু জোজোকে পারে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। একদম একলা-একলা জলে নামতে ভাল লাগে না। এখানে আর কেউ স্নান করছেও না, দু-একটা মাছ-ধরা নৌকো দেখা যাচ্ছে শুধু।

সন্তু বাঁধ থেকে নেমে আসতেই কাকাবাবু তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে ? এবার ডাকো, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি একদম চান-টান করে বেরোব, না দুপুরে আবার ফিরে আসব ?"

কাকাবাবু বললেন, "এখনও গরম পড়েনি, বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল, হামপি দেখতে অনেকক্ষণ লাগবে। সবাই মিলে চান করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে না ?"

এই সময় দেখা গেল রঞ্জন আর রিঙ্কু নেমে আসছে বাগানের দিকে। রঞ্জনের চুল উসকোখুসকো, চোখে এখনও ঘুম লেগে আছে মনে হয়। রিঙ্কু কিন্তু এরই মধ্যে বেশ ফিটফাট হয়ে গিয়েছে।

রঞ্জন একটু দূর থেকেই বলল, "সুপ্রভাত কাকাবাবু, আপনার কাছে ঘড়ি আছে ? এই রিঙ্কু শুধু-শুধু আমাকে ধাক্কা মেরে-মেরে বিছানা থেকে তুলল। আমি যত বলছি, এখন সাড়ে ছ'টার বেশি হতেই পারে না। এখনও ভোর রয়েছে।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "আমার হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু আকাশে তো মস্ত বড় একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটার দিকেই তাকিয়ে বলা যায়, এখন অন্তত সাড়ে আটটা বেজে গেছে।"

রঞ্জন বলল, "তা হলে তো ঠিকই আছে। দক্ষিণ দেশে ন'টার পর সকাল হয়, তার আগেকার সময়টাকে এরা বলে ভোর।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জনকে না ডাকলে ও সারাদিন ঘুমোতে পারে, জানেন !"

রঞ্জন বলল, "তাতেই বোঝা যায়, আমার হেল...হেল... মানে স্বাস্থ্য কত ভাল। আবার দরকার হলে আমি সারারাত জেগে থাকতে পারি। এখন একখানা বেশ ভাল করে অবগাহন স্নান করতে হবে, কী বলো শ্রীমান সন্তু ? আমার সঙ্গে সন্তরণ প্রতিযোগিতা হবে নাকি ? শুনেছি তুমি ভাল সাঁতার জানো। তুঙ্গভদ্রা নদী এপার-ওপার করার চ্যা...চ্যা... বাজি ফেলবে ?"

হঠাৎ রঞ্জন অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, বাংলা খেলা তো কাল রাত্তিরেই শেষ হয়ে গেছে। আমি এত কষ্ট করে বাংলা বলছি কেন ? গুড মর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত বলে ফেললুম ! আজ সারাদিন প্রাণ ভরে ইংরেজি বলব !"

রিঙ্কু বলল, "শুধু-শুধু ইংরেজি বলার দরকারই বা কী ? গুডমর্নিং-এর বদলে সুপ্রভাত শুনতে তো বেশ ভালই লাগে !"

রঞ্জন বলল, "তুমি বাজে কথা বোলো না। তোমার কাল সবচেয়ে বেশি ফাইন হয়েছে। টাকাটা তুমি আজই সন্তুর কাছে জমা করে দাও, মেরে দেবার চেষ্টা কোরো না !"

কাল রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর হিসেব করা হয়েছিল, কে কতগুলো ইংরেজি বলে ফেলেছে। রিঙ্কু আর রঞ্জন প্রায় সমান-সমান, রিঙ্কু আঠাশ টাকা আর রঞ্জনের সাতাশ।

রঞ্জন আবার সন্তুকে বলল, "কী, আমার সঙ্গে সুইমিং কমপিটিশানে নামতে রাজি আছ ? তুঙ্গভদ্রা এপার-ওপার, একশো টাকা বাজি। চ্যালেঞ্জ !"

রিঙ্কু বলল, "রাজি হয়ে যা, সন্তু ! একশো টাকা পেয়ে যাবি। রঞ্জন সাঁতারই জানে না !"

রঞ্জন আকাশ থেকে পড়ার মতন অবাক হয়ে বলল, "আমি সাঁতার জানি না ? আমি একটা জেনুইন বাঙাল, আমাদের সাতপুরুষ পূর্ববাংলার নদী-নালার দেশে...তুমি জানো, ওখানে চার বছরের বাচ্চারাও পুকুরে ডুব-সাঁতার দিতে শিখে যায়।"

রিঙ্কু বলল, "তুমি তো আর কোনওদিন পূর্ববাংলায় ছিলে না ! তোমায় আমি কোনওদিন সাঁতার কাটতে দেখিনি !"

রঞ্জন বলল, "দেখোনি, আজ দেখিয়ে দিচ্ছি ! আমি কলকাতার গঙ্গা কতবার এপার-ওপার করেছি ! ও হ্যাঁ, জোজো কোথায় ? সে নিশ্চয়ই আমার থেকেও বড় চ্যাম্পিয়ান ? জোজো খুব সম্ভব কোনও সমুদ্র এপার-ওপার করেছে।"

সন্তু বলল, "জোজো এখনও জাগেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের সাঁতারের কেরামতি এখন দেখতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমরা যদি স্নান করেই বেরোতে চাও তো বাথরুমেই স্নান করে নাও। আমার মনে হয়, হাম্পি দেখতে হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভাল।"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, আপনার আর সন্তুর চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি। আমরাও এই বাগানে বসেই বেড-টি খাব ! অ্যাই সন্তু, একটু চায়ের কথা বলে দে না ভাইটি !"

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু চা খায়নি আমার সঙ্গে। অন্য একজন ভদ্রলোকের

সঙ্গে আলাপ হল। তিনি চা খেতে-খেতে গল্প করছিলেন আমার সঙ্গে।"

গেস্ট হাউসের একজন বেয়ারা এদিকেই আসছিল কাপগুলো নিতে, তাকেই বলে দেওয়া হল চায়ের কথা। দোতলার বারান্দায় দেখা গেল জোজোকে। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা যে হামপি দেখতে যাচ্ছি, সেখানে আসলে কী দেখার আছে একটু বুঝিয়ে বলুন তো !"

কাকাবাবু বললেন, "হামপি এখানকার একটি গ্রামের নাম। এককালে ওইখানেই ছিল বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী। বিজয়নগরের কথা ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়ই।"

রঞ্জন বলল, "আমি অঙ্কে খুব ভাল তো, সেইজন্য ইতিহাস আর ভূগোলে খুব কাঁচা। তা ছাড়া ইস্কুল ছাড়বার পর তো আর ইতিহাস পড়িনি ! বিজয়নগর নামে একটা রাজ্য ছিল বুঝি ?"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "অ্যাই রঞ্জন, তুমি বিজয়নগরের কথা জানো না ! বিজয়নগর আর বাহমনি, এই দুটো রাজ্যের মধ্যে সবসময় লড়াই হত !"

সন্তু বলল, "হরিহর আর বুক্ক নামে দুই ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল দক্ষিণ ভারতে। দিল্লিতে তখন পাগলা রাজা মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল। সেটা ফোরটিনথ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি।"

রঞ্জন সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "বাহ্, তোর তো বেশ ইতিহাসে মাথা। সেঞ্চুরি পর্যন্ত মনে আছে। হ্যাঁ বুঝলাম, বিজয়নগর নামে একটি রাজ্য ছিল, তার রাজারা সবসময় মারপিট করত। তারপর ?"

কাকাবাবু বললেন, "হামপিতে সেই এককালের বিরাট শহর বিজয়নগরের রুইনস আছে। সেইগুলোই দেখতে যাচ্ছি।"

রঞ্জন অবহেলার সঙ্গে বলল, "ওঃ, হিস্টোরিক্যাল রুইনস ? তার মানে তো দু-চারটে ভাঙা দেওয়াল আর আধখানা মন্দির, আর-একটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা গেট। যে-জায়গাটায় হাতি থাকত সেই জায়গাটাই দেখিয়ে গাইডরা বলবে, এটাই ছিল মহারানির প্রাসাদ। এই তো ? এ-আর দেখতে কতক্ষণ লাগবে ? বড়জোর একঘন্টা ! এই হিস্টোরিক্যাল রুইনস-টুইনসগুলো সাধারণত খুব বোরিং হয়।"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই না ! আমার এসবগুলো দেখতে খুব ভাল লাগে।"

রঞ্জন বলল, "ঠিক আছে, আমি গাছতলায় শুয়ে থাকব। তোমরা যত খুশি পেট ভরে দেখো দু'ঘন্টা, তিনঘন্টা, তার বেশি তো লাগবে না ! লাঞ্চের আগেই শেষ হয়ে যাবে। আমি বলি কী, এই গেস্ট হাউস ছাড়ার দরকার নেই, আমরা এখানেই ফিরে আসব আবার। রাত্তিরটা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।"

জোজো বাগানে এসে সন্তুর পাশে দাঁড়িয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, "হামপিতে যদি ভাঙাচোরা জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখবার না থাকে, তা হলে

ওই মোহন সিং সেখানে যেতে আমাদের বারণ করল কেন ? কাকাবাবুকে শাসালই বা কেন ?"

রঞ্জন বলল, "দ্যাট ইজ আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবছিলুম। আমরা হামপি বেড়াতে গেলে ওর অসুবিধের কী আছে ? তা ছাড়া ওই গণ্ডারটা কাকাবাবুকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা কাজ দিতে চেয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন একটু-একটু মনে পড়ছে, ওই মোহন সিং-এর ভাই সুরয সিংকে আমি একবার জব্দ করেছিলুম। সুরয সিং এখন জেল খাটছে। সেইজন্যেই আমার ওপর মোহন সিং-এর রাগ থাকতে পারে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভটা কেন দেখিয়েছিল বুঝতে পারছি না। আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল বোধহয়।"

রিঙ্কু বলল, "ওর কথায় আমরা ভয় পাব নাকি ! আমরা হামপি দেখতে এসেছি, সেখানে যাবই। কাকাবাবুর সঙ্গে ওরকম একটা জায়গা দেখার চান্স আর কখনও পাব ? কাকাবাবু সবকিছু ভাল বুঝিয়ে দিতে পারবেন। চলো, চলো, সবাই তৈরি হয়ে নাও !"

আধঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া হল। গেস্ট হাউসটা না ছেড়ে সেখানে রেখে যাওয়া হল কিছু জিনিসপত্র। সবাই ওঠার পর রঞ্জন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "ওই মোহন সিং ব্যাটা সিনেমায় ডাকাতের পার্ট করে, ব্যবহারটাও ডাকাতের মতন। আবার ওদের দলে একজন আশি নব্বই বছরের থুত্থুরে বুড়ো, সে নাকি একজন নামকরা পণ্ডিত, এই অদ্ভুত কম্বিনেশনটা আমি বুঝতে পারছি না।"

রিঙ্কু বলল, "ওরা দলবল মিলে সবাই হামপিতে গেছে নিশ্চয়ই। চলো, একটু পরেই সব বোঝা যাবে।"

ওদের দু' জনের এই কথা শুনে কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট্ট শহর মতন দেখা গেল। সেটার নাম হসপেট। কিছু দোকানপাট, হোটেল আর রেল স্টেশন আছে।

গেস্ট হাউসে শুধু ডিম আর পাউরুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না বলে ওরা সেখানে ব্রেকফাস্ট খায়নি। ডিম আর টোস্ট তো রোজই খাওয়া হয়, বাইরে বেড়াতে এসেও ওসব খেতে ভাল লাগে না। রিঙ্কুর আজ পুরি-তরকারি-জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

সেরকম দু-তিনটে দোকান দেখা গেল। রঞ্জন গাড়ি দাঁড় করাল একটা দোকানের সামনে। সকালবেলার শীত-শীত ভাবটা এরই মধ্যে চলে গেছে, আজ অবশ্য সঙ্গে খাবার জল নেওয়া হয়েছে তিন বোতল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকে হামপি আর

ছ-সাত কিলোমিটার দূরে। কিন্তু একসময় বিজয়নগর রাজ্য শুরু হয়েছিল প্রায় এখান থেকেই। এইদিক দিয়েই পর্তুগিজরা আসত গোয়া থেকে। ওরা ঘোড়া বিক্রি করত। বিজয়নগরের রাজারা ঘোড়া আমদানি করত ইওরোপ থেকে। পর্তুগিজরা সেই ঘোড়া সাপ্লাই দিত।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ইউরোপ থেকে ঘোড়া কিনত কেন ? আমাদের দেশে তখন ঘোড়া পাওয়া যেত না ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, পাওয়া যেত। কিন্তু সেগুলো ছোট-ছোট। ইওরোপের ঘোড়া অনেক বড় আর তেজি বেশি। তখনকার দিনে যে-রাজার যত বেশি শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী থাকত, তারাই যুদ্ধে জিতে যেত।"

সন্তু বলল, "আমাদের দেশের ঘোড়াগুলো সব টাট্টু ঘোড়া ?"

কাকাবাবু বললেন, "সব নয়, বেশির ভাগ। ভাল জাতের ঘোড়া বিদেশ থেকেই এসেছে।"

রঞ্জন বলল, "সেইসব ভাল ভাল ঘোড়া যুদ্ধেই মরে গেছে নিশ্চয়ই। এখানকার টাঙার ঘোড়াগুলো দেখুন, বেতো-বেতো, রোগা-রোগা !"

এই শহরের রাস্তা দিয়ে টাঙ্গার মতন একরকম গাড়ি যাচ্ছে অনেক। রঞ্জনের কথাই ঠিক, সেগুলোর কোনও ঘোড়াই তাগড়া নয়।

পাঁচজনের এই দলটি গিয়ে বসল একটা রেস্তোরাঁর দোতলায়। এর মধ্যে রঞ্জনের চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে। লম্বা-চওড়া, মুখভর্তি দাড়ি, আজ সে মাথায় একটা টুপি পরেছে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন। অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

খাবারের অর্ডার দেবার পর রঞ্জন বলল, "হামপিতে যাবার পর যতদূর মনে হচ্ছে ওই মোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা হবেই। সে যদি আবার ধমকাধমকি শুরু করে, তা হলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, সেটা আগে ঠিক করে ফেলা যাক।"

রিঙ্কু বলল, "ইশ, ধমকালে হলই নাকি ! বিজয়নগরটা কী ওর মামাবাড়ি ? ও যদি গায়ে পড়ে আর-একটা কথা বলতে আসে, তা হলে ওকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব !"

রঞ্জন বলল, "কাকাবাবু, জানেন তো, রিঙ্কুর ধারণা, ভারতবর্ষের সব পুলিশ ওর হুকুম শুনতে বাধ্য।"

রিঙ্কু বলল, "কেন শুনবে না ? একজন লোক যদি অন্যায় করে, পুলিশ তাকে ধরবে না ?"

জোজো বলল, "তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও ! এবার মোহন সিং কিছু করতে এলে আমি একাই ওকে টিট করব !"

রঞ্জন বলল, "তা জোজো পারবে। জোজো সব পারে।"

টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট প্লাস্টিকের বাটি তুলে নিল জোজো। সেই বাটিতে রয়েছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এদিককার লোকেরা খুব ঝাল খায়, সব খাবারে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নেয়। জোজো পকেট থেকে রুমাল বার করে তাতে ঢেলে নিল লঙ্কার গুঁড়োগুলো। তারপর রুমালটায় পুঁটুলি বেঁধে পকেটে রাখল।

সন্তু বলল, "হাতটা ধুয়ে নে জোজো। নইলে কখন নিজের হাত চোখে লাগিয়ে কান্নকাটি শুরু করবি।"

রিঙ্কু বলল, "ওসব করবার দরকার নেই। লোকটাকে আমি ঠিক পুলিশে ধরাব!"

রঞ্জন বলল, "অর্থাৎ কিছুই ঠিক হল না। কাকাবাবু কিছু বলছেন না, তার মানে তিনি কিছু একটা ঠিক করে রেখেছেন। যাকগে! বিজয়নগর দেখার পর আমরা কোথায় যাব?"

রিঙ্কু বলল, "এরপর আমরা গোয়া যাব!"

রঞ্জন বলল, "সে তো অনেক দূরে! অতখানি কে গাড়ি চালাবে?"

সন্তু বলল, "রঞ্জনদা, ওই যে তুঙ্গভদ্রা নদী আমরা দেখলাম, সেই নদী কোনও এক জায়গায় কৃষ্ণা নদীতে মিশেছে। সেইখানটায় একবার গেলে হয় না?"

রঞ্জন বলল, "গ্রেট আইডিয়া, একসঙ্গে দুটো নদীর জল লুটোপুটি, হুটোপুটি করছে, সেটা তো দেখতেই হবে! সেখানে আমরা সাঁতার কাটব, কী বলো সন্তু?"

রঞ্জন এ-কথায় এত উৎসাহিত হয়ে গেল যে, ঝটপট সাত-আটখানা পুরি আর আলুর দম খেয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি, সবাই তাড়াতাড়ি করো। আগে আমরা ইতিহাস-ফিতিহাস দেখা সেরে নিই, তারপর চলে যাব তুঙ্গভদ্রার ধার দিয়ে দিয়ে কৃষ্ণা নদীর দিকে। আহা, কৃষ্ণা নদী, কী সুন্দর নাম!"

রঞ্জনের তাড়ায় গরম গরম কফি পেয়ালায় ঢেলে খেতে হল জোজো আর সন্তুকে। তারপর আবার গাড়িতে চড়া।

হাম্পিতে ঢোকার মুখে একদল গাইড দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয়নগরের ভাঙা রাজধানী অনেকটা ছড়ানো, দেখবার জিনিসগুলো বেশ দূরে-দূরে, গাইডের সাহায্য ছাড়া খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রঞ্জনদের গাড়িটা গেটের কাছে থামতেই চার-পাঁচজন গাইড ছুটে এল।

কাকাবাবু বললেন, "গাইড নেবার দরকার নেই। জায়গাগুলো আমার মোটামুটি মনে আছে।"

গাইডরা সবাই মিলে একসঙ্গে বলতে লাগল, "অনেক নতুন নতুন জায়গা বেরিয়েছে। অনেক জায়গা খুঁড়ে নতুন জিনিস বেরিয়েছে!"

রঞ্জন বলল, "আরে ভাই, হামলোগ নতুন জিনিস দেখনে নেহি আয়া। হামলোগ পুরনো ইতিহাস দেখে গা !"

একজন গাইড তবু জোর করে সামনের দরজা খুলে কাকাবাবুর পাশে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, কাকাবাবু একটা হাত তুলে তাকে আটকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের গাইড হতে চান তো ? তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। রাম রায় যখন বিজয়নগর আক্রমণের কথা শুনলেন, তখন তিনি কী করছিলেন ?"

লোকটি থতমত খেয়ে বলল, "রাম রায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি রাম রায়ের নামও শোনেননি ? তা হলে আপনি আমাদের গাইড হবেন কী করে ? আমার সঙ্গের এই ছেলেমেয়েরা যে অনেক প্রশ্ন করবে ?"

গাইডটি গাড়ির দরজা থেকে একটু সরে গেল। তারপর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে বলল, "ঠিক আছে, যাও না, যাও ! তোমরা কিছুই দেখতে পাবে না ! কিছুই দেখতে পাবে না !"

রঞ্জন আবার গাড়ি স্টার্ট দিল বটে, কিন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "লোকটা কি আমাদের অভিশাপ দিল নাকি ?"

রিঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, "লোকটা খুব রেগে গেছে ! ও বেচারা কী করে বুঝবে যে বিখ্যাত আরকিওলজিস্ট রাজা রায়চৌধুরী এই গাড়িতে আছেন, আর তিনি ওকে ইতিহাসের পড়া ধরবেন !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, রাম রায় কে ছিলেন ? এখানকার শেষ রাজা ?"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, রাজা নন। ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে অনেকটা লম্বা ইতিহাস বলতে হয়।"

রঞ্জন বলল, "না, না, দরকার নেই। ইতিহাস যত ছোট হয়, ততই ভাল। ফজলি আমের চেয়ে যেমন ল্যাংড়া আম মিষ্টি সেইরকমই, বড় ইতিহাসের চেয়ে...মানে, আমরা যখন ওইসব ভাঙা দেওয়াল-টেওয়াল দেখব, তখন ছোট্ট করে ইতিহাসটা শুনে নেব।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "রঞ্জন, তোমার শুনতে ইচ্ছে না করে চুপ করে থাকো। কাকাবাবু, আপনি বলুন তো !"

কাকাবাবু বললেন, "সামনে অত ভিড় কিসের বলো তো ? পুলিশ-টুলিসও দেখা যাচ্ছে।"

রাস্তাটা সবে একটা বাঁক নিয়েছে, একটু দূরে দেখা গেল প্রচুর লোক জমে আছে। আরও কিছু লোক সেই দিকে ছুটছে। একটা বোমা ফাটার মতন জোর শব্দও হল।

কাকাবাবু বললেন, "ওইখানেই মেইন গেট। কিছু একটা ঘটেছে মনে

হচ্ছে।”

একটা বড় গেট দেখা যাচ্ছে। সেখানেই লোকেরা ঠেলাঠেলি করছে, কয়েকজন পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছে তাদের।

রঞ্জন সেই গেটের উলটো দিকের মাঠে গাড়িটা থামিয়ে বলল, “আপনারা বসুন, আমি দেখছি।”

গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে সে এগিয়ে গেল। একটু বাদেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, “আজ আর ভেতরে ঢোকাই যাবে না। আজ সব বন্ধ!”

রিঙ্কু ভুরু কুঁচকে বলল, “ভেতরে ঢোকা যাবে না মানে? কেন ঢোকা যাবে না?”

রঞ্জন দাড়ি চুমরে বলল, “এখন ওই গাইডটার অভিশাপের মানে বুঝতে পারছি। ও সব জানত। আমাদের সঙ্গে গাড়িতে পর্যন্ত এসে কিছুই না জানার ভান করে পয়সা আদায় করার তালে ছিল।”

রিঙ্কু বলল, “গাইডের কথা বাদ দাও! ভেতরে যাওয়া যাবে না কেন, কী হয়েছে?”

রঞ্জন বলল, “বললুম না, আজ বন্ধ। ভিজিটারস নট অ্যালাউড! ওখানে একটা সিনেমার শুটিং হচ্ছে। পুলিশ কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না।”

রিঙ্কু আরও রেগে গিয়ে বলল, “সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে আমরা যেতে পারব না? কতদূর থেকে এসেছি, এমনি-এমনি ফিরে যাব? আমি গিয়ে ওদের বলছি! এটা বেআইনি!”

রিঙ্কুর সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু আর জোজোও নেমে গেল গাড়ি থেকে। কাকাবাবু গাড়ির মধ্যে বসে থেকেই দরজাটা খুলে দিলেন হাওয়া খাওয়ার জন্য। রঞ্জন নাকে একটিপ নস্যি নিয়ে বলল, “এইবার দেখা যাবে রিঙ্কুর তেজ কেমন গ্যাস বেলুনের মতন ফুটো হয়ে যায়! ওর সাধের পুলিশরাই ওকে কড়কে দেবে!”

রিঙ্কুরা ফিরে এল মিনিট-দশেক বাদে। ওদের মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল কিছু সুবিধে হয়নি। রিঙ্কু রাগে একেবারে ছটপট করছে।

রঞ্জন মজার সুরে জিজ্ঞেস করল, “কী হল? পারমিশন পেয়ে গেছ?”

সন্তু বলল, “শুটিং-এর সময় কাউকে ঢুকতে দেবে না।”

জোজো বলল, “খুব জোর একটা ফাইটিং সিন হচ্ছে মনে হচ্ছে। ওরা বলল, বিকেল পাঁচটার আগে কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না।”

রঞ্জন রিঙ্কুকে খোঁচা মেরে বলল, “তুমি পুলিশের কাছে নালিশ করলে না? সিনেমা তো করছে মোহন সিং! তোমার পুলিশরা কী বলল?”

রিঙ্কু রাগে-দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, “এইসব ঐতিহাসিক জায়গা এখন ন্যাশনাল মনুমেন্টস। সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে পাবলিক সেখানে ঢুকতে পারবে না? এটা অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়! কতকগুলো কনস্টেবল ওখানে

রয়েছে, তারা কোনও কথাই শুনতে চায় না !"
রঞ্জন বলল, "তা হলে এখন কী করা যায় সেটা বলো ? বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে এই রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয় না !"
রিঙ্কু বলল, "এখানে বসে থাকব না, বিকেলে আবার ফিরে আসব !"
রঞ্জন বলল, "তাতেও কোনও সুবিধে হবে না। সিনেমার শুটিং পাঁচটা বললে সাতটায় শেষ হবে। কিংবা আজ হয়তো শেষই হবে না। কালও এইরকম চলবে। আমি যা বুঝতে পারছি, হামপি দেখার কোনও আশা আমাদের নেই। এইজন্যই মোহন সিং এখানে আসতে বারণ করেছিল। খুব খারাপ কিছু বলেনি !"
রিঙ্কু বলল, "তুমি বলতে চাও, আমরা এই জায়গাটা না দেখে ফিরে যাব ? অসম্ভব !"
রঞ্জন বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী বলো ! আমি তো তোমাদের বাধা দিইনি ! অবশ্য আমি পার্সোনালি খুব একটা হতাশ হইনি। আমার ভাই অত ইতিহাসের দিকে ঝোঁক নেই। ভাঙা দেওয়াল, ভাঙা দুর্গ আর মন্দির-টন্দির সব জায়গাতেই প্রায় এক। তোমরা চাও তো, অন্য জায়গায় তোমাদের ওইসব জিনিস দেখিয়ে দেব। এখন আমি সাজেস্ট করছি, এখানে শুধু-শুধু বসে থেকে কোনও লাভ নেই। চলো, কৃষ্ণা আর তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমের দিকে যাই, রাস্তায় খাবারদাবার কিনে নেব, সেখানে পিকনিক করব, একসঙ্গে দুটো নদীর জলে সাঁতার কাটব ! ইতিহাসের চেয়ে জ্যান্ত প্রকৃতি অনেক ভাল !"
রিঙ্কু বলল, "আমরা বিজয়নগর না দেখে ফিরে যাব ? কাকাবাবু, আপনি কিছু বলছেন না ?"
কাকাবাবু আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। আকাশে অনেকগুলি চিল কিংবা শকুন উড়ছে একসঙ্গে। সম্ভবত বোমার শব্দে তারা এখান থেকে উড়ে গেছে।
কাকাবাবু সেখান থেকে চোখ নামিয়ে বললেন, "রঞ্জন, তোমার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ নেই। কিন্তু এখানে অন্য একটা ভারী চমৎকার দেখার বা শোনার জিনিস আছে। রাজধানী বিজয়নগর প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও এর ভেতরে একটা মন্দির আছে, সেটা খুব বেশি ভাঙেনি। তার নাম এরা এখন বলে, বিঠলস্বামী টেম্পল ! সেই মন্দিরটার মজা কী জানো তো, সেটা হচ্ছে মিউজিক্যাল টেম্পল ! তার মানে, সেই মন্দিরের এক-একটা থামে একটু জোরে আঘাত করলে নানারকম সুর বেরোয়।"
রঞ্জন চোখ বড়-বড় করে বলল, "থামে আঘাত করলে সুর বেরোয় ?"
কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সাতটা থামে টোকা মারলে তুমি সা-রে-গা-মা শুনতে পাবে। আর-এক জায়গায় পুরো একটা গানের সুর। একটা থামে তবলার লহরা !"
রঞ্জন গান-বাজনা খুব ভালবাসে। সে খুব কৌতূহলের সঙ্গে কাকাবাবুর

কথা শুনল। তারপর বলল, "এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, কাকাবাবু! মন্দিরের থামে টোকা দিলে সা-রে-গা-মা, তবলার লহ্‌রা শোনা যায়? যাঃ, হতেই পারে না! আষাঢ়ে গপ্পো!"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "ইস্তাম্বুলে এরকম মন্দির আছে!"

রঞ্জন বলল, "ইস্তাম্বুলে তো আমরা এখন যেতে পারছি না ভাই! তা ছাড়া ইস্তাম্বুলে কোনও মন্দির আছে বলেও শুনিনি।"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন, তুমি বড্ড ইয়ে হয়ে গেছ! কাকাবাবু কি তোমায় মিথ্যে কথা বলবেন!"

রঞ্জন বলল, "আমি সে-কথা বলছি না। তবে, সিয়িং ইজ বিলিভিং! মানে, নিজের চোখে না দেখলে, নিজের কানে না শুনলে এসব কথা বিশ্বাস করা যায় না! তুমি আমার সঙ্গে বাজি ধরবে! কত, একশো টাকা?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি ওর সঙ্গে বাজি ধরছ কেন? কথাটা তো বলেছি আমি! চলো, তা হলে মন্দিরটা দেখে আসা যাক!"

রঞ্জন বলল, "যাব কী করে? যাবার উপায় নেই বলেই তো আপনি আমাকে এত ধোঁকায় ফেলে দিলেন!"

কাকাবাবু বললেন, "কেন যাওয়া যাবে না? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।"

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়তেই রঞ্জন একগাল হেসে বলল, "ও তাই বলুন! আপনার আইডেন্টিটি কার্ড দেখলেই পুলিশরা আপনাকে রাস্তা ছেড়ে দেবে! আপনাকে কেউ আটকাবে না, সেকথা এতক্ষণ বললেই হত।"

রিঙ্কু কিংবা সন্তু-জোজোর মুখে অবশ্য কোনও আশার ভাব ফুটল না। তারা এইমাত্র পুলিশের সঙ্গে তর্ক করে এসেছে। অতি সাধারণ সব কনস্টেবল, তারা কোনও কথাই বুঝতে চায় না। সিনেমা কোম্পানির কিছু লোকও সেখানে রয়েছে, তারা খালি চেঁচিয়ে বলছে, "হঠাও, ভিড় হঠাও!"

এরা কি কাকাবাবুকে পাত্তা দেবে?

কাকাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে বললেন, "তোমরা গাড়ি বন্ধ করে চলে এসো আমার সঙ্গে।"

ভিড় ঠেলে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন একেবারে সামনে। সন্তু মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছে। সে জানে, কাকাবাবু কোনওদিন কাউকে আইডেন্টিটি কার্ড দেখান না। এমনকী কাকাবাবুর সেরকম কোনও কার্ড আছে কি না তাই-ই সে জানে না।

এই দলটাকে খুব সামনে এগিয়ে আসতে দেখে দু'জন কনস্টেবল রুক্ষভাবে বলল, "হঠো, হঠো, দূর হঠো!"

কাকাবাবু আঙুল তুলে একটু দূরের একজন ষণ্ডামার্কা লোককে দেখিয়ে পুলিশদের বললেন, "আমরা এই সিনেমা ইউনিটের লোক। ওই লোকটাকে ডাকো, ও ঠিক বুঝবে!"

রঞ্জন সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আমাকে গলাধাক্কা দিয়েছিল ! কী যেন নাম ওর, বিরজু সিং, তাই না ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এবার দ্যাখো না, কী মজা হয় !"

পুলিশরা কাকাবাবুর কথা শুনেও দ্বিধা করছিল, কাকাবাবু আবার তাদের বললেন, "আমরা মোহন সিং-এর মেহমান। কেন দেরি করছ, ওই বিরজু সিং-কে এখানে ডেকে আনো !"

এবার একজন সেপাই ছুটে গেল। বোঝা গেল যে, মোহন সিং-এর নামটা এদের খুব চেনা, সেই নামটাকে ওরা ভক্তি করে কিংবা ভয় পায়।

সেপাইয়ের কথা শুনে এগিয়ে এল বিরজু সিং। কাকাবাবুকে দেখে সে যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠল। ভুরু দুটো কপালে তুলে সে বলল, "আপ ? রাজা রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি একা নই। মোহন সিং-কে খবর দাও, আমার সঙ্গে আরও চারজন আছে, আমরা ভেতরে যাব !"

বিরজু সিং আর কোনও কথা না বলে উলটো দিকে ফিরে এক দৌড় দিল।

দূরে আবার শোনা গেল বোমা ফাটার মতন শব্দ। কতকগুলো ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠল। অবশ্য আসল জায়গাটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

একটু বাদেই দূর থেকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল একটা ঘোড়া। তার পিঠে জরি মখমলের পোশাক-পরা একজন বিরাট চেহারার লোক। কোমরবন্ধের একদিকে তলোয়ার, আর-একদিকে পিস্তল। মাথায় পালক দেওয়া শিরস্ত্রাণ। ইতিহাস বইয়ের পাতায় এই রকম মানুষের ছবি আঁকা থাকে।

সিনেমার পার্টের জন্য মেকআপ নিলেও সন্তুরা চিনতে পারল মোহন সিংকে। জোজো পকেটে হাত দিয়ে চেপে ধরল শুকনো লঙ্কার পুঁটলিটা, রঞ্জন হাতে নিল নস্যির কৌটো !

ঘোড়া চালিয়ে মোহন সিং থামল একেবারে কাকাবাবুর সামনে। প্রায় এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সে আস্তে-আস্তে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আপনি সত্যি এসেছেন ? এসে বলেছেন কী যে আপনি আমার মেহমান ?"

কাকাবাবু হাল্‌কাভাবে বললেন, "হ্যাঁ, এসে পড়লাম। আমাদের সিনেমার শুটিং দেখার খুব ইচ্ছে। পুলিশরা ঢুকতে দিচ্ছিল না, তাই তোমার নাম বললাম। কেন, তোমার কোনও আপত্তি আছে নাকি ?"

ঘোড়া থেকে নেমে মোহন সিং কাকাবাবুর একেবারে নাকের সামনে এসে দাঁড়াল।

একটু দূরে বিরজু সিং আরও কয়েকটি গুণ্ডা ধরনের লোক নিয়ে আসছে।

কাকাবাবু পিছন ফিরে একজন পুলিশকে বললেন, "আমাদের গাড়িটার ওপর একটু নজর রেখো ভাই। আমরা খানিক বাদেই ফিরে আসব !"

তারপর তিনি মোহন সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো, এবার যাওয়া

যাক !”

মোহন সিং হঠাৎ যেন বদলে গেল। বেশি-বেশি বিনয় দেখিয়ে সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, “নমস্তে, নমস্তে ! আইয়ে, আইয়ে ! আপনার মতন গুণী লোক শুটিং দেখতে এসেছেন, এ তো অতি ভাগ্যের কথা ! জানেন মিঃ রায়চৌধুরী, এর আগে অনেক মন্ত্রী আর সরকারি অফিসার শুটিং দেখতে চেয়েছিল, কারও কথায় পাত্তা দিইনি। কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা !”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। মোহন সিং, আপনার মেকআপ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি শুটিং করতে করতে চলে এসেছেন ? আপনার ব্যস্ত হবার কোনও দরকার নেই। আমরা ঘুরে-ঘুরে চারপাশটা দেখেই চলে যাব।”

মোহন সিং বলল, “আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে হয় থাকবেন। প্রোফেসর শর্মাজি আমাদের বলে রেখেছেন যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী এলে তাঁকে খাতির-যত্ন করবে। আপনি এই জায়গাটার হিস্ট্রির বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। শুটিং-এর সময় আপনি অ্যাডভাইস দিতে পারবেন।”

জোজো হঠাৎ উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই সেদিকে ফিরতেই জোজো বলল, “আমার চোখে কী যেন কামড়েছে হঠাৎ !”

তারপরেই দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে সে আর্তনাদ করতে লাগল, “উঃ, জ্বলে গেল ! চোখ জ্বলে গেল ! আমি অন্ধ হয়ে যাব !”

রঞ্জন সন্তুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

রিঙ্কু ব্যস্ত হয়ে বলল, “জল ! কোথায় জল পাওয়া যাবে ? ওর চোখে জলের ঝাপটা দিতে হবে।”

মোহন সিং পেছন ফিরে হুকুম দিল, “বিরজু, এই মেহমানদের টেন্টে নিয়ে যাও। চা-পানি পিলাও। আমি শর্মাজিকে খবর দিয়ে আসছি।”

অন্ধ মানুষের মতন জোজোকে ধরে-ধরে নিয়ে চলল সন্তু। জোজো অনবরত “উঃ, আঃ, মরে গেলুম,” বলে যাচ্ছে। সন্তু তার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, “তোকে হাতটা ভাল করে ধুয়ে নিতে বলেছিলুম না !”

একটু দূরেই পরপর তিনটে তাঁবু খাটানো। বাইরে রঙিন ঝালর আর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। একটা তাঁবু বেশ বড়, তার মধ্যে অনেকগুলি চেয়ার। একপাশে তবলা, ঢোল, সেতার, সারেঙ্গি এইসব রাখা। আর-একপাশে অনেকগুলো তলোয়ার, খন্তা, কোদাল আর শাবল।

ওদের সেই তাঁবুর মধ্যে এনে বিরজু সিং বলল, “আপলোগ বৈঠিয়ে। আমি এক্ষুনি পানি নিয়ে আসছি।”

একটু পরেই একজন লোক এক জাগ জল নিয়ে এল। রিঙ্কু সেটা নিয়ে বলল, “জোজো, চোখ খোলো। আমি ঝাপটা দিয়ে দিচ্ছি।”

জোজো কিছুতেই চোখ খুলতে পারছে না, রঞ্জন এসে চেপে ধরল তার হাত। সন্তু জোর করে তার চোখের পাতা খুলে দেবার চেষ্টা করল, রিঙ্কু জল ছিটিয়ে দিতে লাগল তার মুখে।

রঞ্জন বলল, "নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল !"

রিঙ্কু বলল, "চুপ। এখন ওসব বলে না !"

মিনিট-পাঁচেক বাদে জোজো অনেকটা সুস্থ হল। তার জামা ভিজে গেছে অনেকখানি। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে সে বসে রইল আচ্ছন্নের মতন।

কাকাবাবু বললেন, "কিছু ক্ষতি হবে না। এত জলের ঝাপটায় চোখটা বরং পরিষ্কার হয়ে গেল। তা হলে আর দেরি করে কী হবে ? চলো, যাওয়া যাক। জোজো, আর কোনও অসুবিধে নেই তো ?"

জোজো এখনও চোখ খুলছে না। সে বলল, "না, ঠিক আছে, যেতে পারব।"

রঞ্জন বলল, "জোজো চোখ বুজে-বুজে শুটিং দেখবে। তাতেই বোধহয় বেশি ভাল দেখা যাবে !"

বিরজু সিং বলল, "না, না, আপনারা বসুন। শুটিং শুরু হতে দেরি আছে। এই রোদ্দুরের মধ্যে কোথায় ঘুরবেন। এখানে বসে আরাম করুন।"

কাকাবাবু বললেন, শুটিং শুরু না হলেও আমরা ততক্ষণ মন্দির-টন্দিরগুলো দেখি। বিঠলস্বামীর মন্দিরটা এদের দেখাব বলেছি।"

বিরজু বলল, "ওই মন্দিরের সামনে একটা অন্য সেট তৈরি হচ্ছে। বাঁশ বাঁধা হচ্ছে। এখন গেলে কিছুই দেখতে পাবেন না। বিকেলবেলা আপনাদের নিয়ে যাব সেখানে !"

কাকাবাবু বললেন, "বিকেল পর্যন্ত তো আমরা এখানে থাকব না ?"

এই সময় মোহন সিং ফিরে এসে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনারা এসেছেন শুনে প্রোফেসর শর্মাজি খুব খুশি হয়েছেন। উনি একবার ডাকছেন আপনাকে। জরুরি কথা আছে। আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য ঘুরে আসবেন ? আপনার লোকেরা ততক্ষণ বসুক এখানে।"

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে, শর্মাজির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। কতদূর যেতে হবে ?"

মোহন সিং বলল, "এই তো কাছেই। উনি এইরকম আর-একটা তাঁবুতে আছেন। উনি এই ফিল্মে পার্টও করছেন জানেন তো ? দেখবেন চলুন, কীরকম মেকআপ নিয়েছেন।"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "তাই নাকি ? উনি সিনেমায় পার্ট করছেন ? এই বয়েসে ?"

মোহন সিং বলল, "জি হাঁ। উনি রাম রায় সেজেছেন ! খুব মানিয়েছে !"

সেই থুত্থুরে বুড়ো লোকটি সিনেমায় পার্ট করছে শুনে সন্তু-রঞ্জনদের মুখে

একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল।

কাকাবাবু ওদের বললেন, "তোরা বোস তা হলে। আমি চট করে ঘুরে আসি। অন্য কোথাও চলে যাসনি যেন!"

কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর সন্তু তাঁবুর এক কোণায় গিয়ে একটা তলোয়ার তুলে নিল হাতে। রঞ্জনও আর-একটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে দু'বার ঘুরিয়ে বলল, "কী সন্তু, হবে নাকি সোর্ড-ফাইট?"

সন্তু বলল, "আমি তলোয়ার খেলতে জানি না। আপনি শিখেছেন বুঝি?"

রঞ্জন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "অনেকদিন আগে। স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারের চেয়ে একটু কম ভাল পারি। এদেশে চ্যাম্পিয়ান।"

সন্তু বলল, "সিনেমার জন্য অনেক সেট বানাতে হয়। মাটি-ফাটি খুঁড়তে লাগে বোধহয়। সিনেমায় যত রাজবাড়ি-ফাড়ি দেখা যায়, সবই তো নকল!"

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বিরজু সিং আবার ঢুকতেই ওরা তলোয়ার দুটো রেখে দিল।

বিরজু সিং-এর হাতে একটা ট্রে-তে চার গেলাস শরবত। বেশ লম্বা-লম্বা গেলাস, তাতে ভর্তি শরবতের ওপর বরফের টুকরো ভাসছে।

রঞ্জন প্রথমেই হাত বাড়িয়ে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "আরে, এসব আবার কেন?"

বিরজু বলল, "বাইরে বহুত গরম। একটু ঠাণ্ডা খেয়ে নিন!"

রঞ্জন বলল, "জোজো, খেয়ে নে, তোর চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি শরবত খাব না।"

বিরজু তার কাছে এসে বলল, "খান, খেয়ে দেখুন। পেস্তা আর মালাইয়ের শরবত। শুটিং-এর সময় সবাই দু-তিন গেলাস করে খায়।"

রঞ্জন প্রথম চুমুক দিয়ে বলল, "চমৎকার! আমারও দু-তিন গেলাস খেতে ইচ্ছে করছে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিঙ্কুকে নিতে হল গেলাসটা।

বিরজু সিং রঞ্জনকে বলল, "আপনি আর-এক গেলাস নেবেন? আমি আনছি।"

রঞ্জন বলল, "না, না, আমার আর চাই না। এমনিই বলছিলাম।"

রঞ্জন দ্বিতীয় চুমুকেই সবটা শেষ করে ফেলল। বিরজু সিং বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

রিঙ্কু বলল, "আমার ভাল লাগছে না। বড্ড বেশি মিষ্টি! সবটা খাব না!"

সন্তু আর জোজো প্রায় শেষ করে এনেছে। রঞ্জন বলল, "রিঙ্কু, তুমি সবটা খাবে না? তা হলে আমাকে দিয়ে দাও!"

জোজোর হাত থেকে খসে পড়ল গেলাসটা। মেঝেতে দড়ির কার্পেট পাতা, তাই গেলাসটা ভাঙল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী হল রে ? গেলাসটা ফেলে দিলি ?"

জোজো একটা বিরাট হাই তুলে বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সন্তু নিচু হয়ে গেলাসটা তুলতে যেতেই ঝিমঝিম করে উঠল তার মাথা। কী হচ্ছে তা বোঝবার আগেই সে জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর।

॥ ৪ ॥

চোখ মেলার পর সন্তু দেখতে পেল আকাশ। কয়েকটা তারা ঝিকমিক করছে। চারপাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। দু-এক মিনিট সন্তু আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল। সে যে কোথায় শুয়ে আছে তা নিয়ে চিন্তাও করল না।

একটু-একটু করে ঘুমের ঘোর কেটে তার মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। পাশের দিকে হাত চাপড়ে বুঝতে পারল, বিছানা নেই, পাথর ও ঘাস। এটা তা হলে কোন্ জায়গা ?

চারপাশে ঝিঁঝি ডাকছে। আকাশ ছাড়া আর কোনও দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। এটা কি তা হলে কোনও জঙ্গল ?

প্রায় খুব কাছেই একটা শেয়ালের ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। শেয়ালটা হঠাৎ এত জোরে ডেকে উঠেছে যে, তার বুকটা ধক করে উঠেছে। এদিক-ওদিক হাত চালিয়ে সে একটা পাথরের চাঁই খুঁজে পেয়ে সেটা ধরে বসে রইল।

কিন্তু শেয়ালটা তাকে কামড়াতে এল না। শুকনো পাতার ওপর দৌড়োবার শব্দ শুনে বোঝা গেল, সেটা দূরে চলে যাচ্ছে।

শেয়ালটার ডাক শুনে চমকাবার জন্যই তার মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে।

এবারে সে মনে করবার চেষ্টা করল কী-কী ঘটেছে। সকালবেলা সবাই মিলে বেড়াতে আসা হল হামপিতে। মোহন সিং তাদের খাতির করে বসাল একটা তাঁবুতে। কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল, ওদের শরবত খেতে দিল। তারপর ? আর কিছু মনে নেই।

ওই শরবতের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল !

ওরা কি মৃত ভেবে সন্তুকে এই পাহাড়ি জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে ?

সন্তু নিজের গায়ে হাত বুলোল। তার নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। তা হলে সে মরেনি। উঠে দাঁড়িয়ে সে দু-তিনবার লাফাল। না, তার শরীরে ব্যথা-ট্যথাও কিছু নেই। সে শুধু অজ্ঞান হয়ে ছিল এতক্ষণ।

অন্য সবাই কোথায় গেল ?

অন্ধকারটা এখন অনেকটা চোখে সয়ে গেছে। একটু-একটু জ্যোৎস্নাও আছে। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে গাছপালা। এই বনে শেয়াল ছাড়া আরও কোনও হিংস্র জন্তু আছে নাকি ? পাথরের চাঁইটা সন্তু আবার তুলে নিল মাটি থেকে।

কাকাবাবুর অসম্ভব সাহস। বাঘের গুহায় মাথা গলাবার মতন তিনি মোহন সিং-এর নাম করেই হ্রামপির মধ্যে ঢুকলেন। তারপর মোহন সিং-এর সঙ্গেই নির্ভয়ে কোথায় চলে গেলেন ! কাকাবাবুও কি ওই শরবত খেয়েছেন ? মোহন সিং আগেই কাকাবাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কাকাবাবু থাকলে বোধহয় একচুমুক দিয়েই ওই শরবত যে বিষাক্ত তা বুঝতে পারতেন।

জোজো আর রঞ্জনদার কী হল ? রিঙ্কুদি সবটা খায়নি। রঞ্জনদা খেয়েছে দেড় গেলাস। সর্বনাশ !

এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। জায়গাটা ঢালু মতন। মনে হচ্ছে কোনও পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গা। এখান থেকে নামতে হবে।

একটুখানি যেতেই সন্তুর পায়ে কিসের যেন ধাক্কা লাগল। পাথর কিংবা গাছ নয়, কোনও জন্তু কিংবা মানুষ !

প্রথমে ভয় পেয়ে সন্তু ছিটকে সরে এল। কিন্তু প্রাণীটা কোনও নড়াচড়া করছে না দেখে সে ভাবল, তাদেরই দলের কেউ হতে পারে। হ্যাঁ, মানুষই, একপাশ ফিরে শুয়ে আছে। প্যান্ট পরা।

কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে মানুষটির মুখে হাত বুলিয়ে দেখল দাড়ি নেই। তার মানে রঞ্জনদা নয়। তা হলে জোজো।

সে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, "জোজো, এই জোজো, ওঠ্।"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। সন্তু নাকের নীচে হাত নিয়ে দেখল, নিশ্বাস পড়ছে। গাটা ঠাণ্ডা নয়। তা হলে জোজোও বেঁচে আছে।

বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর জোজো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কে ? কে ? কে ? কে ?"

সন্তু বলল, "ভয় নেই, আমি ! আমি ! উঠে বোস !"

জোজো বলল, "আমি কে ? কে আমি ?"

সন্তু বলল, "আমায় চিনতে পারছিস না ? উঠে বোস। এখানে সাপ-টাপ থাকতে পারে।"

সন্তু জানে যে জোজো সাপের কথা শুনলেই দারুণ ভয় পায়। কিন্তু এখন সে তা শুনেও উঠল না। কাতর গলায় বলল, "সন্তু, আমার মাথাটা পাথরের মতন ভারী হয়ে আছে। আমায় টেনে তোল। আমি উঠতে পারছি না, এত জলতেষ্টা পেয়েছে যে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।"

সন্তু তাকে ধরে-ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "এটা একটা পাহাড়, এখানে

জল কোথায় পাব ? চল, নীচে নেমে দেখি !"

"আমি হাঁটতে পারব না রে, সন্তু। পায়ে জোর নেই। বুকটা ধড়ফড় করছে !"

"চেষ্টা করতেই হবে। আমাকে ধরে আস্তে-আস্তে চল।"

"কাকাবাবু কোথায় ?"

"জানি না ! রঞ্জনদাদেরও খুঁজতে হবে। ভাগ্যিস তোকে পেয়ে গেলুম !"

"আমার মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি আর বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না এবার। মা-বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না ! এই অন্ধকারের মধ্যে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ?"

"অত ভেঙে পড়িস না, জোজো। পাহাড়ের নীচে গেলে একটা কোনও রাস্তা পাওয়া যাবেই। সত্যি, আমার অন্যায় হয়েছে। তুই এবার আসতে চাসনি, তোকে আমি প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি। এরকম যে কাণ্ড হবে ভাবতেই পারিনি। এবার তো শুধু বেড়াবার কথা ছিল !"

"আমরা এই পাহাড়ের ওপর এলুম কী করে ? আমরা কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম ? আজ কত তারিখ ?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখনও !"

খানিকটা নেমে আসার পর সন্তু দাঁড়াল। জোজোকে প্রায় পিঠে করে বয়ে আনতে হচ্ছে বলে সে হাঁপিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ হচ্ছে, তা শুনে চমকে-চমকে উঠতে হয়। মানুষ না কোনও জন্তু ? হঠাৎ দূরে আর-একটা শেয়াল ডেকে উঠতেই জোজো ভয় পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে।

সন্তু বলল, "সিধে হয়ে দাঁড়া, জোজো। তুই আর-একটু হলে আমাকে ফেলে দিচ্ছিলি ! শেয়ালের ডাক চিনিস না ? শেয়াল আমাদের কী করবে ?"

জোজো বলল, "যদি এই জঙ্গলে বাঘ থাকে ?"

"বাঘ থাকলে এতক্ষণে আমাদের খেয়ে ফেলত অজ্ঞান অবস্থাতেই !"

"পাহাড়ের ওপর দিকে বাঘ থাকে না, নীচের দিকে থাকতে পারে !"

"তা বলে কি আমরা নীচে নামব না ? শুধু-শুধু ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। সব সময় বাঁচার চেষ্টা করতে হয়। এবার তুই নিজে-নিজে হাঁটতে পারবি না ?"

"হ্যাঁ পারব।"

"আমি ভাবছি, রঞ্জনদারা কোথায় গেল ? আর সবাইকেও এই পাহাড়েই ফেলে দিয়ে গেছে ? কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে খুঁজব কী করে ?"

"চেঁচিয়ে ডাকব ?"

"ওরা যদি এখনও অজ্ঞান হয়ে থাকে ? তবু ডেকে দেখা যাক !"

দু'জনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "রঞ্জনদা ! রিঙ্কুদি !

কাকাবাবু !”

বেশ কয়েকবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। কাছাকাছি দু-একটা গাছের পাখিরা ভয় পেয়ে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল।

জোজোর হাত ধরে সন্তু বলল, “দিনের আলো না ফুটলে জঙ্গলের মধ্যে ওদের খোঁজা যাবে না। বরং তার আগে আমরা নীচে নেমে দেখি, অন্য কোনও সাহায্য পাওয়া যায় কি না ! আমার হাত ছাড়িস না !”

জোজো বলল, “আমি জলতেষ্টায় মরে যাচ্ছি ! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ! মনে হচ্ছে তিন-চারদিন জল খাইনি।”

আর খানিকটা নামতেই জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা পাওয়া গেল। সামান্য জ্যোৎস্নার আলোয় সেই রাস্তা ধরে-ধরে ওরা এগোতে লাগল। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, টিলার মতন। সমতলে পৌঁছতে আর ওদের দেরি হল না।

সামনেই ওরা দেখতে পেল একটা নদী। জলে কেউ নেমেছে, সেই আওয়াজ হচ্ছে। একটুখানি এগিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তু দেখল, একটা কোনও জন্তু জল খাচ্ছে, সেটা কুকুরও হতে পারে, শেয়ালও হতে পারে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একবার জন্তুটা এদিকে মুখ ফেরাল। আগুনের গোলার মতন জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ।

জন্তুটা ওদের দেখতে পেল কি না কে জানে, কিন্তু এদিকে তেড়ে এল না। হঠাৎ জল খাওয়া থামিয়ে সে নদীটার ধার দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

সন্তু আর জোজো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জন্তুটা অনেক দূর চলে যাবার পর জোজো ফিসফিস করে বলল, “লেপার্ড ? হায়না ? উল্‌ফ ?”

সন্তু বলল, “বুঝতে পারলুম না। চল, আমরাও জল খেয়ে নিই !”

জোজো আঁতকে উঠে বলল, “এই নদীর জল খাব ? নোংরা, পলিউটেড, কত কী থাকতে পারে।”

সন্তু বলল, “খুব বেশি তেষ্টার সময় ওসব ভাবলে চলে না।”

জোজো তবু বলল, “এইমাত্র একটা জন্তু যে-জল খেয়ে গেল, আমরা সেই জল খাব ?”

সন্তু বলল, “এই হাওয়াতেই তো জন্তু-জানোয়াররা নিশ্বাস নেয়, তা বলে কি আমরা নিশ্বাস নেব না ? তুই যদি জল না খেয়ে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারিস তো থাক, পরে ভাল জল খুঁজে দেখব।”

সন্তু চলে গেল নদীর ধারে। হাঁটু গেড়ে বসে এক আঁজলা জল তুলে দেখল, বেশ টলটলে আর স্বচ্ছ। নদীতে স্রোত আছে। সেই জল সন্তু মুখে দিল, তার বিস্বাদ লাগল না। সে পেট ভরে জল খেয়ে নিল।

এবার জোজোও ছুটে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জন্তুদের মতনই চোঁ-চোঁ করে জল টানতে লাগল ঠোঁট দিয়ে। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। প্রায় দু-তিন মিনিট পরে সে মুখ তুলে বলল, “আঃ, বাঁচলুম ! সাধে কী বলে জলের

আর-এক নাম জীবন ! জল খেতে-খেতে আমি আর-একটা কী ভাবলুম বল তো সন্তু ?“

“কী ?”

“তোর খিদে পাচ্ছে ?”

“সেরকম কিছু টের পাচ্ছি না। অজ্ঞান অবস্থায় বোধহয় খিদে থাকে না।”

“কিন্তু আমরা যদি তিন-চারদিন না খেয়ে থাকতুম, তা হলে খালি পেটে এতটা জল খেলেই গা গুলিয়ে উঠত, পেট ব্যথা করত। আমরা সকালে বেশ হেভি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলুম, পুরি-তরকারি, তারপর শুধু দুপুর আর রাত্তিরটা খাওয়া হয়নি। খুব সম্ভব একদিনের বেশি কাটেনি।”

“এটা বোধহয় তুই ঠিকই ধরেছিস !”

“নদীর ওপারে দ্যাখ, এক জায়গায় মিটমিট করে আলো জ্বলছে, একটা ঘর রয়েছে।”

নদীটা বেশি চওড়া নয়। প্রায় একটা সরু খালের মতন। কতটা গভীর তা অবশ্য বলা যায় না। জলে বেশ স্রোত আছে, হেঁটে পার হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সন্তু এক্ষুনি এটা সাঁতরে চলে যেতে পারে, কিন্তু জোজোর কী হবে ? জোজো সাঁতার জানে না ! কতবার জোজোকে সন্তু বলেছে সাঁতারটা শিখে নিতে।

সন্তু চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, “আমার যতদূর মনে হচ্ছে, নদীর ওপার দিয়েই আমাদের যেতে হবে। হসপেট থেকে হামপি আসবার পথে আমরা কোনও পাহাড় দেখিনি। হামপিতে ঢোকার আগে আমি হামপির পেছন দিকে কয়েকটা টিলা লক্ষ করেছিলুম। সেইরকম একটা টিলাতেই আমাদের ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল বোধহয় অজ্ঞান অবস্থাতেই আমাদের শেয়াল-টেয়াল ছিঁড়ে খাবে।”

জোজো বলল, “অত সহজ নয় ! আমাদের মেরে ফেলা অত সহজ নয় ! অ্যাই সন্তু, তুই তখন বললি কেন রে, তুই এবারে আমাকে জোর করে এনেছিস ? আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি ! এসেছি তো কী হয়েছে ? এ তো অতি সামান্য বিপদ ! জানিস, একবার আফ্রিকায় আমি আর আমার এক মামা কী অবস্থায় পড়েছিলুম ? নরখাদকেরা আমাদের দু'জনকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে...”

সন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “বুঝেছি, বুঝেছি, তুই এখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিস। কিন্তু এখন এই নদীটা পার হওয়া যাবে কী করে ?”

জোজো বলল, “নো প্রবলেম। নদীটার ধার দিয়ে-দিয়ে হাঁটি, কোনও একটা জায়গায় নদীটা শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই !”

সন্তু বলল, “নদীর শেষ খুঁজতে গিয়ে যদি সমুদ্রে পৌঁছে যাই ? শোন, তোকে আমি পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি। আমার লাইফ সেভিংসের ট্রেনিং

আছে। কিন্তু তার আগে তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুই জলে নেমে ভয় পাবি না, ভয় পেয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরবি না ! তা হলে কিন্তু তোকে আমি ফেলে দেব !"

জোজো বলল, "ঠিক আছে। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। আমি আলতো করে তোর পিঠটা ছুঁয়ে থাকলেই ভেসে থাকতে পারব। আমি প্রায় থ্রি-ফোর্থ সাঁতার জানি। একবার ক্যাস্পিয়ান সাগরে..."

সন্তু আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "থ্রি-ফোর্থ সাঁতার বলে কিছু হয় না। হয় কেউ সাঁতার জানে, অথবা জানে না। এখন বেশি কথা বলার সময় নেই। জুতো খুলে ফ্যাল !"

জোজো বলল, "ওটা কী রে, সন্তু ?"

ওদের বাঁ পাশে নদীর জলে একটা ঝুড়ির মতন কী যেন ভাসছে। সাধারণ ঝুড়ির পাঁচ-ছ' গুণ বড়। সন্তু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "ইউরেকা ! আর জামা-প্যান্ট ভেজাতে হল না। এটা তো একটা ডিঙি নৌকো। আমি কোনও গল্পের বইতে পড়েছিলুম, সাউথ ইন্ডিয়ার কোনও-কোনও নদীতে নৌকোগুলো হয় গোল-গোল। বুঝতে পেরেছি, এটা একটা খেয়াঘাট, তাই নৌকোটা এখানে বাঁধা রয়েছে।"

সন্তু আগে নৌকোটাতে উঠল, তারপর জোজোর হাত ধরে টেনে নিল। দেখলে মনে হয় গোল ঝুড়িটা মানুষের ভারে ডুবে যাবে, কিন্তু ওঠার পর বোঝা গেল, সেটা বেশ মজবুত। কিন্তু বৈঠা হাতে নিয়ে চালাতে গিয়ে সন্তু মুশকিলে পড়ে গেল। বালিগঞ্জ লেকে সন্তু অনেকবার রোয়িং করেছে, কিন্তু এরকম গোল নৌকো তো কখনও চালায়নি। এটা খালি ঘুরে-ঘুরে যায়, সামনের দিকে এগোয় না।

সন্তু বলল, "এটা চালাবার আলাদা টেকনিক আছে, ঠিক ম্যানেজ করতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। তুই নৌকোটাতে বোস, আমি জলে নেমে এটাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।"

জোজো শিউরে উঠে বলল, "তুই জলে নামবি ? যদি এই নদীতে কুমির থাকে ?"

সন্তু বিরক্ত হয়ে বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছিস ? এইটুকু ছোট নদীতে কুমির থাকবে ? একটু আগে আমরা এটা সাঁতরে পার হবার কথা ভাবছিলুম না ?"

জোজো বলল, "তা ঠিক। কিন্তু নৌকো দেখলে আর জলে নামার কথা মনে থাকে না !"

সন্তু জামা আর জুতো খুলে নেমে গেল নদীতে। নদীটা খুব অগভীর নয়, স্রোতের টানও আছে বেশ। সন্তু সাঁতার দিতে-দিতে নৌকোটাকে ঠেলতে লাগল। কাজটা খুব সহজ না হলেও খানিকবাদে ওরা পৌঁছে গেল অন্য

পারে।

নদীর এদিকের ঘাটেও একটা এইরকম গোল নৌকো বাঁধা। বোঝা গেল, এটা ফেরিঘাট, দু'দিক থেকে লোকেরা এসে নিজেরাই নৌকো চালিয়ে পারাপার করে।

এপারে একটা ছোট্ট মন্দির, তার মধ্যে আলো রয়েছে। একটা বড় মাটির প্রদীপে মোটা করে পাকানো সলতে জ্বলছে। ভেতরের ঠাকুর ফুল-পাতা দিয়ে একেবারে ঢাকা, দেখাই যায় না। কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই।

ওরা মন্দিরের পেছনটায় একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল। সেখানে একটা বিছানা পাতা রয়েছে, কিন্তু কোনও লোক শুয়ে নেই। বোধহয় এটা মন্দিরের পুরুতঠাকুরের ঘর, কিন্তু আজ রাত্তিরে তিনি অন্য কোথাও গেছেন। দরজাটা খোলা। একটা হ্যারিকেন টিমটিম করছে।

সেই ঘরের মধ্যে গোটা-তিনেক সাইকেল। শিকল দিয়ে বাঁধা। সন্তু সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা সাইকেল পেলে অনেক সুবিধে হয়।

সন্তু বলল, "এখানে কোনও লোক থাকলে তাকে বলে-কয়ে একটা সাইকেল ধার নিতাম!"

জোজো বলল, "না বলেও ধার নেওয়া যায়। পরে ফেরত দিলেই হবে।"

"ঘরের দরজা খুলে রেখে গেছে, এদেশে কি চুরি-টুরি হয় না?"

"আমরা একটা সাইকেল নিলে উনি ঠিক বুঝতে পারবেন, আমরা চুরি করিনি। বিপদে পড়ে ধার নিয়েছি। কাকাবাবুদের খুঁজে বার করা দারুণ জরুরি এখন আমাদের কাছে, তাই না?"

"শিকল দিয়ে বাঁধা, তাতে তালা লাগানো। খুলব কী করে?"

"ও তো একটা পুঁচকে তালা, ভাঙতে পারবি না, সন্তু?"

"আমি তালা ভাঙা কখনও শিখিনি। তুই পারবি? একটা হাতুড়ি-টাতুড়ি পেলেও হত।"

জোজো এগিয়ে গিয়ে বিছানা থেকে বালিশটা তুলে ফেলল। তার তলায় একগোছা চাবি। একগাল হেসে জোজো বলল, "দেখলি, বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই এই তালারও চাবি আছে।"

সন্তু একটা-একটা করে চাবি লাগিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। জোজো উঁকি দিল খাটিয়ার নীচে। সেখানে অনেক হাঁড়ি-বাটি রাখা। একটা-একটা করে টেনে সে দেখল, কোনওটার মধ্য চাল, কোনওটার মধ্যে ডাল। একটা হাঁড়িতে বাতাসা। জোজো একমুঠো বাতাসা মুখে পুরে বলল, "সন্তু, খেয়ে নে, আগে খেয়ে নে! বেশ ভাল খেতে, কর্পূর দেওয়া আছে, চমৎকার গন্ধ!"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, "এই, ওগুলো খাচ্ছিস? ওগুলো পুজোর বাতাসা

মনে হচ্ছে !”

জোজো বলল, “তাতে কী হয়েছে ? পুজো দেবার পর সেই প্রসাদ তো মানুষেই খায়। আমাদের যা খিদে পেয়েছে, একটু কিছু খেয়ে গায়ের জোর করে নেওয়া দরকার। ওই দ্যাখ, জলের কলসিও আছে।”

তালাটা খোলা হয়ে গেছে। সন্তুও লোভ সামলাতে পারল না। সেও কুড়ি-পঁচিশটা বাতাসা খেয়ে নিল। জোজো কলসি থেকে জল গড়াতে গড়াতে বলল, “পুরুতমশাই লেখাপড়াও জানে। এই দ্যাখ, পাশের টুলে বই-খাতা রয়েছে। একটা কলমও আছে। আমরা একটা চিঠি লিখে রেখে গেলে উনি নিশ্চয়ই ঠিক বুঝবেন !”

সন্তু বলল, “এটা ভাল আইডিয়া, লিখে দে একটা চিঠি। ইংরিজিতে লিখিস।”

জোজো খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “পুরুতমশাই-এর ইংরিজি কী রে ?”

সন্তু একটা সাইকেল বার করতে করতে বলল, “প্রিস্ট ! তাড়াতাড়ি কর। দু-তিন লাইনে সেরে দে।”

সন্তু সাইকেলটা নিয়ে এল রাস্তায়। এতক্ষণ বাদে তার মনটা একটু হাল্কা হয়েছে। সাইকেলে তাড়াতাড়ি হামপি পৌঁছনো যাবে। একবার রাস্তা ভুল হলেও অন্য রাস্তায় ফিরতে অসুবিধে হবে না।

জোজো বেরিয়ে এসে বলল, “বিছানার ওপর চাপা দিয়ে এসেছি, ফিরলেই চোখে পড়বে। আমি কিছু এক্সট্রা বাতাসাও পকেটে নিয়ে এসেছি। পরে কাজে লাগতে পারে।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “তুই সাইকেল চালাতে জানিস ?”

জোজো অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, “সাইকেল ? আমি মোটরবাইক চালাতে জানি খুব ভাল। কিন্তু সাইকেলে প্র্যাকটিস নেই।”

সন্তু বলল, “বুঝেছি। পেছনে ক্যারিয়ার নেই, তুই সামনের রডের ওপর বোস।”

সাইকেলে আলো নেই। অল্প-অল্প জ্যোৎস্নায় রাস্তাটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। খানিকটা দূর এগোতেই ওরা দূরে একজন লোককে দেখতে পেল, এদিকেই আসছে।

সন্তু বলল, “ওই বোধহয় পুরুতমশাই !”

জোজো বলল, “কোনও কথা বলার দরকার নেই। জোরে চালিয়ে চলে যা ! ফিরে গিয়ে তো চিঠিটা পড়বেই। অবশ্য যদি ইংরিজি পড়তে পারে। আমি গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছি।”

সন্তু লোকটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটি কোনও সন্দেহ করেনি।

আরও খানিকটা দূর যাবার পর বোঝা গেল, ওরা ভুল পথে আসেনি।

সামনে এক জায়গায় বেশ কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। ওই জায়গাটা হামপি না হলেও লোকজন আছে নিশ্চয়ই। তাদের খোঁজখবর নেওয়া যাবে।

সেই আলোর দিকে লক্ষ রেখে আরও কিছুটা আসার পর দেখা গেল একটা মন্দিরের চূড়া। একটা কিসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, এখন রাত দেড়টা-দুটো অন্তত হবেই।

সন্তু বলল, "মন্দিরের কাছে অত আলো, লোকজন জেগে আছে মনে হচ্ছে, তা হলে ওটাই নিশ্চয়ই সেই শুটিং-এর জায়গা।"

জোজো বলল, "একেবারে সাইকেল নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ওখানে পৌঁছনো কি ঠিক হবে? মোহন সিং আমাদের যদি আবার দেখে ফেলে?"

সন্তু বলল, "ঠিক বলেছিস। শেষ পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না!"

আলোর অনেকটা কাছে এসে ওরা সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। মন্দিরের দিক থেকে বেশ কিছু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে, আরও একটা অন্যরকম আওয়াজ। কিছু একটা চলছে ওখানে।

সন্তু সাইকেলটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বলল, "আমরা দু'জন একদম পাশাপাশি না হেঁটে একটু দূরে-দূরে থাকব, বুঝলি? একজন ধরা পড়লে আর-একজন তবু পালাতে পারব। যে-করেই হোক, পুলিশে খবর দিতেই হবে। মোহন সিং-এর এতবড় দলের বিরুদ্ধে তো আমরা দু'জনে কিছু করতে পারব না!"

জোজো একটু অভিমানের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আমি ধরা পড়লেও তুই পালিয়ে যাবি?"

সন্তু বলল, "দু'জনেই চেষ্টা করব ধরা না পড়তে! এখানকার অবস্থাটা একটু দেখে নিয়ে হসপেট থানায় আমাদের পৌঁছতেই হবে।"

মন্দিরের এই পাশটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের বাইরে রাইফেল নিয়ে বসে আছে চার-পাঁচজন পুলিশ। তারা ঘুমে ঢুলছে।

জোজো ফিসফিস করে বলল, "ওই তো পুলিশ। ওদের কাছে গিয়ে বললেই তো হয়, মোহন সিং আমাদের বিষ খাইয়েছিল।"

সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, "উহুঁঃ, ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা সাধারণ কনস্টেবল, মোহন সিং ওদের ভাড়া করে এনেছে। ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে ডায়েরি করাতে হবে যে, কাকাবাবু, রিঙ্কুদি, রঞ্জনদাদাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ওরা অ্যাকশান নিতে বাধ্য।"

"পুলিশগুলোকে এড়িয়ে আমরা ভেতরে ঢুকব কী করে?"

"পাঁচিলের পাশ দিয়ে-দিয়ে চল। অন্য কোনও ঢোকার জায়গা আছে কি না খুঁজতে হবে। ওরা আমাদের দেখলে মোহন সিং-এর হাতে ধরিয়ে দেবে।"

দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষে খানিকটা যেতেই দেখা গেল, এক জায়গায় দেওয়ালটা একেবারে ভাঙা। সেখানে কাঁটাতার দেওয়া রয়েছে। কিন্তু কোনও পাহারাদার নেই।

সন্তু একটা কাঁটাতার তুলে ধরল, জোজো সেই ফাঁক দিয়ে গলে গেল। তারপর সন্তুও ঢুকে পড়ল।

মন্দিরের সামনের চাতালে একটা বড় ফ্লাড লাইট জ্বলছে। একদল লোক খন্তা-শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। লোকগুলোর চেহারা মোটেই কুলিদের মতন নয়, প্যান্ট-শার্ট পরা। এর মধ্যেই একটা কুয়োর মতন গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে সেখানে।

জোজো বলল, "এটাই তা হলে বিঠলস্বামীর মন্দির। এর সামনে সিনেমার জন্য সেট তৈরি হচ্ছে বলেছিল না?"

সন্তু অনেকটা এগিয়ে লোকগুলোকে ভাল করে দেখল। বিরজু সিং ছাড়া চেনা আর কেউ নেই।

বেশ খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে আর-একটা আলো দেখা গেল। সেটা ইলেকট্রিকের আলো নয়, মশাল। সন্তু আর জোজো এগিয়ে গেল সেদিকে। সেই জায়গাটা যেন তাদের চুম্বকের মতন টানল।

মাঠের মধ্যে সিংহাসনের মতন একটা চেয়ার পাতা। তার ওপরে জরির পোশাক পরে রাজা সেজে বসে আছে এক থুত্থুরে বুড়ো। তার মুখ-ভর্তি পাতলা-পাতলা সাদা দাড়ি, তার ভুরু পর্যন্ত পাকা। সেই বৃদ্ধ রাজা কিন্তু দিব্যি আরাম করে একটা সিগারেট টানছে।

তার পায়ের কাছে পড়ে আছে একজন মানুষ। নীল রঙের নাইলনের দড়ি দিয়ে তার সারা শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। একপাশে পড়ে আছে একজোড়া ক্রাচ। কাকাবাবু!

॥ ৫ ॥

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামছে। ক্ষীণ একটা আলোর রেখা এসে পড়ল। পায়ের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, একজন নয়, অনেকে আসছে। রিঙ্কু একেবারে কোণের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘরটা যে মাটির নীচে তা রিঙ্কু আগেই বুঝতে পেরেছিল। মোটা পাথরের দেওয়াল, কোনওদিক দিয়েই আলো আসে না। দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে, তার ওপর জমে আছে পুরু শ্যাওলা।

রাজধানী বিজয়নগরে এরকম গুপ্তকক্ষ থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। এটা কী ছিল বন্দিশালা? সিঁড়িটাও রিঙ্কু আগেই খুঁজে পেয়েছিল, ওপর পর্যন্ত উঠে দেখে

এসেছে, একটা শক্ত দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। খুব লম্বা সিঁড়ি, প্রায় তিনতলা পর্যন্ত উঁচু মনে হয়।

একটা বিচ্ছিরি শরবত খেয়ে এই কাণ্ড হয়ে গেল!

রিঙ্কু খেতে চায়নি, তাকে জোর করে খানিকটা খাওয়ানো হয়েছে। চোখের সামনে সে দেখল, জোজো আর সন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রঞ্জন চিৎকার করে বলেছিল, "এদের কী হল? বিষ খাইয়েছে? আমায় জব্দ করতে পারবে না, আমি সব হজম করে ফেলব!" হাতের গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রঞ্জন ছুটে গিয়ে তুলে নিয়েছিল একটা তলোয়ার। সন্তু আর জোজোর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, "খবর্দার, এদের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারবে না!"

বিরজু সিং বিকটভাবে হেসে উঠেছিল হা-হা করে!

রঞ্জন তলোয়ারটা হাতে ধরে রাখতে পারল না। প্রথমে সে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, তারপর তার কপালটা ঠুকে গেল মেঝেতে। রঞ্জনও জ্ঞান হারিয়েছে।

রিঙ্কু বুঝতে পেরেছিল, রঞ্জনদের সাহায্য করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তারও ঘুম-ঘুম পাচ্ছে, আঙুলের ডগাগুলো অবশ হয়ে আসছে। শরবতের মধ্যে ওরা কী মিশিয়েছে, বিষ না কড়া ধরনের ঘুমের ওষুধ?

রিঙ্কু তখনও চোখ চেয়ে আছে দেখে বিরজু সিং বলেছিল, "চিল্লামিল্লি কোরো না। কোনও লাভ হবে না!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা আমাদের মেরে ফেলবে? কেন? আমরা তোমাদের কী ক্ষতি করেছি?"

এর উত্তরে বিরজু সিং আবার হেসেছিল।

দুটি মেয়ে এরপর এসে রিঙ্কুকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, তখনও রিঙ্কুর জ্ঞান আছে, কিন্তু বাধা দেবার শক্তি নেই। তারা এক জায়গায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়েছে, তাও রিঙ্কু টের পেয়েছে। তারপর একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার জায়গায় তাকে রেখে ওরা চলে গেল, একটু পরে রিঙ্কু ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে তা জানে না। এখন দিন না রাত তাও বোঝার উপায় নেই।

আবার ওরা আসছে।

রিঙ্কু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ির মুখটা থেকে অনেকটা দূরে। প্রথমে দুটো টর্চ হাতে নিয়ে নামল দুজন, পেছনে আরও কেউ আসছে। ওদের টর্চের আলো ঘুরে-ঘুরে এসে রিঙ্কুর মুখের ওপর পড়ল। রিঙ্কু ওদের দেখতে পাচ্ছে না।

এরপরে হাতে মোমবাতি নিয়ে নেমে এল আর-একটি মেয়ে, তার অন্য হাতে একটা খাবারের থালা। এবারে দেখা গেল, টর্চ হাতে দু'জনের মধ্যে একজন মেয়ে, একজন পুরুষ।

টর্চ হাতে মেয়েটি রিঙ্কুর দিকে এগিয়ে এসে তাকে ভাল করে দেখল। খুব

যেন অবাক হয়ে গেছে। রিঙ্কুর চোখের ওপর টর্চ ফেলে সে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ ! এত সিমিলিয়ারিটি ! তোমার কোনও যমজ বোন আছে ?"

চোখ বুজে ফেলে রিঙ্কু বলল, "না !"

পুরুষটি জিজ্ঞেস করল, "কাম চলে গা ?"

মেয়েটি বলল, "বহুত আচ্ছা চলে গা ! না বলে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে, এ অন্য মেয়ে।"

পুরুষটি বলল, "এ কি সব ঠিকঠাক পারবে ?"

মেয়েটি বলল, "না পারার কী আছে ? কাঁদতে তো পারবে। সব মেয়েই কাঁদতে জানে। বাকিটা আমি শিখিয়ে দেব !"

পুরুষটি বলল, "তব তো ঠিক হ্যায়। জানকী, ইনকো খানা খিলাও ! কাপড়া বদল কর দেও। যাস্তি টাইম নেহি হ্যায়।"

মেয়েটি রিঙ্কুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "ডরো মত। সব ঠিক হয়ে যাবে !"

টর্চ-হাতে মেয়েটি ও পুরুষটি ওপরে উঠে গেল, রইল শুধু মোম-হাতে মেয়েটি। সে প্রায় রিঙ্কুরই সমবয়েসী। হাতের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে নরম গলায় ডাকল, "আও বহিন, খানা খা লেও !"

রিঙ্কু সাড়া দিল না। সে মোটেই ওই খাবার মুখে তুলবে না। একবার ওদের শরবত খেয়েই যা অবস্থা হয়েছে, তারপর আর কেউ ওদের খাবার খেতে যাবে !

মেয়েটি কাছে এসে রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "খাবার খেয়ে নাও, তোমার খিদে পায়নি ?"

রিঙ্কু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "না, আমি খাব না !"

মেয়েটি হেসে বলল, "না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে ? দুর্বল হয়ে যাবে যে। সারা রাত জেগে কাজ করতে হবে, তা কি পারবে ?"

মেয়েটির গলায় খানিকটা সহানুভূতির সুর পেয়ে রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কাজ মানে ? আমায় কী কাজ করতে হবে ?"

মেয়েটি হাসতে হাসতে দুলে দুলে বলল, "তুমি ফিল্‌মে চান্স পেয়ে গেছ। ফিল্মে পার্ট করবে। এক ঘন্টা পরেই শুটিং !"

রিঙ্কু চোখ-মুখ ঘুরিয়ে বলল, "ফিল্মে পার্ট করব ? বললেই হল ? মোটেই আমি পার্ট করব না। সেইজন্য ওরা এখানে আমাকে আটকে রেখেছে ?"

মেয়েটি আবার রিঙ্কুর হাত ধরে বলল, "এসো বহিন, খেতে বসে যাও। খেতে-খেতে কথা হবে। আমার নাম জানকী। তুমি আমাকে জানকী বলে ডেকো।"

রিঙ্কু বলল, "বলছি তো, ওই খাবার আমি খাব না। যদি ওতে বিষ মেশানো থাকে ?"

জানকী অবাক হয়ে বলল, "বিষ ! কেন, খাবারে বিষ থাকবে কেন ? ঠিক

আছে, এর থেকে একটা আমি মুখে দিচ্ছি, তা হলে তোমার বিশ্বাস হবে তো !"

প্লেটটাতে একগোছা লুচি আর আলুর দম রয়েছে। মেয়েটি একখানা লুচি নিয়ে, একটু আলুর দম মুখে পুরল। রিঙ্কু আগে দেখে নিল, সে সবটা খায় কি না ! খাবার দেখে তার খিদে পেয়ে গেছে ঠিকই। কতক্ষণ সে খায়নি কে জানে।

এবার সে খেতে শুরু করে দিল।

জানকী বলল, "তোমাকে দেখতে ঠিক সুজাতাকুমারীর মতন। সেইরকম মুখ, সেইরকম হাইট, সেইরকম ফিগার। সুজাতাকুমারীর এই ফিল্মে বড় পার্ট আছে, হিরোইনের পরেই সে। কিন্তু তার অসুখ হয়ে গেছে। শুটিং তো বন্ধ রাখা যায় না। তোমাকে দিয়ে কাজ চলে যাবে !"

রিঙ্কু বলল, "আমি রাজি আছি কি নেই তা না জিজ্ঞেস করেই আমাকে দিয়ে পার্ট করাবে ? বললেই হল ! আমার সঙ্গে অন্য যারা ছিল, তারা কোথায় ?"

জানকী বলল, "তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?"

রিঙ্কু বলল, "আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তাদের ওরা অজ্ঞান করে রেখেছে। তা ছাড়া কাকাবাবু ছিলেন, তিনি ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন।"

জানকী রীতিমত অবাক হয়ে বলল, "তাদের তো আমি দেখিনি, বহিন। আমি অন্যদের কথা কিছু জানি না।"

রিঙ্কু ধমক দিয়ে বলল, "জানো না মানে ? তুমিও তো এদেরই দলের !"

ধমক খেয়ে কাচুমাচুভাবে জানকী বলল, "বিশ্বাস করো বহিন, আমি কিছুই জানি না। আমার কাজ ফিমেল আর্টিস্টদের মেক-আপ করা। আমি তোমাকে সাজিয়ে দিতে এসেছি। আমাকে কস্তুরীজি বললেন, "এই মেয়েটার দিমাগের ঠিক নেই। একটু পাগল আছে। তুই ওকে সাজিয়ে দিবি ভাল করে, তারপর ওর কাছে বসে থাকবি !"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "কস্তুরী কে ?"

জানকী বলল, "কস্তুরীজিকে চেনো না ? তিনিই তো এই ফিল্মের হিরোইন। ওই যে একটু আগে টর্চ হাতে এসেছিলেন !"

রিঙ্কু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ও হিরোইন না ভিলেন ? ডাকাত দলের সর্দারনির মতন চেহারা। ও আমাকে পাগল বলে, এত সাহস !"

জানকী বলল, "না, না তুমি পাগল কেন হবে ! ও ঠাট্টা করে বলেছে। তুমি ওর জন্য ফিল্মে চান্স পেয়ে গেলে। যদি ভাল পার্ট করো, তা হলে তোমার কত নাম হবে। অনেক টাকা হবে। তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে নাও, তারপর তোমাকে সাজিয়ে দিতে হবে। এই দ্যাখো, কস্তুরীজি তোমার জন্য কত ভাল শাড়ি রেখে গেছেন।"

এক পাশে একটা পুঁটলি পড়ে আছে, রিঙ্কু আগে দ্যাখেনি।

জানকী সেটা খুলল। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম জরি বসানো একটা

ঝকঝকে শাড়ি, ওড়না, একজোড়া ভেলভেটের চটি এইসব। আর-একটা ছোট বাক্সে ক্রিম, পাউডার, লিপস্টিক, কাজল ও কয়েকটা তুলি।

জানকী বলল, "হিস্টোরিক্যাল বই তো, সেইজন্য তোমাকে বেশি সাজগোজ করতে হবে।"

খাওয়া শেষ করে রিঙ্কু বলল, "জল ? জল নেই ?"

জানকী বলল, "ওঃ হো, পানি আনা হয়নি। আচ্ছা, একটু বাদেই নিয়ে আসছি। তার আগে দ্যাখো তো, এই কাঞ্জিভরম শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

রিঙ্কু নিজের শাড়ির আঁচলেই হাতটা মুছে নিল। তারপর ওড়নাটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখার ভান করে হঠাৎ সেটা জানকীর গলায় দিয়ে টেনেই একটা ফাঁস বেঁধে দিল।

ভয়ে জানকীর চোখ কপালে উঠে গেল, সে আঁ-আঁ করতে লাগল।

রিঙ্কু ফাঁসটা আর-একটু টেনে বলল, "চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলেই একদম দম বন্ধ করে মেরে ফেলব ! তুমি এই ডাকাতদের দলে থাকো, আবার বলছ, তুমি কিছু জানো না ? আমার সামনে ভালমানুষ সাজছ ? জোর করে কাউকে বন্দী করে রেখে, তারপর তাকে দিয়ে সিনেমার পার্ট করানো যায় ? চালাকি আমার সঙ্গে ?"

শাড়িখানার একদিক দিয়ে সে আগে জানকীর হাত দু'খানা পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধল শক্ত করে, তারপর অন্য দিক দিয়ে বাঁধল পা। এবার গলা থেকে ওড়নার ফাঁসটা খুলে নিয়ে সে জানকীর মুখ বেঁধে দিল। জানকীর আর কথা বলার কিংবা নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না।

জানকী মেয়েটা বোধহয় সত্যিই নিরীহ, সে এমনই ভয় পেয়ে গেছে যে, খুব একটা বাধা দেবার চেষ্টাও করেনি।

রিঙ্কু গিঁটগুলো পরীক্ষা করে দেখল, জানকী নিজে থেকে বাঁধন খুলতে পারবে না, চ্যাঁচাতেও পারবে না।

এবারে রিঙ্কু একটু নরম হয়ে বলল, "তুমি অবশ্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিছু করোনি। কিন্তু তুমিই ভেবে দ্যাখো, আমার সঙ্গে যে আরও চারজন ছিল, তারা কোথায় গেছে আমি জানি না। তিনজনকে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি, এরা বিষ খাইয়েছে। এই অবস্থায় আমি এদের সিনেমায় পার্ট করতে পারি ? আগে তাদের খুঁজে দেখতে হবে।"

জানকীর চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে এল !

রিঙ্কু বলল, "কাঁদলে কী হবে, তবু তোমাকে আমি ছাড়ছি না। আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দ্যাখো, আমাকে তো পালাতেই হবে। এইরকম অবস্থায় খানিকক্ষণ থাকলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। কেউ-না-কেউ খানিক বাদে খুঁজতে এসে তোমাকে খুলে দেবে। কিংবা কাকাবাবুদের আমি যদি পেয়ে যাই,

তা হলে আমিই এসে তোমাকে ছেড়ে দেব, কেমন ?”

আঁচল দিয়ে জানকীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রিঙ্কু বলল, “লক্ষ্মী মেয়ের মতন বসে থাকো, আমি চলি !”

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে এল রিঙ্কু। কিন্তু ওপরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ !

সেই কস্তুরী জানকীকে শুদ্ধু এখানে বন্ধ করে রেখে গেছে ? তা হলে উপায় !

রিঙ্কুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। জানকী জল আনবে বলেছিল। তা হলে কি বাইরে কোনও পাহারাদার আছে ? রিঙ্কু দরজায় তিনটে টোকা দিল। হয়তো এদের কিছু সঙ্কেত আছে, সেটা কী কে জানে। সে আরও কয়েকবার টকটক করল দরজায়।

এবার দরজাটা খুলে গেল। একজন বন্দুকধারী লোক উঁকি মেরে বলল, “কেয়া হুয়া ?”

রিঙ্কু মুখটা একপাশে ফিরিয়ে বলল, “উ লেড়কি পানি মাঙ্‌তা। থোড়া পানি লে আইয়ে !”

পাহারাদারটি অবহেলার সঙ্গে বলল, “আমি কোথায় পানি পাব ? আমি যাব না। আমাকে এখানে থাকতে বলেছে।”

বাইরে প্রায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রিঙ্কু চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে আবার বলল, “তা হলে আপনি দরজা বন্ধ করে দিন। আমি জল নিয়ে আসছি। দেখবেন, যেন মেয়েটা বেরিয়ে না আসে। তা হলে কস্তুরীজি খুব রাগ করবেন !”

আঁচলটা মাথায় দিয়েছে রিঙ্কু, তা দিয়ে মুখের একপাশটা ঢেকে সে বেরিয়ে পড়ল। পাহারাদারটি কোনও সন্দেহ করল না। তরতর করে হেঁটে রিঙ্কু মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেতে-খেতে রিঙ্কু দৌড়ল। সে কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না। তার শুধু একটাই চিন্তা, যে-জায়গাটায় সে বন্দী ছিল, সেখান থেকে যতদূর সম্ভব দূরে চলে যেতে হবে। সে জল নিয়ে ফিরে না গেলেই খটকা লাগবে পাহারাদারটির মনে।

খানিকটা দূর যাবার পর রিঙ্কু দেখতে পেল মশালের আলো। সেই আলো ঘিরে ছায়ামূর্তির মতন জনাচারেক লোক বসে আছে। রিঙ্কু এবার খুব সাবধানে পা টিপেটিপে এগোতে লাগল। ওই লোকগুলো কারা আগে দেখতে হবে !

একটা তাঁবুর দড়িতে পা লেগে রিঙ্কু হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। তাঁবুটার মধ্যেও একটা লণ্ঠন জ্বলছে। রিঙ্কু তাঁবুটার পেছন দিকে চলে গিয়ে একটা ফাঁক দিয়ে চোখ লাগিয়ে দেখল। তাঁবুটা খালি। যতদূর মনে হচ্ছে, এই তাঁবুর মধ্যেই তাদের শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল।

রঞ্জন-সন্তু-জোজোরা এখানে এখন নেই।

তাঁবুটা পার হয়ে আরও কিছুটা যাবার পর রিঙ্কু দেখল, মশালের আলো ঘিরে যারা বসে আছে, তারা পুলিশ। গোল হয়ে বসে তারা কিছু খাচ্ছে।

এবার রিঙ্কুর সব দুশ্চিন্তা চলে গেল। পুলিশদের যখন পাওয়া গেছে, তখন আর কোনও ভয় নেই। পুলিশের সাহায্য না পেলে সে একা-একা কী করে অন্য সবাইকে খুঁজে বার করবে ?

রিঙ্কু একেবারে কাছে গিয়ে বলল, "নমস্তে ! আমি খুব বিপদে পড়েছি। আপনাদের সাহায্য চাই !"

পুলিশরা খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল।

রিঙ্কু বলল, "এরা সব ডাকাত ! এরা আমার সঙ্গের অন্য লোকজনদের বন্দী করে রেখেছে !"

একজন পুলিশ বলল, "ডাকু ? ইয়ে লোগ তো ফিল্ম ইউনিট হ্যায় !"

আর-একজন পুলিশ বলল, "এদের ফিল্মের গল্পটা বোধহয় ডাকাতদের নিয়ে। অনেক লড়াই আর গোলাগুলি !"

অন্য একজন পুলিশ বলল, "না, না, হিস্টোরিক্যাল। বিজয়নগরকা কাহানী !"

রিঙ্কু ব্যাকুলভাবে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না ? এরা ফিল্মের লোকের ছদ্মবেশে ডাকাত। এরা আমাদের বিষ-মেশানো শরবত খেতে দিয়েছিল !"

একজন পুলিশ তার থালার পাশ থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বলল, "বিষ মেশানো শরবত ? এই তো আমরা শরবত খাচ্ছি। বিষ-টিষ তো কিছু নেই।"

সে ঢকঢক করে শেষ করে ফেলল গেলাসের বাকি শরবতটা !

পেছনে একটা ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ শোনা গেল। একজন পুলিশ চেঁচিয়ে বলল, "মোহন সিংজি ! ও সিংজি, ইধার আইয়ে !"

রিঙ্কু আরও এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমাকে শিগগিরই থানায় নিয়ে চলুন !"

একজন পুলিশ ধমক দিয়ে বলল, "আপ চুপসে ইধার খাড়া রহিয়ে।"

রিঙ্কু সামনে তাকিয়ে দেখল, বড় গেটটার বাইরে রয়েছে একটা গাড়ি। রঞ্জনের গাড়ি সে দেখেই চিনল। এই পথ দিয়েই ওরা ভেতরে এসেছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দটা খুব কাছে এসে গেছে।

রিঙ্কু খুব জোরে সামনের দিকে দৌড়তেই দু'জন পুলিশ লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে ফেলল। রিঙ্কু তাদের একজনের হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না।

ঘোড়া হাঁকিয়ে যে এল, সে মোহন সিং নয়, সে ফিল্মের নায়িকা কস্তুরী।

তার এক হাতে একটা চাবুক।

একজন পুলিশ গদগদ হয়ে বলল, "কস্তুরীদেবী ! আইয়ে আইয়ে ! দেখিয়ে ইয়ে লেড়কি কী সব উলটোপালটা বলছে !"

কস্তুরী অবাক হবার ভান করে বলল, "এ তো সেই পাগলিটা। আবার পালাবার চেষ্টা করছিল ! কী মুশকিল হয়েছে জানেন, একে পাগলির পার্ট দেওয়া হয়েছিল, তাতে এ সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছে।"

সবক'টি পুলিশ একসঙ্গে হেসে উঠল।

কস্তুরী বলল, "শিগগির এর হাত বাঁধুন, মুখ বাঁধুন। না হলে এ কামড়ে দিতে পারে !"

একজন পুলিশ বলল, "আমাকে তো কামড়ে দিয়েছে একবার। ওরে বাপরে, এমন পাগল !"

কস্তুরী শপাং করে চাবুকটা রিঙ্কুর মুখের সামনে ঘুরিয়ে বলল, "এই লেড়কি ! আবার যদি গণ্ডগোল করবি তো চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব !"

রিঙ্কু তবু তেজের সঙ্গে বলল, "তোমরা আমার সঙ্গের লোকজনদের আটকে রেখেছ কেন ? তারা কোথায় ? তুমি ভেবেছ, তোমাদের ফিল্মে আমি পার্ট করব ? মোটেই না ! কিছুতেই না !"

রিঙ্কু আর কিছু বলতে পারল না। একজন পুলিশ তার মুখ চেপে ধরে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে দিল, আর-একজন পুলিশ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল তার হাত।

কস্তুরী ঘোড়া থেকে নেমে সেই দড়ির অন্য দিকটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল রিঙ্কুকে।

॥ ৬ ॥

মোহন সিং কাকাবাবুকে নিয়ে গেল শর্মাজির সঙ্গে দেখা করাতে। অন্য একটা তাঁবুতে কাকাবাবুকে বসিয়ে বিনীতভাবে বলল, "আপনি একটু আরাম করুন রায়চৌধুরী সাব, আমি শর্মাজিকে খবর দিচ্ছি। সকাল থেকে ওঁর শরীরটা আবার খারাপ যাচ্ছে।"

কাকাবাবু শান্তগলায় বললেন, "অত বুড়ো মানুষকে তোমরা এখানে নিয়ে এলে কেন ? উনি কেমন আছেন, তা দেখতেই তো আমি এসেছি।"

মোহন সিং হেসে বলল, "কী করব, বলুন ! ওঁর যে সিনেমায় পার্ট করার শখ হয়েছে। উনি বিজয়নগরের হিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করে নতুন-নতুন খবর বার করেছেন। তাই নিয়ে গল্প লিখেছেন। সে গল্প নিয়ে সিনেমা হচ্ছে বলে উনি

নিজেই বুড়ো রাজার পার্ট করতে চান।"

কাকাবাবু বললেন, "বুড়ো বয়েসের শখ। কিন্তু এত ধকল কি ওঁর শরীরে সইবে?"

মোহন সিং এমনভাবে কথা বলছে যেন কাকাবাবুর সঙ্গে কোনওদিন তার ঝগড়া হয়নি। সে আবার বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা সঙ্গে একজন ভাল ডাক্তার রেখেছি। আর একদিনের শুটিং হলেই শর্মাজিকে আমরা বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আপনি বসুন, আমি আসছি।"

এই তাঁবুর মধ্যে রয়েছে একটা সিংহাসন, আরও দুটি মখমলের চেয়ার। কাকাবাবু সেগুলোতে না বসে বসলেন একটা নেমন্তন্ন-বাড়ির চেয়ারের মতন কাঠের চেয়ারে। ক্রাচ দুটো পাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

একটু পরেই খুব সাজগোজ করা একটি মেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বলল, "নমস্তে, আমার নাম কস্তুরী। আপনি ভাল আছেন রায়চৌধুরী সাহেব?"

কাকাবাবু মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। এই মেয়েটিই রাস্তার চায়ের দোকানে অসুস্থ ভগবতীপ্রসাদ শর্মার মাথাটা কোলে নিয়ে সেবা করছিল। এখন তার পোশাক অন্যরকম, হাতে একটা চাবুক।

কাকাবাবু বললেন, "নমস্কার। শর্মাজির আবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনলাম! আমি ওঁকে দেখতে এসেছি।"

কস্তুরী বলল, "এখন ঠিক হয়ে গেছেন। অত বুড়ো হলেও মনের জোর আছে খুব। সব কথা মনে থাকে।"

একটি লোক একটা লম্বা-গেলাসে শরবত এনে বলল, "লিজিয়ে সাব!"

কাকাবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, আমি এখন শরবত খাব না!"

"খেয়ে দেখুন, সাব। বহুত বঢ়িয়া শরবত! পেস্তা আর মালাই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু আগে চা খেয়েছি। এখন শরবত খেতে পারব না। এটা নিয়ে যাও।"

লোকটি বলল, "তা হলে চা নিয়ে আসব? চা আনছি এক্ষুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "চা-ও লাগবে না। চা খেয়ে এসেছি বললুম যে!"

কস্তুরী বলল, "এই জগ্গু, উনি খাবেন না বলছেন, তাও কেন জোর করছিস। কিছু লাগবে না, যা!"

লোকটি চলে যাবার পরেই মোহন সিং ধরে-ধরে নিয়ে এল বৃদ্ধ শর্মাজিকে। তাঁর হাতে একটা রুপো বাঁধানো ছড়ি, পরে আছেন একটা জরির চুমকি বসানো লম্বা আলখাল্লা। সাদা ধপধপে চুল ও দাড়ি আর ওইরকম আলখাল্লার জন্য তাঁকে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতন দেখাচ্ছে এখন। তিনি বুকে হাত দিয়ে কয়েকবার খুক-খুক কাশলেন।

কাকাবাবু তাঁকে দেখে সম্মানের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শর্মাজি, হেঁটে আসতে আপনার কষ্ট হয়েছে! আপনি যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেখানে আমাকে

ডেকে পাঠালেই তো পারতেন।”

শর্মাজি কাশি থামিয়ে বললেন, “না, না, ঠিক আছি। এখন ঠিক আছি। শুটিং করবার সময় হাঁটা-চলা করতে হবে না ? ঘোড়ার পিঠেও চড়তে হবে। আমি সব পারব। আপনি, রায়চৌধুরী। আপনি এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার সঙ্গের ছেলেমেয়েদের বিজয়নগর রুইনস একটু ঘুরিয়ে দেখাব। এখানকার ইতিহাস তো অনেকেই জানে না।”

শর্মাজি বললেন, “হ্যাঁ, দেখান কিন্তু তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেলে চলবে না। আপনি আমাদের শুটিং-এর সঙ্গে থাকুন, আমাদের অ্যাডভাইস দিন ! হিস্ট্রির কোথাও যদি ভুল হয়, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন !”

কাকাবাবু হেসে বললেন, “আপনি থাকতে আমি আর কী ভুল ধরাব ? আপনার চেয়ে বেশি কেউ জানে ?”

শর্মাজি বললেন, “আমি তো শুটিং-এ ব্যস্ত থাকব, আমি কি সব দিক দেখতে পারব ? আপনার মতামতে আমাদের অনেক উপকার হবে। মোহন সিং, তুমি রায়চৌধুরীর থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দাও !”

বৃদ্ধ শর্মাজি বসলেন সিংহাসনটিতে, আর ভেলভেটের চেয়ার দু' খানায় বসল মোহন সিং আর কস্তুরী।

কাকাবাবু বললেন, “আপনি তা হলে রাম রায়-এর পার্ট করছেন ? আপনাকে মানাবে ভাল।”

শর্মাজি বললেন, “হ্যাঁ, আমি সাজছি রাম রায়। মোহন সিং হবে আলি আদিল শাহ। আর কস্তুরী হচ্ছে রাজা সদাশিবের বউ, মহারানি পদ্মিনী। তার ছোট বোন ধারাদেবীর ভূমিকায় আছে সুজাতাকুমারী। আরে, তোমরা রায়চৌধুরীকে শরবত দিলে না ? কাউকে আনতে বলো !”

কাকাবাবু বললেন, “এনেছিল আমার জন্য। আমি এখন খাব না।”

শর্মাজি বললেন, “রায়চৌধুরী, আপনাকে কাল রাত্তিরে কানে-কানে কী বলেছিলাম, মনে আছে তো ? আপনি এবার সেই কথা এদের সামনে বলে দিতে পারেন।”

কাকাবাবু মোহন সিং আর কস্তুরীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। তারপর বললেন, “হ্যাঁ, এখন বলে দিলে ক্ষতি নেই। আপনি বলেছিলেন যে, আলি আদিল শাহ কথা বলার সময় একটু স্ট্যামার করবে। মানে একটু তোতলা। শুটিং-এর আগে সেটা মনে করিয়ে দিতে। কোনও ইতিহাস বইতে এ-কথা লেখা হয়নি আগে।”

শর্মাজি একটু চমকে উঠে বললেন, “এই কথা বলেছিলাম ? ও হ্যাঁ ! তখন আমার খুব জ্বর ছিল তো। কী বলতে কী বলেছি মনে নেই। আর কী

বলেছিলাম বলুন তো ?”

কাকাবাবু সামান্য চিন্তা করে বললেন, “আপনাকে ঠিক সময় সরবিট্রেট ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন।”

শর্মাজি বললেন, “হ্যাঁ, ঠিক ! আর ?”

কাকাবাবু বললেন, “রাম রাজার কাটা মুণ্ডু দেখাতে হবে। সেজন্য মাটির মুণ্ডু তৈরি করে সেখানে আলতা মাখিয়ে রক্ত বোঝাতে হবে।”

শর্মাজি এবার রেগে গিয়ে মোহন সিংকে বললেন, “এই লোকটা আমাদের সঙ্গে চালাকি করছে !”

কাকাবাবু এবার জোরে হেসে উঠলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললেন, “হ্যাঁ চালাকিই তো করছি। নয়তো কি বোকামি করব ? এই লোকটা তো শর্মাজির ডামি। আসল শর্মাজি কোথায় ?”

মোহন সিং সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কস্তুরী তার চাবুকটা উঁচিয়ে ধরল।

শর্মাজি তাদের দিকে হাত উঁচু করে থামতে ইঙ্গিত করে বললেন, “এ আপনি কী বলছেন, রায়চৌধুরী সাহেব ? আমার কোনও ডামি নেই। আমি তো যুদ্ধ করব না ! আপনি এদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই !”

কাকাবাবু বললেন, “কিসের ঠাট্টা ? এই মোহন সিং-এর দল সবাইকে এত বোকা ভাবে কেন ? একটা লোককে ভগবতীপ্রসাদ সাজিয়ে আনলেই আমি তা বিশ্বাস করব ? কাল রাত্তিরে আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। আজ তাঁকে চিনতে পারব না ? শর্মাজি আমাকে ‘আপনি’ বলে কথা বলেন না, ‘তুমি’ বলেন। আমাকে রায়চৌধুরী বলে ডাকেন না, রাজা বলেন। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। আমি এতক্ষণ বানিয়ে-বানিয়ে যেসব কথা বলে গেলুম, তা শুনেই এই লোকটা হ্যাঁ-হ্যাঁ করল ! আমি প্রথম এসে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আসল শর্মাজি কোথায়। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো !”

মোহন সিং কস্তুরীকে বলল, “আমি আগেই বলেছিলাম না, এই লোকটা ঝঞ্ঝাট পাকাবে। একে এখানে আসতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।”

কস্তুরী চাবুকটা তুলে শপাং-শপাং করে বলল, “এবার ওর উচিত শিক্ষা হবে !”

মোহন সিং বলল, “দেরি করে লাভ নেই, ওকে খতম করে দিই ?”

কাকাবাবুর হাতে ততক্ষণে তার রিভলভার চলে এসেছে। সেটা মোহন সিং-এর দিকে তুলে কড়া গলায় বললেন, “মোহন সিং, কাল তোমায় একটুর জন্য প্রাণে মারিনি, মনে নেই ? আমাকে শিক্ষা দেওয়া অত সহজ নয়। শর্মাজি আমাকে বারবার বলেছেন, এখানে এসে দেখা করতে। সেইজন্যই আমি এসেছি। শর্মাজির সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না।”

নকল শর্মাজি হুকুম দিল, “এই লোকটার মুণ্ডু কেটে জলে ভাসিয়ে দাও !”

কাকাবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারলেন না।

তাঁবুর পেছন দিকে একটা ঢোকার জায়গা আছে। সেখান দিয়ে জগ্‌গু নামের লোকটা কখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে, কাকাবাবু তা টেরও পাননি। তিনি পেছন ফিরে তাকাবারও সময় পেলেন না।

জগ্‌গু একটা লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারল কাকাবাবুর মাথায়।

কাকাবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে একটু দূরে পড়তেই মোহন সিং সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর সে কস্তুরীর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে এক ঘা কষাতে গেল কাকাবাবুর পিঠে।

কাকাবাবু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সেই চাবুকটা ধরে ফেলেন। ততক্ষণে জগ্‌গু আর-একবার লাঠি তুলেছে। প্রথম আঘাতেই কাকাবাবুর মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় আঘাত লাগলে তাঁর বাঁচবার আশা থাকবে না।

তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, "থামো! আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কোনও লাভ হবে না। হিরেটা কোনওদিন খুঁজে পাবে না তোমরা। বিজয়নগরের হিরের সন্ধান আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না। শর্মাজি যে ম্যাপটা এঁকে দিয়েছেন তাতে মাত্র অর্ধেকটা আছে। যদি তোমরা ওঁকে ফাঁকি দাও, সেইজন্য উনি পুরোটা আঁকেননি। সেটা তোমরা কিছুই বুঝবে না। সেই ম্যাপের বাকি অংশটার কথাই তিনি আমাকে কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন!"

কাকাবাবু এক হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। তবু রক্ত বন্ধ হল না। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেল, চোখ দুটো বুজে এল।

কস্তুরী লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগগির ডাক্তার ডাকো। লোকটাকে বাঁচিয়ে তোলো! বিজয়নগরের হিরে আমার চাই-ই চাই! চাই-ই চাই!"

কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এল মিনিট-পনেরো পরেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে এনে একটি খাটে শোওয়ানো হয়েছে, একজন ডাক্তার তাঁর মাথায় ব্যান্ডেজ করছে। তিনি কোনও কথা বললেন না। মাথার যন্ত্রণাটা অনেকটা কমে গেছে। তা হলে খুব বেশি কাটেনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পর ডাক্তার তাঁর ডান হাতের জামা গুটিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিতে এল। কাকাবাবু বাধা দিলেন না। একটু পরেই তাঁর আবার ঘুম পেয়ে গেল।

পরের বার যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাকাবাবু ওঠবার চেষ্টা করতেই বুঝলেন যে তাঁর সমস্ত শরীর শক্ত কোনও দড়ি দিয়ে বাঁধা। হাত দুটো পেছন দিকে মোড়া, একটু নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁকে ওরা বিশ্বাস করেনি, তাই এরকমভাবে বেঁধে রেখেছে।

কাকাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "মোহন সিং! মোহন সিং!"

কয়েকবার ডাকাডাকি করার পর প্রথমে অন্য একজন লোক ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। তারপর সে চলে গিয়ে ডেকে আনল মোহন সিংকে। সঙ্গে এল কস্তুরী, তার হাতে একটা মোমবাতি।

দু'জনে এসে কাকাবাবুর খাট ঘেঁষে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং, আমাকে বেঁধে রেখেছ কেন? তুমি আমাকে এখনও চেনোনি মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার ভাই আমাকে চিনেছিল, সে এখনও জেল খাটছে, তাই না? আমাকে কিছুতেই তোমরা মেরে ফেলতে পারবে না। আমাকে বেঁধে রাখলে আমার পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না!"

মোহন সিং দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমার ভাইকে জেল খাটিয়েছ। কাল সন্ধেবেলা আচানক আমার গলা টিপে ধরেছিলে। আমি আজ তার শোধ নেব। তোমার মাংস একটু-একটু করে কেটে কুকুরকে খাওয়াব।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ, তাই খাওয়াও, দেখি তোমার কেমন সাধ্য! তোমার মতন দুর্বৃত্ত আমি আগে অনেক দেখেছি। আজ পর্যন্ত তো কেউ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। আমার একটা পা যে ভাঙা দেখছ, এটা হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্টে হয়েছে, কেউ ভেঙে দেয়নি। এবারে তুমি কী করতে পারো দেখা যাক!"

মোহন সিং কাকাবাবুর গলা টিপে ধরতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আহা, থামো না। আগে আমি দু-একটা কথা বলি!"

তারপর সে খুব মিষ্টি গলায় বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আমি আপনার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছি। মোহন সিং-এর ভাইকে আপনি পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনার ওপর মোহন সিং-এর এত রাগ, তবু আপনি এখানে এলেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো মোহন সিং-এর কাছে আসিনি। এসেছিলাম প্রোফেসার শর্মার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। তিনি আমার গুরুর মতন, তিনি আসতে বললেও মোহন সিং-এর ভয়ে আমি আসব না?"

কস্তুরী বলল, "সঙ্গে কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেন, তাদের বিপদের কথাও চিন্তা করলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "জীবনে কতরকম বিপদ আসে। ভয় পেয়ে দূরে থাকলে কি সব বিপদ কাটানো যায়? ওরা নিজের ইচ্ছেতে আমার সঙ্গে এসেছে, ওদের যদি কোনওরকম বিপদ হয়, ওরা নিজেরাই বাঁচার চেষ্টা করবে। এইভাবে বাঁচতে শিখবে!"

মোহন সিং বলল, "ওদের আর তুমি দেখতে পাবে না কোনওদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা হলে বিজয়নগরের হিরের সন্ধানও

তোমরা কোনওদিন পাবে না !”

মোহন সিং বলল, “আলবাত পাব। আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে, কোনও জায়গা খুঁজতে বাকি থাকবে না।”

কাকাবাবু বললেন, “অতই সহজ ? চারশো বছর ধরে কত লোক সেই হিরে খুঁজেছে, কেউ পায়নি। তোমরা সমস্ত বিজয়নগর খুঁড়ে ফেললেও পাবে না, এই আমি বলে দিচ্ছি !”

কস্তুরী বলল, “এই মোহন সিং, আস্তে কথা বলো। বাবুজি, আমরা এখানে কেন এসেছি জানেন ? আমরা এসেছি এখানে ফিল্মের শুটিং করতে। তার সঙ্গে হিরের কী সম্পর্ক আছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “ফিল্মের শুটিং-এর নাম করে এসে তোমরা পুরো জায়গাটা ঘিরে ফেলেছ। পুলিশ বসিয়েছ। বাইরের লোকদের ঢুকতে দিচ্ছ না। সেই সুযোগে তোমরা বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজে বার করবে। প্রোফেসর শর্মা তোমাদের এই বুদ্ধি দিয়েছেন, আমি জানি। কিন্তু শর্মাজি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর। সেই হিরে পেলেও তিনি তোমাদের সেটা দিতেন না। সেই হিরে আবিষ্কার করলে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে যাবে, সেটাই হবে তাঁর শেষ কীর্তি, তিনি এই কথা ভেবে এসেছেন।”

কস্তুরী বলল, “শর্মাজির কথা বাদ দিন। অত বুড়ো মানুষ দিয়ে কাজ চলে না। আমি সেই হিরে খোঁজার জন্য যা বন্দোবস্ত করেছি, তাতে আমার এর মধ্যেই পনেরো লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে।”

কাকাবাবু বললেন, “বিজয়নগরের হিরে পাওয়া গেলে তার দাম হবে পনেরো কোটি টাকারও বেশি। কোহিনূরের চেয়েও দামি !”

কস্তুরী বলল, “আপনি সেই হিরে বার করে দিন। আপনি কত টাকা নেবেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ বেশ ! আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সামনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে। আগে বাঁধন খুলে দাও, তারপর কথা হবে !”

মোহন সিং গর্জে উঠে বলল, “খবর্দার, কস্তুরী ওর কথা শুনো না। এ লোকটা সাপের মতন, একবার ছাড়লে কী করবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ওকে ছাড়া হবে না !”

কস্তুরী তার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল, “তুমি চুপ করো !”

তারপর কাকাবাবুকে বলল, “আগে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হোক, তারপর আপনার হাত-পায়ের দড়ি খুলে দেওয়া হবে তো নিশ্চয়ই ! আপনি বলুন, আপনি আমাদের সাহায্য করার বদলে কী নেবেন ? মনে রাখবেন কিন্তু, মোহন সিং আপনাকে যখন-তখন খতম করে ফেলতে রাজি। আমি আপনাকে বাঁচাব। আপনার প্রাণের দাম কি একটা হিরের চেয়েও বেশি নয় ?”

কাকাবাবু বললেন, "শর্মাজি আমাকে বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে আমি যেন হিরের ব্যাপারে নাক না গলাই। তাতে তাঁর ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি কোনও কারণে মরে গেলে, তারপর যেন আমি ওই কাজে হাত দিই। তিনি আমাকে সব বাতলে দিয়েছেন, আমিও তাঁর কাছে শপথ করেছি। শর্মাজি কোথায় ?"

মোহন সিংয়ের দিকে একবার দ্রুত দেখে নিয়ে কস্তুরী বলল, "ওঁর আজ সকাল থেকে হঠাৎ প্যারালিসিস হয়ে গেছে, কোমার মতন অবস্থা। কথা বলতে পারছেন না। বোধহয় আর জ্ঞান ফিরবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "এটা সত্যি কথা ?"

কস্তুরী বলল, "জি হাঁ, এটা সত্যি কথা। আপনাকে শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলব কেন ! শর্মাজি খুবই অসুস্থ। তিনি এখানে নেই। ডাক্তাররা বলেছেন, তাঁকে এবারের মতন বাঁচাবার চেষ্টা হলেও তিনি আর কথা বলতে পারবেন না। লিখতেও পারবেন না। তাতেই আমাদের খুব মুশকিল হয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের যে কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিছে, তা বোঝা মুশকিল। যাকগে, আমার সঙ্গে যে আর চারজন ছিল, তারা কোথায় গেল ?"

মোহন সিং রুক্ষ গলায় বলল, "তাদের কথা বাদ দিন ! কথা হবে শুধু আপনার সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে। আমার যে ভাই জেল খাটছে, তাকে নিয়ে কি আমি দরাদরি করছি ? আপনার সঙ্গে যারা এসেছিল, তারা বাড়ি চলে গেছে। আপনি কী শর্তে আমাদের সাহায্য করতে চান, সেটাই বলুন।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও শর্ত নেই। আমার সঙ্গে যে চারজন ছিল, তাদের আগে এনে হাজির করো, নইলে তোমাদের মতন স্বার্থপর লোকদের সঙ্গে আমি কোনও কথাই বলব না !"

মোহন সিং আর রাগ সামলাতে না পেরে কস্তুরীর থেকে চাবুকটা নিয়ে দু' ঘা কষিয়ে দিল কাকাবাবুর বুকে। গরগর করতে করতে বলল, "হারামজাদা, তোমাকে এক্ষুনি খুন করে ফেলতে পারি। তবু তুমি বড় বড় কথা বলছ ? বাঁচতে চাও তো শিগগির বলো, হিরেটা কোথায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "কে জানে হিরেটা কোথায় ? মোহন সিং, তুমি যে আমাকে দু'ঘা চাবুক কষালে, ঠিক সেই দু'ঘা তুমি আবার ফেরত পাবে !"

মোহন সিং চাবুক তুলে বলল, "তোমাকে আমি যদি এক্ষুনি খতম করে দিই তা হলে কে আমাকে আটকাবে ?"

কস্তুরী বলল, "কী পাগলের মতন কথা বলছ, মোহন সিং ! শর্মাজি আমাদের যে ম্যাপ দিয়েছেন, তা দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রায়চৌধুরীর সাহায্য আমাদের দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং, আমাকে যত ইচ্ছে চাবুক মেরে হাতের সুখ করে নিতে চায় নিক, কিন্তু আমি আর একটাও কথা বলব না ! আমার সঙ্গের চারজন ছেলেমেয়েকে আমি আগে দেখতে চাই এখানে !"

মোহন সিং বলল, "হবে না ! আমার যে ভাই জেল খাটছে, আমি কি তাকে ছেড়ে দেবার কথা বলেছি ? ওর লোকেরাও কোথায় আছে আমি জানি না !"

কাকাবাবু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ কিংবা মুখ এরা বাঁধেনি। তবু তিনি যেন এদের আর মুখ দেখতে চান না।

কস্তুরী বলল, "আমি একটা শর্ত করছি। আপনি বিজয়নগরের হিরের একটা কিছু রাস্তা দেখিয়ে দিন, আজই আমি আপনার সামনে আপনার দলের কোনও ছেলেমেয়েকে হাজির করব। শুধু একজন। ঠিক আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তারা কোথায় আছে আমি জানতে চাই !"

কস্তুরী বলল, "আপনি একজনকে দেখতে পাবেন। তার মুখেই জানতে পারবেন সব কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "মোহন সিং-কে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি একটি মেয়ে, আশা করি তুমি কথার খেলাপ করবে না ! হিরেটার কাছে পৌঁছবার চারটে স্টেপ আছে। আমি শুধু প্রথম স্টেপটার কথা বলব। একটা গোপন লোহার দরজা ! সেটা যদি তোমরা বার করতে পারো, তা হলে আমার দলের একজনকে আমার সামনে হাজির করবে ? কথা দিচ্ছ ?"

কস্তুরী বলল, "বাবুসাহেব, এই হিরেটার জন্য আমি বহু টাকা খরচ করে ফেলেছি। যে কোনও উপায়ে সেটা আমার চাই। আপনি কথা রাখলে আমিও কথা রাখব।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ভাল করে শুনে নাও। বিঠলস্বামী মন্দিরের মেইন গেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারপর দক্ষিণ দিকে সোজা পা ফেলে-ফেলে এগোবে। ঠিক তিনশো পা গিয়ে থামবে। তুমি নিজে মাপবে, কোনও পুরুষকে দিয়ে মাপালে বেশি হয়ে যাবে। তোমার মতন কোনও মেয়ের তিনশো পা। দড়ি ফেলে দাগ টেনে দেখে নেবে ঠিক সোজা তিনশো পা হয়েছে কি না। তারপর সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করবে। তিনশো যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে পাঁচ ফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত এঁকে নিয়ে খুঁড়বে। একটা কুয়োর মতন করে সেই পাঁচ ফুট খুঁড়ে ফেলবে। দশ ফুট গভীর হবে। তারপর সেখানে একজন লোককে নামিয়ে দেবে। সেই লোকটি বিঠলস্বামী মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে সেই কুয়োর দেয়ালে হাত বুলোলে একটা লোহার দরজা পাবে। বড় দরজা নয়, একটা লোহার সিন্দুকের দরজার মতন, কোনওরকমে একজন মানুষ সেখানে ঢুকতে পারে। ব্যস, এই পর্যন্ত বলে দিলাম। এবার যাও, খুঁজে দ্যাখো। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে আছে তো, না লিখে নেবে ?"

কস্তুরী বলল, "লিখে নিচ্ছি, লিখে নিচ্ছি !"

মোহন সিং বলল, "দাঁড়াও ! যদি পুরোটাই এই বাঙালিবাবুর ধোঁকা হয় ? শর্মাজির ম্যাপে বিঠলস্বামীর মন্দিরের উত্তর দিক পর্যন্ত দেখানো আছে। আর এ বলছে সম্পূর্ণ উলটো, দক্ষিণ দিক !"

কস্তুরী একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বলল, "আমাদের শুধু-শুধু ধোঁকা দিয়ে ওর কী লাভ ?"

মোহন সিং বলল, "সময় নষ্ট করিয়ে দেবে। কাল সকালের মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ করার কথা, গভর্নমেন্ট তার বেশি পারমিশান দেবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "দশ ফুট গর্ত খুঁড়তে কত সময় লাগবে ? একসঙ্গে বিশজন লোক লাগিয়ে দাও, দু' ঘন্টায় হয়ে যাবে ! তারপরই দেখতে পাবে, সেখানে লোহার দরজা আছে কি না !"

মোহন সিং আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কস্তুরী তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। চোখের ইঙ্গিতে কী যেন বোঝাল তাকে।

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "ঠিক আছে, রায়চৌধুরীবাবু। আপনার কথামতন আমরা খুঁড়ে দেখব। যদি সত্যিই লোহার দরজা পেয়ে যাই, আপনিও আপনার দলের একজনকে ফেরত পেয়ে যাবেন। আর যদি আমাদের ধোঁকা দিয়ে থাকেন, আপনার মাংস আমরা কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তারপর কঙ্কালটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসব। সবাই জানবে, জংলি জানোয়াররা আপনাকে মেরে ফেলছে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "জংলি জানোয়ার কি শুধু জঙ্গলেই থাকে ? মানুষের পোশাক পরেও ঘোরাফেরা করে। নাঃ, আপাতত আমার মরার কোনও ইচ্ছে নেই। যাও, খুঁড়তে শুরু করো। ঠিক যেরকমভাবে বললাম, ভুল না হয় !"

মোহন সিং আর কস্তুরী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবুর ইচ্ছে হল পাশ ফিরে শুতে। হাত নাড়াবার চেষ্টা করে বুঝলেন, খুব শক্ত করে বেঁধেছে, সারা শরীরে দড়িটা একেবারে কেটে-কেটে বসে গেছে। এখন আর কিছু করবার নেই। সন্তু, রঞ্জনরা কোথায় আছে কিছু বুঝতে পারছেন না। প্রফেসার শর্মা অসুস্থ হয়ে না পড়লে মোহন সিং এতটা নিষ্ঠুরতা দেখাতে সাহস পেত না। কাল রাত্তিরে শর্মাজিকে দেখে মনে হয়েছিল, মনের জোরেই তিনি টিকে যাবেন।

সত্যিই কি তাঁর প্যারালিসিস হয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে ? এতবড় একজন পণ্ডিত বাড়ি থেকে এত দূরে এসে এইভাবে মারা যাবেন ? বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা উদ্ধার করার জন্য তিনি অন্তত তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হিরেটা পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। কোহিনূরের চেয়েও অনেক দামি হিরে।

চোখ বুজে নানারকম চিন্তা করতে-করতে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

খানিকবাদে তাঁর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। গোটাচারেক লোক এসে তাঁর পা আর মাথা ধরে তুলে ফেলল খাট থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, আরে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

লোকগুলো কোনও উত্তর দিল না। একটা বালির বস্তার মতন তাঁকে কাঁধে নিয়ে চলল। একজন কাকাবাবুর ক্রাচ দুটোও তুলে নিল।

বাইরে এসে কাকাবাবু দেখলেন, আকাশ মেঘলা-মেঘলা। চতুর্দিক অন্ধকার, দু-তিনটে জায়গায় আলো জ্বলছে। তিনি আন্দাজে বুঝলেন, একটা আলো জ্বলছে বিঠলস্বামী মন্দিরের কাছে। ওখানে এখনও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে।

লোকগুলো কাকাবাবুকে বয়ে নিয়ে এসে মাঠের মাঝখানে নামিয়ে দিল। সেখানেও একটা আলো জ্বলছে। সিংহাসনের ওপর বসে আছে নকল ভগবতীপ্রসাদ শর্মা, এখন তার মাথায় একটা জরির পাগড়ি। কোলের ওপর রাখা একটা তলোয়ার। সে একটা সিগারেট টানছে। আসল শর্মাজি জীবনেও সিগারেট খাননি।

কাকাবাবুকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? দিব্যি খাটে শুয়েছিলাম, হঠাৎ আমাকে মাঠের মধ্যে আনা হল কেন?"

নকল শর্মা বলল, "ক্যামেরা আসছে। শুটিং হবে। আসল কাজের সঙ্গে-সঙ্গে ফিল্মের শুটিংও চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। এখানে একটা সিন তুলব। রাজা রাম রায়ের সামনে আনা হয়েছে একজন বন্দীকে। তুমিই সেই বন্দী। তোমাকে অবশ্য দেখানো হবে পিছন দিক থেকে। তোমার মুখ দেখা যাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার এক বন্দীর গায়ে নাইলনের দড়ি? তখনকার বন্দীদের শুধু হাত দুটো শেকল দিয়ে বাঁধা হত!"

নকল শর্মা বলল, "হিন্দি সিনেমায় এসব চলে যায়! অত কেউ খুঁটিয়ে দ্যাখে না।"

কাকাবাবু বললেন, "চারশো বছর আগেকার রাজা সিগারেটও খাবে নাকি?"

নকল শর্মা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আরে, ক্যামেরাম্যান, লাইটসম্যানরা সব কোথায় গেল? সবাই মিলে মাটি খোঁড়া দেখতে গেলে কী করে চলবে? ওরে কে আছিস?"

কাকাবাবুকে নামিয়ে রেখে সেই চারজন লোক চলে গেছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। নকল শর্মা চেঁচিয়ে আরও কয়েকবার ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। তলোয়ারটা হঠাৎ পড়ে গেল তার কোল থেকে। সেটা তুলে সে সিংহাসনের এক পাশে রাখল।

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে মজা করে বলল, "কুয়ো তো খোঁড়া হচ্ছে, সেখানে যদি লোহার সিন্দুকের দরজা না পাওয়া যায়, তা হলে তোমার কী হবে বলো তো ? মোহন সিং বলছে, কুকুর দিয়ে তোমাকে খাওয়াবে। কস্তুরী বলছে, এইরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তোমাকে নদীতে ফেলে দেবে। আর আমি ভাবছি, সিনেমার শুটিং-এ তোমাকে কাজে লাগাব। প্রথমে আমি আমার পায়ের জুতো দিয়ে তোমার নাক ঘষে দেব ! তারপর ল্যাথি মেরে-মেরে তোমার দাঁতগুলো ভাঙব। তারপর তোমার চোখ..."

কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি ! তুমি একটু-একটু করে কষ্ট দিয়ে আমায় মারবে। তাই তো ? এবারে উলটো দিকটা বলো। আমি যদি হিরেটা তোমাদের উদ্ধার করে দিই, তা হলে কী হবে ?"

নকল শর্মাজি বলল, "হিরে যদি তুমি খুঁজে দিতে পারো, সত্যি দিতে পারো, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব। বাঁধন খুলে দেব। ইউ উইল বি ফ্রি ! মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত ! কথা যখন দেওয়া হয়েছে, হিরে পাওয়া গেলেই তোমার ছুট্টি !"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু হিরেটা পাওয়া গেলে নেবে কে ? তুমি, না মোহন সিং, না কস্তুরী ?"

নকল শর্মা ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "মোহন সিং ? ছোঃ ! ও তো একটা সামান্য লোক। ওকে আমরা যা বলি, ও তাই করে। অবশ্য ও একটু গোঁয়ার। কথায়-কথায় মারামারি করতে যায়। কিন্তু হিরের ওপর কোনও অধিকার নেই। আর কস্তুরী ? হাঁ, সে কিছু টাকা খরচ করেছে বটে। সে টাকা ফিল্ম থেকেই উঠে যাবে। হিরেটা হবে আমার। বিজয়নগরের হিরেটা আমার চাই !"

কাকাবাবু কৌতুকের সঙ্গে বললেন, "এ যে নতুন কথা শুনছি। কস্তুরী এতক্ষণ বলছিল, হিরেটা সে-ই নেবে। অন্য কোনও ভাগীদার নেই। এখন দেখছি, আপনিও একজন ভাগীদার !"

নকল শর্মা বলল, "ভাগীদার মানে ? না, না, অন্য কাউকে আমি ভাগ-টাগ দেব না। আমার সব বন্দোবস্ত করা আছে, হিরেটা পেলেই আমি বম্বে চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তো খুব মুশকিল হল। আমি হিরেটা কস্তুরীকেই খুঁজে দেব কথা দিয়েছি। কস্তুরীর সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে।"

নকল শর্মা বলল, "ঠিক আছে, তুমি হিরেটা কস্তুরীর জন্যই খোঁজো ! এমনকী সবার সামনে তুমি হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিতে পারো। তারপর ওর কাছ থেকে সেটা বাগিয়ে নিতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। সেটা আমি বুঝব। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হল, তা খবর্দার বলবে না আর কাউকে। কস্তুরীকে যদি আগে থেকে কিছু বলার চেষ্টা করো, তা হলে তোমার

আমি জিভ কেটে নেব !”

কাকাবাবু বললেন, “আমার জিভ কেটে নিলে একটু মুশকিল আছে। আমি যদি কথা বলতে না পারি, তা হলে হিরেটা তোমরা পাবে কী করে ?”

নকল শর্মা চোখ কটমট করে বলল, “রায়চৌধুরী, একটা কথা মনে রেখো। তুমি বাঁচবে কি মরবে, সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। কস্তুরী হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।”

সিংহাসনের পাশে হাত চাপড়ে সে তলোয়ারটা খুঁজল। সেটা সেখানে নেই। আবার নীচে পড়ে গেছে ভেবে সে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখল, সেখানেও নেই।

সে অবাক হয়ে বলল, “আরে, আমার তলোয়ারটা কোথায় গেল ?”

সিংহাসনের পিছন থেকে সামনে ঘুরে এসে সন্তু বলল, “এই যে !”

সন্তুর হাতে সেই খাপ খোলা তলোয়ার। তার ডগাটা সে নকল শর্মার গলায় ছুঁইয়ে বলল, “চুপ ! কোনও শব্দ করবে না। তা হলেই গলা ফুটো করে দেব !”

আতঙ্কে নকল শর্মার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সন্তুর বদলে সে যেন ভূত দেখছে !

সন্তু বলল, “জোজো, শিগগির কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দে !”

অন্ধকার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে জোজো কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

কাকাবাবু বেশ সন্তুষ্টভাবে বললেন, “যাক, তোরা ভাল আছিস তা হলে ? রিঙ্কু, আর রঞ্জন কোথায় ?”

জোজো বলল, “এখনও দেখতে পাইনি। এই গিঁটগুলো খুলতে পারছি না। একটা ছুরি পেলে ভাল হত।”

কাকাবাবু বললেন, “নাইলনের দড়ি ছুরি দিয়েও কাটা খুব শক্ত। গিঁটগুলোই খোলার চেষ্টা কর। কোনওরকমে আমার হাতটা আগে খুলে দে !”

সন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে অধীরভাবে বলল, “তাড়াতাড়ি, তাড়িতাড়ি ! লোকজন আসছে !”

জোজো তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলল। নখ দিয়ে চেপে ধরেও সে গিঁট খুলতে পারছে না। কেনওরকমে কাকাবাবুর হাতের বাঁধনটা খুলতে-না-খুলতেই হইহই করে ছুটে এল সেখানে চার-পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে একজন মোহন সিং। সে ফুর্তিতে চিৎকার করে বলতে-বলতে এল, “পাওয়া গেছে ! পাওয়া গেছে ! লোহার দরজা বেরিয়েছে !”

সন্তু আর জোজো পালাবার সুযোগ পেল না। কাকাবাবুকে ফেলে পালাবার কথা তাদের মনেও এল না।

মোহন সিং এসেই খপ্ করে জোজোর চুলের মুঠি চেপে ধরে বলল, “এ

কী ?”

সন্তু তলোয়ারটা নকল শর্মার গলায় আর-একটু চেপে বলল, “শিগগির কাকাবাবুকে ছেড়ে দাও, নইলে একে আমি মেরে ফেলব !”

মোহন সিং কয়েক মুহূর্ত দারুণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সন্তুর দিকে। যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, সন্তুরা এরই মধ্যে বেঁচে এখানে ফিরে এসেছে।

তারপরেই সে ঘোর কাটিয়ে ফস করে একটা রিভলভার বার করে বলল, “তুই ওর গলা কাটবি ? কাট ! তার আগে এক গুলিতে আমি তোর মাথা উড়িয়ে দেব !”

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, “সন্তু, তলোয়ারটা ফেলে দে !”

সন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তলোয়ারটা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে। একজন লোক ছুটে গিয়ে সন্তুকে চেপে ধরল।

নকল শর্মা রাগের চোটে সপাটে এক চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর মোহন সিংকে বলল, “লোহার দরজা পাওয়া গেছে ? তা হলে আর রায়চৌধুরীকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী ? ওকে খতম করে দিলেই তো হয় ?”

মোহন সিং চওড়া করে হেসে বলল, “আমিও তো তাই ভেবেছি। মাটির নীচে সত্যি একটা লোহার দরজা আছে। এবার দরজা ভেঙে আমরাই হিরেটা বার করতে পারব ! এ লোকটাকে আর দরকার নেই। এই বিচ্ছুগুলোকেও ওর সঙ্গে...”

কাকাবাবু হাত দুটো ঘষতে-ঘষতে বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও ! একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ ! মোহন সিং, তুমি একটা বেওকুফ ! আমাকে কি তোমার মতনই বুদ্ধু ভেবেছ ? আমি জানতুম, তোমরা কথার খেলাপ করবে ! হিরেটার খোঁজ পেয়ে গেলেই আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে ! হিরে পাওয়া এত সহজ ? ওই লোহার দরজা খুলে দ্যাখো, ওর মধ্যে কিচ্ছু নেই !”

নকল শর্মা আর মোহন সিং একসঙ্গে বলে উঠল, “কেয়া ? কুছ নেহি ?”

কাকাবাবু বললেন, “দরজাটা ভাঙবার দরকার নেই। ধাক্কাধাক্কি করলেও খুলবে না। সামনের দিকে জোরসে টান দাও, তা হলেই খুলে যাবে। ওই সিন্দুকের মধ্যে হিরে-মুক্তো কিছুই নেই। এর আগে অন্তত পনেরোজন লোক ওই সিন্দুক খুলে দেখেছে ! গত চারশো বছর ধরে কত লোক এই বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরে খুঁজছে তা জানো ?”

এবারে কস্তুরী এসে পৌঁছল সেখানে। সে সব কথা শুনে হতাশ হয়ে বলল, “অ্যাঁ ? ওই সিন্দুকের মধ্যে কিছু নেই ? রায়চৌধুরীবাবু, তুমি শুধু-শুধু আমাদের দিয়ে এতখানি মাটি খোঁড়ালে ? তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছ ?”

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ, বেশ মজা তো ! আমি ধোঁকা দিয়েছি ? তোমরা যে লোহার দরজাটা দেখামাত্রই আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে, সেটা কী ? আমি তোমাদের এই অমূল্য হিরে খুঁজে দেব, আর তোমরা তারপর আমাকে মেরে

ফেলবে। বাঃ, কী চমৎকার !"

মোহন সিং বলল, "ওই হিরে না পেলেও কি তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব ভাবছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে তোমাদের ভারী লাভ হবে ! শুধু-শুধু মানুষ খুন করাই হবে, হিরে পাবে না। যে জন্য এত কাণ্ড করে এখানে এসেছ, সব নষ্ট হবে ! প্রোফেসর শর্মার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি কিছু বলতে পারবেন না। আমিও যদি মরে যাই, তা হলে চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে বিজয়নগরের হিরে !"

কস্তুরী বলল, "না, না, তা হতে পারে না। হিরেটা আমাদের চাই ! রায়চৌধুরীবাবু, আপনাকে কেউ মারবে না ! আপনার সঙ্গের লোকদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে ! আমি কথা দিচ্ছি !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার কথার যে কী দাম আছে, তা তো দেখলাম ! আর আমি তোমাদের বিশ্বাস করছি না।"

মোহন সিং জোজোকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, "বিরজু, বিরজু ! এই ছোকরাটার একটা-একটা করে কান কেটে দে। তারপর নাক কাটবি। তা দেখেও রায়চৌধুরী হিরের কথা লুকিয়ে রাখতে পারে কি না দেখতে চাই !"

বিরজু এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে জোজোকে আবার দাঁড় করাল। একটা ছুরি বার করে বলল, "কাটব ?"

জোজো কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। কাকাবাবুর মুখের হাসি-হাসি ভাব দেখে সে ভয় পেল না।

কাকাবাবু বললেন, "আবার একটা বোকামি করছ, মোহন সিং ! এরকমভাবে জোর করলে আমি তো তোমাদের আর-একটা ধোঁকা দেব ! আর-এক জায়গার মাটি খুঁড়তে বলব। দু'-তিন ঘন্টা লেগে যাবে। তারপর দেখবে, সেখানেও কিছু নেই ! এই করে-করে রাত ভোর হয়ে যাবে ! আমার লোকদের গায়ে একবার হাত ছোঁয়ালে আমি কিছুতেই সত্যি কথা বলব না।"

কস্তুরী এগিয়ে এসে বলল, "বিরজু, ছেলেটেকে ছেড়ে দাও ! এভাবে কিছু হবে না। সময় বেশি নেই। রায়চৌধুরীবাবু, আপনার কাছে আমি, মোহন সিং আর কর্নেলসাহেব একসঙ্গে শপথ করব যে, হিরেটা পেলেই আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব।" আপনার সঙ্গের লোকজনদেরও ছেড়ে দেব। তা হলে আপনি মানবেন তো ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল কে ?"

কস্তুরী নকল শর্মার দিকে হাত দেখাল।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের ওই শপথ-টপথে আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। এবার আমার শর্ত বলছি শোনো। আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি নিজে

হিরেটা খুঁজতে যাব। আমি নিজে না গেলে অন্য কেউ ঠিকমতন বার করতে পারবে না। অনেক কিছু শেখাতে হবে।"

কস্তুরী সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "বাঁধন খুলে দাও! খুলে দাও!"

বিরজু গিঁটগুলো খুলে দিল খানিকটা চেষ্টা করে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "উঃ, সারা গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। এমন শক্ত করে কেউ বাঁধে! শুধু হাত দুটো বাঁধাই তো যথেষ্ট ছিল। আমি খোঁড়া মানুষ, আমি কি দৌড়ে পালাতে পারতুম?"

ক্রাচ দুটো তুলে নিয়ে তিনি বললেন, "যে-কুয়োটা খোঁড়া হয়েছে, সেটার কাছে চলো! আমি তোমাদের পুরোপুরি ধোঁকা দিইনি। মিছিমিছি মাটি খুঁড়তে বলিনি!"

পুরো দলটা চলে এল বিঠলস্বামীর মন্দিরের কাছে।

নতুন খোঁড়া গর্তটার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "লোহার দরজাটা খুলতে পেরেছ?"

একজন বলল, "জি হাঁ, খোলা হয়েছে। ভেতরে কিছু নেই। সিন্দুকটা খালি!"

কাকাবাবু বললেন, "একেবারে খালি নয়। একেবারে পিছনের দেওয়ালের গায়ে দ্যাখো একটা ত্রিশূল গাঁথা আছে। খুব সাবধানে শাবলের চাড় দিয়ে সেই ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে এসো!"

বিরজু নিজে সেই কুয়োর মতন গর্তে নেমে গেল। একটু পরেই সে বলল, "হাঁ, হাঁ, একটা ত্রিশূল আছে।"

সে আবার ওপরে উঠে আসার পর দেখা গেল, তার হাতে একটা সাধারণ লোহার ত্রিশূল। বেশ মোটা। অনেক কালের পুরনো হলেও সেটার গায়ে মরচে পড়েনি!

কাকাবাবু সেই ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বললেন, "এই ত্রিশূল আমি আগে দেখেছি, ফার্গুসনসাহেব দেখেছেন, মানুচ্চিসাহেব দেখেছেন, আরও অনেকে দেখেছেন, আমরা কেউই বুঝতে পারিনি, মাটির অত নীচে একটা লোহার সিন্দুকে এরকম একটা সাধারণ ত্রিশূল রাখার মানে কী! আমরা ভেবেছি, আগে বোধহয় ওখানে দামি কোনও মূর্তি ছিল, কেউ চুরি করে নিয়েছে। ভগবতীপ্রসাদ শর্মা মাত্র কিছুদিন আগে একটা বহু পুরনো পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। সেটা পড়ে তিনি জানতে পেরেছেন, এই ত্রিশূলটা আসলে চাবি! অন্য একটা সিন্দুকের চাবি। সেইজন্যই এটাকে এত যত্ন করে এমন গোপন জায়গায় রাখা হয়েছে।"

মোহন সিং সেই ত্রিশূলটা কাকাবাবুর হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত সহজ নয়! যে সিন্দুকের চাবি এই ত্রিশূলটা, সেটা কোথায় আছে তুমি জানো? সাত জন্মেও খুঁজে পাবে না। যদি

খুঁজে পাও, তা হলেও এই চাবি দিয়ে খুলতে পারবে না। কতবার ডান দিকে আর কতবার বাঁদিকে ঘোরাতে হবে, তা একটা শ্লোকের মধ্যে লেখা আছে। সেই শ্লোক না জানলে কোনও লাভ নেই।"

কস্তুরী বলল, "এই মোহন, রায়চৌধুরীবাবুর কাজে বাধা দিও না! আচ্ছা, রায়চৌধুরীবাবু, একটা কথা বলুন তো! প্রোফেসর শর্মাজি যখন এই চাবিটার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি নিজে কেন আগে এসে হিরেটা নিলেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "উত্তরটা খুব সোজা। তিনি একা এসে খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারতেন না। গভর্নমেন্টকে জানাতে হত। আর গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরেটা খুঁজে বার করলে, সেটা গভর্নমেন্টকেই দিয়ে দিতে হত'। সেইজন্যই তিনি তোমাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ফিল্ম তোলার নাম করে এলে জায়গাটা ঘিরে রাখা যায়, রাত্তিরেও কাজ করা যায়। মাটি খুঁড়লেও কেউ সন্দেহ করে না।"

পেছন ফিরে কাকাবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন কোণাকুণি আর-একটা ছোট্ট মন্দিরের দিকে। এটা একটা অতি সাধারণ শিবমন্দির, ছাদের অনেকটা ভেঙে পড়েছে, দরজার পাল্লাও নেই। ভেতরে মস্ত বড় একটা শিবলিঙ্গ, তার মাথার কাছটাও কিছুটা ভাঙা।

কাকাবাবু বললেন, "রাজধানী বিজয়নগর যেদিন ধ্বংস হয়, সেদিন আক্রমণকারীরা এখানকার অনেক মন্দিরও ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দেয়। শুধু বিঠলস্বামীর মন্দিরটা তারা ভাঙেনি বিশেষ কারণে। মন্দিরের সব ক'টা থাম থেকে একটা অদ্ভুত গানের সুর বেরোচ্ছিল, তা শুনে ওরা ভয় পেয়ে যায়। এই ছোট্ট মন্দিরটাও তারা ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। এই দ্যাখো, এই শিবলিঙ্গটা এত শক্ত পাথরের তৈরি যে মাত্র একটুখানি ভাঙতে পেরেছে! ডিনামাইট দিয়ে না ওড়ালে এটা ভাঙা যাবে না।"

তারপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, "দেখি তো, এর বেদীর মাঝখানে একটা গর্ত থাকার কথা।"

সত্যি তাই, সেই শিবলিঙ্গের তলার বেদীতে চৌকো করে খানিকটা কাটা।

কাকাবাবু সেই কাটা অংশের মধ্যে ত্রিশূলটা ঢোকাতে যেতেই তার ভেতর থেকে ধড়ফড় করে একটা গিরগিটি বেরিয়ে এল। সে বেচারা ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল কস্তুরীর গায়ে। কস্তুরী তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে আর্ত গলায় বলল, "ওরে বাপ রে, এটা কী রে!"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা একটা নিরীহ গিরগিটি। কামড়াবে না। কিন্তু এর মধ্যে সাপখোপ আরও কত-কী আছে কে জানে!"

চোখ বুজে কিছু চিন্তা করে ত্রিশূলটা কয়েকবার ডান দিকে, কয়েকবার বাঁ দিকে ঘোরালেন। অত বড় শিবলিঙ্গটা আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল।

সেখানে বেরিয়ে পড়ল একটা অন্ধকার গর্ত।
সবাই মুখ দিয়ে বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল।

কাকাবাবু মোহন সিং-এর দিকে ফিরে বললেন, "তুমি কি ভাবছ, এটা সিন্দুক ? তা মোটেই না। আসল সিন্দুক আছে অনেক নীচে। এরকম আরও তিনবার চাবি ঘোরাতে হবে তিন জায়গায়। বিজয়নগরের রাজারা সাবধানী ছিলেন খুব !"

উঠে দাঁড়িয়ে, ত্রিশূলটা খুলে নিয়ে তিনি সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে পা বাড়িয়ে বললেন, "আমি এর ভেতরে নামব। সন্তু, জোজো, তোরাও সঙ্গে আয় !"

মোহন সিং বলল, "না, ওরা যাবে না। ওরা বাইরে জামিন থাকবে। আপনি ফিরে এলে ওদের ছাড়ব।"

কাকাবাবু বললেন, "জামিন আবার কী ! আমি খোঁড়া পায়ে একা সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারব না। ওদের সাহায্য লাগবে। তোমরা এই গর্তের বাইরে অপেক্ষা করো।"

মোহন সিং বলল, "তা আমাদেরও একজন আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এত মোটা, তুমি যেতে পারবে না। এক জায়গায় আটকে যাবে।"

বিরজু বলল, "আমি যাচ্ছি ! আমি ওদের পাহারা দেব ! আমাকে একটা টর্চ দাও।"

শুধু টর্চ নয়, মোহন সিং বিরজুর হাতে তুলে দিল নিজের রিভলভারটাও।

প্রথমে কাকাবাবু, তারপর সন্তু, জোজো আর বিরজু নেমে গেল সেই গর্ত দিয়ে। মোহন সিং, কস্তুরীরা উঁকি দিয়ে রইল গর্তের মুখে।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামছে তো নামছেই। ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছে টর্চের আলো। একসময় সেটাও মিলিয়ে গেল। বোধহয় সুড়ঙ্গটা বেঁকে গেছে সেখানে।

হঠাৎ অনেক নীচ থেকে একটা বিকট ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। সেটা কার গলার আওয়াজ তা বোঝবার আগেই কিসের যেন ধাক্কায় ছিটকে গেল মোহন সিং আর কস্তুরীরা। দড়াম করে একটা শব্দ হল।

শিবলিঙ্গটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে।

মোহন সিং হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "বন্ধ করে দিয়েছে ! ও ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিয়েছে !"

॥৭॥

রিঙ্কুকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে সেই মাটির নীচের ঘরটায়। সেখানে অবশ্য এখন মোম জ্বলছে। সেই মোমের পাশে চুপটি করে বসে আছে জানকী। তার অবশ্য মুখ আর হাত-পায়ের বাঁধন এখন খোলা।

জানকীকে দেখে রিঙ্কুর একটু লজ্জা করল। সে মুখটা ফিরিয়ে রইল অন্যদিকে।

জানকী শান্ত গলায় বলল, "এসো বহিন! আমি তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি তো আগে জানতাম না যে, তোমাদের এরা জোর করে ধরে রেখেছে। আমাকে বলেছিল, তুমি একটু পাগল। তাই তোমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করাই ছিল আমার কাজ। তোমাকে এরা কেন ধরে রেখেছে?"

রিঙ্কু মুখ না ফিরিয়ে বলল, "আমি তা কী কররে জানব?"

জানকী বলল, "আর-একজন খোঁড়াবাবুকেও নাকি এরা হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছে!"

এবারে রিঙ্কু মুখ ফিরিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায়? কোথায়?"

জানকী বলল, "সেটা ঠিক জানি না। ওপরের সেপাইটা বলল। তোমাকে দিয়ে জোর করে ফিল্মের পার্ট করাতে চাইছে কেন তাও তো বুঝি না! আমি কত ফিল্মের মেকআপের কাজ করেছি, এরকম কখনও দেখিনি!"

রিঙ্কু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের সঙ্গে আরও যারা ছিল, একজন দাড়িওয়ালা, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সে কোথায় আছে জানো? আরও দুটি অল্প বয়েসী ছেলে?"

জানকী বলল, "তাদের কথা তো কিছু শুনিনি। তুমি পালাতে পারলে না? ধরা পড়লে কী করে?"

রাগে-দুঃখে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে রিঙ্কু বলল, "গেটের কাছের পুলিশগুলোই তো আমাকে ধরিয়ে দিল। পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলুম, কস্তুরী এসে পড়ল সেই সময়ে!"

জানকী বলল, "ওই কস্তুরী দেবী বড় হিংসুটি! অন্য কোনও সুন্দরী মেয়েকে ও সহ্য করতে পারে না। তোমাকে খুব কষ্ট দেবে। এখন তো শুনছি, সুজাতাকুমারীর পার্টের যে-জায়গাটা ডামি দিয়ে করাবার কথা, সেই জায়গাটা তোমাকে দিয়ে করাবে।"

রিঙ্কু বলল, "ডামি মানে?"

জানকী বলল, "সিনেমায় ডামি কাকে বলে জানো না? মনে করো, ফাইটিং সিন। হিরো একজনের সঙ্গে ঘুঁসোঘুসি করছে। সেখানে কিন্তু সত্যিকারের হিরো লড়ে না। হিরোর মতন পোশাক পরে আর-একজন খুব ঘুসি চালায়,

ক্যামেরার কায়দায় তাকেই হিরো মনে হয়। তাকেই বলে ডামি। সেইরকম হিরোইন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যায় কিংবা জলে ঝাঁপ দেয়, সত্যিকারের হিরোইনরা তো ওসব পারে না। অন্য একজন করে দেয়।"

"আমাকে দিয়ে কী করাতে চায় ওরা ?"

"আমি তো স্টোরিটা সব জানি না। একটু পরেই তোমাকে এসে ওরা বলবে। তুমি শাড়িটা বদলে নাও।"

"আমার হাত যে বাঁধা ! এই অবস্থায় শাড়ি বদলাব কী করে ? আমার হাত খুলে দাও !"

"ওরে বাবা, আমি খুলে দিতে পারব না। আমাকে মেরে ফেলবে। তুমি তখন আমার মুখ বেঁধে পালিয়ে গেলে, সেইজন্য ওরা এসে আমায় কী করেছে জানো ? এই দ্যাখো, আমার মাথার চুল কেটে দিয়েছে !"

"আমার এইরকম হাত বাঁধাই থাকবে ?"

"তাই তো বলেছে। আচ্ছা, আমি তোমায় শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছি।"

রিঙ্কু দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে বলল, "খবর্দার ! আমি মোটেই আমার শাড়ির বদলে এই শাড়ি পরব না।"

জানকী বলল, "এই রে ! তা হলে আমি কী করি ! ঠিক আছে ! শাড়ি এখন নাই-বা বদলালে। তোমাকে মেকআপটা করে দিই ? চোখে কাজল দিতে হবে। গালে লাল রং মাখতে হবে।"

রিঙ্কু বলল, "আমি ওসব কিছু মাখব না। কিছুতেই মাখব না !"

জানকী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "তুমি কোনও কথাই শুনবে না ? আমি তো তোমার ওপর জোর করতে পারব না !"

রিঙ্কু বলল, "তুমি যখন এদের দলে নও, তা হলে তুমি বরং একটা কাজ করো। তুমি বাইরে গেলে তো তোমাকে আটকাবে না। তুমি গিয়ে দেখে এসো, সেই যে খোঁড়া ভদ্রলোককে ওরা হাত-পা বেঁধে রেখেছিল, তিনি ছাড়া পেয়েছেন কি না। আর-একজন লোককে খুঁজবে, ওই বললুম, সারা মুখে দাড়ি, লম্বা-চওড়া, মাথার চুল বাবরি মতন, তাকে বলবে যে, আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। আমার নাম রিঙ্কু !"

জানকী বলল, "এই অন্ধকারের মধ্যে আমি তাদের কোথায় খুঁজে পাব ?"

"একটুখানি ঘুরে দ্যাখো। বুঝতে পারছ না, আমাদের কতখানি বিপদ। ওরা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফ্যালে, উনি কতবড় একজন নাম-করা লোক, তুমি জানো ?"

"আমি বাইরে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করলে ওরা সন্দেহ করবে।"

"একটু সাবধানে ঘুরবে। রঞ্জনকে একটা খবর দিতেই হবে। ও হ্যাঁ, ওই দাড়িওয়ালা লোকটির নাম রঞ্জন। জানকী, প্লিজ যাও !"

"আমার ভয় করছে, বহিন।"

"মানুষ বিপদে পড়লে তুমি এইটুকু সাহায্য করবে না ?"

"যদি আমি ধরা পড়ে যাই ?"

"তুমি কেন ধরা পড়বে, তোমাকে তো ওরা আটকে রাখেনি। তুমি কাজ করতে এসেছ। যাও, লক্ষ্মীটি, আমাদের বিপদ কেটে গেলে তোমাকে আমি এক জোড়া সোনার দুল উপহার দেব।"

জানকী থুত্‌নিতে আঙুল দিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

রিঙ্কু তাকে তাড়া দিয়ে বলল, "যাও, আর দেরি করো না !"

জানকী বলল, "ঠিক আছে, যাচ্ছি ! তুমি... তুমি ততক্ষণ অজ্ঞান হবার ভান করে শুয়ে থাকো। আমায় যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব, তুমি অজ্ঞান হয়ে গেছ বলে আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ওরা দেখতে এলে তুমি অজ্ঞান সেজে থাকতে পারবে তো ?"

রিঙ্কু মাথা নেড়ে বলল, "তা পারব না কেন ? অজ্ঞান সাজা আবার শক্ত নাকি ?"

জানকী বলল, "তা হলে তুমি চোখ বুজে শুয়ে পড়ো !"

রিঙ্কু মোমবাতিটার দিকে তাকাল, "সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে, জানকী চলে গেলেই সে মোমবাতির শিখায় তার দড়ির বাঁধনটা পুড়িয়ে ফেলবে। তারপর যা হয় দেখা যাবে।"

জানকী সিঁড়ির দিকে এগোতেই শপাং করে একটা চাবুকের ঘা পড়ল তার মুখে। জানকী ভয়ে একেবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

সিঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মোহন সিং। জানকীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি সব শুনেছি। তুই আবার একে সাহায্য করছিলি ? এবার তোকে বাঁধব।"

জানকী হাত জোড় করে বলল, "সাহেব, আমার কোনও দোষ নেই। আমার কোনও দোষ নেই। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলে·আপনাদেরই খবর দিতে যাচ্ছিলাম। ও শাড়িটা বদলাতে চাইছে না। ওই মিলের শাড়ি পরে ও কী করে হিস্টোরিক্যাল বইতে পার্ট করবে ?"

মোহন সিং বলল, "ওতেই হবে ! মেয়েটা যদি যেতে না চায়, জোর করে ওকে তুলে নিয়ে যাব। তুই মাথার দিকটা ধর, আমি পা দুটো চেপে ধরছি।"

রিঙ্কু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

মোহন সিং রিঙ্কুর হাতের দড়িটা ধরে টেনে বলল, "চল !"

মাঠের মধ্য দিয়ে রিঙ্কুকে টানতে-টানতে এনে দাঁড় করানো হল বিঠলস্বামী মন্দিরের পেছন দিকটায়। সেখানে এখন বড়-বড় আলো জ্বেলে একটা ক্যামেরা সাজানো হয়েছে। দশ-বারোজন লোক ঘোড়ায় চেপে বসে আছে আগেকার দিনের সৈন্যদের মতন সাজপোশাক করে। নকল শর্মাজির ছবি

তোলা হচ্ছে সেইসব অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে।

রিঙ্কুকে একজন লোকের সামনে বসিয়ে দিয়ে মোহন সিং বলল, "দেখিস একে! আমি আসছি!"

ছোট ভাঙা মন্দিরটার মধ্যে সেই শিবলিঙ্গটিকে অনেক ঠেলাঠেলি করেও আর এক চুলও নড়ানো যায়নি। সুড়ঙ্গের মধ্যে যে কী হচ্ছে তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চারজন বন্দুকধারী গার্ডকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার চারপাশে।

বিঠলস্বামী মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতকে ঘুম থেকে তুলে এনে কস্তুরী বারবার জিজ্ঞেস করে চলেছে, এই শিবলিঙ্গটাকে সে কখনও সরতে দেখেছে কি না। বৃদ্ধটি বারবার মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছে, সে জীবনে কখনও দ্যাখেনি।

মোহন সিং এসে কস্তুরীকে বলল, "এখানে তো পাহারা রইলই। চলো, ততক্ষণ আমরা শুটিং সেরে আসি!"

কস্তুরী বলল, "তুমি আগে তোমারটুকু করে নাও। আমি পরে যাব। ওই মেয়েটার মুখখানা ভাল করে মাটির সঙ্গে ঘষে দিও!"

মোহন সিং বলল, "রায়চৌধুরী কোথায় পালাবে? আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না!"

তারপর সে শিবলিঙ্গের নীচের বেদীটার চৌকো গর্তে মুখ দিয়ে বলল, "রায়চৌধুরী, ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো। তোমাদের দলের মেয়েটার গা থেকে আমি ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছি!"

মোহন সিং-এর কথা সুড়ঙ্গের মধ্যে পৌঁছল কি না কে জানে। ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না।

কস্তুরী বলল, "আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।"

মোহন সিং দপদপিয়ে বেরিয়ে গেল সেই মন্দির থেকে। শুটিং-এর জায়গায় গিয়ে বলল, "আরম্ভ করো।"

খুব রোগা লিকলিকে চেহারার একজন লোককে মনে হল পরিচালক। সে বলল, "আমি সিনটা আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঘোড়ায় চড়া সৈন্যরা প্রথমে দু'জন দু'জন করে ছুটে যাবে ক্যামেরার সামনে দিয়ে। বেশি দূরে যাবে না কিন্তু, একটুখানি গিয়েই পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে ঠিক আবার আগের মতন ক্যামেরার সামনে দিয়ে যাবে। তাতে মনে হবে, পরপর অনেক ঘোড়া ছুটছে। এইরকম ঠিক চারবার ঘুরে যাবে। শেষবার আর থামবে না। অনেক দূরে মিলিয়ে যাবে। সেটা আমি লং শট নেব। ঠিক বুঝেছ?"

ঘোড়ায় চড়া সৈন্যদের মধ্যে একজন বলল, "হ্যাঁ, সার, ঠিক আছে!"

পরিচালক বলল, "ঠিক গুনে-গুনে চারবার ঘুরে যাবে। তারপর দূরে মিলিয়ে যাবে, মনে থাকে যেন। এরপর মোহন সিং-এর সিন। আপনি এই

বন্দিনী মেয়েটিকে আপনার ঘোড়ার ওপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে নিয়ে যাবেন !"

মোহন সিং বলল, "ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাব না। ওকে আমি মাটি দিয়ে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাব।"

পরিচালক একটু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "সে কী, স্ক্রিপ্ট বদলে গেছে ? আগে তো ঘোড়ার পিঠে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল !"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, বদলে গেছে !"

পরিচালক বলল, "সে কী, বদলে গেল, আর আমি জানলাম না ?"

মোহন সিং বলল, "যা বলছি, তাই শোনো !"

পরিচালক তবু বলল, "ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নিয়ে গেলে পরের সিনটার সঙ্গে... মানে, পরে এই মেয়েটির সঙ্গেই তো আপনার বিয়ে হবে, তাকে মাটি দিয়ে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

মোহন সিং বলল, "হ্যাঁ, এটাই ঠিক হবে। আমি বলছি, এইটাই হবে !"

পরিচালক বলল, "তবে তো হবে নিশ্চয়ই। আমি টেক করছি। লাইট, লাইট ঠিক করো।"

রিঙ্কু চেঁচিয়ে বলল, "আমি এই পার্ট করব না !"

মোহন সিং বলল, "এই মেয়েটার মাথার গোলমাল আছে। এর কোনও কথায় কান দেবার দরকার নেই !"

অশ্বারোহীদের একজন ফিসফিসিয়ে আর একজনকে বলল, "এ মেয়েটা কে ? এ তো সুজাতাকুমারী নয় ?"

পাশের অশ্বারোহী বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। এ সুজাতাকুমারী হতেই পারে না !"

প্রথম অশ্বারোহীটি হাসতে-হাসতে বলল, "সুজাতাকুমারীর পেট খারাপ হয়েছে শুনেছি। এরা কোথা থেকে একটা পাগলিকে ধরে এনেছে !"

পাশের অশ্বারোহীটি হাসতে-হাসতে বলল, "ঠিক বলেছ। পাগল, একদম পাগল !"

পরিচালক হেঁকে বলল, "সব চুপ ! টেকিং ! স্টার্ট সাউন্ড ! ক্যামেরা..."

অন্যদিক থেকে দু'জন বলল, "রানিং !"

অশ্বারোহী সৈন্যরা দৌড়ে গেল ক্যামেরার সামনে দিয়ে। মোট বারোটা ঘোড়া, কিন্তু তারা ঘুরে-ঘুরে আসতে লাগল বলে সত্যি মনে হল অনেক অশ্বারোহী যাচ্ছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে সব সৈন্যদের মুখ একইরকম দেখায়।

চারবারের পর তারা মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার খুরের কপাকপ-কপাকপ শব্দ শোনা গেল খানিকক্ষণ।

পরিচালক বলল, "গুড ! ভেরি গুড ! এবার মোহন সিং-এর সিন। আপনি তৈরি হয়ে নিন !"

মোহন সিং-এর জন্য এবার আর-একটা ঘোড়া আনা হল। হাতে একটা তলোয়ার নিয়ে মোহন সিং অন্য একজনের কাঁধে ভর দিয়ে সেই ঘোড়ায় চাপল। তারপর বলল, "মুকুট ? আমার মাথার মুকুটটা কোথায় ?"

একজন এসে একখানা প্রায় আসলের মতন দেখতে রাজমুকুট পরিয়ে দিল তার মাথায়।

এবার সে বলল, "ওই মেয়েটার হাতের দড়িটার একটা দিক আমাকে দে !"

রিঙ্কু জোর করে দড়িটা টেনে রেখে বলল, "আমি যাব না। আমি যাব না !"

মোহন সিং হাসতে-হাসতে বলল, "তোলো, এইখান থেকে তোলো !"

মোহন সিং ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি মারতেই ঘোড়াটা এগিয়ে গেল কয়েক কদম। দড়ির হ্যাঁচকা টানে রিঙ্কু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এবার তার কান্না এসে গেল।

সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও !"

হা-হা শব্দে আকাশ ফাটানো অট্টহাসি দিয়ে উঠল মোহন সিং।

একবার চেঁচিয়েই থেমে গেল রিঙ্কু। সে বুঝতে পারল, কাঁদলে কিংবা কাকুতি-মিনতি করলে এরা কেউ শুনবে না। সবাই ভাববে, এটাই অভিনয়।

পরিচালক বলল, "ফাইন। তবে, আর-একবার করতে হবে। দড়িটা আরও লম্বা হলে ভাল হয়।"

মোহন সিং বলল, "ঠিক বলেছ। যতক্ষণ না ভাল হয়, ততবার আমি ওকে মাটিতে ছ্যাঁচড়াব। ওর হাতে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে দাও !"

রিঙ্কু মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বাধা দিয়ে আর কোনও লাভ নেই বলে সে চুপ করে রইল। একজন একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে দিল তার দু'হাতে।

মোহন সিং বলল, "মেয়েটাকে আবার দাঁড় করিয়ে দাও। আমি আবার হ্যাঁচকা টান মারলে ও পড়ে যাবে, সেইখান থেকে ছবি তুলবে। তারপর ওকে অনেকখানি টেনে নিয়ে যাব।"

পরিচালক বলল, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে, প্রথমটায় আপনি আস্তে-আস্তে টানবেন। তারপর জোরে।"

রিঙ্কুকে একটা পুতুলের মতন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দড়ির টানে আবার সে পড়ে গেল। তলোয়ারটা উঁচিয়ে হাসতে-হাসতে ঘোড়া ছোটাতে লাগল মোহন সিং।

হঠাৎ উলটো দিকের অন্ধকার থেকে ছুটে এল আর-একটা ঘোড়া। একজন বিশাল চেহারার অশ্বারোহী তলোয়ার তুলে হা-রে-রে-রে বলে চিৎকার করতে-করতে এসে প্রথমে মোহন সিং-এর তলোয়ারে এক ঘা মারল। মোহন সিং-এর হাত থেকে তলোয়ারটা ছিটকে গেল, ঝোঁক সামলাতে না পেরে সেও

পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

সেই অশ্বারোহী তারপর এক কোপে কেটে দিল রিঙ্কুর হাতের দড়ি।

তারপর রাশ টেনে ছুটন্ত ঘোড়াটাকে থামাতেই ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু' পা তুলে। ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে এনে অশ্বারোহী ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল। দড়িটা কাটবার পর রিঙ্কু উঠে দাঁড়াতেই সেই অশ্বারোহী এক হাতে রিঙ্কুকে তুলে নিল নিজের ঘোড়ায়। তারপর ঘোড়াটা প্রায় ক্যামেরার ওপর দিয়েই লাফিয়ে চলে গেল। অশ্বারোহী আবার চিৎকার করে উঠল, "হা-রে-রে-রে!"

সব ব্যাপারটা ঘটে গেল প্রায় চোখের নিমেষে। অন্য সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অনেকেই ভাবল, সেই ব্যাপারটাও বোধহয় সিনেমার গল্পের মধ্যে আছে।

মোহন সিং উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগল, "পাকড়ো! পাকড়ো! উসকো পাকড়ো! ডাকু!"

অশ্বারোহীটি মন্দিরের এলাকা পেরিয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে। এবার সে ফুর্তিতে বলে উঠল, "পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা! পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা! কেমন দিলুম, অ্যাঁ? ঠিক নিক অফ দা টাইমে এসে পড়েছি! কী গো, রিঙ্কু, খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে, তাই না?"

রিঙ্কু বলল, "রঞ্জন! তুমি কোথায় ছিলে?"

রঞ্জন বলল, "তোমার কাছেই ছিলুম, চিনতে পারোনি তো? সৈন্য সেজে ছিলুম, ক্যামেরার সামনে শুটিং করলুম ঘোড়া ছুটিয়ে।"

রিঙ্কু বলল, "সৈন্য সাজলে কী করে?"

রঞ্জন বলল, "খুব সোজা! আমাকে শরবত খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে কোথায় যেন ফেলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। এত বড় লাশ তো আর বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাই ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক ব্যাটা। কিন্তু আমাকে তো চেনে না। দেড় গেলাস শরবত খেয়ে টক্ করে অজ্ঞান হয়ে গেলেও জ্ঞান ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি। ভেজাল, ভেজাল, আজকাল বিষেও ভেজাল! জ্ঞান ফেরার পরেই আমি সেই ব্যাটাকে কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেললুম। তারপর তার সঙ্গে আমার পোশাক বদলা-বদলি করে ফিরে এলুম এখানে। সৈন্যদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিলুম।"

রিঙ্কু বলল, "উঃ, রঞ্জন, যদি আর একটু দেরি করতে, তা হলে আমি বোধহয় মরেই যেতুম!"

রঞ্জন বলল, "কেন, পাথরে নাক ঘষে গেছে বুঝি? মুখখানা নষ্ট হয়ে যায়নি তো? তোমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমি একবার পাগল, একেবারে পাগল বলে হাসলুম, তখন আমার গলা শুনেও চিনতে পারোনি?"

রিঙ্কু বলল, "খেয়াল করিনি। তখন মনের অবস্থা এমন ছিল..."

রঞ্জন বলল, "ভয় পেয়ে কাঁদছিলে !"

রিঙ্কু বলল, "মোটেই আমি কাঁদিনি ! রঞ্জন, রঞ্জন, পিছনে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, ওরা তাড়া করে আসছে।"

রঞ্জন বলল, "শক্ত করে ধরে থাকো, পাগলি ! এবারে ঘোড়াটাকে পক্ষিরাজের মতন উড়িয়ে নিয়ে যাব !"

রিঙ্কু বলল, "সাবধান, সাবধান ! সামনে একটা পাঁচিল, এদিকে যাওয়া যাবে না !"

রঞ্জন বলল, "অন্ধকারে যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

রঞ্জন ঘোড়াটাকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিতেই কোনাকুনি এসে কয়েকজন অশ্বারোহী তাকে প্রায় ধরে ফেলল।

রঞ্জন বলল, "কুছ্ পরোয়া নেই। ডরো মত্ রিঙ্কু !"

তার পাশে একজন অশ্বারোহী আসতেই রঞ্জন তার তলোয়ার তুলল। অন্য অশ্বারোহীটির হাত থেকে দু-তিনবার আঘাতেই খসে গেল তলোয়ার।

রঞ্জন বলল, "আরে ব্যাটা, তোরা তো সিনেমার জন্য সৈন্য সেজেছিস। তোরা আমার সঙ্গে লড়তে পারবি ? আমি পয়সা খরচ করে ফেনসিং শিখেছি।"

দ্বিতীয় সৈন্যটির তলোয়ারে আঘাত করতে-করতে রঞ্জন বলল, "ইশ, এই লড়াইটার কেউ ছবি তুলছে না ? তা হলে একটা রিয়েল ফাইটিং-এর ছবি হত। আমার ভাগ্যটাই খারাপ !"

দ্বিতীয় অশ্বারোহীটিও হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর এগিয়ে এল মোহন সিং।

রঞ্জন বলল, "এই তো, এবার রিয়েল ভিলেইন এসেছে ! এবার তোমাকে পেয়েছি চাঁদু ! দস্যু মোহন সিং, আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন !"

মোহন সিং বলল, "কোথায় পালাবি তুই ? এই দ্যাখ, তোকে খতম করছি !"

মোহন সিং ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে দু' হাতে তলোয়ারটা ধরে প্রচণ্ড জোরে একটা কোপ মারতে গেল রঞ্জনের পিঠে। রঞ্জন সামান্য একটু সরে গিয়ে সেই কোপটা এড়িয়ে গেল। হাসতে-হাসতে বলল, "এ ব্যাটা কিস্যু জানে না। শুধু গণ্ডারের মতন গায়ের জোর দেখাতে এসেছে। দু' হাতে কেউ সোর্ড ধরে ! এটা কি গদা পেয়েছিস ?"

মোহন সিং দ্বিতীয়বার তলোয়ার তোলার আগেই রঞ্জন তার কব্জিতে একটা আঘাত করল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মোহন সিং পড়ে গেল তার ঘোড়া থেকে।

রঞ্জন বলল, "এবার এ-ব্যাটার গলাটা কেটে ফেলি, কী বলো রিঙ্কু ?"

রিঙ্কু বলল, "ছিঃ ! তুমি মানুষ খুন করবে নাকি ! মানুষকে কখনও মারতে

নেই !”

রঞ্জন বলল, “এই তো মুশকিল, আমাদের বড্ড দয়ার শরীর। এ ব্যাটা সত্যি-সত্যি মানুষ কি না, সে বিষয়ে তুমি কি শিওর ?”

রিঙ্কু বলল, “তা হোক, তবু তুমি ওকে মেরো না !”

রঞ্জন বলল, “একেবারে মেরে ফেলব না। তবে কিছু শাস্তি দেবই। তোমাকে মাটিতে ঘষটেছে, ওকে আমি ঘোড়া দিয়ে মাড়িয়ে দেব !”

মোহন সিং ডান হাতের রক্তমাখা কব্জিটা বাঁ হাতে চেপে ধরে কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জন হুড়মুড় করে ঘোড়াটা চালিয়ে দিল তার গায়ের ওপর দিয়ে।

ঘোড়াটাকে আবার ফিরিয়ে বলল, “একবারে হয়নি, আরও দু-তিনবার দিতে হবে।”

রিঙ্কু বলল, “না, রঞ্জন, আর থাক।”

হঠাৎ দুটো বন্দুক গর্জে উঠল দূর থেকে।

রঞ্জন বলল, “রিঙ্কু, মাথা নিচু করো, মাথা নিচু করে প্রায় শুয়ে পড়ো ! গুলি ছুঁড়ছে !”

মোহন সিংকে ছেড়ে সে ঘোড়াটা ছোটাল অন্যদিকে। বিড়বিড় করে বলল, “কাওয়ার্ডস ! আনফেয়ার মিন্‌স নিচ্ছে ! আমার কাছে বন্দুক-পিস্তল কিচ্ছু নেই, তবু ওরা গুলি ছুঁড়ছে কেন ? সামনাসামনি লড়ে যাবার হিম্মত নেই !”

মাঝে-মাঝেই এক-একটা ভাঙা দেওয়াল এসে পড়ছে বলে ঘোড়ার মুখ ফেরাতে হচ্ছে বারবার। একটা দিক অনেকটা ফাঁকা পেয়ে রঞ্জন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল প্রচণ্ড জোরে। গুলির আওয়াজ আর শোনা গেল না।

রিঙ্কু বলল, “আস্তে, এবার একটু আস্তে। আর আমি ধরে থাকতে পারছি না ! পড়ে যাব !”

রঞ্জন বলল, “ঘোড়া এখন পক্ষিরাজ ! আর কে ধরবে আমাদের !”

বলতে-বলতেই ঘোড়াটা একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিল সামনে। সবাই মিলে একসঙ্গে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল জলে। সেখানে একটা নদী।

রঞ্জন বলল, “যাক, ভালই হল। আজ সারাদিন স্নান করা হয়নি, মনে আছে ? তুমিও অনেক ধুলোবালি খেয়েছ। এবার নদীতে ভাল করে স্নান করা যাবে !”

॥ ৮ ॥

ত্রিশূলটা সন্তুর হাতে দিয়ে কাকাবাবু টর্চ নিয়ে এগোচ্ছেন সামনে-সামনে। তাঁর পেছনে সন্তু। তারপর জোজো। বিরজু সিং জোজোর চুলের মুঠি ধরে

আছে এক হাতে, অন্য হাতে রিভলভারটা রেডি রেখেছে।

সিঁড়িটা শুধু যে সরু তাই নয়, মাঝে-মাঝে দু-একটা ধাপ একেবারে ভাঙা। কাকাবাবু একটা ক্রাচ বাড়িয়ে আগে দেখে নিচ্ছেন পরের ধাপটা আছে কি না, তারপর পা ফেলছেন। সন্তু পেছন থেকে ধরে আছে কাকাবাবুর কোমর, যাতে তিনি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে না যান।

সন্তু নিজেই আগে-আগে যেতে চেয়েছিল, কাকাবাবু রাজি হননি। তিনি কয়েকবার জোরে নিশ্বাস টেনে বললেন, "একটা বিচ্ছিরি গন্ধ পাচ্ছি। কিসের গন্ধ বলতে পারিস?"

সন্তু বলল, "বুঝতে পারছি না। কিছু একটা পচা গন্ধ মনে হচ্ছে।"

প্রায় তিরিশটা সিঁড়ি নামবার পর টর্চের আলোয় চক চক করে উঠল কালো জল।

কাকাবাবু বললেন, "এই রে, এখানে জল দেখছি। কতটা গভীর কে জানে!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমি নেমে দেখব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আগেই তোর নামবার দরকার নেই। আমি দেখে নিচ্ছি।"

সিঁড়ির ওপর বসে তিনি একটা ক্রাচ বাড়িয়ে দিলেন সামনে। সেটা বেশি ডুবল না। মাটিতে ঠকঠক শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে জল বেশি নেই। সামনে আর সিঁড়িও নেই, শক্ত মাটি। এখন চিন্তার কিছু নেই।"

সেই জলের মধ্যে এগোতে-এগোতে এক জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। তারপর আবার জল কমে গেল। খানিকটা জায়গা একেবারে শুকনো।

কাকাবাবু বললেন, "এই রাস্তাটা উঁচু-নিচু। যেখানটা ঢালু, সেখানে জল জমে আছে!"

জোজো বলল, "এত নীচে জল এল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।"

সন্তু বলল, "মাটির তলা থেকে জল উঠতে পারে। এরকম একটা গভীর কুয়ো খুঁড়লে কি জল বেরোত না?"

কাকাবাবু বললেন, "এসব পাথুরে দেশে অনেক গভীর করে কুয়ো খুঁড়তে হয়। তা ছাড়া যেখানে মাটির তলা থেকে জল ওঠে, সেখানে কি রাজারা গুপ্ত ঘর বানাত? কী জানি, দেখা যাক।"

জোজো বলল, "এই লোকটা আমার চুল খামচে ধরে আছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যিই তো। ওর চুল চেপে ধরার কী দরকার?"

টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে তিনি বিরজু সিংকে বললেন, "এই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও না! আমরা তো আর পালাচ্ছি না এখান থেকে!"

বিরজু সিং গম্ভীরভাবে বলল, "নেহি ! নেহি ছোড়ে গা !"
কাকাবাবু বললেন, "এ তো আচ্ছা গোঁয়ার দেখছি !"
জোজো সন্তুর কোমরে একটা খোঁচা মেরে কী যেন ইঙ্গিত করল। তারপর সে কাকুতিমিনতি করে বলল, "ও সিংজি ! একবার একটু ছাড়ো। আমার খুব মাথা চুলকোচ্ছে। একবার চুলকে নিই ?"
বিরজু সিং হাতের মুঠিটা আলগা করল।
জোজো পকেট থেকে হাত বার করে মাথা চুলকোবার জন্য ওপর দিকে হাত তুলেই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিল বিরজু সিং-এর চোখে।
বিরজু সিং 'মর গয়া, মর গয়া' বলে আর্তনাদ করে উঠল। সেই অবস্থাতেই এক হাতে চোখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে গুলি চালাতে গেল, সন্তু তার ত্রিশূলটা দিয়ে খুব জোর মারল সেই হাতে।
হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ে গেলেও বিরজু সিং অন্ধের মতন লাফিয়ে জোজোকে জাপটে গলা টিপে ধরল। এবার সন্তু আর এক ঘা ত্রিশূল কষাল তার মাথায়।
বিরজু সিং 'আঃ' বলে ঢলে পড়ে গেল।
কাকাবাবু বললেন, "কী করলি রে, মেরে ফেললি নাকি লোকটাকে ?"
সন্তু বলল, "না। ত্রিশূলের পাশ দিয়ে মেরেছি। গেঁথে দিইনি। অজ্ঞান হয়ে গেছে। জোজো, তুই কী করলি রে, লোকটাকে ?"
জোজো বলল, "সেই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। সকালবেলা পকেটে নিয়েছিলুম মনে নেই ? কাজে লেগে গেল !"
সন্তু বলল, "তুই যে এবার সত্যিই দারুণ কাণ্ড করে ফেললি রে, জোজো ! আমি আগে বুঝতেই পারিনি।"
জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "এ আর এমনকী ? এরকম কত গুণ্ডাকে আমি আগে ঘায়েল করেছি ? একবার ইজিপ্টে..."
কাকাবাবু বললেন, "এবার থেকে জোজোর সব কথাই বিশ্বাস করতে হবে। লোকটাকে যখন অজ্ঞান করেই ফেলেছিস, তা হলে ওর হাত-পা বেঁধে ফ্যাল। নইলে কখন আবার পেছন থেকে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে !"
জোজো বলল, "দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে ?"
কাকাবাবু বললেন, "দড়ি পাওয়া যাবে না। তোদের জামা দুটো খুলে তাই দিয়ে বেঁধে দে। হাত দুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে বাঁধলে আর খুলতে পারবে না। এখানে দেখছি সামনে একটা দেওয়াল। আর পথ নেই।"
টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে তিনি সেই দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকো গর্ত দেখতে পেলেন। তার মধ্যে ঢুকে গেল ত্রিশূলটা। কাকাবাবু ত্রিশূলটা ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতেই দেওয়ালটাও ঘুরতে লাগল একটু একটু করে, সেই সঙ্গে সুড়ঙ্গের ওপর দিকে বিরাট জোরে শব্দ হতে লাগল। ওপর থেকে যে

একটু-একটু আলো আসছিল, তা মুছে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার। আগেকার দিনের লোকদেরও কতখানি ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছিল দ্যাখ। এই দেওয়ালটা সরে যেতেই ওপরের সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।"

ওপরের আওয়াজটা এত জোর যে বুক কেঁপে উঠেছিল সন্তু আর জোজোর!

বিরজু সিং-এর রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এটা তো মনে হচ্ছে আমারই। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। মোহন সিং আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। সন্তু, তুই যেমন বিরজু সিং-এর মাথা ফাটালি, সেইরকম জগ্‌গু বলে একটা লোক আজ দুপুরে আমার মাথা ফাটিয়েছে। এখনও মাথাটা টনটন করছে।"

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "ওফ্‌ এতক্ষণে মুক্তি পাওয়া গেল। আজ সারাদিন বড্ড জ্বালিয়েছে ওরা। এবার আর ওপরের শিবলিঙ্গটা ওরা সরাতে পারবে না। ওটা ভাঙতেও পারবে না। কোনও কুলি-মজুরও শিবলিঙ্গ ভাঙতে রাজি হবে না। এখন হিরেটা খুঁজে পাই বা না পাই, তাতে কিছু আসে যায় না, কী বল!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, একখানা হিরের জন্য এরা এত কাণ্ড করছে কেন? এই হিরেটা কী-এমন দামি?"

কাকাবাবু বললেন, "ও, তোরা তো সব ব্যাপারটা জানিস না। আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। বিজয়নগর আর বাহমনি রাজ্যের কথা তো ইতিহাসে কিছুটা পড়েছিস। এই দুই রাজ্যে দারুণ শত্রুতা ছিল। প্রায় দুশো-আড়াইশো বছর ধরে ওদের মধ্যে লড়াই হয়েছে। কখনও বিজয়নগর জিতেছে, কখনও বাহমনি জিতেছে। তারপর হল কী এক সময় বাহমনি রাজ্য ভেঙে পাঁচ টুকরো হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই টুকরো-টুকরো হয়ে ওরা দুর্বল হয়ে পড়ল, আর বিজয়নগর হয়ে উঠল খুব শক্তিশালী! বিজয়নগরের রাজা তখন সদাশিব, তিনি ছিলেন অপদার্থ, আসল ক্ষমতা ছিল রাজারই এক আত্মীয়, রাম রায়ের হাতে। এই রাম রায় ছিলেন দারুণ বীরপুরুষ, তিনি অনেকগুলো যুদ্ধ জয় করে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওদিকে বাহমনির সুলতানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে মরছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে বিজয়নগর ধ্বংস হল কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হল কী, কয়েকটা যুদ্ধ জয় করার পর ওই রাম রায়ের দারুণ অহঙ্কার হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, বিজয়নগরের সৈন্যদের আর কেউ হারাতে পারবে না। তিনি সুলতানদের খুব অপমান করতে লাগলেন। তখন মরিয়া হয়ে সেই পাঁচজন সুলতান আবার জোট বাঁধল, তারা একসঙ্গে লড়াই করবে ঠিক করল। তাদের নেতা হলেন আলি আদিল শাহ। সেই পাঁচটি

রাজ্যের ফৌজ একসঙ্গে আক্রমণ করতে এল বিজয়নগর রাজ্য। সেখানকার রাজা তো কোনও খবরই রাখতেন না। রাম রায় অহঙ্কার নিয়ে মত্ত ছিলেন। তিনি ভাবতেন, বাহমনির সুলতানরা এই রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসই পাবে না। একদিন দুপুরে তিনি খেতে বসেছেন, এইসময় খবর পেলেন, শত্রুপক্ষ তাঁদের রাজ্যের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়েছে। খাওয়া ছেড়ে তক্ষুণি উঠে রাম রায় গেলেন যুদ্ধ করতে। তখন তাঁর বয়েস নব্বই-একানব্বই হবে! তবু সাহস ছিল খুব। বুড়ো প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা এই জন্যই রাম রায়ের পার্ট করতে চেয়েছিলেন, তাঁর বয়েসের সঙ্গে মানিয়ে যেত। যাই হোক, রাম রায় তো যুদ্ধ করতে গেলেন, সৈন্যদের বললেন, 'আলি আদিল আর অন্যান্য সুলতানদের প্রাণে মারবে না। জ্যান্ত ধরে আনবে, আমি তাঁদের খাঁচায় পুরে পুষব।' কিন্তু ঘটনা ঘটল ঠিক উলটো। রাম রায় যুদ্ধে যেতে-না-যেতেই শত্রুপক্ষের একটা হাতি পাগলা হয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল এদিকে। সেই পাগলা হাতির তাণ্ডবে কাছাকাছির সৈন্যরা ভয়ে দৌড়তে লাগল। রাম রায় একটা চতুর্দোলা চেপে ছিলেন, সেটা থেকে তিনি পড়ে গেলেন। অমনি শত্রুপক্ষের কিছু সৈন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গেল সুলতানের কাছে। সুলতান একটুও দেরি না করে রাম রায়ের মুণ্ডুটা কেটে ফেলে একটা লম্বা বর্শার ফলকে গেঁথে উঁচু করে দেখাতে লাগলেন বিজয়নগরের সৈন্যদের। রাম রায়ের কাটা মুণ্ডু দেখেই বিজয়নগরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল, ঠিকঠাক লড়াই হলে তারা জিততেও পারত, কিন্তু একজন ভাল সেনাপতির অভাবে তারা গো-হারান হেরে গেল, যে যেদিকে পারল পালাল। যুদ্ধে জয়ী হবার পর আলি আদিল ঠিক করলেন, বিজয়নগরের রাজধানীটাকেই একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন, যাতে এ-রাজ্য আর কোনওদিন উঠে দাঁড়াতে না পারে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বিজয়নগর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

সন্তু বলল, "পুরো শহরটাকেই ধ্বংস করে দিল?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, মন্দির-টন্দির সব। হাজার-হাজার লোককে মেরে ফ্যালে। দুটো-একটা মন্দির শুধু টিকে গেছে, আর রাজপ্রাসাদের খানিকটা অংশ। মোটকথা বিজয়নগর চিরকালের মতন ধ্বংস হয়ে গেল, তারপর আর এখানে মানুষ থাকেনি, চারশো বছর ধরে এইরকম ধ্বংসস্তূপ হয়েই পড়ে আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে সেই হিরেটা?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার হিরের কথাটা বলছি। তখন ইওরোপিয়ান বণিকরা এদেশে আসতে শুরু করেছে। বিজয়নগরের জাঁকজমক দেখে তারা অবাক হয়ে যেত। ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্যের শেষ ছিল না। কেউ-কেউ বলেছে, বিজয়নগর রোমের চেয়েও বড় শহর ছিল। পর্তুগিজ, ইতালিয়ান

পর্যটকরা বিজয়নগরের কথা লিখে গেছেন। এখানে তখন অনেক হিরে পাওয়া যেত। গোলকুণ্ডার হিরের খনিও ছিল বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যেই। তার মধ্যে কয়েকজন পর্যটক একটা হিরের কথা লিখেছে। যেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। সেই হিরেটা নাকি একটা মুরগির ডিমের সমান! পৃথিবীতে এতবড় হিরে আজও কেউ দ্যাখেনি। সেই হিরেটা গেল কোথায়?"

সন্তু বলল, "সুলতানের সৈন্যরা যখন বিজয়নগর ধ্বংস করে তখন নিশ্চয়ই লুটপাটও করেছিল। তারা সেই হিরেটা পায়নি!"

কাকাবাবু বললেন, "লুটপাট তো করবেই। গোরুর গাড়ি ভর্তি করে সোনাদানা আর হিরে-জহরত নিয়ে গেছে। রাম রায় মারা যাবার পর রাজা সদাশিবও তাড়াতাড়িতে যা পেরেছেন সোনাদানা নিয়ে পালিয়েছিলেন। কিন্তু মুরগির ডিমের মতন হিরেটা তাঁর কাছে ছিল না। অনেকে বলে যে, বিজয়ী বীর হিসেবে আলি আদিল শাহ সেই হিরেটা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাও বোধহয় সত্যি না। তারপর সেটা গেল কার কাছে? অতবড় হিরেটা তো হারিয়ে যেতে পারে না? মোগল সম্রাট শাজাহানের কাছে যে কোহিনূর ছিল, সেটা নানান হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং-এর নাবালক ছেলের কাছ থেকে ইংরেজরা নিয়ে নেয়। সেটা এখনও ইংল্যান্ডের রানির সম্পত্তি। আর কোহিনূরের চেয়েও বড় একটা হিরে সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মানুষের কৌতূহল তো থাকবেই?"

জোজো বলল, "হিরেটা তা হলে এখানেই আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "বহু লোক এখানে এসে বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা খোঁজাখুঁজি করেছে। আমিও একবার এসে খুঁজে গেছি। কেউ কোনও সন্ধান পাইনি। কিন্তু হিরে তো কখনও ভাঙে না, বা নষ্ট হয় না, তা হলে সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে কী করে! অনেকের ধারণা হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই কোনও রাজা-বাদশার হাত থেকে নদীতে বা সমুদ্রে পড়ে গেছে। এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু প্রোফেসর ভগবতীপ্রসাদ শর্মা ওই হিরেটার সন্ধানে বহু বছর ধরে লেগেছিলেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, হিরেটা এখানেই আছে। হঠাৎ কিছুদিন আগে তিনি একটা পুঁথির খোঁজ পান। সেই পুঁথিতে লেখা আছে যে, রাম রায় সেই হিরেটা বিঠলস্বামীর মন্দিরে দান করেছিলেন। অত দামি জিনিস বাইরে রাখা হত না। এই মন্দিরেরই কাছাকাছি কোনও গুপ্ত জায়গায় সাবধানে রাখা থাকত।"

সন্তু বলল, "পুঁথি মানে কী জানিস তো জোজো? পুরনো আমলের হাতে-লেখা বই। পুঁথির মালার পুঁথি নয়।"

জোজো বলল, "জানি, জানি। এ তো সবাই জানে!"

সন্তু বলল, সুলতানরা এই মন্দিরটা কেন ভাঙল না? এখানে কেন লুটপাট করেনি? আপনি কী কী যেন বাজনার কথা বললেন তখন!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটাও একটা গল্পের মতন। সুলতানদের বাহিনী যখন বিজয়নগর ধ্বংস করার জন্য কামান দাগতে এগোচ্ছে, তখন কামানের আওয়াজ এক-একবার থামতেই তারা সুন্দর টুংটাং, ঝুনঝুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ঠিক যেন কোনও মিষ্টি বাজনার মতন। তারা তো দারুণ অবাক। এইরকম সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধের মধ্যেও কে বাজনা বাজাবে? আরও একটু এগিয়ে এসে দেখল, এই মন্দিরের বারান্দায় পাকা চুল-দাড়ি আর ধপধপে সাদা কাপড় পরা একজন পুরোহিত একা দাঁড়িয়ে আছে, আর এই মন্দিরের থাম থেকে আপনি-আপনি বাজনার শব্দ হচ্ছে। তখন সৈন্যরা ভাবল, এটা কোনও অলৌকিক ব্যাপার। তারা ভয়ে আর এই মন্দিরের কাছ ঘেঁষল না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, এই মন্দিরের থামগুলো বিশেষ কায়দায় তৈরি। কিছু দিয়ে আস্তে টোকা মারলেই সুন্দর গানের সুরের মতন শব্দ হয়। সেদিন কামানের প্রচণ্ড গর্জনে যে ভাইব্রেশান হচ্ছিল, তাতেই মন্দিরের থাম থেকে আপনি-আপনি সুর বেরোচ্ছিল। সেই সুর শুনে সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালাল বলেই মন্দিরটা বেঁচে গেল। এখনও এই মন্দিরের থামে টোকা দিলে সেই সুর শোনা যায়। রঞ্জনকেও ওই বাজনা শোনাব বলেছিলাম। ও হ্যাঁ, রঞ্জনেরা কোথায় গেল? রঞ্জন-রিঙ্কুকে দেখিসনি?"

সন্তু বলল, "না। জোজো আর আমি আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলুম ওই শরবত খেয়ে!"

জোজো বলল, "রঞ্জনদা দেড়-গেলাস খেয়েছিল। হয়তো রঞ্জনদার এখনও জ্ঞান ফেরেনি।"

সন্তু বলল, "আমাদের চেয়ে রঞ্জনদার চেহারা অনেক বড়। তাড়াতাড়ি হজম করে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের দু'জনকে যেখানে ওরা ফেলে এসেছিল, সেখানে রঞ্জনদা-রিঙ্কুদি বোধহয় ছিল না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের কোথায় ফেলে দিয়ে এসেছিল?"

জোজো বলল, "অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যেভাবে আমরা ফিরে এসেছি, তা আপনি শুনলে..."

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, সে-ঘটনা পরে শুনব। রঞ্জন-রিঙ্কুর জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব। কিন্তু এখন কিছু উপায়ও তো নেই। এখান থেকে বেরিয়ে ওদের খোঁজ করতে হবে।"

জোজো বলল, "এখান থেকে আমরা কী করে বেরোব? ওপরে উঠলেই তো ওরা ধরবে!"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওপরে আর ওঠা যাবে না! সাধারণত এই ধরনের সুড়ঙ্গের দুটো মুখ থাকার কথা। শেষ পর্যন্ত গিয়ে তো দেখা যাক। চল, অনেকক্ষণ বিশ্রাম আর গল্প হয়েছে।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এই বিরজু সিং এখানে পড়ে থাকবে ?"

সন্তু বলল, "তা না তো কি ওকে টেনে-টেনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব নাকি !"

জোজো বলল, "আমি ওর চুল ধরে নিয়ে যেতে পারি। ও আমার চুলের মুঠি ধরে অনেক ঝাঁকিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ও এখানেই থাক। পরে ওকে ছেড়ে দেবার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

খানিকটা এগোতেই সামনে আবার খানিকটা জল দেখা গেল। তার মানে এইখানটা ঢালু। ওরা জলে পা দিতেই একটু দূরে, কী যেন খলবল করে উঠল জলের মধ্যে। তিনজনেই চমকে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

জোজো ভয় পেয়ে বলল, "সাপ ! মাটির তলায় সাপ থাকে ?"

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখতে লাগলেন। আর একবার খলবল করে শব্দ হতেই তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সাপ নয়, মাছ !"

সন্তু বললেন, "মাটির তলায় সাপ যদিও বা থাকতে পারে, মাছ আসবে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "যাত্রাপথে মাছ দেখা শুভলক্ষণ।"

সন্তু বলল, "এতক্ষণে আর-একটা জিনিস বুঝতে পারলুম। আমরা যে পচা গন্ধটা পাচ্ছিলুম, সেটা আসলে মাছ পচা গন্ধ। এই জলে মাছ থাকলে তা তো খাবার কেউ নেই। একসময় কিছু-কিছু মাছ মরে পচেও যায় নিশ্চয়ই !"

কাকাবাবু বললেন, "এটা ঠিকই বলেছিস। মাছ পচা গন্ধই বটে !"

জোজো হঠাৎ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে চেপে ধরল, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কাকাবাবু, ওটা কী ? ওখানে কে বসে আছে ?"

দৃশ্যটা দেখে ভয় পাবারই কথা। জলটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক তার পাশেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসানো আছে একটি মানুষের কঙ্কাল। শুধু হাড়গুলোই দেখা যাচ্ছে টর্চের আলোয়, কিন্তু তার বসে থাকার ভঙ্গিটার জন্যই মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত। যেন কঙ্কালটা মাথা নিচু করে কিছু একটা চিন্তা করছে, এক্ষুনি মুখ তুলে চাইবে !

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো চারশো বছর আগে লোকটা ওই গুপ্ত সুড়ঙ্গের প্রহরী ছিল। কোনও একদিন সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর খোলেনি, ওর চিৎকারও কেউ শুনতে পায়নি।"

সন্তু বলল, "কিন্তু বসে-বসে কি কেউ মরে ? মরার সময় তো শুয়েই পড়ে সবাই।"

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে-শুয়ে মরার পরও অনেক সময় মৃতদেহটা আস্তে-আস্তে উঠে বসে। এরকম আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

জোজো বলল, "ওইটার পাশ দিয়ে আমাদের যেতে হবে ?"

সন্তু বলল, "ভয়ের কী আছে ? কঙ্কাল মানে তো ভূত নয়। এই দ্যাখ, আমি যাচ্ছি !"

সন্তু আগে-আগে চলে গেল, জোজো কাকাবাবুকে ধরে রইল। কঙ্কালটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে চোখ বুজে ফেলল।

বেশ জোরে-জোরেই সে বলল, "হে ভগবান, এখান থেকে কী করে বেরোব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এ-লোকটা প্রহরীই ছিল, ওর পাশে একটা মরচে-ধরা তলোয়ার পড়ে আছে। এখানে প্রহরী বসিয়ে রাখত, তার মানে কাছাকাছি রত্ন ভাণ্ডার থাকার কথা !"

জোজো বলল, "আমাদের অবস্থাও বোধহয় ওই লোকটার মতনই হবে। সুড়ঙ্গের ওপরটা যদি আর না খোলে !"

কাকাবাবু বললেন, "অত ঘাবড়াসনি রে জোজো, তাতে কোনও লাভ হবে না। আগে শেষ পর্যন্ত দেখে নি।"

একটু পরেই আবার একটা ঢালু জায়গা, সেখানেও জল জমে আছে। সন্তু ছপছপ করে আগে এগিয়ে গেল। জোজো এখনও কাকাবাবুর হাত ছাড়েনি। একটু অসাবধান হতেই কাকাবাবুর হাত থেকে টর্চটা জলে পড়ে গেল। কাকাবাবু হাত ডুবিয়ে টর্চটা খুঁজতে লাগলেন, তাঁর হাতের ওপর দিয়ে দু-একটা মাছ চলে গেল।

সুড়ঙ্গটা অন্ধকার হয়ে গেছে, তারই মধ্যে সামনে একটা হুড়মুড় শব্দ হল। তারপরই সন্তু চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাকাবাবু ! আমায় ধরেছে !"

কোনওরকমে টর্চটা তুলে সেদিকে আলো ফেলতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। নীল আগুনের টুকরোর মতন।

চোখ দুটো দেখেই কাকাবাবু চিনতে পেরেছেন। কিন্তু এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন তিনি। টর্চের আলো তাঁর হাতে কেঁপে যাচ্ছে। দরদর করে ঘাম বেরোতে লাগল শরীর দিয়ে।

জোজো বলল, "ওরে বাবা, ফোঁসফোঁস শব্দ হচ্ছে !"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, ভয় পাসনি, তুই টর্চটা ধর। ওই চোখ দুটোর ওপর থেকে আলো সরাবি না। সন্তু, নড়াচড়া করিস না। এতবড় সাপের বিষ থাকে না। তুই শুধু নিজের চোখ দুটো ঢেকে থাক। চোখে যেন না কামড়ায়। গুলি করতে পারছি না। তোর গায়ে লাগবে।"

কাকাবাবু পিছিয়ে গিয়ে সেই কঙ্কালটার পাশ থেকে মরচে-পড়া তলোয়ারটা তুলে নিয়ে এলেন। ফিরে এসে সন্তুর খুব কাছে এগিয়ে গেলেন। সন্তু আঃ-আঃ করে কাতরাচ্ছে। জোজোর হাতেও টর্চটা কাঁপছে।

কাকাবাবু তলোয়ারের ডগাটা দিয়ে সাপটাকে চেপে একটা খোঁচা মারবার

চেষ্টা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে রেগে খুব জোরে ফোঁস করে সাপটা অনেকটা মুখ বাড়িয়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুকে। কাকাবাবু বিদ্যুৎবেগে সাপটার গলায় একটা কোপ বসালেন। মরচে পড়া তলোয়ারে সাপটার গলা মোটেই কাটল না, কিন্তু কাকাবাবু তলোয়ার দিয়ে সাপটার মাথা ঠেসে ধরলেন জলের মধ্যে।

সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু, ও আমার পা'টা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, লেজের দিকটা চেপে ধরে খোলবার চেষ্টা কর।"

প্রাণপণ শক্তিতে ডান হাতের তলোয়ার দিয়ে জলের মধ্যে সাপটার গলা চেপে রেখে কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে রিভলভারটা বার করলেন। তারপর খুব সাবধানে টিপ করে জলের মধ্যেই গুলি চালালেন দু'বার।

তারপর দারুণ পরিশ্রান্তভাবে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু-জোজো, সাবধান। এরকম সাপ সাধারণত একজোড়া থাকে। আর-একটা আছে বোধহয়। তোরা খুঁজে দ্যাখ। আমি বসে একটু রেস্ট নিই।"

সাপটা ময়াল জাতের। সন্তুর পা পড়ে গিয়েছিল ওর গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে ও সন্তুর ডান পায়ে সাতটা পাক দিয়েছিল। আর একটুক্ষণ বেঁচে থাকলেই সাপটা সন্তুর পায়ের হাড় মুড়মুড়িয়ে ভেঙে দিত।

একটু সুস্থ হবার পর জোজোর কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে সন্তু সুড়ঙ্গের সামনের দিকটা দু'দিকের দেওয়ালের গা ভাল করে দেখতে লাগল। দ্বিতীয় সাপটার কোনও চিহ্ন নেই।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "এখানের মাছগুলো ওই সাপের খাদ্য।"

সন্তু সে-কথা শুনতে পেল না। সুড়ঙ্গের একদিকের দেওয়ালে কুলুঙ্গির মতন একটা জায়গায় কাটা। সেখানে আলো ফেলতেই কী-যেন ঝকঝক করে উঠছে। সে বারবার সেখানে আলো ফেলছে। ওখানেই কি দ্বিতীয় সাপটা আছে, তার চোখ ঝকঝক করছে?

কাকাবাবুও সেই আলোর ঝিলিক দেখতে পেলেন একবার। সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে এসে তিনি চিৎকার করে বললেন, "বিজয়নগরের হিরে!"

কুলুঙ্গিতে ভেতরের দৃশ্যটা অদ্ভুত!

সামনেটা মাকড়সার জাল দিয়ে প্রায় ঢাকা। সেই জাল ছিঁড়তেই দেখা গেল, সেখানেও বসানো রয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল। মাত্র তিন-চার বছরের শিশুর কঙ্কাল বলে মনে হয়। সেই কঙ্কালটার সামনে অনেকরকম লাল-সবুজ-নীল পাথরের টুকরো ছড়ানো। কঙ্কালটার ঠিক কোলের কাছে রয়েছে, অবিকল মুরগির ডিমের মতনই একটা পাথর, আলো পড়লেই তা থেকে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি বেরিয়ে আসছে।

কাকাবাবু খুব সাবধানে সেই পাথরটা বার করে এনে বললেন, "তা হলে সত্যি আছে। বিজয়নগরের হিরে। প্রোফেসর শর্মা এখানে থাকলে কত খুশি হতেন। এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমরা প্রোফেসর শর্মাকেই দেব, কী বলিস,

সন্তু ?"

সন্তু বলল, "আমি একবার হাতে নিয়ে দেখব ?"

জোজো আর সন্তু দু'জনেই হিরেটাকে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখল। হাতে নিলে খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু বলে মনে হয় না। এর যে এত দাম বোঝাও শক্ত।

কাকাবাবু বললেন, "অনেক কালের ধুলো জমেছে। পালিশ করাতে হবে। নতুন করে কাটাতেও হবে। ঠিক মতন কাটার ওপরেই হিরের সৌন্দর্য ঠিকমতন খোলে। অন্য পাথরগুলোও খুব দামি হবে নিশ্চয়ই, ওগুলোও পকেটে ভরে নে। এবার শিগগির বেরিয়ে পড়তে হবে।"

জোজো রঙিন পাথরগুলো পকেটে ভরতে ভরতে বলল, "কোনদিক দিয়ে বেরোব ?"

কাকাবাবু বললেন, সাপটাকে দেখে একটা জিনিস বোঝা গেল। মাছ দেখেও আমার সেই কথাই মনে হয়েছিল আগে। এখানে বাইরে থেকে জল ঢুকে পড়ে। খুব সম্ভবত কাছাকাছি একটা নদী আছে। জলের সঙ্গে মাছও আসে, তারপর ঢালু জায়গাতে আটকে যায়। সেই মাছ খেতে সাপ আসে। সুতরাং নদীর দিকে একটা বেরোবার রাস্তা আছেই।"

এরপর আরও দু'জায়গায় ঢালু জলাশয় পড়ল। প্রত্যেকটাতেই দ্বিতীয় সাপটা আছে কি না ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর ওরা নামল। এদিকের মাছগুলো ছোট-ছোট মৌরলা মাছের মতন, জলও অনেক পরিষ্কার। পাথরের দেওয়াল পড়ল আর একটা। সেটা খুলতে হল ত্রিশূল দিয়ে।

সুড়ঙ্গটা একটা বাঁক নিতেই দেখা গেল একটা লোহার দরজা। কিন্তু তার একটা দিক কিছুটা ভাঙা। সেখান দিয়ে এখনও জল ঢুকছে একটু-একটু।

কাকাবাবু বলেছিলেন না, এইসব সুড়ঙ্গে রাজারা সবসময় একটা বেরোবার রাস্তা রাখত। বহুকালের পুরনো দরজা, জল লেগে মরচে পড়ে খানিকটা ভেঙে গেছে।

দরজাটায় ভেতরের দিকে হুড়কো লাগানো। সেটা ধরে খানিকক্ষণ টানাটানি করতে খুলে গেল। দরজাটা ফাঁক করতেই দেখা গেল একটু নীচে একটা নদী।

বাইরে এসে বড়-বড় নিশ্বাস নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আঃ, কী আরাম ! ভেতরে যেন দম আটকে আসছিল শেষ দিকে।"

সন্তু বলল, "ভোর হয়ে আসছে। একটু-একটু আলো ফুটেছে।"

জোজো বলল, "সত্যি বেঁচে গেলুম ! অ্যাঁ ? এই সন্তু !"

বাইরের জায়গাটা উঁচু টিবির মতো। চতুর্দিকে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। সেইজন্যই লোহার দরজাটা দেখা যায় না। অবশ্য ভেতরেও সুড়ঙ্গের মাঝখানে নিরেট পাথরের দেওয়াল আছে। ত্রিশূলের চাবি ছাড়া যা খোলা যায় না। সেই

পাথরের দেওয়ালের তলা দিয়ে জলের সঙ্গে সাপ বা মাছ্ যেতে পারে। মানুষের গলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের চেষ্টা করতে হবে নদীটা পার হয়ে যেতে। তারপর হসপেটে গিয়ে বাঙ্গালোরে ফোন করে সব জানাব। হসপেট থানা থেকে পুলিশ এনে ধরতে হবে মোহন সিং-এর দলটাকে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওই দেখুন, খানিকটা দূরে একটা গোল নৌকো দেখা যাচ্ছে। ওটা বোধহয় খেয়াঘাট। ওখান দিয়ে নদী পার হওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "চল তা হলে, ওইদিকেই যাই। এখন বিশ্রাম নিলে চলবে না। নদীটা পার হওয়া আগে দরকার।"

পুব আকাশে লাল রঙের সূর্য উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ভোরের সূর্যের রং টুকটুকে লাল হলেও ভোরের আলোর রং নীলচে। শোনা যাচ্ছে পাখির কিচিরমিচির।

কাকাবাবু এক জায়গায় থমকে গিয়ে বললেন, "দিনের আলোয় একবার হিরেটা দেখি। এটা তো গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতেই হবে, তার আগে একবার ভাল করে দেখে নি।"

কাকাবাবু সূর্যের দিকে মুখ করে দু'হাত ঘুরিয়ে হিরেটা দেখছেন আচমকা ঢিবির ওপর থেকে একটা লোক লাফিয়ে পড়ল তাঁর সামনে। লোকটার হাতে একটা রাইফেল ! তারপরই নেমে এল একটি মেয়ে। কস্তুরী আর জগ্‌গু !

কস্তুরী বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি খুব ধোঁকাবাজ তাই না ? আমাকে ফাঁকি দেবেন ! আপনি কস্তুরীকে চেনেননি ভাল করে। দু'ঘন্টা ধরে বসে আছি এখানে। আপনাদের জন্য। দিন, আমায় হিরেটা দিন !"

কাকাবাবু জগ্‌গুর দিকে তাকালেন। জগ্‌গুর মুখখানা বুলডগের মতন, চোখদুটো স্থির। রাইফেলের ট্রিগারে তার হাত। কস্তুরীর হুকুম পেলেই সে যে গুলি চালাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কস্তুরী বলল, "দিন, দিন, হিরেটা দিন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে এখানে এলে ? কী করে বুঝলে যে..."

কস্তুরী বলল, "অত কথা বলার সময় নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে হিরেটা দিন আমার হাতে, নইলে এই জগ্‌গু...এক, দুই..."

কাকাবাবু হিরেটা কস্তুরীর হাতে তুলে দিলেন।

কস্তুরী হিরেটাতে চুমু খেতে-খেতে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "পেয়েছি-পেয়েছি, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি, সব কষ্ট সার্থক। বুঝলেন, বাঙালিবাবু, আমি বিঠলস্বামীর মন্দিরের পুরুতকে জেরা করে জেনেছি, এদিকে নদী আছে কি না। পুরুত এই সুড়ঙ্গের কথাও তার বাবার মুখে শুনেছে, কিন্তু কোনওদিন খুলতে দ্যাখেনি। আমি ঠিক বুঝতে পেরে চলে এসেছি নদীর ধারে। সুড়ঙ্গের

একটা মুখ এদিকে থাকবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বুদ্ধি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

কস্তুরী বলল, "হিরে পেয়ে গেছি, এবার আমিও আমার কথা রাখব। আপনাদের প্রাণে মারব না। তবে আপনারা আর আমাকে ফলো করবার চেষ্টা করবেন না। আমি নদী পেরিয়ে হসপেট স্টেশনে চলে যাব। তারপর সোজা বোম্বাই। চল, জগ্‌গু!"

জগ্‌গু কর্কশ গলায় বলল, "ঠারো! ত্রিশূল লেও, পিস্তল লেও!"

কস্তুরী বলল, "ঠিক, ঠিক তো। জগ্‌গুর সব মনে থাকে। ত্রিশূল আর রিভলভার দিয়ে দিলেই আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না! দিন!"

জগ্‌গু রাইফেলের নলটা নিচু করতেই সন্তু ত্রিশূলটা দিয়ে দিল কস্তুরীর হাতে। কাকাবাবুও পকেট থেকে বার করে রিভলভারটা দিতে বাধ্য হলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ফিরে কস্তুরী দৌড় মারল। জগ্‌গু যেতে লাগল আস্তে-আস্তে, চারদিক দেখেশুনে।

ওরা একটু দূরে চলে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "এবার ওই জগ্‌গু যদি কস্তুরীকে মেরে হিরেটা নিয়ে নেয়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। হিরে অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। একটা হিরের জন্য কত মানুষ খুন হয়। তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "তা বলে ওই লোকটা হিরেটা নিয়ে নেবে!"

জোজো বলল, "ইশ, যদি আর খানিকটা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো থাকত, তা হলে ওই জগ্‌গু ব্যাটাকে..."

কাকাবাবু বললেন, "হসপেট থেকে বম্বে যেতে গেলে ট্রেনে কিংবা গাড়িতে ছাড়া যেতে পারবে না। তারমধ্যেই থানায় পৌঁছে ওদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গোল নৌকোটার কাছে গিয়ে আগে কস্তুরী তাতে উঠে বসে বৈঠা হাতে নিল। এরপর জগ্‌গু উঠে রাইফেলটা উঁচিয়ে এদিকে চেয়ে রইল।

নৌকোটা ছাড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কোথা থেকে যেন একটা বিরাট পাথরের চাঁই এসে পড়ল নৌকোটার ঠিক পাশ ঘেঁষে জলের মধ্যে। অমনি জগ্‌গু এদিকে গুলি চালাল একবার।

কাকাবাবু বললেন, "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! আমরা কিছু করিনি, তবুও আমাদের মারতে চাইছে। আমরা এতদূর থেকে অতবড় পাথর ছুঁড়ব কী করে?"

জোজো শুয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলল, "কে পাথর ছুঁড়ল? মোহন সিং?"

টিবির ওপর থেকে আবার একটা পেল্লায় পাথর এসে পড়ল গোল নৌকোর ওপরে। আর-একটা জগ্‌গুর মাথায়। এর মধ্যে নৌকোটাও উলটে গেছে,

কস্তুরী আর জগ্‌গু পড়ে গেছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার হল কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ কোনও শব্দ করিস না। চুপচাপ শুয়ে থাক। দেখা যাক, এরপর কে আসে।"

এবার শোনা গেল একটা উঁচু গলায় গান! একজন কেউ গাইছে, "হোয়েং গেল! হোয়েং গেল!"

খানিকদূরে ঢিবির ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এল রঞ্জন আর রিঙ্কু! কস্তুরী সাঁতার জানে না। সে জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিঙ্কু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে তুলল তাকে।

রঞ্জন বলল, "ও ব্যাটাকে তুলো না, ও একটু নাকানিচোবানি খাক।"

সন্তু "রঞ্জনদা" বলে চিৎকার করে ছুটে গেল ওদের দিকে!

কাকাবাবু হেসে বললেন, "রঞ্জনটা একটা খেলা দেখাল বটে। আমি তো শেষ মুহূর্তে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলুম।. চল, জোজো।"

কস্তুরী মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে, "আমার হিরে! জলে ডুবে গেল! আমার হিরে! কী সর্বনাশ হল। কেন আমাকে জল থেকে তুললে! সব গেল। সব গেল!"

জোজো হতাশভাবে বলল, "কাকাবাবু, হিরেটা জলে ডুবে গেল! এত কাণ্ডের পরও হিরেটা রাখা গেল না!"

কাকাবাবু হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "এই নদীতে বেশি জল নেই। জেলে এনে জাল ফেলে দেখতে হবে। পাওয়া যাবে মনে হয়! পেতেই হবে!"

রঞ্জন রিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করল, "এ-মেয়েটা এত কাঁদছে কেন? মোটে একখানা হিরে গেছে, তাতে কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "ও রঞ্জনদা! তুমি তো হিরেটার কথা কিছুই জানো না। এটা বিজয়নগরের হিরে, ওয়ার্লড ফেমাস, এটার জন্য আমরা কত কষ্ট করেছি..."

রঞ্জন সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বলল, "আরে, রাখ তো হিরের কথা। হিরে মানে তো কয়লা! একটুকরো কয়লাও যা, একটা হিরেও তা।"

তারপর সে কাকাবাবুকে দেখে আনন্দে দু'হাত তুলে বিশাল শরীর নিয়ে নেচে-নেচে গাইতে লাগল। "হোয়েং গেল! সবং কিছুং ঠিকঠাকং হয়েং গেল! কাকাংবাবু, কেমং আছেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "আর একটু কাজ বাকি আছে। চলো, আগে ওপারে যাওয়া যাক। আমি আর কস্তুরী আগে খেয়া নৌকোয় যাব। তোমরা জগ্‌গুর ওপরে নজর রাখো, ওকে ওপারে নিয়ে যাবার দরকার নেই।"

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে কস্তুরীর হাত ধরলেন। কস্তুরী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, "আমি এখন যাব না!"

কাকাবাবু তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "এখন আমি যা বলব, তাই-ই তোমাকে শুনতে হবে। চলো, দেরি করো না!"

গোল নৌকোটায় উঠে কাকাবাবু বসে পড়লেন। তাঁর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে রঞ্জন আর সন্তু কস্তুরীকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তুলে দিল।

মাঝ নদীতে এসে কাকাবাবু বললেন, "কস্তুরী, এত কষ্ট করে উদ্ধার করার পরও হিরেটা হারিয়ে গেল ? ছি ছি ছি, কী দুঃখের কথা !"

কস্তুরী বলল, "নৌকোটা উল্টে গেল যে হঠাৎ ! হিরেটা জলে পড়ে গেল। এর চেয়ে আমার ডুবে মরা ভাল ছিল ! কত টাকা খরচ করেছি ! কত কষ্ট করেছি, সব গেল !"

কাকাবাবু বললেন, "নদীতে পড়লেও আবার তোলা যেতে পারে। অত নিরাশ হচ্ছ কেন ? এই জায়গাতেই তো পড়েছিল, তাই না ?"

কস্তুরী খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল, "প্রায় এই জায়গায়। নদীতে স্রোত আছে। বোধহয় দূরে সরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "একবার ডুব দিয়ে দ্যাখো তো, পাওয়া যায় কি না !"

কস্তুরী আঁৎকে উঠে বলল, "আমি ডুব দেব ? আমি সাঁতার জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কী হয়েছে ? একবার ডুব দাও, তারপর তোমাকে আমি ঠিক তুলব।"

কস্তুরী দু' হাত ছড়িয়ে বলল, "না, না, না, আমি পারব না। আমি পারব না !"

কাকাবাবু বজ্র কঠিন হাতে কস্তুরীর কাঁধ চেপে ধরে বললেন, "তোমাকে ডুব দিতেই হবে। কিংবা, হিরেটা যদি তুমি লুকিয়ে রেখে থাকো, তা হলে ভালয় ভালয় আমাকে দিয়ে দাও ! ওটা সরকারের সম্পত্তি।"

কস্তুরী বলল, "আমি লুকিয়ে রাখিনি ! মিঃ রায়চৌধুরী, বিলিভ মী ! জলে পড়ে গেছে !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তোমাকে ডুব দিতেই হবে।"

ঠিক একটা পুতুলের মতন কাকাবাবু তাকে উঁচুতে তুলে জলে ফেলে দিলেন।

পাড়ে রঞ্জন, রিঙ্কু, জোজো আর সন্তু অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জন রিভলভারটা ঠেকিয়ে রেখেছে জগ্‌গুর পিঠে।

কস্তুরী জলে ডুবতে ডুবতে কোনওরকমে একবার মাথা তুলতেই কাকাবাবু তার একটা হাত ধরে বললেন, "পেলে না ? আবার ডুব দেবে ? না, তোমার কাছেই আছে, এখনও বলো !"

দারুণ আতঙ্কে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কস্তুরী কোনওরকমে বলল, "আমার কাছে নেই, আমার কাছে নেই ! আমি শপথ করছি !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আবার ডুব দাও !"

কাকাবাবু কস্তুরীর মাথাটা জলের মধ্যে ঠেসে ধরে রইলেন। প্রায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল কস্তুরী।

তারপর কাকাবাবু আর একবার তাকে তুলতেই সে কোনওক্রমে দম আটকানো গলায় বলল, "বাঁচান ! আছে !"

কাকাবাবু এবার এক ঝটকায় কস্তুরীকে তুলে আনলেন নৌকোর ওপরে। হাসতে হাসতে বললেন, "কোনও মেয়ে অত দামি একটা হিরে চট করে জলে ফেলে দেবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি ? কোথায় লুকিয়েছ, বার করো !"

কস্তুরী হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে লাগল। জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু হাসলেন। কস্তুরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর জামার ভেতর থেকে বার করে আনল সেই মুর্গীর ডিমের সমান হিরেটা।

কাকাবাবু সেটা উঁচু করে তুলে সন্তুদের দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখ, পাওয়া গেছে !"

রঞ্জন আবার দু' হাত তুলে নাচতে নাচতে গেয়ে উঠল, "হোয়েং গেল ! পাওয়াং গেল ! সত্যি সত্যি বিজয়নগরের হিরে পাওয়াং গেল। হোয়েং গেল ! খেল খতম্ !..."

কাকাবাবু ও বজ্র লামা

কাকাবাবু ও বজ্র লামা

হঠাৎ আলো নিভে গেল !

কলকাতার বাইরে এসেও লোডশেডিং থেকে মুক্তি নেই। দার্জিলিং শহরেও যখন-তখন আলো নিভে যায়। প্রত্যেক সন্ধেবেলা একবার করে তো বিদ্যুৎ পালাবেই।

একটু আগে হোটেলের ডাইনিং রুমে রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া সেরে ওপরে নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছে সন্তু। কাকাবাবু এবেলা বিশেষ কিছুই খাবেন না আগেই বলেছিলেন, তাঁর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এক বাটি সুপ্। বিকেলে জলাপাহাড়ের দিক থেকে এক চক্কর ঘুরে এসেই কাকাবাবু টেব্‌ললাম্প জ্বেলে কীসব লেখালেখি করতে বসেছেন।

ডাইনিং-রুম আজ প্রায় ফাঁকা ছিল। সন্তু একা বসে ছিল একটা টেবিলে। হোটেল-রেস্তরাঁয় এরকমভাবে একা-একা বসে খেতে সন্তুর কেমন যেন লজ্জা করে। মনে হয়, অন্য টেবিলের লোকরা তাকে দেখছে। এই হোটেলের ম্যানেজার ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে সন্তুদের এখনও আলাপ হয়নি। কাকাবাবু তো চট করে অচেনা লোকদের সঙ্গে কথা বলতেই চান না।

কলকাতায় রাত্তিরের খাওয়াদাওয়ার পর সন্তু কিছুক্ষণ গান-বাজনা শোনে কিংবা গল্পের বই পড়ে। সাড়ে এগারোটার আগে শুতে যায় না। কিন্তু এখানে সন্ধের পর থেকেই আর কিছুই করার নেই। ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তা দিয়ে মানুষজন হাঁটে না। সন্তু তার ছোট্ট ক্যাসেট-প্লেয়ারটা আনতে এবার ভুলে গেছে, তাই গান শোনার উপায় নেই। বই এনেছে দু'খানা, কমপ্লিট শার্লক হোম্‌স আর রাজশেখর বসুর মহাভারত। কিন্তু মাঝে-মাঝেই আলো নিভে গেলে কি বই পড়ার মেজাজ থাকে ?

রাত এখন মাত্র সাড়ে ন'টা।

কাকাবাবু বসে আছেন জানলার ধারে টেবিলে, সন্তু শুয়ে পড়েছিল নিজের খাটে। সেখান থেকে নেমে সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, মোম জ্বালব ?"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যানেজার তো বলেছিল, এদের জেনারেটর আছে।

দ্যাখ সেটা চালায় কি না !”

সন্তু বলল, “কাল...পরশু...একদিনও তো জেনারেটরে আলো জ্বলেনি !”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আজ সারাবার কথা। দ্যাখ একটু অপেক্ষা করে। মোমবাতিতে তো আর লেখাপড়া করা যাবে না !”

সন্তু অন্য জানলাটার কাছে এসে দাঁড়াল। বাইরে অবশ্য কিছুই দেখবার নেই। পুরো দার্জিলিং শহরটাই অন্ধকার। অনেক দূরে-দূরে দু-একটা বাড়িতে জোনাকির মতন মিট-মিট করে মোম কিংবা লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। আকাশ অদৃশ্য।

অথচ দিনের বেলা এই জানলা দিয়ে এমনই সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে যে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সন্তুদের ঘরটা হোটেলের তিনতলায়। এই জানলার দিকে থাক-থাক পাহাড় নেমে গেছে একটা উপত্যকার দিকে, তার ওপারে আবার পাহাড়। প্রায় সব সময়েই এখানে মেঘের রাজত্ব। এক-একবার মেঘ এসে সব-কিছু ঢেকে দেয়, আবার একটু পরেই মেঘ ফুঁড়ে দূরের পাহাড়গুলো স্পষ্ট হয়। আর সেইসব পাহাড়েরও ওপাশে দৈবাৎ ম্যাজিকের মতন আচমকা ঝলমল করে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই ক'দিনে সন্তু মাত্র তিনবার দেখতে পেয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তাও কোনওবারই দু-এক মিনিটের বেশি না। দেখলেই আনন্দে বুক কেঁপে ওঠে। এই পৃথিবীতে যত পাহাড় আছে, তার মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটাই সন্তুর সবচেয়ে সুন্দর মনে হয়।

কিন্তু রাত্তিরে তো কিছুই দেখার উপায় নেই। হঠাৎ সন্তুর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, দার্জিলিং শহরে মাঝে-মাঝে রোদ তবু দেখা যায়, কিন্তু কোনও রাত্তিরে জ্যোৎস্না ওঠে ? সন্ধের পর পুরোপুরিই তো মেঘের রাজত্ব। দার্জিলিং শহরে যারা সারা বছর থাকে, তারা কি কখনও ফটফটে জ্যোৎস্নামাখা আকাশ দেখেছে ?

এই কথাটা মুখ ফিরিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, “হ্যাঁ, দেখা যায়। আমি নিজেই তো দেখেছি। দার্জিলিঙের মতন জায়গায় বেড়াবার সবচেয়ে ভাল সময় কখন জানিস ? ডিসেম্বর-জানুয়ারি। লোকে শীতের ভয়ে তখন আসতে চায় না, কিন্তু সেই সময়েই আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে, অনেকক্ষণ ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট দেখা যায়। হ্যাঁ, আমি একবার জানুয়ারিতে এসে রাত্তিরবেলা জ্যোৎস্না আর চাঁদও দেখেছি। এরকম বর্ষাকালে কিছুই দেখার নেই। এখন তো মেঘ থাকবেই !

এই বর্ষার সময় সন্তু আর কাকাবাবু অবশ্য শখ করে দার্জিলিং বেড়াতে আসেনি। ওরা এসেছে একটা কাজে। ঠিক কাজও বলা যায় না।

এখানকার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে তেনজিং নোরগের একটা স্মরণসভা হচ্ছে খুব বড় করে। সেই সভার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছেন কাকাবাবু। তেনজিং কাকাবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন। তেনজিং কলকাতায় গেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন, সন্তু তাদের বাড়িতে তেনজিংকে দু-তিনবার দেখেছে। জাপান-ফ্রান্স-ইংল্যান্ড-আমেরিকা-সুইডেন থেকে অনেক নামকরা পর্বত-অভিযাত্রী এসেছেন এই সভায় যোগ দিতে। সার এডমন্ড হিলারি হচ্ছেন সভাপতি, তিনি বিশেষ করে কাকাবাবুকে আসতে লিখেছিলেন। দু'দিন ধরে মিটিং চলছে, আগামীকালই শেষ, কালকেই আছে কাকাবাবুর বক্তৃতা।

অন্ধকারে চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মিনিট। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন কাকাবাবু। এক সময় তিনি খুব চুরুট খেতেন। একবার নেপাল অভিযানে গিয়ে রাগ করে চিরকালের মতন চুরুট খাওয়া ছেড়ে দেন। এখন সিগারেট-চুরুটের গন্ধও সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এখনও মাঝে-মাঝে ডান হাতের দুটো আঙুল ঠোঁটে চেপে ধরে হুশ হুশ শব্দ করেন।

এক সময় কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই তো শার্লক হোম্‌স পড়ছিস। বল তো, কোনান ডয়েলের কোন লেখার মধ্যে এই কথাটা আছে, এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন!"

সন্তু বলল, "এই ধাঁধাটা আমি জানি। লোকের মুখে-মুখে কথাটা রটে গেছে, কিন্তু শার্লক হোম্‌সের কোনও গল্পেই ঠিক এইরকমভাবে, এলিমেন্টারি আর মাই ডিয়ার ওয়াটসন পাশাপাশি নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, মহাভারত থেকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। বল তো, অর্জুন কৃষ্ণের কে হয়?"

সন্তু এবার একটু আমতা-আমতা করে বলল, "কে হয় মানে...মানে...ওঁরা দু'জন খুব বন্ধু..."

কাকাবাবু বললেন, "বন্ধু তো বটেই। তা ছাড়া অর্জুন কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। কুন্তী ছিলেন কৃষ্ণের পিসি! আচ্ছা, আর একটা বল্।"

কাকাবাবুর অন্য প্রশ্নটা আর করা হল না, দরজায় খট-খট শব্দ শোনা গেল।

কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনেই দরজার দিকে তাকাল। হোটেলের কাউন্টারে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, আগে টেলিফোনে জিজ্ঞেস না করে কোনও লোককেই কাকাবাবুর কাছে পাঠানো চলবে না। কেউ যেন তাঁকে ডিসটার্ব না করে। তা হলে এই সময় কে এল?

আর-একবার দরজায় খট-খট শব্দ হতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ ইট?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "অ্যান আরজেন্ট মেসেজ ফর ইউ সার!"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "এখন আবার কে মেসেজ পাঠাল? দ্যাখ তো সন্তু!"

অন্ধকারে যাতে চেয়ারে আর খাটে ঠোক্কর খেতে না হয়, তাই সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে পৌঁছল সন্তু। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"চিঠ্‌ঠি হ্যায়!"

সন্তু দরজাটা খুলতেই একজন লোক তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ভেতরে এসেই দরজা বন্ধ করে দিল চেপে। একটা টর্চ জ্বেলে কাকাবাবুর মুখের ওপর ফেলে কড়া গলায় ইংরেজিতে বলল, "ফোনে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। নড়বেন না। আমি যা বলছি শুনুন, তা হলে আপনাদের কোনও ক্ষতি হবে না।"

যার হাতে টর্চ থাকে, অন্ধকারের মধ্যে তাকে দেখা যায় না। তবু লোকটি ইচ্ছে করে নিজের ডান হাতের ওপর একবার টর্চের আলো বুলিয়ে নিল। সেই হাতে একটা রিভলভার।

একটা ধাক্কা খেয়েই সন্তু বুঝেছে যে, লোকটির গায়ে বেশ জোর। অস্পষ্ট সিলুয়েট দেখে মনে হয়, বেশ লম্বা-চওড়া পুরুষ। সন্তু অসহায়ভাবে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। কাকাবাবু এবারে দার্জিলিঙে কোনও রহস্য সমাধান করতে কিংবা কোনও অপরাধীকে ধরতে আসেননি, এসেছেন শুধু একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে। তবু তাঁর ওপর এখানে হামলা করতে আসবে কে? অবশ্য কাকাবাবুর শত্রুর অভাব নেই। হয়তো পুরনো কোনও শত্রু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দার্জিলিং পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে।

কাকাবাবু যে টেবিলে বসে লিখছেন, তার ডান দিকের দেরাজেই কাকাবাবুর নিজের রিভলভারটা রাখা আছে, সন্তু জানে। কিন্তু কাকাবাবু কি দেরাজটা খোলার সুযোগ পাবেন?

আগন্তুকটি এক-পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, আমি এসেছি আপনার ডায়েরিটা নিতে। ওটা আমাকে হ্যান্ড ওভার করে দিন, তা হলেই আমি চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ডায়েরি? সেটা এমনকী মূল্যবান জিনিস?"

লোকটি বলল, "ওই ডায়েরিটাই আমার চাই।"

কাকাবাবু বললেন, "এতে সব বাংলায় লেখা। আমার হাতের লেখাও জড়ানো। এই ডায়েরি তো আর কেউ পড়ে কিছু বুঝবে না।"

লোকটি বলল, "বেশি কথা বলার সময় নেই। ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দিন!"

কাকাবাবু সন্ধে থেকে ওই ডায়েরিতেই লেখালেখি করছিলেন। এখনও তাঁর হাতে কলম ধরা। ডায়েরিটা একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা খাতা। পাতাগুলো রুল টানা। প্রায় পাঁচ-ছ বছর ধরে কাকাবাবু ওই ডায়েরিটা ব্যবহার করছেন।

কাকাবাবু কলমটা সরিয়ে, ডায়েরিটা বন্ধ করে টেবিলের এক পাশে ঠেলে দিয়ে বললেন, "নিন তা হলে !"

লোকটি বলল, "আমার দিকে এগিয়ে দিন।"

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে কাকাবাবুর থেকে পাঁচ-ছ ফুট দূরে। হাত বাড়িয়ে ডায়েরিটা দেওয়া যায় না। কাকাবাবু চরম বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা আপনার দিকে ছুঁড়ে দেব ?"

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে মত বদল করে বলল, "না, না, ছুঁড়তে হবে না। ওটা ওখানেই রাখুন। আপনার হাতটা সরিয়ে নিন। আমি তুলে নিচ্ছি। নো ফানি বিজনেস, প্লিজ ! কোনওরকম গণ্ডগোল করলেই কিন্তু আমি গুলি চালাব !"

হোটেলটা পুরোপুরি কাঠের তৈরি। কিন্তু মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা বলেই চলাফেরার শব্দ হয় না। ঠাণ্ডার জন্য সব ঘরের লোকেরাই দরজা জানলা বন্ধ করে রাখে। এখান থেকে চিৎকার করলেও অন্য কেউ শুনতে পাবে না।

লোকটি ডায়েরির ওপর টর্চের আলোটা ফেলে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল। একবার হঠাৎ পেছন ফিরে সন্তুর মুখে টর্চ ফেলে ধমকের সুরে বলল, "কোনওরকম কায়দা দেখাবার চেষ্টা কোরো না, খোকা ! তা হলে গুলি খেয়ে মরবে।"

টেবিলের ওপর টর্চের আলো পড়েছে বলে সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু ডান দিকের দেরাজটা খোলার চেষ্টাও করেননি।

লোকটির এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। কোন হাতে তা হলে মোটা খাতাটা নেবে ? সন্তু এখন শুধু লোকটির পিঠের দিকটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে।

লোকটি জ্বেলে রাখা অবস্থাতেই টর্চটি কোটের পকেটে ভরল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডায়েরিটা তুলে নিতে গেল।

কাকাবাবু এতক্ষণ স্থিরভাবে বসে ছিলেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "শয়তান !"

চেয়ারের পাশেই যে কাকাবাবুর ক্রাচদুটি ঠেস দিয়ে রাখা, তা এই লোকটি লক্ষই করেনি। কাকাবাবু বিদ্যুৎগতিতে একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে লোকটির ডান হাতে মারলেন খুব জোরে।

রিভলভারটি ছিটকে গিয়ে প্রথমে লাগল ঘরের সিলিং-এ, তারপর সেটা একটা খাটের পাশের বেড-ল্যাম্পের ওপর গিয়ে পড়ল। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হল।

সন্তুও সঙ্গে-সঙ্গে পেছন দিক দিয়ে এক লাফে লোকটির গলা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। এইরকমভাবে ধরলে যত গায়ের জোরই থাক কোনও লোকই সহজে ছাড়াতে পারে না।

ঠিক এই সময় আলো জ্বলে উঠল !

কালো কোট-প্যান্ট পরা লোকটি সত্যিই বেশ স্বাস্থ্যবান। মুখখানা এই অঞ্চলের পাহাড়ি মানুষদের মতন, কিন্তু পাহাড়িদের তুলনায় লোকটি বেশ লম্বা।

ক্রাচটাকে রাইফেলের মতন তুলে ধরে কাকাবাবু বললেন, "তুই এবার ছেড়ে দে, সন্তু! রিভলভারটা দ্যাখ কোথায় পড়ল, তুলে নে।"

তারপর লোকটিকে বললেন, "আমার এই ক্রাচের মধ্যে গুপ্তি আছে। তুমি আর কোনওরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করলেই একটা লকলকে ছুরির ফলা তোমার বুক ফুটো করে দেবে। এবার বলো তো, তুমি কে? এইসব স্মলটাইম ক্রুকদের নিয়ে মহা জ্বালাতন। এরা ভাবে যে, একটা সামান্য রিভলভার এনে নাড়াচাড়া করলেই রাজা রায়চৌধুরীকে জব্দ করা যায়। শুধু-শুধু সময় নষ্ট!"

লোকটি এবার হো-হো করে হেসে উঠল।

সন্তু খাটের তলা থেকে রিভলভারটা তুলে এনে কাকাবাবুর পাশে এসে দাঁড়াল। এরকম একটা অস্ত্র হাতে নিলে তার মনে বেশ ফুর্তি আসে। লোকটাকে বেশ সহজেই টিট করা গেছে। মনে-মনে সে যেন জানত, লোকটা কাকাবাবুর ডায়েরি নিয়ে কিছুতেই এই ঘরের বাইরে যেতে পারবে না!

লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামি। মুখের ভাব দেখলে সাধারণ গুণ্ডা-বদমাইশ বলে মনে হয় না।

লোকটি হাসতে-হাসতেই বলল, "হ্যাট্স অফ, মিঃ রাজা রায়চৌধুরী!" আপনি সত্যিই অসাধারণ! মাই স্যালিউট টু ইউ! আমি আপনার সম্পর্কে যতটা শুনেছি বা পড়েছি, আপনি তার চেয়েও অনেক বেশি গুণী! আমি চোর-গুণ্ডা নই, আমি আপনার সঙ্গে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম।"

কাকাবাবু ভুরু তুলে বললেন, "ঠাট্টা?"

লোকটি বলল, "আপনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে আমার। সেইজন্যই এইভাবে...আপনার ডায়েরির ওপর আমার কোনও লোভ নেই। আমি বাংলা পড়তে জানিই না। আমার নাম ফিলিপ তামাং। আপনি শিংলাও জায়গাটার নাম শুনেছেন? লিট্‌ল রংগিত নদীর ধার ঘেঁষে যেতে হয়। সেখানে আমার একটা ছোট্ট চা-বাগান আছে।"

লোকটি কোটের পকেট থেকে একটি কার্ড বার করে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

কাকাবাবু কার্ডটা উলটে-পালটে দেখে বললেন, "এটা ফিলিপ তামাং নামে একজনের কার্ড হতে পারে। কিন্তু তুমিই যে সেই ব্যক্তি তা বুঝব কী করে? আর এইভাবে রিভলভার নাচিয়ে আলাপ করতে আসার মানেই বা কী?"

লোকটি বলল, "এই হোটেলের ম্যানেজারও আমাকে চেনে। সে সব প্রমাণ আপনি ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন। আমি আর মিথ্যে কথা বলছি না। আপনার

ওই ক্রাচটা এবার নামাবেন ? যদি ফট করে ছুরির ফলাটা বেরিয়ে আসে ? আমি গুপ্তি-টুপ্তি জাতীয় জিনিসকে খুব ভয় পাই !"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "ঠিক আছে, বুঝলাম, আপনি ফিলিপ তামাং, একটা চা-বাগানের ম্যানেজিং ডাইরেকটর। কিন্তু এভাবে ভয় দেখিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য এত ব্যস্ততা কিসের জন্য ? আর আপনি আলাপ করতে চাইলেই যে আমি আলাপ করব, তার কী মানে আছে ?"

লোকটি বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি আপনার একজন ভক্ত। আমি আপনার সব ক'টা অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি। আপনি নেপাল হয়ে কালাপাথরের দিকে গিয়ে যেভাবে কেইন শিপটনের জারিজুরি খতম করেছিলেন, ওঃ অদ্ভুত আপনার সাহস। আর আপনার সঙ্গীটি, এই মাস্টার সন্তু, এও কম নয়। তাই ভেবেছিলাম, আপনাদের একটু চমকে দেব।"

কাকাবাবু তবু বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি খুব খারাপ কাজ করেছেন। রিভলভার নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করা চলে না। যদি ওর থেকে গুলি বেরিয়ে এসে কারও গায়ে লাগত ? একটা সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত !"

লোকটি হেসে বলল, "সে রিস্ক আমি নিইনি। আমার রিভলভারে গুলি ভরা নেই একটাও। আপনি চেক করে দেখুন !"

কাকাবাবু সন্তুর কাছ থেকে রিভলভারটা নিয়ে দেখলেন, তাতে সেফটি ক্যাচ লাগানো। চেম্বারে সত্যিই কোনও গুলি নেই।

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু গোঁফের ফাঁকে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আমার এই ক্রাচের মধ্যেও গুপ্তি-টুপ্তি কিছু নেই। তার কোনও দরকারও হয় না।"

লোকটি ডান হাতখানা মুখের সামনে এনে ফুঁ দিতে দিতে বললেন, "উঃ, খুব জোর লেগেছে। কব্জিটা মচকে গেল কি না কে জানে। একটা রিভলভার দেখেও যে আপনি এত কুইকলি সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন, তা আমি কল্পনাই করিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মুখের সামনে কেউ রিভলভার নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আমি মোটেই তা পছন্দ করি না। আমার দিকে কেউ অস্ত্র তুললে আমি তাকে কিছু-না-কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না !"

লোকটি বলল, "আর আপনার এই ভাইপোটি যে ঠিক একই সঙ্গে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল...আপনি কি অন্ধকারের মধ্যেও ওকে চোখের ইঙ্গিত করেছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুকে ওসব কিছু বলতে হয় না। ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ অ্যাকশান নিতে হয়, তা ও জানে।"

লোকটি বলল, "আমার হাতটায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে আসব ? না হলে

হাতটা ফুলে যাবে মনে হচ্ছে। আপনাদের বাথরুমটা একটু ব্যবহার করতে পারি ?”

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

লোকটি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই কাকাবাবু টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন ফোনটা। রিসেপশন থেকে একজন বলল, “গুড ইভনিং, সার। বলুন !”

কাকাবাবু ফোনটা আলগা করে ধরলেন, সন্তু সব কথা শুনতে পাচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ফিলিপ তামাং নামে কাউকে আপনি চেনেন ?”

ম্যানেজার বলল, “হ্যাঁ সার, চিনি। একটা চা-বাগানের ম্যানেজার। আমাদের হোটেলে প্রায়ই আসেন। আজও তো আমাদের লাউঞ্জে বসে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আলো নিভে যাবার পর বোধ হয় চলে গেছেন। এখন আর দেখছি না।”

“লোকটি কি বেশ লম্বা ?”

“হ্যাঁ, সার। লেপচাদের মধ্যে ওরকম লম্বা মানুষ খুব কম দেখা যায়। উনি একসময় ভাল ফুটবল খেলতেন। কলকাতাতেও খেলেছেন মোহনবাগানে। আপনি কি ফিলিপ তামাংকে খুঁজছেন ? ডাইনিং রুমে আছে কি না দেখব ?”

“না, ঠিক আছে। থাক।”

কাকাবাবু ফোনটা রেখে দেবার পরেই ফিলিপ তামাং বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে বলল, “মিঃ রায়চৌধুরী, আমি আপনার সঙ্গে শুধু-শুধু আলাপ করতে আসিনি। আমি একটা প্রস্তাবও নিয়ে এসেছি। তার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই ভাল করে।”

সন্তু বলল, “দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার চেহারা দেখে আপনার পরিচয় যতটুকু বোঝা যায়, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। দেখুন তো মেলে কি না !”

ফিলিপ তামাং অবাকভাবে সন্তুর দিকে তাকাল।

সন্তু একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কার্পেট থেকে একটুখানি অদৃশ্য ধুলো তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, “আপনি প্রথমে এসে ঠিক এইখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনার জুতোর ছাপ পড়েছে। এটা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আপনি হিন্দু নন, ক্রিশ্চান !”

ফিলিপ তামাং হেসে বলল, “আমার ফার্স্ট নেইম ফিলিপ, সেটা শুনেই বোঝা যাবে। এর সঙ্গে জুতোর কী সম্পর্ক ?”

সন্তু বলল, “আপনি ক্রিশ্চান তো বটেই, তা ছাড়াও, আপনি নেপালি বা গোর্খা নন, আপনি লেপচা।”

ফিলিপ তামাং বলল, “এটা অবশ্য নাম শুনে বোঝা যায় না। তামাং নামটা

সাধারণত নেপালিদেরই হয়। গুড গেস্‌। হ্যাঁ মিলেছে। তারপর ?”

সন্তু বলল, “আপনার দু'পায়ের জুতোর ছাপ সমানভাবে পড়েনি। ডান পায়ের ওপর বেশি জোর দেন। এর থেকেই প্রমাণ হয়, আপনি একজন ফুটবল খেলোয়াড়, একসময় ভালই খেলতেন। খুব সম্ভবত স্ট্রাইকার পজিশানে...”

ফিলিপ তামাং চোখ বড়-বড় করে কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, “ও শার্লক হোম্‌সের গল্পগুলো বারবার পড়েছে তো। তাই খুব ছোটখাটো ব্যাপার থেকে অনেক-কিছু জানতে শিখেছে।”

ফিলিপ তামাং ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, “ফ্যানট্যাস্টিক ! আর কী, আর কী বলতে পারো তুমি ?”

সন্তু বলল, “আপনি যেভাবে চেয়ারে বসলেন, তার থেকেই বোঝা যায়, আপনি বাঙালিদের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করেছেন। আপনি বাংলা জানেন। নিজে ভাল বলতে না পারলেও বুঝতে পারেন সব। ঠিক কি না ?”

ফিলিপ তামাং এবারে বাংলাতেই বলল, “একেবারে ঠিক। আর ? আর ?”

সন্তু বলল, “ছেলেবেলায় আপনার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। আপনার একটা পায়ে খুব চোট লেগেছিল।”

ফিলিপ তামাং বলল, “এটাও মিলেছে। কিন্তু কোন্‌ পায়ে ?”

সন্তু ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, “ডান পায়ে। হাঁটুতে। তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু এখন হাঁটুটায় মাঝে-মাঝে ব্যথা করে।”

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুর দিকে উদভ্রান্তভাবে তাকিয়ে বলল, “আপনার এই ভাইপোটির সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে নাকি ? অল্প বয়েসে আমি একবার পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন খুব একটা ব্যথা পাইনি। কিন্তু এখন এই ডান দিকের হাঁটুটা মাঝে-মাঝে অসহ্য টনটন করে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, কেউ সারাতে পারে না। কিন্তু এসব কথা এই ছেলেটি জানল কী করে ?”

কাকাবাবুও কৌতূহলীভাবে সন্তুর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কোনও মন্তব্য করলেন না।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আপনার সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকু আমরা জানি। আপনার বাকি পরিচয়টা এবার বলুন।”

ফিলিপ তামাং বলল, “আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি কী করে এতসব...আচ্ছা, আর কী জানো ?”

সন্তু বলল, “আপনি খুব বেশি সিগারেট খান।”

ফিলিপ তামাং সঙ্গে-সঙ্গে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, “মাই গড ! আমি এ পর্যন্ত একটাও সিগারেট ধরাইনি, তবু তুমি কী করে ধরলে ?”

কাকাবাবু এবার বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। মিঃ তামাং, এবার আপনি কী জন্য এসেছেন বলুন।"

ফিলিপ তামাং সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার বার করে ফস্ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আপনারা দু'জনে মিলে একটা ইউনিক টিম! মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সংক্ষেপে নিজের সম্পর্কে আরও একটু পরিচয় দিচ্ছি। আমার বাবা ছিলেন লেপচা, মা নেপালি। আমার অল্প বয়েসে বাবা মারা যান। মা একটা চার্চে ধোয়া-মোছার কাজ করতেন। সেই চার্চের ফাদাররা আমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেন। আমার তখন মাত্র সাত বছর বয়েস। ফাদাররা আমাকে যত্ন করে লেখাপড়া শেখান। তারপর আমি কলকাতায় কলেজে পড়তে গেছি, সেখানে খেলাধুলোও করেছি। তারপর সেই চার্চের ফাদারদের সুপারিশেই আমি একটা চা-বাগানে চাকরি পাই। সেটা ছিল খুব বড় চা-বাগান, তখনও সেটার মালিক ছিল এক ইংরেজ-সাহেব। আমি ভাল করে বাগানের কাজ শিখেছিলাম, মালিকও আমাকে পছন্দ করতেন। তারপর সেই ইংরেজ-সাহেব যখন চা-বাগানটা বিক্রি করে দেন এক পাঞ্জাবির কাছে, তখন সেই বাগানের একটা ছোট অংশ তিনি আমাকে দিয়ে যান। ফ্রি গিফ্‌ট! সুতরাং আমি এখন একটা চা-বাগানের মালিক। আমি অ্যাডভেঞ্চার-স্টোরি পড়তে খুব ভালবাসি। আমি আপনাদের সব-ক'টা অভিযানের কাহিনী পড়েছি। আমি আপনার ভক্ত তো ছিলামই, এখন থেকে সন্তুরও ভক্ত হয়ে গেলাম। আমি আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু একটু অধৈর্যভাবে বললেন, "হ্যাঁ, সেটা বলুন!"

ফিলিপ তামাং বলল, "আপনি এখানে কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। কালকে আপনার লেকচার হয়ে যাবে। তারপর কয়েকদিন আমার চা-বাগানে কাটিয়ে আসবেন চলুন! সেখানে বিশ্রাম নেবেন। আপনি কখনও কোনও চা-বাগানে থেকেছেন?"

কাকাবাবু একটা চাপা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, থেকেছি। একবার লংকাপাড়া টি-এস্টেটে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে গেছি।"

ফিলিপ তামাং বলল, "লংকাপাড়া? সে তো ডুয়ার্সে। আপনি পাহাড়ে তো থাকেননি। পাহাড়ের চা-বাগান অন্যরকম।"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ে...হ্যাঁ, লোপচু চা-বাগানেও থেকেছি একবার। এক সময় দার্জিলিং-কালিম্পং অঞ্চলে আমার যথেষ্ট ঘোরাফেরা ছিল। মিঃ তামাং, আপনার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এবার আমাদের যাওয়া হবে না। পরশুই আমরা কলকাতায় ফিরব।"

সন্তু অবশ্য কোনওদিন চা-বাগানের মধ্যে গিয়ে থাকেনি। তার খুব আগ্রহ হচ্ছিল, তবু সে চুপ করে রইল।

ফিলিপ তামাং বলল, "পরশুই ফিরে যাবেন? কেন, আপনি তো এখন

রিটায়ার্ড শুনেছি, তা হলে আপনার এত তাড়া কিসের ? কয়েকটা দিন আমার বাগানে বিশ্রাম নিয়ে যান। আমার লোকেরা আপনার খুব খাতির-যত্ন করবে। আপনার ভাল লাগবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি রিটায়ার্ড বটে, কিন্তু এখনও বিশ্রামের জন্য তেমন ব্যস্ত নই। কলকাতাতে কিছু কাজ আছে।"

ফিলিপ তামাং বলল, "বিশ্রাম মানে আমি মিন করছি বেড়াবেন ওদিকটায়, সুন্দর ছোট্ট নদী আছে একটা, গভীর জঙ্গল, আর আমাদের বাংলোর বাগানে বসেই পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেইঞ্জ দেখা যায়। আরও কিছু অদ্ভুত জিনিসও আছে। ওখানে আপনি অ্যাডভেঞ্চারেরও অনেক সুযোগ পাবেন।"

কাকাবাবু চেয়ারটা খানিকটা সরিয়ে বললেন, "আমার এই পা-টা দেখেছেন ? আমি খোঁড়া মানুষ। এক সময় এইসব পাহাড়-অঞ্চল খুবই ভালবাসতাম, এখন পাহাড়ে উঠতে-নামতে খুব কষ্ট হয়।"

"আপনাকে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হবে না।"

"কোথাও গিয়ে চুপ করে বসে থাকাও যে আমার ধাতে নেই।"

"আপনি একবার গিয়েই দেখুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। যদি ভাল না লাগে, দু দিন পর ফিরে আসবেন।"

"আমি দুঃখিত, মিঃ তামাং, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, ওখানে একটা সাঙ্ঘাতিক মিস্ট্রি আছে, আপনি যদি সেটা সল্‌ভ করতে পারেন..."

"আমি আর কোনও মিস্ট্রি-টিস্ট্রির কথা শুনতে চাই না। দার্জিলিঙে এসেছি তেনজিং-এর স্মরণসভা অ্যাটেন্ড করতে, তা ছাড়া অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, সেইজন্য। পরশু আমরা ডেফিনিটলি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।"

এর পরও কিছুক্ষণ ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগল, কাকাবাবু কিছুতেই মত বদলালেন না।

এক সময় বেশ কঠোরভাবে কাকাবাবু বললেন, "আপনার আমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ, মিঃ তামাং। কিন্তু আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবার আমি ঘুমোতে যাব। গুডনাইট !"

ফিলিপ তামাং নিরাশভাবে উঠে দাঁড়াল। রিভলভারটা ভরে নিল পকেটে। অনিচ্ছুকভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আর-একটু ভেবে দেখুন, যদি আপনি মত পালটান, তা হলে কাল আমাকে জানাবেন। কাল আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা।"

ফিলিপ তামাং সন্তুর দিকে হাত তুলে বলল, "বাই বাই, ওয়ান্ডার বয় !"

তারপর ফিলিপ তামাং বেরিয়ে যেতেই সন্তু দরজাটা লক করে দিল।

কাকাবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, "উঃ, নাছোড়বান্দা একেবারে ! রিভলভার দেখিয়ে আলাপ করতে আসা, এ আবার কী ধরনের বদ রসিকতা ! এই ধরনের লোকদের আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

ফিলিপ তামাং যেখানে বসে ছিল, তার পাশ থেকে ছাইদানিটা তুলে নিয়ে সন্তু বলল, "লোকটা মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটে চারটে সিগারেট খেয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "যারা বেশি সিগারেট খায়, তাদের হাতের দুটো আঙুলে হলদে ছোপ পড়ে যায়। যারা ফরসা, তাদের বেশি বোঝা যায়। তুই ওর হাতের হলদে ছোপ দেখে ধরেছিলি যে, লোকটা বেশি সিগারেট খায়। তাই না ?"

সন্তু মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "ওর ফুটবল খেলার কথাটা বলে ওকে খুব চমকে দিয়েছিলি। আর কলকাতায় যখন কয়েক বছর কাটিয়েছে, তখন কিছুটা বাংলা জানবেই। কিন্তু একটা কথা বলে তুই আমাকেও অবাক করেছিস। ওর যে ছোটবেলায় পায়ে চোট লেগেছিল, সেটা তুই কী করে বললি ?"

সন্তু লাজুকভাবে হেসে বলল, "আন্দাজে। পাহাড়ে যারা থাকে, তারা কি ছোটবেলায় একবার না একবার গড়িয়ে পড়ে না ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আর কী করে বুঝলি, ডান পায়ের হাঁটুতে ব্যথা ?"

সন্তু বলল, "আমি অ্যাকসিডেন্টের কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা একবার চট করে ডান পায়ের হাঁটুতে হাত রেখেই আবার হাত সরিয়ে নিল। আমি ঠিক দেখে নিয়েছি। হাঁটুটা ধরা দেখেই বুঝলুম, এখনও ব্যথা হয়।"

কাকাবাবুও এবার হেসে বললেন, "গুড অবজারভেশান ! শার্লক হোম্‌সও তো এইরকমভাবে খুঁটিনাটি দেখেই লোককে চমকে দিত। তুই আরও ভাল করে কোনান ডয়াল পড়, সন্তু। তুইও একটা খুদে শার্লক হোম্‌স হয়ে উঠতে পারবি মনে হচ্ছে !"

॥ ২ ॥

মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আজ খুব ভিড়। ভারতের রাষ্ট্রপতি শেষ দিনের সভায় যোগ দিতে এসেছেন, সেইজন্যই চতুর্দিকে পুলিশ আর লোকজনও বেড়েছে তিন-চার গুণ। এত ভিড় সন্তুর ভাল লাগে না।

ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে ম্যারাপ বেঁধে বিশাল অডিটোরিয়াম তৈরি হয়েছে। মঞ্চের কাছাকাছি একটা চেয়ার দখল করে বসে রইল সন্তু। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলেছে। সন্তু অধীরভাবে অপেক্ষা করছে কখন কাকাবাবুর বক্তৃতা হবে। এক-একজন বক্তা সময় নিচ্ছেন বড্ড বেশি।

অন্যদের তুলনায় কাকাবাবু বললেন খুব সংক্ষেপে। তিনি বললেন, "এখানে

কয়েকটি বিষয়ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, তাই আমি বেশি সময় নষ্ট করব না। আমি শুধু দুটি পয়েন্ট যোগ করতে চাই। এক নম্বর হল, মানুষ আজ সব পাহাড়ই জয় করেছে। এভারেস্টের চূড়াতেও মানুষ পা দিয়েছে বারবার। পৃথিবীর অনেক দেশের অভিযাত্রীরাই এভারেস্ট জয় করেছে, কেউ-কেউ সেখানে দু'বারও উঠেছে। এর পর মানুষ নিশ্চয়ই একদিন এভারেস্টের চেয়েও উঁচু পাহাড় জয় করবে। কিন্তু জয় করাটাই বড় কথা নয়। শুধু দল বেঁধে কোনও একটা পাহাড়ের শিখরে উঠে দাঁড়ানোর মধ্যেই এমন-কিছু কৃতিত্ব নেই। পাহাড়কে যে ভালবাসতে শেখে, পাহাড়ের মহিমা যে অন্তর দিয়ে বোঝে, সে-ই আসল অভিযাত্রী। পাহাড়ের একটা আলাদা গন্ধ আছে, পাহাড়ি জঙ্গল, নদী, বরফের মধ্যে কত নতুন-নতুন রং আছে, বাতাসের শব্দ, জলের শব্দ, পাখির ডাক এইসব মিলিয়ে কত নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি হয়। চোখ-কান-মন খোলা রেখে এইসব রূপ-রং-গন্ধ অনুভব করতে না পারলে পাহাড়ে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না।"

একটু থেমে কাকাবাবু আবার বললেন, "আমার শেষ কথাটি সকলের প্রতি অনুরোধ। আপনারা সবাই জানেন, আজকাল এত বেশি দল পাহাড় অভিযানে যাচ্ছে যে, তার ফলে অনেক পাহাড় নোংরা হয়ে যাচ্ছে। এমনকী, এভারেস্টে ওঠার পথেও জমে যাচ্ছে অনেক আবর্জনা। তাই প্রত্যেক অভিযাত্রীকে এখন থেকে শপথ নিতে হবে যে, কিছুতেই পাহাড় নোংরা করা চলবে না। খাবারের খালি টিন, পলিথিন বা কাগজের প্যাকেট, ছেঁড়া জুতো-মোজা কিংবা অন্য সমস্ত বাতিল জিনিস কিছুই না ফেলে সঙ্গে করে ফেরত আনতে হবে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এইসব নোংরা ফেলে অপবিত্র করা একটা চরম পাপ! চরম অন্যায়!"

কাকাবাবুর এই কথা শুনে সবাই একসঙ্গে খুব জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। কাকাবাবুর পাশে-বসা রাষ্ট্রপতিও মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক, ঠিক!"

কাকাবাবুর বলা শেষ হতেই সন্তু উঠে পড়ল। আর তার বক্তৃতা শোনার ধৈর্য নেই।

রাষ্ট্রপতি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ কাকাবাবুকেও মঞ্চে বসে থাকতে হবে। সন্তু একাই লোকজনদের ভিড় কাটিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় যেতে চাইল।

পর্বত-অভিযাত্রীদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের যে মিউজিয়ামটা আছে, সেটা এখন ভিড়ে ঠাসাঠাসি। সন্তু ওই মিউজিয়াম আগেই দেখে নিয়েছে। সে ওর পেছন দিকটায় গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে একটা চমৎকার উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও অবশ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু লোক রয়েছে।

সন্তু দেখতে পেল, একটা বড় পাথরের ওপর বসে ফিলিপ তামাং দু'জন সাহেবকে হাত-পা নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে।

এর আগে সন্তু ফিলিপ তামাংকে দূর থেকে দেখেছে কয়েকবার। একবার

চোখাচোখিও হয়েছিল, কিন্তু ফিলিপ তামাং কাছে এসে কথা বলার চেষ্টা করেনি। কাল রাতে, শেষের দিকে কাকাবাবু ওকে প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছেন, ও নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করেছে। রেগেও যেতে পারে।

হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একটা অলৌকিক পর্দা সরে গেল। সন্তু চোখ তুলে দেখল, সামনের দিগন্ত জুড়ে ফুটে উঠেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তার সারা গায়ে ঝকঝক করছে রোদ। এত সুন্দর যে, সন্তুর যেন দম বন্ধ হয়ে এল! সত্যিই, নিশ্বাস ফেলার কথাও তার মনে রইল না।

কিন্তু ঠিক দু মিনিট বা তিন মিনিট, তারপরেই কোথা থেকে এসে গেল মেঘ। সেই মেঘ এসে এমনভাবে ঢেকে দিল, তার আড়ালে যে অত বিশাল একটা পাহাড় আছে, তা আর বোঝাই যায় না। এসব আকাশের ম্যাজিক!

অনেকদিন আগে কাকাবাবু বলেছিলেন, আকাশ কখনও পুরনো হয় না। কথাটা খুব সত্যি।

পেছন থেকে একজন কেউ সন্তুর পিঠে চাপড় মারতেই সে চমকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল নরেন্দ্র ভার্মাকে। দিল্লির এই বড় অফিসারটি কাকাবাবুর খুব বন্ধু।

নরেন্দ্র ভার্মা হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সোণ্টুবাবু, এখানে একা-একা আকাশের দিকে চেয়ে কী দেখছ? তুমি পোয়েট্রি লেখো নাকি?"

সন্তু বলল, "আপনি কবে দার্জিলিং এলেন? আগে তো দেখিনি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এসেছি আজই সকালে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনোনি? রাজার বক্তৃতা বেশ ভাল হয়েছে। এইসব জায়গায় ছোট বক্তৃতাই শুনতে ভাল লাগে, তাই না?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু সকলের চেয়ে ভাল বলেছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন, "খুব যে নিজের কাকার জন্য গর্ব! তোমরা কোন হোটেলে উঠেছ? আজ সন্ধেবেলা তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাব।"

সন্তু বলল, "আমরা আছি মাউন্টেন টপ হোটেলে, তার টপ ফ্লোরে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, চিনি ওই হোটেল। আরে, ওই তো হিলারি-সাহেব বেরিয়ে আসছেন। মিটিং শেষ হয়ে গেল নাকি? সন্তু, তুমি সার এডমান্ড হিলারিকে চেনো? উনি আর তেনজিং-ই মানুষের ইতিহাসে প্রথম এভারেস্টের চূড়ায় পা দিয়েছিলেন।"

সন্তু বলল, "এ-কথা কে না জানে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, মানে, অনেকদিন হয়ে গেল তো। তোমাদের বয়েসী ছেলেরা...চলো, হিলারি-সাহেবের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই!"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, না, থাক। অত বড় একজন লোকের সঙ্গে আমি কী কথা বলব? আপনি যান।"

নরেন্দ্র ভার্মা তবু সন্তুকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। হিলারি-সাহেব

এত নাম-করা লোক হলেও ব্যবহারে খুব ভদ্র। ছিপছিপে লম্বা মানুষটি, মুখে বেশ একটা সৌম্য ভাব। চোখের মণি দুটো একেবারে নীল। সন্তুর কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, "ও, তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইয়ের ছেলে ? ওঁকে তো আমি ভালই চিনি। ওঁর একটা পা ভাঙা বলে উনি কোনও উঁচু পাহাড়ে ওঠেননি, কিন্তু পাহাড় সম্পর্কে উনি অনেকের চেয়ে ভাল জানেন। তুমি কি ঠিক করেছ, তুমি মাউন্টেনিয়ার হবে ?"

সন্তু মুখ নিচু করে বলল, "আমার সাঁতার কাটতে বেশি ভাল লাগে। আমার ইচ্ছে আছে, একবার ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করব !"

হিলারি-সাহেব খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ, খুব ভাল কথা। একবার তা হলে ক্যালকাটা থেকে সাঁতার কেটে অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড চলে এসো !

হঠাৎ কথা থামিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে হিলারি-সাহেব নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ ভার্মা, ওই লোকটি কে ? চেনেন ?"

সন্তু দেখল, একজন বিদেশির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ডান পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে ফিলিপ তামাং।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উনি তো মিস্টার স্ট্রিন্ডবার্গ। সুইডেন থেকে এসেছেন !"

হিলারি বললেন, "না, না, স্ট্রিন্ডবার্গকে তো আমি ভালই চিনি। তার সঙ্গে ওই ভারতীয়টি ?"

"না, ওকে চিনি না। স্থানীয় কেউ হবে মনে হচ্ছে।"

"ওই লোকটি আজ খুব ভোরে আমার হোটেলে দেখা করতে এসেছিল। কী যে অদ্ভুত, অনেক কথা বলল, তা বুঝতেই পারলাম না। এইটুকু বুঝলাম, আমাকে একটা চা-বাগানে নিয়ে যেতে চায়। আমি হঠাৎ সেখানে যাব কেন ?"

"না, না, এরকম কেউ ডাকলেই আপনি যাবেন কেন ? মোটেই যাবেন না। আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছি লোকটি সম্পর্কে !"

ওই ফিলিপ তামাং যে কাকাবাবুর সঙ্গেও দেখা করতে এসেছিল, সে-কথা আর সন্তু বলল না।

এর পর নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে নিয়ে গেলেন চায়ের ক্যান্টিনে। কাকাবাবুও এর মধ্যে এসে গেছেন সেখানে। সকালের মিটিং শেষ হয়ে গেছে, লাঞ্চের পর আরও কিছু বক্তৃতা আছে। একটা টেবিলে বসে বেশ আড্ডা জমে গেল। তাতে যোগ দিলেন দেশ-বিদেশের কয়েকজন পর্বতারোহী।

কথায়-কথায় উঠল ইয়েতির কথা। কেউ-কেউ ইয়েতির অস্তিত্বে কিছুটা বিশ্বাস করেন, কেউ-কেউ একেবারেই করেন না। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন বরফের ওপর ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছেন নিজের চোখে।

ফরাসি-অভিযাত্রী মঁসিয়ে জাকোতে বললেন, "সবচেয়ে কী আশ্চর্য ব্যাপার জানো ? একবার আমি হিমালয়ে তেরো ফিট ওপরে বরফের ওপর ইয়েতির

টাটকা দুটো পায়ের ছাপ দেখে সঙ্গে-সঙ্গে ছবি তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ফিল্ম ডেভেলাপ করার পর দেখা গেল, অন্য সব ছবি উঠেছে, কিন্তু শুধু ওই পায়ের ছাপের ছবিটাই ওঠেনি। স্ট্রেইঞ্জ ব্যাপার!

অনেকেই হেসে উঠল।

একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি একবার কালাপাথরে কয়েকটা জ্যান্ত ইয়েতি দেখেছিলে না?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, দেখেছিলাম?"

সন্তু বলল, "নকল!"

কাকাবাবু বললেন, প্রথমে মনে হয়েছিল সত্যি। একটা নয়, তিন-চারটে, হেলেদুলে হাঁটছে। আসলে সেসব হল কেইন শিপটনের কারসাজি। ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে পোশাক বানিয়ে কয়েকটা লোককে ইয়েতি সাজিয়েছিল। লোকজনদের ভয় দেখাত!

অন্য একজন বলল, "এই কেইন শিপটন অনেক কুকীর্তি করেছে। কিন্তু লোকটা এমন ধুরন্ধর যে, কিছুতেই ধরা পড়ে না।"

এই সময় সুইডিশ অভিযাত্রী ম্যাক্স স্ট্রিন্ডবার্গ সেখানে এসে বলল, "কী নিয়ে কথা হচ্ছে? ইয়েতি? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, নিশ্চয়ই আছে! এই ইন্ডিয়াতে যে কত কী রহস্যময় ব্যাপার এখনও আছে, তার অনেকটাই আমরা জানি না।"

মঁসিয়ে জাকোতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও ইয়েতি দেখেছ নাকি? তুমি কখনও প্রমাণ পেয়েছ? তুমি তো দু'বার হিমালয়ে এক্সপিডিশানে গেছ।"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "ইন্ডিয়াতে অনেক কিছুই প্রমাণ করা শক্ত। প্রমাণ না পেয়েও তো অনেক লোকে বিশ্বাস করে। সেটাও কি কম কথা? এই তো একটু আগে একজন লোক আমাকে বলল, এখানে কাছাকাছি কোনও মনাস্টারিতে নাকি চার-পাঁচজন লোক এখনও বেঁচে আছে, যাদের বয়েস তিনশো বছর!"

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "যাঃ, গাঁজাখুরি কথা। তিনশো বছর কোনও মানুষ বাঁচে?"

স্ট্রিন্ডবার্গ দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, "ভাবছ আমি বানাচ্ছি? এখানেই ফিলিপ তামাং নামে একজন লোক বলল, সে নিজের চোখে ওই তিনশো বছরের বুড়োদের দেখেছে। আমাকেও নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারে।"

একজন বলল, "দেখলেই বা তুমি কী করে বুঝবে যে, তাদের বয়েস তিনশো বছর? বয়েস মাপার কোনও ইয়ার্ড স্টিক আছে নাকি?"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "দেখলে একটা কিছু বোঝা যাবে নিশ্চয়ই। একশো বছরের বৃদ্ধ আর তিনশো বছরের বৃদ্ধদের চেহারা তো এক হতে পারে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উজবেকিস্তানে একশো চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন

বুড়োর কথা একবার শোনা গিয়েছিল। তারচেয়ে বেশিদিন কোনও মানুষ বাঁচেনি। তিনশো বছর! হুঁঃ! তা হলে এর মধ্যে কতবার সেই বুড়োদের নাম উঠে যেত গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে!"

কাকাবাবু স্ট্রিন্ডবার্গকে জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাক্স, তুমি ফিলিপ তামাং-এর সঙ্গে সেই বুড়োদের দেখতে যাচ্ছ?"

স্ট্রিন্ডবার্গ চওড়াভাবে হেসে বলল, "খুবই ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। কিন্তু পরশুর মধ্যেই আমাকে স্টকহলম ফিরতে হবে, জরুরি কাজ আছে। উপায় নেই। ইন্ডিয়ায় এলে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। ফেরার তাড়া না থাকলে আমি কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেও যেতাম একবার!"

মঁসিয়ে জাকোতে বলল, "এই তিনদিনের মধ্যে দার্জিলিং থেকে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল না! কাঞ্চনজঙ্ঘার মহান, সুন্দর রূপ একবার অন্তত না দেখলে মন খারাপ লাগে। যাই বলো, উচ্চতায় তৃতীয় হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ এভারেস্টের চেয়েও বেশি সুন্দর।"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "তা ঠিক!"

বড়দের মধ্যে কথা বলা উচিত নয় বলে সন্তু চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ। এবার সে ফস করে বলে ফেলল, "আমি আজ সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি!"

সকলেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল সন্তুর দিকে।

জাকোতে জিজ্ঞেস করল, "আজ সকালে? কখন?"

সন্তু বলল, "এই তো, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে। আমি মিউজিয়ামের পেছন দিকটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

জাকোতে বলল, "আমি অনেকবার বাইরে বেরিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরেছি। দেখতে পাইনি তো?"

স্ট্রিন্ডবার্গ বলল, "আধ ঘণ্টা আগে আমিও ওইখানেই ছিলাম। আমিও দেখিনি। এখানে আর কেউ দেখেছে?"

অন্য সবাই দু'দিকে মাথা নাড়ল। নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুর পিঠে একটা চাপড় মেরে হাসতে-হাসতে বলল, "ও নিশ্চয়ই কল্পনায় দেখেছে। আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটি অনেক কিছু বানিয়ে বলতে ভালবাসে। আজকের মতন মেঘলা দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা অসম্ভব!"

সবাই হেসে উঠল। সবাই ভাবল, "সন্তু গুল মেরেছে।"

সন্তুর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে যে সত্যিই কাঞ্চনজঙ্ঘা একটুক্ষণের জন্য স্পষ্ট দেখেছে, তা তো আর প্রমাণ করা যাবে না। অন্য কেউ আর দেখেনি? সন্তু কি তবে কল্পনায় দেখেছে? তা মোটেই না!

হঠাৎ সন্তুর সারা গায়ে রোমাঞ্চ হল। তবে কি কাঞ্চনজঙ্ঘা শুধু সন্তুর জন্যই একটুক্ষণের জন্য মেঘের আড়াল সরিয়েছিল? আজকের আকাশ শুধু সন্তুর জন্যই এমন একটা উপহার দিল? নিশ্চয়ই তাই।

লজ্জার বদলে এবার অদ্ভুত এক আনন্দ হল সন্তুর।

এখানকার আড্ডা চলল আরও কিছুক্ষণ। তারপর লাঞ্চ খাওয়ার ডাক পড়ল। বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি লাঞ্চ খাবেন, কাকাবাবুও সেখানে আমন্ত্রিত। কিন্তু সন্তুর তো আর নেমন্তন্ন নেই, সে ফিরে গেল হোটেলের দিকে।

হোটেলে পৌঁছবার আগেই বৃষ্টি নামল খুব জোরে। এখানে সকলের কাছেই ছাতা থাকে। সন্তু ছাতা কিংবা রেনকোট কিছুই আনেনি। গাছতলায় দাঁড়িয়েও কিছু সুবিধে হল না, সে ভিজে গেল পুরোপুরি।

দৌড়ে দৌড়ে শপশপে ভিজে জামা-প্যান্ট নিয়ে পৌঁছল হোটেলে। এখানে তো ভিজে জামা-কাপড় রোদ্দুরে শুকোবার উপায় নেই। সন্তু তার কোটটা একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল বাথরুমে। মোজা-জুতো সব খুলে ফেলার পর তার পরপর সাতবার হাঁচি হল।

খেয়েদেয়ে দুপুরে একঘুম দিল সন্তু। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, আর বাইরে বেরোবার উপায় নেই। ঘুম থেকে ওঠার পরই সন্তু টের পেল, তার জ্বর এসে গেছে। নিশ্বাস পড়ছে গরম-গরম, জ্বালা করছে দুই চোখের কোণ।

বাইরে এসে সন্তুর কখনও অসুখ-বিসুখ হয় না। কাকাবাবু জানতে পারলেই ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কাকাবাবুকে কিছুতেই জানানো চলবে না। একটু জ্বর হলে কী-ই বা আসে যায়!

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তু দেখল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও মোটে সাড়ে চারটে বাজে, কিন্তু আজ আর রোদ ওঠার আশা নেই। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এরকম বৃষ্টি হলে দার্জিলিং-এ যখন-তখন ধস নামে। হিল কার্ট রোড বন্ধ হয়ে গেলে সন্তুরা কাল ফিরবে কী করে? সন্তুর অবশ্য ফেরার জন্য ব্যস্ততা নেই কিছু, তার কলেজ খুলতে এখনও সাতদিন বাকি আছে। কিন্তু কালকের প্লেনের টিকিট কাটা আছে।

কিছুই করার নেই, তাই সন্তু বই নিয়ে বসল। মহাভারত, না শার্লক হোম্‌সের গল্প, কোনটা এখন পড়া যায়? এই দু'খানা বই-ই সন্তুর আগে একবার পড়া হয়ে গেছে। তবু আবার পড়তে ভাল লাগে। সে ইংরেজি বইটাই খুলল বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে।

দু'পাতা শেষ করতে না করতেই আবার ঘুম এসে গেল সন্তুর। ক্রমেই তার জ্বর বাড়ছে।

সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল জোর শব্দে। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সন্তু ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলতে গেল। কোনও বেয়ারা এলে সাধারণত আস্তে টুকটুক করে শব্দ করে। এত জোরে দুম দুম করছে কে?

দরজা না খুলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ ইট?"

বাইরে কাকাবাবুর গলা শোনা গেল।

ভেতরে এসে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোচ্ছিলি বুঝি ? আমরা কতক্ষণ ধরে ডাকছি !"

সন্তু তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল। কাকাবাবুর সঙ্গে তার গায়ের ছোঁয়া লাগলেই কাকাবাবু তার জ্বর বুঝে ফেলবেন।

কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছেন নরেন্দ্র ভার্মা আর-একজন অচেনা লোক। নরেন্দ্র ভার্মা আলাপ করিয়ে দিল, ভদ্রলোকের নাম বীরেন্দ্র সিং, এখানকার একজন ব্যবসায়ী।

কাকাবাবু টেলিফোনে চা দিতে বললেন, একটু পরেই বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা নানারকম গল্প শুরু করলেন। সন্তুর কপালের দুটো পাশ দপদপ করছে, মাথাটা ভারী লাগছে, এখন তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। সে তার বিছানায় বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করল। তবে মাঝে-মাঝেই তার কান চলে যাচ্ছে কাকাবাবুদের কথাবার্তার দিকে।

এক সময় বীরেন্দ্র সিং কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন, আপনার ভাঙা পা-টা সারিয়ে ফেলেন না কেন ? আজকাল তো অনেক রকম চিকিৎসা বেরিয়েছে !"

কাকাবাবু বললেন, "এর আর কোনও চিকিৎসা নেই। এখন আমার তেমন অসুবিধেও হয় না।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আপনার জুতোটা একটু খুলুন তো, আমি দেখি কী অবস্থা।"

সন্তু চোখ তুলে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। সে জানে, কাকাবাবু নিজের ওই ভাঙা পা বিষয়ে বেশি কথা বলা একেবারে পছন্দ করেন না। কাকাবাবুর বাঁ পায়ের পাতাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, হাড় বলে কিছুই নেই। কোনও রকমে জুতো পরতে পারেন শুধু। দু' পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন প্রায় বছরদশেক আগে।

কাকাবাবু বললেন, "ও আর দেখে কী করবেন।"

বীরেন্দ্র সিং তবু ঝুঁকে পড়ে যেন নিজেই হাত দিয়ে কাকাবাবুর জুতো খোলার চেষ্টা করলেন।

কাকাবাবু এবার পা সরিয়ে নিয়ে কড়া গলায় বললেন, "ও ব্যাপারটা থাক। আপনি অন্য কথা বলুন।"

বীরেন্দ্র সিং আবার সোজা হয়ে হাসি মুখে বললেন, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখবেন ?"

যদিও শীত খুব বেশি নয়, তবু ভদ্রলোকটি পরে আছে একটা লম্বা ওভারকোট। ঘরের মধ্যে এসেও সেটা খোলেননি। বাঁ হাতটা এতক্ষণ একটা পকেটেই ছিল। এবার সেই হাতটা বার করলেন।

বীরেন্দ্র সিং-এর ডান হাতটা খালি কিন্তু বাঁ হাতে একটা পুরু ধরনের চামড়ার

দস্তানা পরানো। সেই দস্তানাটা খুলতে-খুলতে তিনি বললেন, "একবার আমার ফ্যামিলির সব লোকজনদের নিয়ে সিন্‌চল লেকের কাছে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, বুঝলেন। আমার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছোট ছেলেটা খুবই চঞ্চল আর দুষ্ট। একটা বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর উঠে সে নাচানাচি করছিল। আমরা অনেক বারণ করলেও সে শোনেনি। হঠাৎ দেখি কী, সেই পাথরটা গড়াতে শুরু করেছে। কোনও কারণে তলার জায়গাটা নিশ্চয়ই আলগা ছিল। সেই পাথরসুদ্ধু আমার ছেলে গড়িয়ে পড়ে যেত পাশের খাদে। আমি ছুটে গেলাম ছেলেকে বাঁচাতে। ছেলে বাঁচল, কিন্তু বেকায়দায় আমার এই হাতটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। মটমট করে আঙুলের হাড়গুলো ভাঙার শব্দ আমি নিজে শুনেছি। শুনতে-শুনতেই যন্ত্রণার চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছি।

গ্লাভসটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে তিনি বললেন, "এখন দেখুন, সেই হাতটার কী অবস্থা!"

বীভৎস দৃশ্য! সন্তু সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল!

বীরেন্দ্র সিং-এর বাঁ হাতে শুধু বুড়ো আঙুল ছাড়া আর একটাও আঙুল নেই।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আঙুল চারটে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর পচতে শুরু করে। গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল। অপারেশন করে চারটে আঙুলই বাদ দিতে হল। তবু ঘা সারে না। কলকাতায় গিয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। সব ডাক্তারই বলেছে, এই হাতটার কবজি পর্যন্ত কেটে ফেলা উচিত। ভাগ্যিস, আমি ডাক্তারদের কথা শুনিনি। ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। রিমবিক বলে একটা জায়গা আছে জানেন তো, তার কাছাকাছি একটা মনাস্টারিতে আমি এক তিব্বতি তান্ত্রিকের সন্ধান পাই। তিনি অনেক কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে দিতে পারেন শুনেছিলাম। তাঁর পায়ে পড়তেই তিনি আমায় অভয় দিয়ে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনিই আমাকে এই দস্তানাটা পরিয়ে দিলেন।"

বীরেন্দ্র সিং বাঁ হাতে আবার দস্তানাটা লাগালেন। এই অবস্থায় দেখলে মনে হয়, ওর পাঁচটা আঙুলই আছে।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "সেই তান্ত্রিক লামা আমাকে কোনও ওষুধ দেননি, শুধু এই হাতের ওপর মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। ব্যস, ঘা শুকিয়ে গেল। এখন আমি এই হাত দিয়ে পাঁচটা আঙুলের কাজই করতে পারি। একদম নর্মাল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এই হাত দিয়ে আপনি সব কাজ করতে পারেন?"

বীরেন্দ্র সিং মুচকি হেসে বললেন, "খালি হাতে পারি না, কিন্তু গ্লাভস পরা থাকলে কোনও অসুবিধে হয় না। এটা মন্ত্র-পড়া গ্লাভস। দেখবেন, এই গেলাসটা তুলে ধরব?"

বীরেন্দ্র সিং সত্যিই একটা কাচের গেলাস তুলে ধরলেন বাঁ হাতে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য ! এরকম আশ্চর্য ব্যাপার কখনও দেখিনি। দস্তানার আঙুলগুলোকে মনে হচ্ছে সত্যিকারের আঙুল। নইলে উনি গেলাসটা ধরে আছেন কী করে ? কী রাজা, এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় ?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি খুব আশ্চর্য ব্যাপার।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "আমাকে অবশ্য প্রতি দশদিন অন্তর রিমবিকের সেই তান্ত্রিক লামার কাছে যেতে হয়। তিনি নতুন করে মন্ত্র পড়ে দেন। কখনও ব্যবসার কাজে কলকাতা কিংবা দিল্লি গিয়ে যদি আটকে পড়ি, দশদিনের মধ্যে ফিরতে না পারি, অমনি হাতটা আবার দুর্বল হতে শুরু করে। আবার সেই লামাজির কাছে ছুটে গেলেই তিনি সব ঠিক করে দেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এরকম ঘটনা কখনও শুনিনি। সেই লামাজি আপনার কাছ থেকে টাকাপয়সা নেন কিছু ? চিকিৎসার ফি ?"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কিচ্ছু না ! উনি কিছুই চান না। আমি শুধু প্রত্যেকবার ওঁর জন্য এক ঝুড়ি ফল নিয়ে যাই। যে সিজ্‌নের যে ফল পাওয়া যায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, "রাজা, তুমি একবার ওই তান্ত্রিক লামার কাছে তোমার পা-টা দেখাও না ! উনি যদি সারিয়ে দিতে পারেন..."

কাকাবাবু বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বললেন, "এবারে তো আর হবে না। আমরা কালকেই ফিরে যাচ্ছি।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কালকের ফেরা ক্যানসেল করুন। আমি আপনাকে রিমবিক নিয়ে যাব। আমার দু-একদিনের মধ্যেই যাওয়ার কথা। আমি ডেফিনিট যে উনি আপনার পা ঠিক করে দেবেন !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার পা ঠিক হয়ে গেলেও তো মুশকিল। তারপর আমাকে প্রত্যেক দশদিন অন্তর দার্জিলিং আসতে হবে ? নাকি দার্জিলিং-এ এসেই পাকাপাকি থাকব ?"

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "তখন দার্জিলিং-এ এসেই পাকাপাকি থাকবেন। এটা কত সুন্দর জায়গা। কলকাতা ঘিঞ্জি, ময়লা ! আমার তো কলকাতা গিয়ে একদিন দু'দিনের বেশি থাকতে ইচ্ছে করে না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমার তবু কলকাতাই ভাল লাগে। কলকাতা ছেড়ে বেশিদিন দূরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, ক্রাচ নিয়ে হাঁটাচলা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন আর কোনও অসুবিধে হয় না। শুধু পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে কষ্ট হয়। সেইজন্যই আর পাহাড়ে বেশি আসি না !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তবু একবার ট্রাই নিয়ে দেখলে পারতে ! বীরেন্দ্র সিং যা বললেন, তাতে তো মনে হচ্ছে মিরাকুলাস কিওর। ওই তান্ত্রিক লামার নিশ্চয়ই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে দূরেই থাকতে

চাই।”

আড্ডা ভাঙল রাত ন'টায়। ওরা দু'জন চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু আর নীচের ডাইনিং রুমে না গিয়ে ঘরেই রাত্তিরের খাবারের অর্ডার দিলেন। সন্তুর মাথায় এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে, খাবার ইচ্ছে একটুও নেই। কিন্তু কিছু না খেলে কাকাবাবু সন্দেহ করবেন। সন্তুর কপালে হাত দেবেন। তাই সে খেতে বসল। কিছুটা খেয়েও নিল।

এর পর কাকাবাবু ডায়েরি লিখতে বসলেন টেবিলে। বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটার চটাপট শব্দ হচ্ছে কাচের জানলায়। সন্তু শুয়ে পড়ল লেপ মুড়ি দিয়ে। জ্বরের চোটে তার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে। কিছু একটা ওষুধ খাওয়া উচিত ছিল বোধ হয়। যাক, কাল দুপুরের মধ্যেই তো কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা। তখন ডাক্তার দেখালেই হবে।

এত জ্বরের মধ্যে ভাল ঘুম আসে না। নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল সন্তু। বৃষ্টিতে ধস নেমেছে, রাস্তা ভেঙে পড়েছে অনেকখানি, তিন-চারদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরা হবে না...একটা বিরাট পাথরের চাঁই গড়িয়ে আসছে উঁচু পাহাড় থেকে, এই হোটেলটাকেও ভেঙে চুরমার করে দেবে...কেইন শিপটন হাসছে হা-হা করে, তার গলার লকেটে দুলছে একটা মস্ত বড় মানুষের দাঁত, সে একটা মাছধরা জালের মতন স্টিলের জাল ছুঁড়ে কাকাবাবুকে আর তাকে বন্দী করে ফেলল, তারপর অট্টহাসি দিয়ে বলল, “এবার সন্তু আর রাজা রায়চৌধুরী। এবার তোমরা কোথায় পালাবে ?”...একটা হাত এগিয়ে আসছে সন্তুর মুখের দিকে, সেই হাতের পাঞ্জায় শুধু বুড়ো আঙুল ছাড়া আর অন্য আঙুল নেই, তবু সেই হাতটাই সন্তুর গলা টিপে ধরছে...

॥৩॥

সকালে উঠে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্তুর মনে হল, এক রাত্তিরেই তার চোখ দুটো যেন অনেকটা বসে গেছে। বেশ দুর্বল লাগছে শরীর, টলটল করছে মাথা। তবে জ্বর কমেছে।

কাকাবাবু তৈরি হয়ে নিয়েছেন অনেক আগেই। একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল।

বাগডোগরায় গিয়ে প্লেন ধরতে হবে, পৌনে বারোটার সময় চেক-ইন করার কথা। সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে, তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র প্যাক করে নীচে নামবার সময় সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, “দৌড়তে দৌড়তে আসছি। ভয় পাচ্ছিলাম, এর মধ্যেই চলে গেলে কি না !”

কাকাবাবু বললেন, “কী ব্যাপার ? কাল রাত্তিরেই তো তোমার কাছ থেকে

বিদায় নিয়েছি। এখন হঠাৎ আবার এলে কেন ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “সকালবেলাতেই রাষ্ট্রপতি আমায় ডেকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। উনি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। উনি এখান থেকে একবার কালিম্পং যাবেন। তোমরা দু'জনে ওঁর সঙ্গে হেলিকপ্টারে যেতে পারো।”

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভাবল, তা হলে আজ আর ফেরা হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন, তা হলে কোনও মানুষ কি তা অগ্রাহ্য করতে পারে ?

কাকাবাবু তবু একটুক্ষণ থেমে বললেন, “কিন্তু আমাদের যে আজই প্লেনের টিকিট কাটা আছে ? না গেলে টিকিট নষ্ট হবে।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “সে-কথাও আমি রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছি। উনি বললেন, রাজা রায়চৌধুরীর যদি জরুরি কাজ থাকে, তা হলে আটকাবার দরকার নেই। সেইজন্য তিনি তোমাকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।”

নরেন্দ্র ভার্মা পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন।

বেশ পুরু কাগজের সাদা রঙের খাম। এক পাশে রাষ্ট্রপতির নাম ছাপা রয়েছে। ওপরের দিকে ছাপ মারা, ‘কনফিডেনশিয়াল’।

কাকাবাবু সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই খামটা খুলে দ্রুত পড়ে নিলেন চিঠিখানা।

তারপর খামসুদ্ধু সেটাকে পকেটে রেখে তিনি নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, “এ চিঠিতে কী লেখা আছে, তুমি জানো ?”

নরেন্দ্র ভার্মা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, “না, প্রেসিডেন্ট আমাকে কিছুই বলেননি।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে। তুমি ওঁকে গিয়ে বলো, আমি আজ আর থাকতে পারছি না। কয়েকদিনের মধ্যেই দিল্লিতে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব !”

নীচে নেমে এসে কাউন্টারে বিল মিটিয়ে দিতে দিতে কাকাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, “ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, ট্যাক্সি এসেছে ?”

ম্যানেজার বলল, “এখনও তো আসেনি। সকাল থেকে দু-তিনবার ফোন করেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “এই রে, দেরি হয়ে যাচ্ছে যে !”

হোটেলের লবি থেকে এগিয়ে এল ফিলিপ তামাং। “গুড মর্নিং, গুড মর্নিং,” বলে সে কাকাবাবুর ডান হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, “মিঃ রায়চৌধুরী, তা হলে সত্যি সত্যি আজই চলে যাচ্ছেন ? আমার চা-বাগানটায় একবার ঘুরে যাবেন না ?”

কাকাবাবু বললেন, “আপনার নেমন্তন্নর জন্য আবার ধন্যবাদ। কিন্তু এবার থাকতে পারছি না।”

পেছন ফিরে হোটেলের ম্যানেজারকে কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, “আপনাকে কাল থেকে বলে রেখেছি, তবু ট্যাক্সি জোগাড় করে রাখেননি। এর

পর ফ্লাইট মিস করব।"

ফিলিপ তামাং বলল, "বাগডোগরার জন্য ট্যাক্সি খুঁজছেন ? আমার গাড়িতে চলে যান না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আপনার গাড়িতে কেন যাব ? পয়সা দিলে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না ?"

ফিলিপ তামাং বলল, "টি বোর্ড থেকে একজন অফিসার আজ আসছেন। আমার গাড়ি তাঁকে আনতে যাবে, এখান থেকে ফাঁকা যাবে সেই গাড়ি। শুধু শুধু আপনি ট্যাক্সির জন্য পয়সা খরচ করবেন কেন ?"

হোটেলের ম্যানেজার আবার ফোন করার চেষ্টা করছিল, এই কথা শুনে ফোন নামিয়ে রাখল, নরেন্দ্র ভার্মাও তাকালেন কাকাবাবুর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ট্যাক্সি না পেলে আমি তোমার জন্য সরকারি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি এক্ষুনি। তবে, এই ভদ্রলোকের গাড়ি যখন ফাঁকাই যাচ্ছে..."

যে কোনও কারণেই হোক, ফিলিপ তামাংয়ের গাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই কাকাবাবুর। কিন্তু সকলে মিলে এমন বোঝাতে লাগলেন যে, কাকাবাবুর আর না বলার কোনও যুক্তি রইল না।

ফিলিপ তামাং বলল, "মিঃ রায়চৌধুরীর এইটুকু উপকার করতে পারলেও আমি ধন্য হব !"

হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ফিলিপ তামাংয়ের ঝকঝকে নতুন জিপ গাড়ি। মালপত্র ভেতরে রেখে কাকাবাবু বসলেন ড্রাইভারের পাশে। সন্তুকেও তিনি তাঁর পাশে বসতে বললেন, কিন্তু সন্তু ইচ্ছে করে ভেতরে চলে গেল।

আজ আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার। ভোর থেকে একবারও বৃষ্টি হয়নি। রোদে ঝলমল করছে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সন্তু প্রত্যেকবার খুব উত্তেজনা বোধ করে, উৎসুকভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আজ তার শরীর ভাল নেই।

দার্জিলিং শহর ছাড়বার পর ঘুম-এর কাছাকাছি এসে কাকাবাবু একবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে সন্তু, তোর মন খারাপ লাগছে নাকি ? আরও দু-এক দিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ?"

সন্তু অন্যমনস্কভাবে বলল, "না।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এত মন-মরা হয়ে আছিস কেন ? সকাল থেকে তোর একটা কথাও শুনিনি।"

সন্তু এবার সোজা হয়ে বসল, কাকাবাবুর গায়ে ছোঁয়া লেগে গেলেই তিনি সন্তুর জ্বরের কথা টের পেয়ে যাবেন, তাই সে দূরে দূরে থাকছে। কিন্তু কোনও কথা না বলে ঝিম মেরে বসে থাকলেও কাকাবাবু সন্দেহ করবেন।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমাদের রাষ্ট্রপতি যে তোমাকে চিঠি লিখলেন, ওঁর

সঙ্গে কি তোমার আগে পরিচয় ছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ছিল। আমি যখন দিল্লিতে চাকরি করতাম, উনি তখন ছিলেন সেই দফতরের মন্ত্রী। প্রায়ই ওঁর কোয়ার্টারে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কাল দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে সেই সময়কার অনেক গল্প হল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "উনি তোমাকে চিঠিতে কী লিখেছেন ?"

কাকাবাবু একবার আড়চোখে গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকালেন। তারপর ইংরেজিতে বললেন, "খামের ওপর কনফিডেনশিয়াল লেখা ছিল দেখিসনি। ওই চিঠির কথা কাউকে বলা যাবে না।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কালকে তুমি বক্তৃতার সময় একবার বলেছিলে, মানুষ এভারেস্টের চেয়েও উঁচু পাহাড় জয় করবে একদিন। এভারেস্টের চেয়ে উঁচু পাহাড় কি আর আছে ?"

"নেই বুঝি ?"

"কখনও তো শুনিনি !"

"চিন দেশে অনেক বড়-বড় পাহাড় আছে। কেউ কেউ বলে, তার দু-একটা নাকি এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। অবশ্য, এখনও সেরকম প্রমাণ সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে পৃথিবীর বাইরে তো আছেই !"

"পৃথিবীর বাইরে ?"

"তুই মঙ্গল গ্রহের পাহাড়টার কথা পড়িসনি বুঝি ? মানুষ কয়েকবার চাঁদে পা দিয়েছে, আর দু-এক বছরের মধ্যেই মঙ্গল গ্রহে নামবে। মঙ্গল গ্রহের অনেক ছবি তোলা হয়ে গেছে এর মধ্যে। তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা গেছে একটা মস্ত বড় পাহাড়। হিমালয় তার কাছে ছেলেমানুষ। তার চূড়াটা ছাব্বিশ কিলোমিটার উঁচু, অর্থাৎ এভারেস্টের তিনগুণ। তার নাম দেওয়া হয়েছে, মন্স ওলিম্পাস। সেটা আবার একটা আগ্নেয়গিরি। মানুষ একদিন না একদিন সেই পাহাড়ও জয় করবে নিশ্চয়ই।"

"এভারেস্টের তিন গুণ ? ওরেব্বাবা !"

সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "এইসব ছোট-ছোট পাহাড়ই দেখতে বেশি ভাল, তাই না ? একবার কলকাতা থেকে প্লেনে কাঠমাণ্ডু যাবার সময় এভারেস্টের চূড়া দেখা গিয়েছিল, তোর মনে আছে ? প্লেনের পাইলট সবাইকে দেখাল। অনেকগুলো বরফ ঢাকা পিকের মধ্যে একটা এভারেস্ট, তার আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্যই বোঝা গেল না !"

সন্তু বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে, কিংবা এক সময় ছিল, তাই না ?"

"কে বলল তোকে ? সেরকম কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।"

"আমি একটা বইতে পড়েছি। খুব পাওয়ারফুল দূরবিন দিয়ে মঙ্গল গ্রহের গায়ে সোজা সোজা দাগ দেখা গেছে। সেগুলো আসলে শুকনো খাল। নদী কখনও একেবারে সোজা যায় না। মানুষের মতন কোনও প্রাণী না থাকলে খাল কাটবে কে?"

"ওটা একটা মজার ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের ভাবার ভুল। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল জানিস? গত শতাব্দীতে ইতালির একজন বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম গিয়োভানি সিয়াপারেলি, তিনি প্রায় সর্বক্ষণ দূরবিনে চোখ দিয়ে বসে থাকতেন আর আকাশ দেখতেন। একবার তিনি নানারকম দূরবিন অদলবদল করতে-করতে হঠাৎ মঙ্গল গ্রহে কতকগুলো দাগ দেখতে পেলেন। দাগ তো নয়, সেগুলো হচ্ছে ভূমির ওপর লম্বা-লম্বা খাঁজ। ইতালিয়ান ভাষায় ওই খাঁজকে বলে Canali, সিয়াপারেলি সেই কথা লিখে গেলেন। তারপরে অনেকে ধরে নিল Canali হচ্ছে ইংরেজিতে Canal বা খাল। তখন পৃথিবীতে সুয়েজ খাল, পানামা খাল এইসব বড়-বড় খাল কাটা হচ্ছে তো, তাই মানুষ ভাবল তাদের আগেই মঙ্গল গ্রহের জীবরা আরও বড় খাল কেটে ফেলেছে। এখন অনেক ভাল ভাল ছবি তুলে দেখা গেছে, খাল-টাল কিছু নেই ওখানে।

এইরকম বিজ্ঞানের গল্পে পেরিয়ে গেল অনেকটা রাস্তা। কাকাবাবুর এইসব গল্পের স্টক অফুরন্ত।

কার্শিয়াং পর্যন্ত এসে জিপের ড্রাইভার হিল কার্ট রোড ছেড়ে পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরল। এই রাস্তাটা খাড়াভাবে নেমে গেছে, ঘন ঘন বাঁক, একটু বিপজ্জনক বটে, কিন্তু খুব সুন্দর। অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় মকাইবাড়ি চা-বাগান, কাছাকাছি পাহাড়গুলি একেবারে ঘন সবুজ। চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই রাস্তায় বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছনো গেল বাগডোগরায়।

কাকাবাবু জিপের ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু বখশিশ দিলেন। তারপর ওরা এসে বসল এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে। কাকাবাবু বেছে নিলেন একেবারে পেছনের কোণের দিকে দুটো চেয়ার। মুখের সামনে মেলে ধরলেন একটা ম্যাগাজিন।

অনেক বিদেশি অভিযাত্রী ফিরে যাচ্ছেন আজ। তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কাকাবাবুর পরিচয় আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না কাকাবাবুর। একবার শুধু তিনি উঠে গিয়ে কাউন্টারে কী যেন কথা বললেন একজনের সঙ্গে।

কলকাতার ফ্লাইট এসে গেছে। একসময় এখানকার যাত্রীদের সিকিউরিটি চেকের জন্য ডাক পড়ল।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই একটু বোস, সন্তু, আমি বাথরুম ঘুরে আসছি।

কাকাবাবু সেই যে গেলেন, আর ফেরার নামটি নেই।

সন্তু টের পেল, তার আবার বেশ জ্বর এসে গেছে। মাথাটা প্রচণ্ড ভারী, খুব ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। তবু জোর করে সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। আর তো এক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে কলকাতায়। তারপর বিকেলের দিকে ডাক্তার মামাবাবুকে দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে নিলেই হবে।

সমস্ত লোক ঢুকে গেল সিকিউরিটি এরিয়ার মধ্যে। কাকাবাবু এখনও আসছেন না। এর পর প্লেন ছেড়ে দেবে। বাথরুমে গিয়ে কাকাবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল নাকি? একবার দেখতেই হয়। কিন্তু সন্তু ভাবল, ব্যাগ দুটো ফেলে বাথরুমের কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? এয়ারপোর্টে বড্ড চুরি হয়।

দুটো ব্যাগই দু' কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সন্তু এগিয়ে গেল।

বাথরুম পর্যন্ত তাকে যেতে হল না। সে দেখল, এয়ারপোর্টের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। সন্তুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সন্তু প্রায় দৌড়ে এসে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, লাস্ট কল দিয়ে দিয়েছে। শিগগির চলো, এর পর আর যেতে দেবে না!"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, আমরা এই ফ্লাইটে যাচ্ছি না। টিকিট ক্যানসেল করিয়ে এসেছি। চল, একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা আবার ফিরব!"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে বলল, "আমরা আবার দার্জিলিং-এ ফিরে যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই তো থেকে যেতেই চেয়েছিলি? তোর কলেজের এখনও ছুটি আছে। চল, আর দু-একটা জায়গায় বেড়িয়ে যাই।"

সন্তু যেন আকাশ থেকে পড়ল। কাকাবাবু বারবার বলেছেন, তাঁকে ফিরতেই হবে কলকাতায়। ফিলিপ তামাং-এর নেমন্তন্ন নিলেন না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়ে কালিম্পং যাবার চমৎকার সুযোগটাও ছেড়ে দিলেন। দার্জিলিং থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে নেমে এসে, এয়ারপোর্টে এক ঘণ্টা বসে থেকে তিনি আবার ফিরতে চান। এর মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটল?

বেড়াবার নামে কিংবা অ্যাডভেঞ্চারের নামে সন্তু সবসময় উৎসাহে টগবগ করে। কিন্তু আজ তার শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। ভাল লাগছে না কিছুই। এটা যদি কোনও শক্ত অসুখ হয়?

একবার সে চিন্তা করল, কাকাবাবুকে জ্বরের কথা বলবে কি না। যাবার পথে কিছু একটা ওষুধ খেয়ে নেওয়া উচিত।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে ভাবল, একবার সে তার অসুখের কথা উচ্চারণ করলেই কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। এর আগে সন্তুর কোনওবার শরীর খারাপ হয়নি। সন্তু একবার মুখ ফুটে জ্বরের কথা বললেই কাকাবাবু খুব চিন্তা করবেন, তাঁর প্ল্যান পালটে ফেলবেন।

সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার দার্জিলিং সবসময় ভাল লাগে। এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছেই করে না!"

এয়ারপোর্টের বাইরেটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে। একটাই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছতলায়। বোঝা গেল, কাকাবাবু আগেই এর ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছেন।

ওরা উঠে বসার পর ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনদিক দিয়ে যাব সার ? হিলকার্ট রোড ? না..."

কাকাবাবু বললেন, "ও দুটোর কোনও রাস্তাতেই না। আপনি মিরিক-এর দিক ধরে চলুন।"

লোকটি চিন্তিতভাবে বলল, "মিরিক হয়ে দার্জিলিং ? অসুবিধে আছে, সার। সুখিয়াপোখরির পর রাস্তা খুব খারাপ। দু' জায়গায় অনেকখানি করে ভাঙা। এর মধ্যে মেরামত না করে থাকলে যাওয়া যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, ততদূরেই যাব। রাত্তিরটা কোথাও থেকে গেলেই হবে।"

সন্তু ভাবল, এইবার তার জ্বরের কথাটা কাকাবাবুকে জানানো উচিত। এর পর যদি অসুখ খুব বেড়ে যায় ? একটা কিছু ওষুধ না খেলে আর চলছে না।

কিন্তু এ-কথাও সন্তুর মনে হল যে, এখন অসুখের কথা শুনলেই কাকাবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। সন্তুকে বকুনি দেবেন, কেন সে আগে জানায়নি ! প্লেনটা ছেড়ে গেল, এখন আর কলকাতায় ফেরাও যাবে না ! কাকাবাবু আবার দার্জিলিং ফিরে যেতে চাইছেন, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে ! সন্তুর অসুখের জন্য সেই প্ল্যানটা নষ্ট হয়ে যাবে ? ধুত, সামান্য বৃষ্টিতেই তার এমন জ্বর হয়ে গেল ! অসুখ হবার আর সময় পেল না !

সন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলল না।

গাড়িতে উঠে সে কাকাবাবু আর তার মাঝখানে হ্যান্ডব্যাগটা রাখল। যাতে ছোঁয়া না লাগে।

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "খিদে পেয়েছে ? দুপুরের লাঞ্চ খেতে হবে। শিলিগুড়িতে এখন খেয়ে নিবি, না মিরিকে গিয়ে খাবি ?"

সন্তুর খিদেই পাচ্ছে না। সকালবেলা হোটেলে সে ব্রেকফাস্টও পুরো খায়নি। মুখখানা বিস্বাদ হয়ে আছে।

সে বলল, "পরে। এখন না !"

কাকাবাবু বললেন, "এই পথে গেলে একটা ভারী সুন্দর ডাকবাংলো পড়ে। সেটার নাম লেপচা জগৎ। যদি জায়গা পাওয়া যায়, রাত্তিরটা সেখানেই থাকব।"

সন্তু বলল, "ডাকবাংলোর নাম লেপচা জগৎ ? বেশ অদ্ভুত তো !"

কাকাবাবু বললেন, "সাহেবদের আমলের পুরনো বাংলো। সাহেবরা খুঁজে খুঁজে চমৎকার জায়গা বার করে সেখানে বাংলো বানাত। এককালে এই পুরো

দার্জিলিং জেলাটা লেপচাদেরই ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় ওইরকম নাম।

মিরিক পর্যন্ত রাস্তা বেশ পরিষ্কার। পৌঁছতে কোনও অসুবিধে হল না। বেলা প্রায় আড়াইটে।

এখানে একটা টুরিস্ট লজ আছে। লাঞ্চ খাওয়ার জন্য কাকাবাবু সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন। তারপর ড্রাইভারকেও ডেকে নিয়ে এলেন খাবার টেবিলে।

সন্তুর কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ কিছু না খেলে কাকাবাবু সন্দেহ করবেন। জোর করেই সে ডাল-ভাত-মুরগির মাংস খেয়ে নিল, তারপর বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে সব বমি করে ফেলল।

সন্তুর ইচ্ছে করছে নিজের গালে চড় মারতে। এরকম বাজে অসুখ তার আগে কখনও হয়নি। কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে সে কোনওদিন তাঁকে অসুবিধেয় ফেলেনি। জ্বরটা কি কিছুতেই কমবে না?

এর পরেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। দারুণ বৃষ্টি।

ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "সার, এর মধ্যে আর এগোবেন? আকাশের যা অবস্থা দেখছি, এ-বৃষ্টি সহজে থামবে না মনে হচ্ছে। টুরিস্ট লজে ঘর খালি আছে। আজ রাতটা এখানেই থেকে যান না?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এখানে থাকব না। আমরা এগোব।"

ড্রাইভার বলল, "এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে যাবার রিস্ক আছে।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনাকে বেশি টাকা দেব!"

ড্রাইভারটি তবু আপত্তির সুরে বলল, "কিন্তু সুখিয়াপোখরির পর আর কিছুতেই যাওয়া যাবে না। আমি এখানে খবর নিয়েছি, তারপরে দার্জিলিং-এর রাস্তা খুব খারাপ হয়ে আছে, এই বৃষ্টিতে আবার ধস নামবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সুখিয়াপোখরি গিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেব!"

দার্জিলিং ফিরে যাবার জন্য কাকাবাবু এরকম অদ্ভুত জেদ ধরেছেন কেন, তা সন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ নেই।

বৃষ্টি যদি কমে, সেইজন্য মিরিকে অপেক্ষা করা হল প্রায় এক ঘণ্টা। একবার একটু কমল বটে, কিন্তু গাড়িটা স্টার্ট করার খানিক বাদেই যেন আবার আকাশ ভেঙে পড়ল, এবার বৃষ্টির সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রের গর্জন।

এই অবস্থায় জোরে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। সুখিয়াপোখরি পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। এখানে অবশ্য তেমন বৃষ্টি নেই। পাহাড়ের এই এক মজা, কোথাও দারুণ বৃষ্টি, কোথাও একেবারে শুকনো খটখটে। সুখিয়াপোখরি অবশ্য শুকনো নয়, খুব মিহি ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, এরকম বৃষ্টিতে গা ভেজে না।

ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিলেন কাকাবাবু।

ড্রাইভারটি বলল, "কাল সকালবেলা দার্জিলিং-এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা

যেতে পারে। কাল ক'টায় বেরুবেন, সার ?"

কাকাবাবু বললেন, "কালকে আর আপনাকে দরকার নেই।"

ড্রাইভারটি অবাক হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তাকে আর সে সুযোগ না দিয়ে বললেন, "আয় সন্তু !"

সুখিয়াপোখরি জায়গাটা ঠিক গ্রামও নয়, শহরও নয়। এমনি কিছু বাড়িঘর, কয়েকটি দোকানপাট রয়েছে। কিছু অল্পবয়েসী ছেলে ক্যারম খেলছে একটা চায়ের দোকানের সামনে। ক্যারম-বোর্ডটা একটা উঁচু টেবিলের ওপর রাখা, এরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্যারম খেলে।

সেই চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন কাকাবাবু। সন্তুর দু'হাতে দুটো ব্যাগ। রাস্তাটা উঁচুর দিকে উঠে গেছে। ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে কাকাবাবুর কষ্ট হয়, তবু তিনি গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

একটা টিলার ওপরের দিকে একটা বেশ সুন্দর কাঠের বাড়ি। সামনের লম্বা বারান্দায় অনেকগুলো ঝুলন্ত ফুলের টব।

সিঁড়ি দিয়ে সেই বারান্দায় উঠে গিয়ে কাকাবাবু একটা দরজায় ঠক-ঠক করলেন।

কয়েকবার ঠক-ঠক করার পরও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ক্যাপটেন নরবু ? ক্যাপটেন নরবু ?"

এবার ভেতর থেকে কেউ একজন রুক্ষ গলায় বলল, "কৌন হ্যায় ?"

তারপর দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, তাই কোনও লোককে দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "হ্যালো, ওলড বয় ?"

লোকটি বলল, "হু ইজ ইট ! গেট আউট ! আই ডোনট সি এনি ওয়ান অ্যাট দিস আওয়ার !"

কাকাবাবু বললেন, "ক্যাপটেন নরবু, তুমি আমায় চিনতে পারছ না ?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল লোকটি। তারপর হঠাৎ বিকট উল্লাসের আওয়াজ করে বলে উঠল, "রাজা রায়চৌধুরী ? রাজা রায়চৌধুরী ? সত্যিই রাজা রায়চৌধুরী, না আমি চোখে ভুল দেখছি !"

লোকটি দু'হাতে এমন জোরে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে যে, তাঁর হাত থেকে ক্রাচ খসে পড়ল।

বারান্দার আলো জ্বালার পর দেখা গেল শক্ত-সমর্থ জোয়ান সেই পুরুষটিকে। তবে, তাঁর বয়েস কাকাবাবুর চেয়েও একটু যেন বেশি, সারা মুখে আঁকিবুকি দাগ। গায়ে একটা পুরনো ওভারকোট। তিনি কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের চোটে একেবারে নাচতে শুরু করলেন আর বারবার বলতে লাগলেন, "এত দিন পর তুমি এলে ? সত্যি আমার বাড়িতে এলে ? রাস্তা

চিনতে পারলে ? ঠিক এগারো বছর পর দেখা, তাই না ?”

এক সময় কাকাবাবু কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, “আগে চা খাওয়াও ! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই আমার ভাইপো, সন্তু। ওকে তুমি আগে দেখোনি !”

ক্যাপটেন নরবু এবার সন্তুকেও জড়িয়ে ধরে উঁচুতে তুলে নিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, “আরে, এর গা এত গরম। এর তো খুব জ্বর।”

কাকাবাবু অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, “জ্বর ?”

“না, না, সেরকম কিছু না, সেরকম কিছু না”, বলে সন্তু একটু পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও ক্যাপটেন নরবু তাকে ধরে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। কাকাবাবু তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, “তাই তো, বেশ টেম্পারেচার দেখছি। চোখ দুটোও বেশ লাল। কখন জ্বর এলো ? আগে বলিসনি কেন ?”

সন্তু বলল, “এই একটু আগে। আমি নিজেও তো বুঝিনি।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আমার কাছে ওষুধ আছে। ঠিক হয়ে যাবে। আগে বসো, চা খাও।”

ভেতর দিকে উঁকি দিয়ে একজন কাউকে চা বানাতে বলে ক্যাপটেন নরবু এসে বসলেন সন্তুর পাশে। বারান্দায় বেশ কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ানো রয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, “বুঝলি সন্তু, এই ক্যাপটেন নরবু এক সময় আর্মিতে ছিলেন। আমরা সিমলাতে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। দু'জনে একসঙ্গে শিকার করতে গেছি অনেকবার।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “রাজা রায়চৌধুরী দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। গ্রেট ম্যান। এরকম বন্ধু হয় না। আমার বাড়িতে আসার জন্য কতবার নেমন্তন্ন করেছি, এত দিনের মধ্যে একবারও আসেননি।”

কাকাবাবু বললেন, “কোনও খবর না দিয়ে এসে পড়েছি এবার। তোমাকে বাড়িতে পাব কি না তাও তো জানতাম না ! আজকের রাতটা লেপচা জগৎ বাংলোতে থাকব ঠিক করেছিলাম। তোমার জিপে সেখানে পৌঁছে দেবে ?”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “মাথা খারাপ ! এদিকে এসে তোমরা ডাক বাংলোতে থাকবে ? আমার এত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে। আমি এখানে একলা থাকি। আচ্ছা রায়চৌধুরী, আমার বাড়িটা কী করে চিনলে বলো তো ?”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি যেরকম ডেসক্রিপশান দিয়েছিলে, সেটা মনে ছিল। সুখিয়াপোখরিতে টিলার ওপরে কাঠের বাড়ি। একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে রাস্তা। এখানে তো মোটে একটাই চায়ের দোকান।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আগে একটা খবর দিতে পারতে না ? সত্যিই যদি আমি বাড়িতে না থাকতাম ? আজই আমার শিলিগুড়ি যাবার কথা ছিল। বৃষ্টির জন্য বেরোইনি !”

কাকাবাবু বললেন, "চান্স নিলাম। তোমাকে না পাওয়া গেলেও রাত কাটাবার মতন একটা জায়গা ঠিক পাওয়া যেতই, কী বলো ! কিন্তু সন্তুর যে জ্বর এসে গেল, তার কী হবে ? তোমাকে নিয়ে এদিকটায় আমার কিছু ঘোরাঘুরির প্ল্যান ছিল।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ওর জ্বর আমি আজকের মধ্যেই সারিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে ভাল ওষুধ আছে। সেই ওষুধেও যদি না সারে, তা হলে এখানে এক তিব্বতি লামার কাছে নিয়ে যাব, তিনি সব অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ধন্বন্তরি লামা ! হ্যাঁ, এঁর কথা শুনেছি। একবার দেখা করার ইচ্ছে আছে। আগে সন্তুকে তোমার ওষুধটাই দাও !"

ক্যাপটেন নরবু দু'হাতে সন্তুর মাথাটা চেপে ধরলেন। সেইভাবে একটুক্ষণ থাকার পর বললেন, "হ্যাঁ, বেশ জোর ঠাণ্ডা লেগেছে। জ্বরটা সহজে যাবে না। একদম বেড রেস্ট নিতে হবে। দু'দিন বিছানা থেকে ওঠা চলবে না, বুঝলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমি একটা ঘর দেখিয়ে দাও। সন্তু এখনই গিয়ে শুয়ে পড়ুক বরং।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি করে বলল, "না, না। আমি এখন শোবো না। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আগে খাবার-দাবার খাবে, তারপর তো ঘুমাবে। তোমরা খুব ভাল দিনে এসেছ। আজ ময়ূর শিকার করেছি, ময়ূরের মাংস আমি নিজে রান্না করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এখনও শিকার করো, নরবু ? আমি শিকার একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। নিরীহ পশু-পাখি মারতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ময়ূর তো আমাদের ন্যাশনাল বার্ড। ময়ূর মারা নিষেধ !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তোমরা যে-রকম পেখম-মেলা বড়-বড় ময়ূর দেখো, এগুলো সেরকম নয়। এ একরকম পাহাড়ি ময়ূর, বহুত পাজি ! ফসল নষ্ট করে। আমি কমলা লেবুর ফার্ম করেছি, সেখানেও এসে উৎপাত করে খুব। ঝাঁক-ঝাঁক আসে। বন্দুক দিয়ে একটা-দুটো মারলে তবে অন্যগুলো পালায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কমলালেবুর ফার্ম করেছ ? কাল সকালে দেখতে যাব।"

এইসময় এক বৃদ্ধা একটা ট্রেতে করে চায়ের পট আর তিনটে কাপ এনে রেখে গেল একটা টেবিলে।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "দাঁড়াও, মাস্টার সন্তু, তুমি চা খেও না। আমি তোমার জন্য খুব স্ট্রং দাওয়াই নিয়ে আসছি।"

কাকাবাবু নিজের চা তৈরি করে নিলেন। ক্যাপটেন নরবু ভেতরে চলে

গিয়ে একটু বাদেই একটা বড় কাচের মগ ভর্তি কী যেন নিয়ে এসে সন্তুকে বললেন, "আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে খাও। দ্যাখো খারাপ লাগবে না।"

কাচের মগের মধ্যে অনেকটা খয়েরি রঙের গরম পানীয়। বেশ ঘন। প্রথমে একটা চুমুক দিয়ে সন্তুর মনে হল, খেতে সত্যি খারাপ নয়। এলাচ, দারুচিনি আরও কী সব যেন আছে। কমলালেবুর গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

খানিকটা খেতেই সন্তুর কান গরম হয়ে গেল, চোখ ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। জিনিসটা ঠিক ঝাল নয়, তবে বেশ ঝাঁঝ আছে। সন্তুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা, তোমরা এসেছ, সেজন্য আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আমার আর একটা কৌতূহলও হচ্ছে। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই কি এই ঝড়-বাদলের দিনে তুমি সুখিয়াপোখরি এসেছ? না, এখানে তোমার অন্য কোনও কাজও আছে?"

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মৃদু হেসে কাকাবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল তো বটেই। তা ছাড়া, আমার এখানে ঠিক কোনও কাজ নেই, তবে একটা কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছে আছে। সে ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো?"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাঃ, বৃষ্টি থেমে যাবার পর বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাতাসে কী যেন একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক। তারপর বাগানে বসে গল্প করতে করতে তোমায় সব বলব!"

॥ ৪ ॥

সন্তু চোখ মেলে দেখল, তার মাথার দু'পাশে মুখ ঝুঁকিয়ে রয়েছেন কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবু। দু'জনের মুখেই দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ। জানলা দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

প্রথমে সন্তুর ঠিক মনে পড়ল না, সে কোথায় শুয়ে আছে!

সে ভাবার চেষ্টা করল। কী হয়েছিল কাল সন্ধেবেলা? কাকাবাবু দার্জিলিং ফিরে যাবার নাম করে সুখিয়াপোখরিতে নেমে গেলেন। এখানে তাঁর বন্ধু ক্যাপটেন নরবুর বাড়ি। এখানেই তিনি আসতে চেয়েছিলেন? তা হলে দার্জিলিং থেকেই তো সহজে আসা যেত। শিলিগুড়ি-বাগডোগরা ঘুরে আসার কী দরকার ছিল?

তার জ্বর হয়েছিল, ক্যাপটেন নরবু কী যেন ওষুধ খেতে দিলেন। তাতে জ্বর কমে গেল। রাত্তিরে ময়ূরের মাংসও কয়েক টুকরো খেয়েছিল গরম-গরম চাপাটির সঙ্গে। তারপর? খেতে-খেতেই তার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল খুব। টেবিলের ওপর ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। তারপর আর তার মনে নেই।

কাকাবাবু বললেন, "একশো পাঁচ জ্বর মনে হচ্ছে। গা এত গরম ! তোমার বাড়িতে থার্মোমিটারও নেই !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ছিল ; ভেঙে গেছে। হ্যাঁ জ্বরটা খুব বেশিই।"

কাকাবাবু বললেন, "কী ওষুধ তুমি দিলে ? কোনও কাজই হল না !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ওষুধ খেয়ে কাল জ্বর অনেক কমে গিয়েছিল। আবার হল। কোনও ভাইরাস ইনফেক্শান মনে হচ্ছে !"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই তাই। তুমি শিগগির জিপের ব্যবস্থা করো। ওকে এক্ষুনি শিলিগুড়ি নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের এখানে তো আর কোনও ডাক্তার নেই বললে।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "একজন অ্যালোপাথ ডাক্তার ছিল, সে ছুটিতে গেছে। কিন্তু এই অবস্থায় কি ছেলেটাকে গাড়িতে এতটা রাস্তা নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে, রায়চৌধুরী ? তাতে ওর আরও স্ট্রেইন হবে !"

সন্তু উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। তার মাথাটা যেন একশো কিলো ভারী।

কাকাবাবু ধমকের সুরে ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "নিয়ে যেতেই হবে। না হলে ওকে আমি এখানে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখব নাকি ?"

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মাস্টার সন্তু, তোমার কষ্ট হচ্ছে ?"

সন্তু আজ আর মিথ্যে কথা বলতে পারল না। জ্বরের ঘোরে তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে সে বলল, "মাথায় খুব ব্যথা। সারা গায়েও ব্যথা !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কালকের বৃষ্টিতে রাস্তা আরও খারাপ হয়ে গেছে। যাওয়া মুশকিল হবে। আমাদের এখানে বর্ষাকালে এমন হয়। মাঝে-মাঝে দু-তিন দিন কোথাও যাওয়া যায় না।"

কাকাবাবু দৃঢ় গলায় বললেন, "তোমার জিপটা বার করো। যেমন করেই হোক যাবার চেষ্টা করতেই হবে !"

সন্তুর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, তার কান্না পাচ্ছে। তার শরীরটা এমনই দুর্বল যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তার জন্য কাকাবাবুকে শিলিগুড়িতে ফিরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কাকাবাবুর নিশ্চয়ই অন্য কিছু প্ল্যান ছিল। একটা হতচ্ছাড়া অসুখের জন্য সব ভেস্তে গেল।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে পাঁজাকোলা করে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে তিনি জিপটা আনতে গেলেন।

কাকাবাবু বারবার সন্তুর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখছেন। কাকাবাবুকে এতটা বিচলিত হতে সন্তু কখনও দেখেনি। কিন্তু সন্তু কী যে বলবে, কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। অসুখটা তাকে একেবারে কাবু করে দিয়েছে।

ক্যাপটেন নরবু জিপটাকে নিয়ে এলেন বারান্দার কাছে। জিপের পেছন দিকে তোশক-চাদর পেতে বেশ পুরু একটা বিছানা বানালেন। তারপর সন্তুকে শুইয়ে দিলেন সেখানে।

জিপের স্টিয়ারিং-এ বসলেন ক্যাপটেন নরবু, কাকাবাবু তাঁর পাশে। বাড়ির সামনের রাস্তাটা এত সরু যে, মনে হয় ওখান দিয়ে গাড়ি চলতে পারে না। কিন্তু জিপটা ঠিকই বেরিয়ে গেল। শুধু একবার একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে খুব জোর লাফিয়ে উঠল। তখন সন্তুও বিছানা থেকে ছিটকে খানিকটা ওপর দিকে উঠে গিয়েছিল। তাতে তার মাথার মধ্যে ঠিক যেন ভূমিকম্প হতে লাগল। যেন মনে হতে লাগল, আকাশ আর পৃথিবী উলটো দিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। জিপ গাড়িটা ওলট-পালট খাচ্ছে শূন্যে।

সন্তুর এই অবস্থার মধ্যে একবার মনে হল, সে কি মরে যাচ্ছে ? আগে তো কখনও তার মাথার এই অবস্থা হয়নি। নাঃ, সে কিছুতেই মরতে চায় না। কলকাতায় ফিরে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার আগে এমনি-এমনি মরে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার !

প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যথার জন্য সন্তুর চোখ বুজে এলেও তার জ্ঞান আছে ঠিকই, সে সবরকম শব্দ, কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে।

জিপটা টিলার নীচে নেমে এসে চায়ের দোকানের পাশে বেঁকল। সেই দোকানের সামনে আজও কয়েকটা ছেলে ক্যারম খেলছে। ক্যাপটেন নরবু ওদের সঙ্গে নেপালি ভাষায় দু-একটা কী যেন কথা বললেন।

তারপর আবার জিপটা স্টার্ট দেবার পর তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "রায়চৌধুরী, একটা কথা বলব ? প্রথমেই না বলো না, আগে শোনো ! আমি খবর নিয়ে জানলাম, সুখিয়াপোখরি থেকে একটু নীচে, মিরিকে পৌঁছবার আগেই সিমানা বলে একটা জায়গায় রাস্তা ভেঙে গেছে। অন্য গাড়ি তো যেতে পারছেই না, জিপও যাবে কি না সন্দেহ আছে।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আগে সেই পর্যন্ত চলো, তারপর দেখা যাবে !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি অন্য একটা কথা সাজেস্ট করছি। এখানে আমার চেনা একজন তিব্বতি লামা আছেন, তাঁর খুব নামডাক। সব অসুখ তিনি ইচ্ছে করলে সারিয়ে দিতে পারেন। পুরনো আমলের অনেক গোপন মন্ত্র তিনি জানেন, তা দিয়ে সব রোগ তিনি দূর করে দেন। তাঁর কাছে একবার মাস্টার সন্তুকে নিয়ে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখো নরবু, মন্তর-ফন্তরে আমার কোনও বিশ্বাস নেই। তবু অন্য সময় হলে আমি লোকটিকে গিয়ে দেখতাম। কিন্তু এখন আমার ভাইপো খুব গুরুতর রকমের অসুস্থ। এখন ওসব ছেলেখেলার প্রশ্রয় দিতে আমি একদম রাজি নই। সন্তুর জীবনের দাম আমার চেয়েও বেশি।

তুমি শিগগির শিলিগুড়ি চলো তো ! ওকে ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে, দরকার হলে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিতে হবে।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “রায়চৌধুরী, সেই তিব্বতি লামা সহজে কারুকে দেখেন না। আমি বললে তিনি রাজি হতে পারেন। তিনি বেশি দূরে থাকেন না। বড় জোর ডিটুর করার জন্য এক ঘণ্টা বেশি সময় লাগবে শিলিগুড়ি পৌঁছতে। একবার ঘুরে যেতে দোষ কী ? তুমি রাজি থাকলে বলো, গাড়ি ঘোরাই।”

কাকাবাবু জেদির মতন বললেন, “না, আমি রাজি নই !”

ক্যাপটেন নরবু এবার বেশ শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, “তুমি ঠিক আগের মতনই জেদি আছ ! বাংলায় কী যেন বলে, গোঁয়ারগোবিন্দ, তাই না ? তুমি রাজি না থাকলেও আমি মানেভঞ্জনের দিকটা ঘুরেই যাব। লামাজিকে দেখিয়েও যদি সন্তুর কোনও উপকার না হয়, তা হলে চটপট নেমে যাব শিলিগুড়ির দিকে। ওই দিকে একটা শর্টকাট আছে, হয়তো সে রাস্তাটা ভাল থাকতেও পারে। রায়চৌধুরী তোমার ভাইপোর অসুখ, সেজন্য কি আমার চিন্তা কিছু কম ?

কাকাবাবু আর কোনও কথা না বলে গুম হয়ে গেলেন।

রাস্তাটা ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, এক সময় মূল রাস্তা ছেড়ে একটা সরু পথে ঢুকে পড়ল। দু'পাশে গভীর জঙ্গল। এদিকে আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার পাশে বাড়ি-ঘরও নেই।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, “তা হলে নরবু, তুমি বলছ, এখানে তিব্বতি লামাদের মধ্যে তিনশো বছরের বুড়ো লোক বেঁচে আছে ?”

নরবু বললেন, “হ্যাঁ আছে। দু'জন।”

কাকাবাবু আবার বললেন, “তিনশো বছর বয়েস ? তা কখনও হতে পারে ? তুমি তো নিজের চোখে তাদের দেখোনি ?”

“না, তা দেখিনি। সেই মনাস্টারিটা খুব রিমোট জায়গায়। তার ভেতরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খুব কড়াকড়ি। তবে আমি খুব বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছ থেকে শুনেছি, সেখানে ওরকম দু'জন মানুষ আছে। তাঁরা এখনো হাঁটতে পারেন, কথা বলতে পারেন।”

“কিন্তু কী করে বোঝা যাবে, তাদের বয়েস তিনশো বছর ?”

“যারা দেখেছে, তারা শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন ? জানো রায়চৌধুরী, এই সব পাহাড়ি মানুষেরা মিথ্যে কথা বলেই না।”

“মিথ্যে কথা বলবে না, কিন্তু তাদের তো ভুল হতে পারে ? পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বুড়ো লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বয়েস একশো বেয়াল্লিশ বছর। তাও সেই বয়েসটা সঠিক কি না, ঠিক প্রমাণ করা যায়নি।

কোনওরকম ডাক্তারি পরীক্ষা তো হয়নি। অনেক সময় হয় কী জানো, যারা বলে তাদের বয়েস একশো বছরের বেশি, তারা অনেক সময় বছর গুনতে ভুলে যায়।"

"তুমি কী বলছ, রায়চৌধুরী ? পাঞ্জাবে আমি একজন বুড়ো লোকের সন্ধান পেয়েছিলাম, সে নিজের চোখে সিপাহি যুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা দেখেছে। নানা সাহেবকে দেখেছে ! সে-ও তো প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগেকার ব্যাপার। তা হলে ওর বয়েস কত বুঝে দেখো !"

"ওসব একদম বাজে কথা ! পুরনো আমলের গল্প শুনতে-শুনতে অনেক সময় মনে হয়, সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা ছেলেবেলার অনেক গল্প বলেন, তখনও এরকম হয়। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একবার একটা চিতা বাঘ ধরা পড়েছিল। তখন বাংলাদেশের গ্রামে প্রায়ই বাঘ আসত। একটা চিতা বাঘ এসে ঢুকে পড়েছিল আমাদের গোয়াল ঘরে। আমার ঠাকুর্দা বন্দুকের গুলিতে তার একটা পা খোঁড়া করে দেন। আমার এক কাকা ছিলেন দারুণ সাহসী, তিনি বস্তা চাপা দিয়ে সেই চিতা বাঘটাকে বেঁধে ফেলেন। পরে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক জমিদারের চিড়িয়াখানায়। এটা সত্যি ঘটনা, আমি ছোটকাকার পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলাম। ছোটকাকা যখন বাঘটাকে বস্তা চাপা দিয়ে বাঁধছেন, তখন আমি তাঁকে দড়ি এগিয়ে দিয়েছি। বাঁধা পড়ে গিয়ে বাঘটা গাঁক গাঁক করে হুঙ্কার ছাড়ছে, সেই আওয়াজ আজও স্পষ্ট শুনতে পাই। কিন্তু পরে হিসেব করে দেখেছি, ওই ঘটনাটা ঘটেছিল আমার জন্মের দু'বছর আগে ! গল্পটা বারবার শুনতে শুনতে কল্পনায় আমি নিজেকে তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। ওই সিপাহি যুদ্ধ দেখার ব্যাপারটাও সেরকম !"

"কিন্তু এই তিনশো বছরের বৃদ্ধ লামাদের বংশধররা এখানেই আছে। তারা সাক্ষী দেবে।"

"তিনশো বছরের কোনও লোকের বংশধর, তার মানে হল বারো জেনারেশন ! এই বারো জেনারেশন আগেকার পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কিছু মনে রাখাও অসম্ভব ব্যাপার। তুমি তোমার ঠাকুর্দার যিনি ঠাকুর্দা ছিলেন, তাঁর নাম বলতে পারো ? বলো, পারবে ?"

"আমি পারব না। কিন্তু তিব্বতি লামারা তাদের বংশ পরিচয়ের খুব ভাল রেকর্ড রাখে। দশ-বারো জেনারেশানের নাম মুখস্থ বলে দিতে পারে।"

"নাম মুখস্থ রাখলেও বারো জেনারেশান আগেকার ঠাকুর্দার চেহারা মনে রাখা কিংবা তাকে আইডেন্টিফাই করা একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার !"

"তুমি দেখছি, কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এখানে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ আছে। সেই ছেলেবেলা থেকে একথা শুনে আসছি।"

"আরে, সত্যি-সত্যি একজন তিনশো বছর বয়েসী মানুষ খুঁজে বার করতে পারলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে! বিরাট খবর হবে। বিজ্ঞানের জগতে একটা আলোড়ন পড়ে যাবে। সে-রকম কেউ তোমাদের সুখিয়াপোখরিতে লুকিয়ে থাকবে কেন ?"

"এঁরা পাবলিসিটি চান না। বাইরের লোকের কাছে দেখা দিতেও চান না। এঁদের কিছু একটা সাঙ্ঘাতিক ওষুধ আছে। সেই ওষুধ খেয়ে এঁরা অনেক দীর্ঘজীবন পেতে পারেন।"

"সন্তুর হঠাৎ এরকম অসুখ না হয়ে পড়লে আমি একবার যাচাই করে আসতাম নিশ্চয়ই। সেই বুড়োদের ছবি তুলে আনতাম। এবার ফিরে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই আসব।"

গোটা দু-এক পাহাড় পেরোবার পর জিপটা এল আর একটা পাহাড়ের পাদদেশে। এখানে একটা ছোটখাটো গ্রাম রয়েছে। কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়ে জিপ গাড়ির শব্দ শুনে ছুটে বেরিয়ে এল। এরা গাড়ি খুব কম দেখে। এই গ্রামটা একটা তিব্বতি উদ্বাস্তুদের কলোনি।

গ্রামের শেষের দিকে একটি মাঝারি মতন বৌদ্ধ গুম্ফা।

সেই গুম্ফা থেকে একটু দূরে জিপটা থামল। সামনের উঠোনে বড় বড় চাটাই পাতা, তার ওপর কী যেন একটা ফল শুকোচ্ছে। একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোরু একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, কিন্তু সে একবারও চাটাইয়ে পা ফেলছে না, কিংবা ফলগুলোতে মুখ দিচ্ছে না।

জিপটা থামতেই কাকাবাবু পেছন দিকে ঝুঁকে সন্তুর কপালে হাত দিয়ে দেখলেন।

সন্তুর জ্বর সেই একই রকম। তার নিশ্বাসে আগুনের হল্‌কা। সে চোখ বুজে আছে।

কাকাবাবুর চোখ ছলছল করে এল। তিনি বললেন, "এখানে দশ মিনিটের বেশি কিছুতেই সময় নষ্ট করা যাবে না। তারপরেই শিলিগুড়ির দিকে ছুটতে হবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি আগে গিয়ে লামাজির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসি। ওঁর মুডের ব্যাপার আছে। সব সময় রাজি হন না।"

ক্যাপটেন নরবু চলে যেতেই কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, সন্তু তোর খুব কষ্ট হচ্ছে ?"

সন্তু শুধু উঁ উঁ করল দু'বার। সে কোনও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "জল খাবি ? তেষ্টা পেয়েছে ?"

সন্তু বলল, "হুঁ।"

আসবার সময় ক্যাপটেন নরবু একটা ওয়াটার বট্‌ল ভর্তি করে এনেছিলেন। কাকাবাবু সেটা খুলে সন্তুকে জল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সন্তু ঢোঁক

গিলতেও পারল না, সব জল গড়িয়ে পড়ে গেল তার মুখের দু'পাশ দিয়ে।

ক্যাপটেন নরবু ছুটতে-ছুটতে ফিরে জিপের পেছনটা খুলতে লাগলেন।

কাকাবাবুকে বললেন, "উনি সহজে রাজি হতে চান না। আজকে ওঁর তন্ত্র সাধনার দিন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। আমার সঙ্গে অনেক দিনের চেনা। আমি এখানে কমলালেবু সাপ্লাই করি। এখানকার মহালামাকে আমি দু'বার আমার জিপে শিলিগুড়ি পৌঁছে দিয়েছি। তাও বললেন, আজ রুগি দেখবেন না। তখন আমি বললাম, দেখুন লামাজি, এই বাঙালিবাবু দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আমি ওঁদের নিয়ে এসেছি। এখন আপনি যদি ওদের ফিরিয়ে দেন, তা হলে আমার খুব অপমান হবে। আমি আর আপনাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না, তখন উনি বললেন, ঠিক আছে, রুগিকে নিয়ে এসো।"

কাকাবাবু বললেন, "নরবু, তোমার এই লামা যদি সন্তুর কোনও উপকার করতে না পারেন, তা হলে কিন্তু আমি তোমার ওপর খুব চটে যাব। তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করাচ্ছ! আমি এসব তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করি না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "একবার একটু বিশ্বাস করে দ্যাখোই না!"

তারপর তিনি সন্তুকে দু'হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত এগোলেন গুম্ফার দিকে।

বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে একটুখানি গিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন ক্যাপটেন নরবু। তাঁর পেছনে কাকাবাবুর ক্র্যাচের খটখট শব্দ হল। এ ছাড়া চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে নিয়ে এলেন মাটির তলার একটি ঘরে। ঘরটি বেশ বড়। সমস্ত দেওয়াল ভর্তি হাতে-লেখা বই। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পেতলের মূর্তি দেওয়ালে গাঁথা। বাইরের কোনও আলো এ-ঘরে ঢোকে না। কিন্তু এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে। একটা বেশ বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব সিলিং থেকে ঝুলছে।

একদিকের দেওয়ালের কাছে একটা জলচৌকির ওপর একটা বাঘ-ছাল পাতা। বাঘের মুণ্ডটাও রয়েছে সামনের দিকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। সেই বাঘ-ছালের ওপর জোড়াসন করে বসে আছেন একজন পুরুষ। বসে থাকা অবস্থাতেই বোঝা যায়, তিনি খুব লম্বা-চওড়া মানুষ। দাড়ি-গোঁফ নেই, পরিষ্কার মুখ, গায়ে একটা নানা রঙের আলখাল্লা।

ক্যাপটেন নরবু সন্তুকে ওই পুরুষটির ঠিক সামনে, মেঝের ওপরেই শুইয়ে দিলেন। তারপর একটু সরে গিয়ে হাত জোড় করে বসলেন। কাকাবাবুও তাঁর দেখাদেখি বসলেন একপাশে, কিন্তু হাত জোড় করলেন না।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "নমস্তে লামাজি! এই ছেলেটির একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। ও খুব কষ্ট পাচ্ছে।"

লামাজি প্রথমে কাকাবাবুর দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক

মুহূর্ত। কাকাবাবুও তাঁর চোখে চোখ রেখে রইলেন। মুখ দেখে ওঁর বয়েস বোঝা যায় না। তবে ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়। মুখখানা কঠোর নয়। দেখলে ভাল লাগে, চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল।

তিনি ডান হাত দিয়ে সন্তুর মুখে, বুকে আলতো করে বোলাতে লাগলেন কয়েকবার। একটা আঙুল দিয়ে সন্তুর চোখের ওপর কী যেন লিখতে লাগলেন।

সন্তু তবু চোখ খুলল না।

এবার উনি ক্যাপটেন নরবুর দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন নিজের ভাষায়, কাকাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে জানালেন, "উনি আশা দিয়েছেন। ভয় নেই। তবে, উনি আমাদের একেবারে চুপ করে থাকতে বললেন।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "কতক্ষণ লাগবে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "চুপ!"

লামাজি এবার বেশ জোরে কী যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন নিজের ভাষায়। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

মিনিট-পাঁচেক এরকম চলার পর তিনি হঠাৎ ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারলেন সন্তুর গালে। বেশ জোরে।

কাকাবাবু আঁতকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন ক্যাপটেন নরবু।

ওই চড় খেয়েই চোখ মেলল সন্তু।

লামাজি দু' আঙুল দিয়ে সন্তুর চোখ আরও বেশি খুলে দিয়ে আবার মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

সন্তু এবার ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। চোখের পলকই ফেলছে না।

লামাজি জোর করে এবার সন্তুর ঠোঁটও ফাঁক করে দিলেন। সন্তু হাঁ করে থাকল। লামাজি পাশ থেকে কমণ্ডলুর মতন একটা জিনিস তুলে নিয়ে উঁচু করে জল ঢেলে দিলেন সন্তুর মুখে।

কাকাবাবু দেখলেন, একটু আগে তিনি চেষ্টা করেও সন্তুকে জল খাওয়াতে পারেননি। এখন সন্তু দিব্যি ঢোঁক গিলে গিলে জল খাচ্ছে।

জলচৌকির তলা থেকে কিছু একটা ওষুধ বের করে লামাজি দিয়ে দিলেন সন্তুর মুখে, আরও অনেকখানি জল খাওয়ালেন। তারপর সন্তুর চোখে চোখ রেখে মন্ত্র পড়তে লাগলেন জোরে-জোরে।

এবারের মন্ত্রটা আরও অদ্ভুত। এমনিতে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু মধ্যে-মধ্যে দুটি ইংরিজি কথা আছে। নো পেইন, নো ফিভার! নো পেইন, নো ফিভার।

ক্রমে সেই মন্ত্রটা গানের মতন হয়ে গেল, প্রচণ্ড চিৎকার করে ওই

কথাগুলোই সুর দিয়ে গান করছেন লামাজি, তাঁর ডান হাতখানা ফণাতোলা সাপের মতন সামনে দোলাচ্ছেন।

প্রায় দশ মিনিট সেই গান চলল। কাকাবাবুর মনে হল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই এক একঘেয়ে জিনিস চলছে। কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করতে পারছেন না। তাঁর মাথাটাও যেন ঝিমঝিম করছে। তিনি খালি শুনছেন, "নো পেইন, নো ফিভার!"

একসময় ঘরের আলোটা নিভে গেল। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। আলোটা নিভে যেতেই মন্ত্র পড়াও থেমে গেল। এতক্ষণ চ্যাঁচামেচির পর হঠাৎ একেবারে দারুণ নিস্তব্ধতা।

একটু পরে সন্তু ডেকে উঠল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "কী রে? কী রে, সন্তু?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমার জ্বর সেরে গেছে! মাথায় ব্যথা নেই।"

আবার আলো জ্বলে উঠল।

লামাজি যেন ক্লান্ত হয়ে এখন দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসেছেন। ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন। সন্তুও উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ক্যাপটেন নরবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক হ্যায়? সব ঠিক হ্যায়?"

সন্তু বলল, "আমার অসুখ একদম সেরে গেছে।"

ক্যাপটেন নরবু ঝুঁকে এসে সন্তুর কপালে হাত দিয়ে খুশির চোটে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "মিরাক্‌ল! মিরাক্‌ল! কপাল একেবারে ঠাণ্ডা!"

সন্তু বলল, "নো পেইন, নো ফিভার!"

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে বললেন, "রায়চৌধুরী দ্যাখো, দ্যাখো, মাস্টার সন্তু পুরোপুরি সেরে গেছে? তুমি হাত দিয়ে দেখে নাও!"

সন্তু নিজেই এগিয়ে গেল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুও হাত তুলে সন্তুর কপালটা ছুঁলেন। সত্যিই সন্তুর কপাল ঘামে ভেজা, ঠাণ্ডা।

তিনি মৃদু গলায় সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাথায় কোনও যন্ত্রণা নেই?"

সন্তু ঝলমলে হাসিমুখে বলল, "নো পেইন! নো পেইন!"

উঠে দাঁড়িয়ে ছটছট করতে করতে বলল, "বাঃ, দেওয়ালে কী সুন্দর সুন্দর মূর্তি? এগুলো দেখব?"

সন্তু ঘুরে-ঘুরে মূর্তি দেখতে লাগল। লামাজি তাঁর পাশের একটা ঝোলানো দড়িতে টান দিলেন। দূরে কোথাও ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দ হল।

ক্যাপটেন নরবু গর্বের সঙ্গে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখলে তো, আগে আমার কথায় বিশ্বাস করোনি।"

কাকাবাবু বললেন, "বীরেন্দ্র সিং নামে একজন লোকের এক হাতের আঙুল কাটা, সে-ও এই লামাজির কাছে চিকিৎসা করাতে আসে, তাই না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তাকে চেনো নাকি? তারও

মিরাকুলাস কিওর হয়েছে। তার এক হাতে মোটে একটা আঙুল, তবু সে সব জিনিস ধরতে পারে। রাজা, তোমার পা-টা লামাজিকে একবার দেখাবে নাকি ?”

লামাজি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। আর কোনও কথা বলছেন না।

কাকাবাবু বললেন, “না, আমার কিছু দরকার নেই। নরবু, তুমি লামাজিকে বলো, উনি যে আমার ভাইপো-কে সারিয়ে তুললেন, আমাদের এই যে উপকার করলেন, এ জন্য আমরা ওঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ !”

ক্যাপটেন নরবু নিজেদের ভাষায় এটা বলতেই লামাজি সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন ওঁর দিকে চেয়ে।

ক্যাপটেন নরবু অনুবাদ করে কাকাবাবুকে জানালেন, “লামাজি বলছেন, মানুষের সেবা করাই তো ওঁর কাজ। ছেলেটি তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছে বলে উনি খুব খুশি হয়েছেন। চিকিৎসার দেরি করালে ওর অসুখটা খুব কঠিন হয়ে যেতে পারত। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। অসাধারণ। এইরকম ছেলের কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

কাকাবাবু বললেন, “সন্তুকে উনি সারিয়ে তুললেন, তার বিনিময়ে কি আমরা কিছু দিতে পারি ? জানি, ওঁর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা যায় না, তবু এই মঠের জন্য আমরা কিছু সাহায্য করতে পারি কি ?”

ক্যাপটেন নরবু লামাজিকে এই কথাটা শুনিয়ে উত্তরটা জেনে নিয়ে বললেন, “উনি বলছেন, চিকিৎসার বিনিময়ে এখানে কিছুই নেওয়া হয় না। উনি চিকিৎসক নন, উনি একজন সাধক। তবে, কাকাবাবুকে লামাজি অনুরোধ করছেন, এই সব কথা তিনি যেন বাইরে গিয়ে প্রচার না করেন। দলে দলে লোক এখানে চিকিৎসার জন্য ছুটে এলে ওঁর সাধনার ব্যাঘাত হবে। এই মঠটাও হাসপাতাল হয়ে যাবে, তা উনি চান না।”

এই সময় একজন লোক এসে তিনটি খাবার-ভর্তি প্লেট এনে রেখে গেল ওঁদের সামনে। তাতে রয়েছে নানারকম ফল ও মিষ্টি।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বলল, “আমার খুব খিদে পেয়েছে।”

সে প্রায় ছুটে এসে কপাকপ খেতে লাগল।

কাকাবাবু একটা ফলের টুকরো তুলে মুখে দিলেন। একদৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লামাজির দিকে।

তারপর হঠাৎ লামাজিকে সরাসরি ইংরেজিতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার মন্ত্রের মধ্যে দু-একটা ইংরিজি কথা ছিল। আপনি নিশ্চয়ই ইংরেজি জানেন ?”

লামাজি সামান্য হেসে বললেন, “এ লিট্‌ল ! নট মাচ।”

কাকাবাবু আবার বললেন, “যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে জানতে পারি

কি, আপনার বয়েস কত ?”

লামাজি হাসি মুখেই বললেন, “সেভেনটি নাইন !”

কাকাবাবু একটা বিস্ময়ের শব্দ করে উঠলেন। তারপর বললেন, “এত ? দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আমার মনে হয়েছিল, বড় জোর ষাট-বাষট্টি।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “সত্যিই দেখে কিছু বোঝা যায় না। গত পঁচিশ বছর ধরে আমি লামাজির ঠিক একই রকম চেহারা দেখছি ! এঁদের মঠের যিনি প্রধান, সেই মহালামার বয়েস বোধ হয় একশো ছাড়িয়ে গেছে !”

লামাজি বললেন, “মহালামার বয়েস একশো পাঁচ বছর।”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “এত বয়েসেও তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান। কথা বলার সময় গলা একটুও কাঁপে না।”

কাকাবাবু বললেন, “আপনাদের এখানে আরও অনেকে দীর্ঘজীবী আছেন, তাই না ?”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “আমরা শুনেছি, মহালামার ওপরেও একজন আছেন। তাঁকে সবাই বলে প্রাচীন লামা। তাঁর বয়েস তিনশো বছর।”

লামাজি বললেন, “প্রাচীন লামার বয়েস এখন ঠিক তিনশো দু' বছর। তাঁর একজন পরিচারকও আছেন। তাঁর বয়েস দু'শো পঁচানব্বই বছর !”

কাকাবাবু বললেন, “সত্যি ?”

ক্যাপটেন নরবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, “এই, এই, রাজা, এঁদের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে নেই। লামাজিরা কখনও মিথ্যে কথা বলেন না !”

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে লামাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, “মাপ করবেন, আমি আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিনি। খুব অবাক হয়েছি। এরকম তো কখনও শোনা যায় না। তিনশো বছর ! তখনও জোব চার্নক কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা করেননি ! আচ্ছা লামাজি, আপনারা বয়েসের হিসেব রাখেন কী করে ? তিনশো বছরের রেকর্ড রাখাও তো সোজা কথা নয় !”

লামাজি বললেন, “পৃথিবীতে একমাত্র বৌদ্ধরাই হাজার-হাজার বছরের ইতিহাস রক্ষা করেছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মের পর থেকেই লিখিত ইতিহাসের শুরু তা জানেন না ? আমাদের এইসব গুম্ফায় প্রত্যেক বছরের ঘটনা লিখে রাখা হয়।”

কাকাবাবু বললেন, “তবু একজন লোকের বয়েস যে তিনশো বছর, সেটা কী করে বোঝা যাবে ? তিনি নিজে বছর গুনতে ভুল করতে পারেন। অন্য কারুর পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব নয়।”

লামাজি বললেন, “আপনি বিশ্বাস করতে না চান, করবেন না। আমরা তো এ-কথা বাইরে প্রচার করতে চাই না ! প্রাচীন লামার কথা বিশেষ কেউ জানেও না !”

কাকাবাবু অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, “না, না, আমি বিশ্বাস করতেই চাই।

আমার শুধু কৌতূহল যে, বয়েসের হিসেব কী করে রাখা হয় !"

লামাজি বললেন, "প্রাচীন লামা প্রত্যেক বছর বুদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে একটা করে শ্লোক লিখে রাখেন। তাঁর তেরো বছর বয়েস থেকে সেইসব প্রত্যেকটি লেখা সযত্নে রাখা আছে।"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "আপনারা জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে যেভাবে ভাবেন, আমরা সেভাবে ভাবি না। আমাদের সাধকেরা যাঁর যতদিন প্রয়োজন এই পৃথিবীতে থাকেন, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পৃথিবী থেকে চলে যান। আমাদের সাধকেরা রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু এই সব-কিছুর উর্ধ্বে।"

কাকাবাবু বললেন, "আরও একটু আমাকে বুঝিয়ে দিন। এতজন সাধকের মধ্যে শুধু একজন-দু'জন তিনশো বছর বেঁচে থাকেন কী প্রয়োজনে ?"

লামাজি বললেন, "প্রাচীন লামা বেঁচে রয়েছেন, শুধু তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়। সমস্ত বৌদ্ধদের স্বার্থে। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে। তিনি এই পৃথিবীতে আবার জন্মাবেন। এবারে তাঁর নাম হবে মৈত্রেয়। তাঁর সেই আবির্ভাবের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি জন্মালেও কেউ তাঁকে প্রথমে চিনতে পারবে না। আমাদের প্রাচীন লামার দিব্যদৃষ্টি আছে। তিনি সমস্ত মানুষ ও প্রাণীর অন্তর পর্যন্ত দেখতে পান। আবার তিনি বহু দূরের দৃশ্যও দেখতে পান। তিনি মৈত্রেয়কে চিনিয়ে দেবেন ! তা হলেই তাঁর কাজ শেষ।"

লামাজি কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন। ক্যাপটেন নরবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আমি স্নান করতে যাব।"

অর্থাৎ, তিনি এদের সবাইকে এখন চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করছেন।

ক্যাপটেন নরবু উঠে পড়লেও কাকাবাবু বসে রইলেন নিজের জায়গায়।

ছেলেমানুষের মতন আবদারের সুরে তিনি বললেন, "চা ? খাবার খাওয়ালেন, চা খাওয়াবেন না ? আপনাদের চা খুব ভাল হয়। আমি অন্য মনাস্টারিতে আগে কয়েকবার চা খেয়েছি, ভেড়ার দুধে সেদ্ধ করা চা, অন্যরকম লাগে।"

লামাজি দড়ি টান দিয়ে ঘণ্টা বাজালেন।

সঙ্গে-সঙ্গেই একজন লোক এসে উপস্থিত হতেই লামাজি বেশ বকুনি দিলেন তাকে। সেই লোকটি দৌড়ে চলে গেল।

লামাজি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, চা আনছে। আপনারা চা খান। আমি স্নান করতে যাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "অনুগ্রহ করে আর এক মিনিট দাঁড়ান। লামাজি, আমরা একবার আপনাদের প্রাচীন লামাকে দর্শন করে প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই !"

লামাজি এবার গম্ভীর সুরে বললেন, "অসম্ভব !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, অসম্ভব কেন ? আমরা ওঁকে ডিস্টার্ব করব না।

একবার শুধু দেখেই চলে যাব !"

লামাজি আবার ধমকের সুরে বললেন, "অসম্ভব !"

কাকাবাবু অনুনয়ের সুরে বললেন, "লামাজি, আপনাকে এই ব্যবস্থাটুকু করে দিতেই হবে। এতবড় একজন পুণ্যবান মানুষ, তিনশো দুই বছর ধরে আছেন এই পৃথিবীতে, এত কাছে এসেও তাঁকে একবার না দেখে চলে যাব ? অন্তত দূর থেকে একবার দেখে জীবন সার্থক করতে চাই !"

লামাজি বললেন, "দেখা হবে না ! এরকম অন্যায় অনুরোধ করবেন না।"

এবার কাকাবাবুও বেশ কড়া গলায় বললেন, "এটা মোটেই অন্যায় অনুরোধ নয় ! মানুষ মানুষকে দেখবে, এর মধ্যে অন্যায় কী আছে ?"

তারপর কাকাবাবু তাঁর কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন।

সেই খামটা লামাজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি ইংরাজি বলতে পারেন যখন, পড়তেও পারেন নিশ্চয়ই। এটা ভারতের রাষ্ট্রপতির চিঠি। রাষ্ট্রপতি দার্জিলিং-এ এসে গুজব শুনেছেন যে, আপনাদের এখানকার কোনও মনাস্টারিতে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ বেঁচে আছে। যদি তা সত্যি হয়, তবে তা সারা পৃথিবীর কাছেই একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভারতের গৌরব। রাষ্ট্রপতি তাই আমাকে একবার নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিতে বলেছেন।"

চিঠিখানা নিয়ে উলটে-পালটে দেখলেন লামাজি। তারপর অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, "এ চিঠি রাষ্ট্রপতি আপনাকে লিখেছেন। আমাদের তো কিছু লেখেননি !"

কাকাবাবু বললেন, "রাষ্ট্রপতি আগেই সরকারিভাবে অ্যাকশান নিতে চান না। আপনাদের ধর্মস্থানে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না। সেইজন্যই তিনি প্রথমে আমাকে প্রাইভেটলি খোঁজ নিতে বলেছেন। আপনারা তিব্বতিরা ভারতের অতিথি। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই অনুরোধটুকু মানবেন না ?"

লামাজি বললেন, "প্রাচীন লামা আরও দূরে, অন্য একটা গুম্ফায় থাকেন। তিনি প্রায় সর্বক্ষণই ঘুমোন। দু তিনদিন অন্তর জাগেন একবার। বাইরের কোনও লোককেই তাঁর সামনে যেতে দেওয়া হয় না। তিনি কখন জাগেন, তারও ঠিক নেই। অনেক সময় মাঝরাত্তিরে..."

কাকাবাবু বললেন, "আমরা সেই গুম্ফার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করব। তিনি মাঝরাত্তিরে জাগলে সেই সময়েই একবার দেখা করব।"

চিঠিখানা কাকাবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লামাজি বললেন, "আপনাদের রাষ্ট্রপতির অনুরোধ মানতে আমরা বাধ্য নই ! আমরা একমাত্র দলাই লামার আদেশ মানি। আপনারা দলাই লামার আদেশ নিয়ে আসুন। না হলে...আমি দুঃখিত !"

কাকাবাবু ও লামাজি পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

সন্তু প্লেটের খাবার শেষ করে আবার দেওয়ালে বসানো মূর্তিগুলো দেখছিল। কাকাবাবু ও লামাজির কথা-কাটাকাটি সে যেন শুনতেই পায়নি।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর হাত ধরে টেনে বললেন, "উনি বলছেন দেখা হবে না। রাজা, এবার চলো!"

সন্তু হঠাৎ পেছন ফিরে বলল, "আমি দেখব! আমি প্রাচীন লামাকে একবার দেখব!"

তারপর সে লামাজির কাছে এসে বলল, "নো ফিভার! নো পেইন!"

লামাজি কাকাবাবুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে সন্তুর দিকে তাকালেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখটা আবার কোমল হয়ে এল। তিনি সন্তুর মাথায় হাত রাখলেন।

সন্তু আবার বলল, "নো পেইন/ নো ফিভার। আমি ভাল হয়ে গেছি। আমি প্রাচীন লামাকে একবার দেখব। তিনশো বছরের মানুষ!"

লামাজি আস্তে-আস্তে বললেন, "ঠিক আছে। আজ সন্ধের সময় তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে!"

॥ ৫ ॥

গভীর জঙ্গলের পথ, এখান দিয়ে গাড়ি চলার কোনও প্রশ্ন নেই।

জিপটাকে রেখে আসা হয়েছে আগের গুম্ফার কাছে, ওরা চলেছে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে। কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে কোনও অসুবিধে নেই। ক্রাচ দুটোকে তিনি ঘোড়ার পেছনের দিকে বেঁধে নিয়েছেন।

একটু আগে সন্তু যাচ্ছে লামাজির পাশাপাশি।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুকে বললেন, "রাজা, তুমি যে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠি এনেছ, সে-কথা তো আমাকে আগে ঘুণাক্ষরেও জানাওনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে চিঠি আনিনি। উনি নিজেই আমাকে চিঠি দিয়েছেন। এইসব ব্যাপারে ওঁর খুব কৌতূহল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির চিঠিটাও লামাজি মানতে চাইছিলেন না, এটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার। তিব্বতের হাজার-হাজার রিফিউজিকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ভারতের কম ক্ষতি হয়নি। চিনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে। সেজন্য ওঁদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এই লামাজি গোঁয়ার ধরনের মানুষ। উনি রাজি না হলে চিঠিটা আমি মহালামাকে দেখাতাম। উনি নিশ্চয়ই রাজি হতেন। উনি খুব হাসিখুশি মানুষ। যদিও এই লামাজির কথাতেই এখানে সবাই চলে।"

"আচ্ছা, এই লামাজির নাম কী?"

"এঁর আসল নাম দোরজে লামা, কিংবা বজ্র লামা। কিন্তু সবাই শুধু লামাজি

লামাজিই বলে।”

“এখন যে মনাস্টারিতে আমরা যাচ্ছি, সেখানে তুমি কখনও গিয়েছ?”

“না। মানে, দূর থেকে দেখেছি, ভেতরে যাইনি।”

“আশ্চর্য ব্যাপার, নরবু! এখানে তিনশো বছর বয়েসী মানুষ থাকে, তা জেনেও তোমার কখনও আগ্রহ হয়নি?”

“আগ্রহ থাকলেই বা উপায় কী? শুনেছি তো, ওর মধ্যে বাইরের কোনও লোককে কক্ষনো যেতে দেয় না। স্থানীয় গোর্খারা ওই মনাস্টারিটাকে খুব ভয় পায়।”

“কেন, ভয় পাবে কেন? ভগবান বুদ্ধের শিষ্যরা তো সবাই অহিংস?”

“এরা এক ধরনের তান্ত্রিক। সব তিব্বতিরাও এখানে আসে না। তিব্বতিদের মধ্যেও তো আলাদা আলাদা ভাগ আছে। একের সঙ্গে অন্যদের মেলে না। এই যে লামাজি, ইনি কারুর কারুর চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে দেন। পয়সা-টয়সা কিছু নেন না। আবার কারুর ওপর খুব রেগে গেলে কঠিন শাস্তিও দেন। একবার একজন চোর নাকি এই জঙ্গলের মনাস্টারিতে ঢুকেছিল। সে অন্ধ হয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এল। কেউ তার চোখ দুটো খুবলে নিয়েছে। সারা গায়ে কোনও হিংস্র জন্তুর নোখের ফালা ফালা দাগ।”

“জন্তুর নোখ, না মানুষের নোখ তা বোঝা গেল কী করে? মনাস্টারির মধ্যে হিংস্র জন্তু থাকবে কী করে?”

“তা কে জানে! তবে মানুষের নোখ কি কারুর শরীর ওরকমভাবে চিরে দেয়? সেই থেকেই লোকের ধারণা, ওই মনাস্টারির মধ্যে নানারকম অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে!”

“তোমাকে তো সাহসী লোক বলে জানতাম, নরবু! তুমিও এই সব আজগুবি কথা শুনে ভয় পাও?”

“এদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমি জন্তু-জানোয়ারদের ভয় পাই না। কিন্তু তান্ত্রিকরা অনেক রকম অলৌকিক কাণ্ড কারখানা ঘটিয়ে দিতে পারে। রাজা, তুমি সঙ্গে আছ বলেই আমি যাচ্ছি। না হলে যেতাম না।”

“ইচ্ছে করলে এখনও ফিরে যেতে পারো।”

“আরে না না, ফিরব কেন? তোমাকে, সন্তুকে কোনও বিপদের মধ্যে ফেলে কি আমি পালাতে পারি? অবশ্য, এবারে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। লামাজি নিজেই তো আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। সন্তুর জন্যই এবার সব কিছু হল। সন্তুর কথাতেই উনি রাজি হলেন।”

“হুঁ, সন্তুর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব জমে গেছে। দ্যাখো, দু'জনে কত গল্প করছে।”

“তুমি তো অলৌকিকে বিশ্বাস করো না, রাজা! কিন্তু সন্তুর অসুখটা কীরকম চট করে সেরে গেল? এটা দারুণ আশ্চর্য ব্যাপার নয়!”

"তেমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তবে, ভাল, ভাল। নিশ্চয়ই ভাল। আমি খুশি হয়েছি।"

"তুমি এখনও বলছ এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় ?"

কাকাবাবু আর-কিছু বলার আগেই দূর থেকে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "কাকাবাবু, এবার ডান দিকে বেঁকতে হবে। তারপর একটা ঝরনা পড়বে। লামাজি বললেন, ঝরনাটায় বেশি জল নেই, ঘোড়া সুদ্ধুই পার হওয়া যাবে।"

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "ঠিক আছে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এই পাহাড়ি ঝোরাটার নাম ডিংলা। এক-এক সময় এটা জলে ভরে যায়, আর এত জোর স্রোত হয় যে কিছুতেই পার হওয়া যায় না। দু-একজন লোক স্রোতের টানে ভেসেও গেছে। এই ঝোরাটাই মনাস্টারিটাকে তিন দিকে ঘিরে আছে। পেছনে খাড়া পাহাড়। সেইজন্য এখানে সব সময় আসাও যায় না!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কতদিনের পুরনো ?"

"অনেক দিনের। এটা কিন্তু তিব্বতি রিফিউজিরা এসে বানায়নি, তার অনেক আগে থেকেই ছিল।"

"তা হলে তিনশো বছরের কোনও বুড়ো যদি এখানে থেকে থাকে, তা হলে সে তিব্বত থেকে আসেনি ? ভারতেই জন্মেছে ?"

"তা জানি না। তুমি এখনও যদি থাকে বলছ ? এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না ?"

"প্রমাণ পাবার আগেই কী করে বিশ্বাস করি বলো!"

জঙ্গলটা অন্ধকার হলেও ঝরনার জলে চিকচিকে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে একটি মিষ্টি কুলুকুলু আওয়াজ।

সন্তু আগে ঘোড়া নিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে পার হয়ে গেল ঝরনাটা।

লামাজি দাঁড়িয়ে যেতে কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "আপনারা আগে যান।"

কাকাবাবুর ঘোড়াটা জলে পা দিয়েই চি হিঁ হিঁ করে ডেকে দু'পা তুলে দিল উঁচুতে। ওর বোধ হয় জলটা বেশি ঠাণ্ডা লেগেছে। কাকাবাবু শক্ত করে ধরে রইলেন লাগাম। পা খোঁড়া হবার আগে তিনি খুব ভাল ঘোড়া চালাতেন।

তিনি ডান হাঁটু দিয়ে ঘোড়াটার পেটে একটা খোঁচা লাগাতেই সে তড়বড় তড়বড় করে ঝরনাটা পেরিয়ে এল।

এদিকে জঙ্গল অনেকটা পরিষ্কার। সামনে একটা ফাঁকা মাঠের মতন। তারপর দেখা যাচ্ছে একটা অন্ধকার বাড়ির রেখা। কোথাও আলো নেই।

অন্ধকারেই বোঝা যাচ্ছে মনাস্টারিটা বেশ বড়।

ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর পাশে এসে বললেন, "যাই বলো রাজা, এখান থেকে দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে। কেমন যেন রহস্যময়!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, রহস্যময় বাড়ি দেখতেই আমার বেশি ভাল লাগে। সাধারণ বাড়ি তো রোজই দেখি!

লামাজি চিৎকার করে কী যেন বললেন।

একইরকম চিৎকার দু-তিনবার করার পর দূরে দপ করে জ্বলে উঠল দুটো মশাল। মনাস্টারির মধ্যে ঢং ঢং করে শব্দ হতে লাগল।

সন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে সেই মশালের দিকে এগিয়ে গেল সবচেয়ে আগে!

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তোমার ভাইপোটির দেখছি একদম ভয়ডর নেই।"

কাছে আসতে দেখা গেল দুজন বিশাল চেহারার পুরুষ উঁচু করে ধরে আছে মশাল দুটো। তাদের ভাবলেশহীন পাথরের মূর্তির মতন মুখ।

মনাস্টারির মস্ত বড় দরজাটা নানারকম কারুকার্য করা। সেটা খুলে গেল আস্তে-আস্তে। ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। তার মধ্যেই কোথাও ঘণ্টা বাজছে।

লামাজি সবাইকে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

মনাস্টারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। তারা লামাজির কাছে হাঁটু গেড়ে বসল নিঃশব্দে। লামাজি তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের মন্ত্র পড়লেন। একটু পরে তারা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলো নিয়ে চলে গেল।

এবার মনাস্টারি থেকে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ। ছোটখাটো চেহারা। মাথা-ভর্তি সাদা চুল। গায়ে একটা নানারকম ছবি আঁকা আলখাল্লা।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে বললেন, "ইনি মহালামা, মহালামা!"

লামাজি, অর্থাৎ, বজ্র লামা এগিয়ে গিয়ে সেই মহালামার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মহালামা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন বিড়বিড় করে।

বজ্র লামা কী যেন জানালেন মহালামাকে। সে ভাষা ক্যাপটেন নরবুও বুঝতে পারছেন না।

মহালামা মুখ তুলে খুনখুনে গলায় বললেন, "ওয়েলকাম! ওয়েলকাম!"

সন্তু হঠাৎ মহালামার সামনে গিয়ে আশীর্বাদ নেবার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল। মহালামা তার মাথাতেও হাত রেখে বললেন, "ওয়েলকাম!"

এবার সবাই মিলে আসা হল মনাস্টারির ভেতরে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। আন্দাজে মহালামা ও বজ্র লামার পেছনে যেতে যেতে সবাই দু-তিনবার ঠোক্কর খেতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "একটা কোনও আলো আনা যায় না? অন্ধকারে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে।"

বজ্র লামা বললেন, "খুব প্রয়োজন না হলে আমরা আলো জ্বালি না। সন্ধের পর জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকার যাইই থাকুক, তাতেই আমরা কাজ চালাই। আজ জ্যোৎস্না ওঠেনি। ঠিক আছে। একটা মোমবাতি জ্বালানো যাক!"

তিনি জোরে জোরে দু'বার হাততালি দিলেন।

এবার সন্তুর বয়েসী একটি ছেলে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এল। বাইরে থেকে একজন নতুন লোক এসেছে, তবু ছেলেটি কোনও কৌতূহল দেখাল না, কারও দিকে চাইল না। তার চোখ মাটির দিকে।

ছেলেটির হাত থেকে মোমটি নিলেন বৃদ্ধ মহালামা। কাছে এসে তিনি কাকাবাবুদের দলের প্রত্যেকের মুখ ভাল করে দেখলেন। বারবার বলতে লাগলেন, "ওয়েলকাম ওয়েলকাম!" মনে হয়, এ ছাড়া তিনি আর কোনও ইংরেজি শব্দ জানেন না।

তারপর তিনি মোমটি তুলে দিলেন লামাজি অর্থাৎ বজ্র লামার হাতে।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।"

ডান দিকে ঘুরে একটা গলির মতন জায়গা দিয়ে খানিকটা যাবার পর তিনি একটা ঘরের দরজা খুললেন।

এই ঘরটি ছোট, তাতে পাশাপাশি দু'খানা খাট পাতা। ধপধপে সাদা চাদর পাতা বিছানা। দেওয়ালের গায়ে জাতকের অনেক ছবি আঁকা।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা এই ঘরে বিশ্রাম করুন। প্রাচীন লামার কখন ঘুম ভাঙবে তার কোনও ঠিক নেই। হয়তো আপনাদের দু-তিনদিন এখানে অপেক্ষা করতে হতে পারে। আবার তিনি আজ রাতেও একবার জেগে উঠতে পারেন। আশা করি, এখানে থাকতে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "না, না, কোনও অসুবিধে হবে না।"

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে বললেন, "সন্তু, এদিকে আয় তো!"

সন্তু কাছে আসতে তিনি তার কপালে হাত ঠেকিয়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোর এখন কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো?"

সন্তু বলল, "নো পেইন, নো ফিভার। আমার অসুখ সেরে গেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ভাল কথা, তোর ক্যামেরাটা বার কর।"

কাকাবাবুদের জিনিসপত্র সব জিপ গাড়িতেই রেখে আসা হয়েছে। সঙ্গে আনা হয়েছে শুধু একটা ছোট্ট ব্যাগ।

সন্তু সেই ব্যাগ থেকে তার ক্যামেরা বার করল।

কাকাবাবু সেটা হাতে নিয়ে দেখে বললেন, "এখনও ফিল্‌ম আছে পনেরোটা। ফ্ল্যাশটা ঠিক কাজ করছে তো? একবার দেখা যাক। সন্তু তুই ক্যাপটেন নরবুর পাশে গিয়ে দাঁড়া।"

ক্যামেরাটা চোখে লাগিয়ে তিনি ওদের দু'জনের একসঙ্গে একটা ছবি তুললেন। ফ্ল্যাশটা ঠিকমতনই জ্বলল।

কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে ক্যামেরাটা রাখলেন কোটের পকেটে।

ক্যাপটেন নরবু একটা খাটে শুয়ে পড়ে বললেন. "আজ রাত্তিরে আর কিছু

হবে না মনে হয়। আচ্ছা রাজা, প্রাচীন লামাকে দেখলেও কী করে তাঁর বয়স বোঝা যাবে ? ওরা তিব্বতি ভাষায় কী সব লিখে রেখেছে, তা তো তুমি কিংবা আমি কিছুই বুঝব না !"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল ডাক্তারি পরীক্ষায় মানুষের বয়েস অনায়াসে জানা যায়।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও ?"

কাকাবাবু বললেন, "চোখে দেখে খানিকটা তো বুঝব। একশো বছরের একজন মানুষ আর তিনশো বছরের মানুষের চেহারা তো এক হতে পারে না ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তিনশো বছর বয়েস হলে মানুষের চেহারা কেমন হয় কে জানে ! তারা কি চোখে দেখতে পায় ? কানে শুনতে পায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাইবেলে আছে, ম্যাথুসেলা নামে একজন লোক তিনশো বছর বেঁচে ছিল। বার্নার্ড শ' নামে একজন নাট্যকারের নাম শুনেছ ? তিনি বলেছিলেন, আমিও ম্যাথুসেলার মতন তিনশো বছর বাঁচতে চাই।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রামায়ণ-মহাভারতেও এক-একজনের বয়েস দুশো-তিনশো বছর না ?"

সন্তু বলল, "পিতামহ ভীষ্মের বয়েস কত ?"

কাকাবাবু বললেন, "এরা সবাই গল্পের চরিত্র। সত্যিকারের কোনও মানুষ দেড়শো বছরের বেশি বেঁচেছে এমন কখনও শোনা যায়নি পৃথিবীর কোনও দেশে। তাও, দেড়শো বছরটাও সন্দেহজনক। ঠিক প্রমাণিত হয়নি। প্রাচীন লামার বয়েস যদি সত্যিই তিনশো বছর হয়, তবে তাঁকে আমি দিল্লি নিয়ে যাব। সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের ডেকে প্রেস কনফারেন্স করব। এটা হবে মানুষের ইতিহাসের এক পরমাশ্চর্য ঘটনা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "প্রাচীন লামাকে এরা এই মঠের বাইরে নিয়ে যেতে দেবে ?"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজা খুলে ঢুকল একজন লোক। একটা কাঠের গোল ট্রেতে চা ও রুটি, তরকারি সাজানো।

ঘরে কোনও টেবিল-চেয়ার নেই। ট্রে-টা একটা বিছানার ওপর রেখে লোকটি ক্যাপটেন নরবুকে কী যেন বলে চলে গেল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলল লোকটি ?"

ক্যাপটেন নরবু জানালেন, "আমাদের খেয়ে নিতে বলল। আধ ঘণ্টা বাদে বজ্র লামা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এত চটপট আমাদের জন্য খাবার তৈরি হয়ে গেল ? এ যে অনেক রুটি দিয়েছে !"

ওরা খাওয়া শেষ করার খানিকবাদে বজ্র লামা এলেন সেই ঘরে। এখন তিনি একটা সিল্কের আলখাল্লা পরে এসেছেন, তাতে বিরাট করে একটা ড্রাগন

আঁকা। তাঁর হাতে একগোছা জ্বলন্ত ধূপকাঠি! সেই ধূপের গন্ধ সাধারণ ধূপের মতন নয়। গন্ধটা অচেনা আর খুব তীব্র।

বজ্র লামা বললেন, "আপনারা সৌভাগ্যবান। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। প্রাচীন লামা একটু আগে জেগে উঠেছেন। টানা তিন দিন তিনি ঘুমিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এখন নিশ্চয়ই তিনি খাওয়া-দাওয়া করবেন? আমরা কি তা হলে একটু পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাব?"

বজ্র লামা হেসে বললেন, "তিনি কিছু খান না। আপনারা এখনই যেতে পারেন!"

ক্যাপটেন নরবু জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি কিছুই খান না?"

বজ্র লামা বললেন, "গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি দেখছি, উনি ঘুম থেকে উঠে শুধু এক গ্লাস জল পান করেন, আর একটা গাছের শিকড় চিবোন।"

কাকাবাবু আর ক্যাপটেন নরবু একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ গাছের শিকড়?"

বজ্র লামা বললেন, "তা আমিও জানি না। দেখে চিনতেও পারি না। কোনও একটা গাছের শুকনো শিকড়। ওঁর কাছে অনেকখানি আছে। উনি সামান্য একটুখানি চিবিয়ে খান। যতটা আছে, তাতে উনি আরও দুশো বছর খেতে পারবেন!"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "শুধু গাছের শিকড় চিবিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে? গাছের শিকড় খেয়ে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? তা হলে তো সেই শিকড় পরীক্ষা করে দেখা উচিত। সেই শিকড় খুঁজে বার করে আরও অনেক মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

বজ্র লামা বললেন, "সব মানুষের তো বেশিদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন হয় না। এঁর দিব্য দৃষ্টি আছে। এঁর জীবনের মূল্য অনেক। ইনি ভগবান বুদ্ধের পুনর্জন্মের পর মৈত্রেয়কে দেখে চিনতে পারবেন। সেইদিন ঘনিয়ে এসেছে।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, ওঁকে দেখে আসি।"

বজ্র লামা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তিন জনেই যাবেন? না শুধু আপনি একা দেখবেন?"

সন্তু আর ক্যাপটেন নরবু একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরাও দেখব!"

বজ্র লামা বললেন, "সবাই ওর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। ওর চোখের দিকে তাকালেই অনেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। এর আগে এরকম হয়েছে। সেইজন্যই তো ওঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করতে দিই না। এমনকী আমি নিজেও ওঁর চোখের দিকে পাঁচ মিনিটের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারি না?"

কাকাবাবু বললেন, "দিব্য দৃষ্টি কাকে বলে জানি না। কখনও দেখিনি। এই

সুযোগটা আমরা কেউই ছাড়তে চাই না।"

বজ্র লামা সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে ক্যামেরা আছে?"

সন্তু অমনি কাকাবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওঁর কাছে আছে!"

বজ্র লামা বললেন, "ক্যামেরাটা অনুগ্রহ করে এখানে রেখে যান। কেউ নেবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওঁর একটা ছবি তোলা যাবে না?"

বজ্র লামা বললেন, "সে প্রশ্নই ওঠে না। মহাপুরুষদের সামনে ছেলেখেলা চলে না।"

কাকাবাবু ক্ষুণ্ণভাবে ক্যামেরাটা কোটের পকেট থেকে বার করে রেখে দিলেন।

বজ্র লামা বললেন, "আর-একটা অনুরোধ, সেখানে গিয়ে কোনও শব্দ করবেন না, কথা বলবেন না। প্রাচীন লামাকে কোনও প্রশ্ন করে লাভ নেই, উনি আপনাদের ভাষা কিছু বুঝবেন না। আপনারা জুতো খুলে রেখে আমার সঙ্গে চলুন।"

বজ্র লামার এক হাতে ধূপকাঠির গোছা, অন্য হাতে তিনি তুলে নিলেন এই ঘরের মোমবাতিটা।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একটা সরু গলি পার হয়ে ওঁরা এলেন মনাস্টারির মূল জায়গাটায়। এই ঘরটা বিশাল, যেমন চওড়া, তেমনি উঁচু। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তি, প্রায় দশ ফুট লম্বা তো হবেই। সেই মূর্তির দু'পাশে জ্বলছে বড়-বড় প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে এত বড় ঘরে অন্ধকার কাটেনি, অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি সব দিকে। দেওয়ালে-দেওয়ালে আরও অসংখ্য মূর্তি রয়েছে, সেগুলো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ক্যাপটেন নরবু হিন্দু হলেও মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন সেই বুদ্ধমূর্তির উদ্দেশে। তাঁর দেখাদেখি সন্তুও তাই করল। কাকাবাবু প্রণাম করলেন হাত জোড় করে।

বজ্র লামা সেই ঘরের এক কোণের একটা দরজা খুলে ফেললেন। তারপর নামতে লাগলেন ঘুটঘুটে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে। এইসব মনাস্টারিতে যে মাটির তলায় ঘর থাকে, তা কাকাবাবু জানতেন না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেশ দূরের একটা ঘরে নিয়ে এলেন বজ্র লামা।

সেই ঘরের সামনে একজন লোক মাটিতে বসে ঘুমে ঢুলছে। সে এতই ঘুমোচ্ছিল যে, তার মাথাটা মাঝে-মাঝে ঠেকে যাচ্ছে মেঝেতে।

বজ্র লামা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে লোকটিকে দেখলেন, তারপর হঠাৎ খুব জোরে একটা লাথি মারলেন তার মুখে।

লোকটি আঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বজ্র লামাকে দেখেই জড়িয়ে

ধরল তাঁর দু'পা। কান্না-কান্না সুরে কী যেন বলতে লাগল।

বজ্র লামা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে একপাশে সরিয়ে দিলেন। তারপর তাকে কিছু একটা আদেশ দিয়ে, ঠেলে খুললেন দরজা।

এই ঘরের মধ্যেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বজ্র লামার হাতের মোমটার সমস্ত আলো সেই অন্ধকার ভেদ করতে পারছে না।

বজ্র লামা তাঁর হাতের ধূপকাঠির গুচ্ছ একদিকের দেওয়ালে কিসে যেন গুঁজে দিলেন। নিভিয়ে দিলেন মোমবাতিটা।

ফিসফিস করে বললেন, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। মহাপুরুষ প্রাচীন লামাকে ঠিক সময় দেখতে পাবেন।"

ঘরের মধ্যে ধূপের গন্ধ ছাড়াও আরও কিসের যেন গন্ধ। কাছেই কোথাও একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুরু হল। অনেকটা কোনও যন্ত্রের শব্দের মতন। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সন্তু আর ক্যাপটেন নরবুর মাঝখানে, হাত দিয়ে ওদের ছুঁয়ে রইলেন।

অন্ধকারের মধ্যে বজ্র লামাকে আর দেখাই যাচ্ছে না।

এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট করে সময় কাটতে লাগল, বজ্র লামা আর কিছুই বলছেন না। অন্ধকারের মধ্যে এরকমভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার মানে কী হয়, তা কাকাবাবু বুঝতে পারছেন না। তবু তিনি ধৈর্য ধরে রইলেন।

হঠাৎ ধূপগুলো থেকে ফস-ফস শব্দ হতে লাগল। তারপরেই ফুলঝুরির মতন সেগুলো থেকে ঝরে পড়তে লাগল আলোর ফুলকি। সে-এক বিচিত্র আলো। কাকাবাবুরা তিনজনেই চমকে সেদিকে তাকালেন। ধূপকাঠি থেকে এ-রকম আলো বেরোতে কেউ কখনও দেখেনি!

সেই আলোর ফুলকিতেই অন্ধকার খানিকটা কেটে গেল। তাতে দেখা গেল, একদিকে একটা উঁচু বেদী, তার ওপরে একজন মানুষ শুয়ে আছে। একটা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা। মানুষটি পাশ ফিরে আছে। এদিকেই মুখ।

আলোর ফুলকিগুলো ক্রমশই জোরালো হল। তখন দেখা গেল উঁচু বেদীর ওপর শুয়ে থাকা মানুষটির মুখ।

কাকাবাবু বিস্ময় চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, "এ কী!"

শুয়ে থাকা মানুষটির মুখ একটি বালকের মতন। তেরো-চোদ্দ বছরের বেশি বয়েস বলে মনে হয় না। অত্যন্ত ফরসা, পরিষ্কার মুখ, মাথার চুলগুলো শুধু ধপধপে সাদা!

দূর থেকে বজ্র লামা বললেন, "প্রাচীন লামাকে প্রণাম করুন!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনি প্রাচীন লামা?"

বজ্র লামা মন্ত্রপাঠের মতন গমগমে গলায় বললেন, "এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? মহাযোগীদের শরীর অনবরত বদলায়। শরীরে বার্ধক্য আসে, বার্ধক্যের

শেষ সীমায় পৌঁছবার পর আবার শৈশব ফিরে আসে। তখন শরীরটা শিশুর মতন হয়ে যায়। তারপর যৌবন, আবার বার্ধক্য, আবার শৈশব। একই শরীরে বারবার এই পালা চলে।"

ক্যাপটেন নরবু বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইরকমই হয়। আমিও শুনেছি।"

সন্তু বলল, "কী সুন্দর, ওঁকে কী সুন্দর দেখতে! কিন্তু এখানে এত কঙ্কাল কেন?"

ধূপকাঠির আলোর ফুলকিতে এখন দেখা যাচ্ছে, উঁচু বেদীটার পেছনের দেওয়ালে সারি সারি মড়ার মাথার খুলি!

কাকাবাবু হাতজোড় করে বেশ জোরে বললেন, "হে মহামানব প্রাচীন লামা, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

তারপর একটুখানি এগিয়ে এসে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি ওঁর পা ছুঁয়ে একবার প্রণাম করতে পারি?"

বজ্র লামা ধমক দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান! আর এগোবেন না। উনি কোনও মানুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারেন না। অপেক্ষা করুন, উনি একটু পরেই চোখ মেলবেন।"

বালকের মতন মুখ, সেই প্রাচীন লামার চক্ষু দুটি বোজা। ঠোঁটে হাসি মাখানো। সত্যি, ভারী সরল, সুন্দর সেই মুখ। শুধু মাথাভর্তি পাকা চুল দেখলে গা শিরশির করে।

ক্যাপটেন নরবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "দেখা হয়ে গেছে! আমার দেখা হয়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "চুপ!"

বালকবেশি প্রাচীন লামা আস্তে-আস্তে চোখ মেললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। সারা ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের মতন আলো ঝলকাতে লাগল। ঠিক আকাশের বিদ্যুতের মতনই ছুটন্ত আলো। প্রত্যেকটা মড়ার মাথার খুলির চোখ দিয়ে আলো বেরোতে লাগল। সব মিলিয়ে এত আলো যে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

বালকবেশি প্রাচীন লামা এবার উঠে বসলেন।

তাঁর মাথায় চার পাশেও ঘুরতে লাগল আলো। তাঁর শরীর থেকেও যেন আলো বেরোচ্ছে। তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুললেন এঁদের দিকে।

ক্যাপটেন নরবু হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে নিজের ভাষায় মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন।

সন্তু দু'হাতে চোখ ঢেকে বলে উঠল, "জ্বালা করছে! আমার চোখ জ্বালা করছে।"

কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে উঁচু বেদীটার ওপর এক হাতের ভর দিয়ে অন্য

হাতে ছুঁয়ে দেখতে গেলেন প্রাচীন লামাকে।

কিন্তু তাঁর গায়ে হাত দেবার আগেই কাকাবাবু আঃ করে প্রবল এক আর্তনাদ করে ধপাস করে পড়ে গেলেন মেঝেতে। সেই মুহূর্তেই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

॥ ৬ ॥

ঘুম ভাঙার আগে কয়েকবার ছটফট করলেন কাকাবাবু। তাঁর মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। ঘুমটা যত পাতলা হয়ে আসছে, ততই যন্ত্রণা বাড়ছে।

চোখ মেলেই ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন। সেই কাল রাতের ধপধপে চাদর পাতা বিছানা। পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ক্যাপটেন নরবু।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, কাল রাত্তিরে এই মনাস্টারিতে পৌঁছবার পর থেকে কি তাঁরা এই ঘরেই শুয়ে আছেন? ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছেন? বাচ্চা ছেলের মতন দেখতে তিনশো বছর বয়েসী প্রাচীন লামা, ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের চমক, এসব তো মানুষ দুঃস্বপ্নেই দেখে!

কিন্তু মাথায় চোট লাগল কী করে? মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, একটা ব্যান্ডেজের মতন ফেট্টি বাঁধা আছে। পেছন দিকে এক জায়গায় বেশ ব্যথা।

তিনি পাশের খাটে উঁকি মেরে দেখলেন, ক্যাপটেন নরবুর ওদিকে সন্তু আছে কি না। সন্তু নেই। সন্তু তা হলে অন্য কোথাও শুয়েছে।

ক্যাপটেন নরবুকে ধাক্কা দিয়ে তিনি ডাকলেন, "নরবু! নরবু! ওঠো!"

ক্যাপটেন নরবুর যেন কুম্ভকর্ণের মতন ঘুম। কিছুতেই উঠতে চান না। কাকাবাবু দু হাত দিয়ে তাঁকে ঝাঁকাতে লাগলেন।

হঠাৎ এক সময় ক্যাপটেন নরবু লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল বলো তো? মনে আছে তোমার?"

ক্যাপটেন নরবু অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "কাল রাত্তিরে? কাল রাত্তিরে? ওঃ কী দেখলাম! জীবন ধন্য হয়ে গেছে! সত্যিকারের মহামানব। তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। তিনি চোখ মেলতেই সারা ঘর আলো হয়ে গেল!"

কাকাবাবু এবার বুঝলেন যে কাল রাত্তিরের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্ন নয়। দুজন মানুষ একই সঙ্গে এক দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে না।

তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম? আমাকে কি এই ঘরে ওরা বয়ে নিয়ে এসেছে?

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "সে কথা আমারও মনে নেই। আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। বজ্র লামা ঠিকই বলেছিলেন, মহামানবের দিব্যদৃষ্টি সহ্য

করা যায় না। তিনি কী সুন্দর করে হাসছিলেন, আমাদের আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তাঁর শরীর থেকে যে আলো বেরোতে লাগল, তাতেই আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। তারপর ঠিক ইলেকট্রিক শক খাবার মতন আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল ! তারপর আর কিছু মনে নেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু কোথায় ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "জানি না তো ? বোধ হয় বাইরে গেছে। এখন কত বেলা হয়েছে ?"

"প্রায় এগারোটা বাজে।"

"ওরে বাবা, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি ! যাই বলো রাজা, সত্যি জীবনটা ধন্য হয়ে গেল। তিনশো বছরের বৃদ্ধ প্রাচীন লামার কী অপরূপ শরীর ! একেবারে তাজা। ঠিক যেন আলো দিয়ে গড়া। এমন কোনওদিন দেখব, কল্পনাও করিনি। নিজের চোখে দেখলাম, আর তো অবিশ্বাস করা যায় না !"

"আমি অবশ্য নিজের চোখকেও বিশ্বাস করি না। নিজের চোখও ভুল দেখতে পারে। নিজের কানও ভুল শুনতে পারে। মানুষের চোখ-কান-নাকও কখনও-কখনও ভুল করতে পারে। কিন্তু মানুষের মন ভুল করে না। অবশ্য যুক্তিবোধটা ঠিক রাখতে হয়।"

"তার মানে ?"

"ধরো, আমি যদি দেখি একটা দড়ি হঠাৎ সাপ হয়ে গেল, সাপের মতনই ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে লাগল, তা হলে আমি হয়তো একটুক্ষণের জন্য ভয় পেতে পারি। ভয় পেয়ে পালিয়েও যেতে পারি। তা বলে কি আমি বিশ্বাস করব, দড়ি হঠাৎ সাপ হয়ে যেতে পারে ?"

"দড়ি যদি সাপ না হয়, তা হলে তুমি তা দেখবেই-বা কী করে ?"

দরজা ঠেলে একজন লোক ঢুকল। তার হাতের কাঠের গোল ট্রে-তে এক পট চা ও দুটো কাপ।

কাকাবাবু ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো, সন্তু কোথায় ?"

ক্যাপটেন নরবু নিজের ভাষায় সে-কথা জিজ্ঞেস করতে লোকটি শুধু দু'দিকে মাথা নাড়ল কয়েকবার। তারপর বেরিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ, সে কিছু জানে না।

কাকাবাবু কাপে চা ঢেলে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, "এরা বেশ অতিথিপরায়ণ। যখন চা দরকার, তখনই ঠিক এসে যায়, চাইতে হয় না। চা-টা খেতেও বেশ ভাল।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তোমার মাথায় ব্যান্ডেজ কে বাঁধল ?"

"জানি না। আমার মাথায় চোট লেগেছিল। এরাই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। মাথায় খুব ব্যথা আছে এখনও।"

"আচ্ছা রাজা, তুমি কেন দড়ির সাপ হয়ে যাওয়ার কথা বললে ? ওরকম কি কেউ কখনও দেখে ?"

"স্টেজে ম্যাজিশিয়ানরা যখন-তখন দেখায়। একদম সত্যি বলে মনে হয়।"

"কিন্তু কাল যা দেখেছি, তা ম্যাজিক হতে পারে না।"

"মড়া মানুষের মাথার খুলির চোখ দিয়ে কিছুতেই আলো বেরুতে পারে না। কিছুতেই পারে না। নিজের চোখে যদি সেরকম কখনও দেখি, তাও বিশ্বাস করা উচিত নয়।"

"রাজা, এসব তোমার গোঁড়ামি। তোমার-আমার জানার বাইরে আরও অনেক কিছু থাকতে পারে না ? আমাদের যুক্তিবোধের বাইরেও অনেক কিছু ঘটে। মহাপুরুষ প্রাচীন লামার মুখখানা বাচ্চা ছেলের মতন, কিন্তু তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা। এরকম কেউ কখনও দেখেছে ?"

"একেবারে থুরথুরে বুড়ো হয়ে যাবার পর আবার নতুন করে দাঁত ওঠে, চোখের দৃষ্টি ফিরে আসে, মুখের কোঁচকানো চামড়া বাচ্চা ছেলেদের মতন মসৃণ হয়ে যায়। শুধু মাথার সাদা চুল কালো হয় না, তাই না ?"

"না, পাকা চুল কখনও কালো হতে পারে না। রাজা, কাল তুমিও প্রাচীন লামাকে দেখে অভিভূত হয়েছিলে। তুমিই প্রথম ওঁকে নমস্কার করে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, নরবু, আমি ওঁকে একবার ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম ! পারিনি বোধ হয়, তাই না ?"

"তুমি কি ভাবছ, প্রাচীন লামা একটা সাজানো পুতুল ? আমি হলফ করে বলতে পারি, তিনি একজন জ্যান্ত মানুষ, তাঁর সারা গা দিয়ে আলো বেরুচ্ছিল।"

দরজাটা আবার খুলে গেল। এবার এসে ঢুকলেন বজ্র লামা।

তিনি সদ্য স্নান করে এসেছেন, মাথার চুল ভেজা। গায়ে একটা কম্বলের তৈরি ঢোলা জামা। কাল রাতের মতনই তাঁর হাতে একগুচ্ছ জ্বলন্ত ধূপ। দেওয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে সেগুলো গুঁজে দিয়ে বললেন, "মঙ্গল হোক। সকলের মঙ্গল হোক। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?"

ক্যাপটেন নরবু বিগলিতভাবে বললেন, "খুব ভাল ঘুম হয়েছে। এত বেলা হয়ে গেছে, টেরই পাইনি। কালকের রাতটা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। কোনওদিন ভুলব না। আপনার কাছে আমরা দারুণ কৃতজ্ঞ।"

বজ্র লামা কাকাবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার মাথায় এখন বেশি যন্ত্রণা নেই তো ? তা হলে একটা ওষুধ দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওষুধ লাগবে না। এখন ঠিক আছে। কী হয়েছিল বলুন তো ? আমার মাথায় চোট লাগল কী করে ?"

বজ্র লামা হেসে বললেন, "আপনার মনে নেই ? আপনি মহামানব প্রাচীন লামার বেশি কাছে এগিয়ে গেলেন জোর করে। আমি তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, সাধারণ মানুষ তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ। একমাত্র মৈত্রেয় পারবেন। লক্ষ করেননি, আমিও প্রাচীন লামার সামনে দাঁড়াই না, পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আপনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, তাতেই আপনার মাথার পেছন দিকটা খানিকটা কেটে গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বললেন, "আমি জীবনে কখনও এমনি এমনি পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হইনি !"

বজ্র লামা বললেন, "আপনি জীবনে প্রাচীন লামার মতন তিন শতাব্দী জয়ী মানুষ দেখেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "এই মহাপুরুষ প্রাচীন লামার কথা সারা পৃথিবীর জানা উচিত।"

বজ্র লামা বললেন, "জানবে, সময় হলেই জানবে। যখন ভগবান মৈত্রেয় আবির্ভূত হবেন, তখনই ইনি সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।"

কাকাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূপের গোছাটা দেখতে লাগলেন। কাল রাত্তিরে এইরকম ধূপকাঠি থেকে নানা রঙের আলোর ফুলকি ঝরে পড়ছিল এক সময়। আজ এগুলোকে সাধারণ ধূপকাঠির মতনই মনে হচ্ছে, শুধু ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

বজ্র লামা বললেন, "এবার আপনাদের ফিরতে হবে। আমিও অন্য গুম্ফায় ফিরে যাব। অনেক কাজ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলুন যাওয়া যাক। আমার ভাইপো সন্তু কোথায় ?"

বজ্র লামা সহাস্যে বললেন, "ও, আপনাদের একটা সুসংবাদ দেওয়া হয়নি। আপনাদের সঙ্গের ছোট ছেলেটি আর ফিরে যাবে না। ও এখানেই থেকে যাবে।"

কাকাবাবু ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে ?"

বজ্র লামা বললেন, "সে আর যেতে চাইছে না। আমাদের এখানে একটি গুরুকুল বিদ্যালয় আছে। সাতটি ছেলে সেখানে ধর্মীয়পাঠ নেয়। আপনার ভাইপো সেই জায়গাটা সকালে দেখতে গিয়েছিল। সেখানকার সব কিছু দেখে তার এমন পছন্দ হয়ে গেল যে, আমার হাত ধরে বলল, সে আর ফিরে যেতে চায় না এখান থেকে। ছেলেটির মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তার খুব মেধা আছে। মনটাও পবিত্র।"

কাকাবাবুও এবার হেসে বললেন, "তা হয় নাকি ? ওকে ফেলে আমরা চলে যেতে পারি ? কয়েকদিন পরেই ওর কলেজ খুলবে।"

বজ্র লামা বললেন, "কিন্তু সে তো কিছুতেই যাবে না বলছে। এর মধ্যেই পাঠ নিতে শুরু করেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে হয়তো ওর একটা ছেলেমানুষী শখ হয়েছে। আমি বললেই বুঝবে। ও আমার দাদার ছেলে। ওকে না নিয়ে আমি যদি একা ফিরে যাই, দাদা-বউদি রক্ষে রাখবেন ?"

বজ্র লামা বললেন, "তাকে আমরা জোর করে ধরে রাখতে চাই না। আবার সে যদি ফিরে যেতে না চায়, তাকে জোর করে ঠেলে পাঠাতেও পারি না। কারুর মনে যদি ধর্মতৃষ্ণা জাগে, তাকে আমরা নিষেধ করব কেন ? সে এখানে থাকার জন্য বদ্ধপরিকর।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "মুশকিল হল তো ! সন্তু যদি ফিরে যেতে না চায়,...সে একেবারে ছেলেমানুষ নয়...কলেজে পড়ে...বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে..."

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তাকে একবার ডাকুন। আমি বুঝিয়ে বলছি !"

বজ্র লামা একটু চিন্তা করে বললেন, "ছাত্রদের এদিকে আসার অনুমতি নেই। আপনি চলুন, তার কাছে চলুন। তার সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন।"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো নরবু। ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরে নাও। এ-ঘরে আর ফিরব না। সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।"

বজ্র লামা এবার অন্য একটা গলিপথ দিয়ে সবাইকে নিয়ে এলেন মঠের পেছন দিকে। সেখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর টালির চাল দেওয়া একটা লম্বাটে ঘর। সেই ঘরের সামনে একটা টানা বারান্দা।

সেই বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে নানা বয়েসী আটটি ছেলে। প্রত্যেকের পরনে ঢোলা আলখাল্লা। যেন সেখানে একটা পাঠশালা বসেছে। ছাত্রদের সামনে একটা মোটা কাঠের গুঁড়ির আসনে বসে আছেন বৃদ্ধ মহালামা।

কাকাবাবু পেছন দিক থেকেই সন্তুকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি ডাকলেন, "সন্তু, এই সন্তু !"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। অদ্ভুত ঘোরলাগা তার দৃষ্টি। কাকাবাবুকে দেখেও তার মুখে কোনও ভাব ফুটল না, সে কোনও উত্তরও দিল না। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

ছাত্রদের সামনে কোনও বই নেই। বৃদ্ধ মহালামা কী যেন একটা কথা উচ্চারণ করলেন, সবাই মিলে তিনবার সেই কথাটা জোরে জোরে বলল।

কাকাবাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এই সন্তু, উঠে আয় !"

সন্তু এবারে আর মুখ ফেরাল না।

ক্যাপটেন নরবু ফিসফিস করে বললেন, "আশ্চর্য ! আশ্চর্য !"

কাকাবাবু বেশ রাগী চোখে একবার তাকালেন ক্যাপটেন নরবুর দিকে। তারপর সন্তুর খুব কাছে গিয়ে বললেন, "এই সন্তু, ওঠ। আমরা এবার ফিরে যাব।"

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বিরক্তভাবে বলল, "কে ? আপনি কে ? আপনাকে আমি চিনি না ! আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব। এখানেই থাকব !"

কাকাবাবু সন্তুর জামাটা ধরে জোর করে টেনে তুলে বললেন, "এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে ? চল, আমাদের যেতে হবে !"

সন্তু বলল, "আমি যাব না, আমি যাব না, আমি যাব না !"

কাকাবাবু বললেন, "তোর কলেজ খুলে যাবে, সে খেয়াল নেই ? তোকে রেখে আমি একা-একা ফিরব নাকি ?"

সন্তু বলল, "কে আপনি ? কে আপনি ? কে ? কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাকা, আমার চোখের দিকে ভাল করে তাকা, দ্যাখ চিনতে পারিস কি না !"

সন্তু তবু মুখ ফিরিয়ে নিতেই কাকাবাবু ঠাস করে এক চড় কষালেন তার গালে। বেশ জোরে। সন্তু এবার পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কে ? এটা কে ? আমায় মারছে কেন ? আমায় মারছে কেন ? আমায় মারছে কেন ? আমি যাব না, যাব না, যাব না !"

দু'জন বলশালী লোক দু'দিক থেকে কাকাবাবুকে চেপে ধরে হিঁচড়ে সরিয়ে আনল সেখান থেকে।

কাকাবাবু জোর করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তিনি রাগের চোটে চিৎকার করে বললেন, "ছাড়ো, আমায় ছাড়ো, ওকে আমি নিয়ে যাব। নিয়ে যেতেই হবে !"

বজ্র লামা কাকাবাবুর সামনে এসে তাঁর থাবার মতন বিশাল এক হাত দিয়ে কাকাবাবুর থুতনিটা চেপে ধরলেন, "তারপর বললেন, ছিঃ এখানে চেঁচাতে নেই। এখানে কেউ কারুকে মারে না। ওই ছেলেটি যাবে না। আপনারা ফিরে যান।"

কাকাবাবু গর্জন করে বললেন, "না, আমি সন্তুকে না নিয়ে যাব না !"

যে-লোক দুটি কাকাবাবুকে ধরে আছে তাদের আদেশ দিলেন বজ্র লামা, তারা কাকাবাবুকে ঠেলতে লাগল ফাঁকা জায়গার দিকে। কাকাবাবু এবার বৃদ্ধ মহালামার দিকে তাকালেন। তিনি আগাগোড়া সব-কিছু দেখছেন চোখ পিট-পিট করে। কাকাবাবু তাঁর উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে বললেন, "মহালামা, আপনি বিচার করুন, আমাকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার ভাইপোকে আটকে রাখবেন না। ছেড়ে দিন !"

বৃদ্ধ মহালামা বললেন, "ওয়েলকাম ! ওয়েলকাম !"

কাকাবাবু হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বৃদ্ধ মহালামার কাছ থেকে

সাহায্য পাবার কোনও আশা নেই। উনি ওই একটাই ইংরেজি শব্দ জানেন। বজ্র লামার কোনও কাজে বাধা দেবার ক্ষমতাও বোধ হয় ওঁর নেই। কাকাবাবুকে যে লোক দুটো ঠেলছে, তাদের গায়ে দৈত্যের মতন শক্তি।

কাকাবাবু আর-একবার মুখ ফিরিয়ে প্রায় আর্ত চিৎকার করে বললেন, "সন্তু, সন্তু, তুই আমার সঙ্গে আসবি না?"

সন্তু এদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "না, না, না, না, যাব না, যাব না, যাব না, যাব না!"

কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন। বোধ হয় তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে সামলালেন।

সন্তুকে নিয়ে তিনি কতবার কত জায়গায় গিয়েছেন। কেউ কাকাবাবুকে জোর করে ধরে রেখেছে, অথচ সন্তু সাহায্য করতে ছুটে আসছে না, এরকম আর আগে কখনও ঘটেনি।

লোক দুটি কাকাবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল দেওয়ালের ধারে। সেখানে একটা ছোট দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল বাইরে। কাকাবাবুর হাত থেকে ক্রাচ দুটো আগেই খসে গেছে। লোক দুটো এবার প্রায় চ্যাংদোলা করে কাকাবাবুকে তুলে এনে বসিয়ে দিল একটা টাট্টুঘোড়ার ওপরে।

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমাল বার করতে গিয়ে কোটের ভেতরের পকেটে তাঁর রিভলভারটায় হাত ঠেকে গেল। কাকাবাবু সেই পকেটে হাত ঢুকিয়েও থেমে গেলেন। নাঃ, এখানে রিভলভার দেখিয়েও কোনও লাভ হত না। সন্তু নিজেই যে আসতে চাইছে না!

একটু পরেই ক্যাপটেন নরবু কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো হাতে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল এদিকে। কাছাকাছি আরও কয়েকটা টাট্টুঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ক্যাপটেন নরবু আর একটা ঘোড়ার পিঠে চেপে বললেন, "চলো, যাওয়া যাক!"

দু'জনের ঘোড়া চলতে লাগল ধীর কদমে।

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কী হল বলো তো? সন্তু তোমাকে চিনতেই পারল না?"

কাকাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "কাওয়ার্ড! দুটো লোক যখন আমায় চেপে ধরল, তখন তুমি আমায় একটু সাহায্য করতে পারলে না?"

ক্যাপটেন নরবু দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "সাহায্য...মানে কী সাহায্য করব? ওরা তো তোমাকে মারেনি? মারলে নিশ্চয়ই আমি প্রতিবাদ করতাম। তুমি হঠাৎ সন্তুকে চড় মারতে গেলে কেন? রাগের মাথায় ওই কাজটা তুমি ঠিক করোনি!"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ করেছি! বেশ করেছি! আমার ভাইপো-কে আমি দরকার হলে একটা চড় মারতে পারব না? সন্তুকে আরও দু-তিনটে চড় মারতে

পারলে ঠিক কাজ হত !”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “যাঃ, কী বলছ, রাজা! ধর্মস্থানের মধ্যে এরকমভাবে কারুকে মারা ঠিক নয়।”

কাকাবাবু বললেন, “কাল রাতে বজ্র লামা একজন প্রহরীকে লাথি মারেনি? আমাদের সামনেই?”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “ওঃ, সে লোকটা ঘুমোচ্ছিল। তার কাজে গাফিলতির জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেটা অন্য ব্যাপার।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরা সন্তুকে এখানে আটকে রেখে দেবে? সন্তুকে না নিয়ে আমি ফিরে যাব?”

ক্যাপটেন নরবু বললেন, “সন্তু নিজেই যে আসতে চাইছে না। বজ্র লামা অন্যায় কিছু বলেননি। সন্তু নিজে ওখানে থেকে যেতে চাইলে তাকে ওরা জোর করে তাড়িয়ে দেবে কী করে?”

“সন্তু আসতে চাইছে না, তা ঠিক নয়। সন্তুকে ওরা জোর করেই ধরে রেখেছে!”

“সন্তু নিজের মুখে কতবার বলল, সে আসবে না! তুমি-আমি নিজের কানে শুনলাম!”

“সন্তু নিজের মুখে বলেছে, তুমি আর আমি নিজের কানে শুনেছি, তবুও ওটা সত্যি নয়। ওটা সন্তুর মনের কথা হতে পারে না। ওরা সন্তুকে সম্মোহন করেছে! ওর চোখ দুটো অন্য রকম দেখোনি?”

“অ্যাঁ? কী করেছে বললে?”

“সম্মোহন। হিপনোটাইজ করেছে। কাল থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওই বজ্র লামা সম্মোহন করে সন্তুর মনটাকে বশ করছে। সন্তু বারবার নো ফিভার, নো পেইন বলছিল, সন্তু কক্ষনো ওইভাবে কথা বলে না। সন্তুর ওই ঘোর কাটাবার জন্যই ওকে আমি চড় মেরেছিলাম।”

“শোনো রাজা, সম্মোহন হোক আর যাই হোক, সন্তু এখন আর আসতে চাইছে না, এটা তো ঠিক? দুটো-তিনটে দিন এখানে ছেলেটা থাকুক না! দু-তিন দিনের বেশি ওর ভাল লাগবে না, তারপর ও নিজেই চলে আসবে। এই ক'দিন তুমি আমার বাড়িতে থেকে যাও। আমরা রোজ সন্তুর খোঁজ নেব!”

“না, সন্তুকে আমি এখানে একদিনও রাখতে চাই না!”

“শোনো রাজা, পাগলামি কোরো না। এখন ফিরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। বজ্র লামার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমরা সন্তুকে কিছুতেই জোর করে ফিরিয়ে আনতে পারব না। আমরা দু'জনে গায়ের জোর দেখালেও সুবিধে হবে না!”

কাকাবাবু ঘোড়াটা থামিয়ে পেছন ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখখানা রাগে লালচে হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে।

তিনি বললেন, “আমি আজই পুলিশ ডেকে এনে সন্তুকে উদ্ধার করব। এর

মধ্যে যদি সন্তুর কোনও ক্ষতি হয়, ওই বজ্র লামাকে আমি শেষ করে দেব। এদের এই সব-কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব!"

তারপর তিনি ক্যাপটেন নরবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাছাকাছি থানা কোথায় আছে?"

"এখানে একটু বড় থানা আছে বিজনবাড়িতে।"

"চলো সেখানে!"

একটু দূরেই ডিংলা ঝরনা। আজ তাতে জল খানিকটা বেশি। তবু পার হওয়া গেল কোনওক্রমে।

এপারে এসেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বিজনবাড়ি কোন দিকে?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "খানিকটা দূর আছে। চলো, আগে আমরা এই ঘোড়া নিয়েই আমার জিপটার কাছে যাই। জিপে করে বিজনবাড়ি যেতে সুবিধে হবে।

কাকাবাবু দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে, জিপটাই নেওয়া যাক!"

তাঁর যেন আর একটুও দেরি সহ্য হচ্ছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা, দিনের আলোয় চেনার কোনও অসুবিধে নেই। কাকাবাবু খুব জোর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন!

॥ ৭ ॥

বিজনবাড়ি থানায় এসে তিন-চারজন কনস্টেবল আর একজন সাব ইনসপেক্টরকে পাওয়া গেল শুধু। অফিসার-ইন-চার্জ অ্যালবার্ট গুরুং-এর আজ ছুটি। তিনি লিট্‌ল রঙ্গিত নদীতে মাছ ধরতে গেছেন।

ও-সি'র সঙ্গেই কথা বলা দরকার, তাই কাকাবাবু ক্যাপটেন নরবুকে বললেন, "চলো, নদীর ধারে।"

একটা ঝুপসি গাছের তলায় তিন-চারজন সঙ্গী ও অনেক খাবারদাবার নিয়ে বেশ সাজিয়ে বসেছেন দারোগাবাবু। নদীর জলে দু'খানা ছিপ ফেলা। আজ আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, সুন্দর ঝকমকে দিন। বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব।

পুলিশের লোকদের দেখলেই চেনা যায়। পাঁচজন লোকের মধ্যে কোন্‌জন যে অ্যালবার্ট গুরুং তা আর বলে দিতে হল না। রীতিমত পালোয়ানদের মতন তাঁর চেহারা, দাড়ি-গোঁফ কিছু নেই, খাকি প্যান্ট ও একটা হালকা সাদা রঙের জ্যাকেট পরে তিনি একটা শতরঞ্চির ওপর আধ-শোয়া হয়ে আছেন।

তাঁর পাশে একজন লাল সোয়েটার-পরা লোক একমনে সিগারেট টানতে-টানতে চেয়ে আছে জলের দিকে। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই

কাকাবাবু চমকে উঠলেন। চা-বাগানের মালিক ফিলিপ তামাং!

অ্যালবার্ট গুরুং কাকাবাবু ও ক্যাপটেন নরবুকে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে বিরক্তভাবে তাকালেন।

কাকাবাবু কাছে এসে যথাসম্ভব বিনীতভাবে বললেন, "নমস্কার। অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করছি, এজন্য দুঃখিত। আপনি ছুটির দিনে মাছ ধরতে এসেছেন, এ-সময় আপনাকে ডিসটার্ব করা উচিত নয়, কিন্তু আমার দরকারটা খুব জরুরি।"

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে, চোখ বড় বড় করে বললেন, "আরে, মিঃ রায়চৌধুরী? শেষ পর্যন্ত এদিকে এলেন তা হলে? কী সৌভাগ্য আমাদের। আসুন, আসুন, বসুন!"

তারপর তিনি দারোগাকে বললেন, "ইনি মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। বিখ্যাত লোক। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?"

অ্যালবার্ট গুরুং দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, শুনিনি!"

ফিলিপ তামাং তবু মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "খুব বিখ্যাত লোক, অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, দিল্লির অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে এঁর চেনা আছে।"

দারোগা অ্যালবার্টের ভুরু কোঁচকানিটা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, "নমস্কার, বসুন।"

কাকাবাবু ফিলিপ তামাংকে পছন্দ করেন না, কিন্তু এই সময় লোকটি উপস্থিত থাকায় কিছুটা সুবিধে হল। কাকাবাবু নিজের মুখে নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে পারতেন না, দারোগা অ্যালবার্টও তাঁকে প্রথমে পাত্তা দিতে চাননি।

কাকাবাবু পাশে হাত দেখিয়ে বললেন, "ইনি ক্যাপটেন নরবু, এক্স মিলিটারি ম্যান। আমার বন্ধু।"

অ্যালবার্ট গুরুং বললেন, "আপনারা স্যান্ডউইচ খাবেন? ফ্লাস্কে চা-ও আছে।"

কাকাবাবু বা ক্যাপটেন নরবু আপত্তি করলেন না। দু'জনেরই খিদে পেয়েছে।

ওঁদের চা ও খাবার দেবার পর অ্যালবার্ট গুরুং জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলুন, কী ব্যাপার!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার এক ভাইপো, তার আঠেরো বছর বয়েস, তাকে জোর করে একটা মনাস্টারিতে আটকে রেখেছে।"

ফিলিপ তামাং বলল, "আপনার সেই ভাইপো সন্তু? দ্যাট ওয়ান্ডার বয়? দারুণ বুদ্ধিমান! তাকে আটকে রাখল কী করে?"

দারোগা অ্যালবার্ট হাত তুলে ফিলিপকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আগে আমাকে সবটা শুনতে দাও ! ছেলেটিকে আটকে রেখেছে মানে কি ? জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সেখানে আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কোন্ মনাস্টারি ? এখানে তো বেশ কয়েকটা আছে ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "পিগু মনাস্টারি। জঙ্গলের মধ্যে। ডিংলা ঝরনার ধারে।"

দারোগা অ্যালবার্ট চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওরে বাবা, সেখানে তো কেউ যায় না। কোনও বাইরের লোককে সেখানে ঢুকতেও দেওয়া হয় না ! আপনারা গেলেন কী করে ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "বজ্র লামা নিজে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন !"

দারোগা অ্যালবার্ট এবার শিস দিয়ে উঠে বললেন, "আপনারা বজ্র লামার পাল্লায় পড়েছিলেন ? সে যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! তারপর তারপর ?"

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মঠে তো তিনশো বছর বয়েসী দু'জন লামা আছেন শুনেছি। তাঁদের দেখেছেন ?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "দু'জনকে না, একজনকে দেখেছি। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রাচীন লামা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো বেরোয়। তিনি চোখ মেলে তাকালে অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়। সমস্ত ঘরটা মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়। আর কী অপরূপ তাঁর রূপ। একদিকে শিশু, অন্যদিকে মহা বৃদ্ধ। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।"

কাকাবাবু বললেন, "সব ম্যাজিক !"

অ্যালবার্ট গুরুং আর ফিলিপ তামাং দু'জনেই কাকাবাবুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "ম্যাজিক মানে ?"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমক আর নানারকম আলোর খেলা, সবই ইলেকট্রিক আলোর কায়দা !"

ক্যাপটেন নরবু খানিকটা আহতভাবে বললেন, "এটা তুমি কী বলছ রাজা ? জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিক আসবে কোথা থেকে। ওখানে তো বিদ্যুতের লাইনই যায়নি। মনাস্টারিতে শুধু মোমবাতি জ্বলছিল, মনে নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "ইলেকট্রিকের কানেকশান না থাকলেও গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালা যায়। সিনেমার শুটিংগুলো হয় কীভাবে ? জেনারেটরে আলো জ্বলে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "জেনারেটর ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। একসময় আমি গোঁগোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনেছি। জেনারেটরের ওপর অনেকগুলো কম্বল চাপা দিলে আওয়াজটা কম

হয়। কিন্তু একেবারে লুকনো যায় না! নরবু, তোমাকে সকালেই বলেছি না, মড়ার মাথার খুলি থেকে যদি আলো বেরুতে নিজের চোখেও দ্যাখো, তা হলেও বিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই সেটা কোনও কারসাজি!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আর ধূপকাঠি থেকে যে ফুলঝুরির মতন রঙিন আলোর ফুলকি বেরুতে লাগল, সেটাও ইলেকট্রিক?"

কাকাবাবু বললেন, "ফুলঝুরির মতন রঙিন আলোর ফুলকি বেরুতে দেখলে বোঝা উচিত, সেটা ফুলঝুরিই, অন্য কিছু না। খুব সাধারণ ব্যাপার। কিছু ধূপকাঠির ওপর দিকে শুধু ধূপের মশলা আর মাঝখান থেকে ফুলঝুরির মশলা দিয়ে তৈরি করলেই সেই ধূপকাঠি কিছুক্ষণ ধোঁয়া দেবার পর ফুলঝুরি হয়ে যাবে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রাজা, আমি তোমার সব কথা মানতে পারছি না। আমি প্রাচীন লামাকে দেখেছি, তিনি সত্যিই এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ, কোনও সাধারণ মানুষের ওরকম চেহারা বা রূপ হতেই পারে না। তুমি বলতে চাও, সবটাই ম্যাজিক আর কারসাজি?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রাচীন লামা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তিনি কালজয়ী মহাপুরুষ হতেও পারেন। আর-একবার ভাল করে তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু বজ্র লামা যে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য নানা রকম আলোর ভেলকি দেখাচ্ছিলেন, তাতে আমার কোনও সন্দেহই নেই!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "বাঙালিবাবুরা অনেক কিছুই অবিশ্বাস করেন। আমি দেখেছি তো অনেক। কিন্তু বজ্র লামার যে নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তা অনেকেই মানে। তিনি একবার ছুঁয়েই অনেক মানুষের রোগ সারিয়ে দেন।"

ক্যাপটেন নরবু নতুন করে উৎসাহ পেয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! এই সন্তুরই তো সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়েছিল, বজ্র লামা তাকে চোখের নিমেষে সারিয়ে দিলেন। কী রাজা রায়চৌধুরী, সেটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারো?"

কাকাবাবু ধীর স্বরে বললেন, "না, সেটা অস্বীকার করছি না। তবে লোককে হিপনোটাইজ করাকে ঠিক অলৌকিক ক্ষমতা বলে আমি মানতে রাজি নই। এই ক্ষমতা কেউ কেউ আয়ত্ত করে। শুধু সাধু-সন্ন্যাসী নয়, কোনও-কোনও ডাক্তারও এটা পারে। মেসমার নামে একজন ডাক্তার এইভাবে রুগিদের চিকিৎসা করতেন, তা জানো না বোধ হয়। সেইজন্যই এই পদ্ধতির নাম মেসমেরিজ্‌ম!"

ক্যাপটেন বললেন, "সম্মোহন করে কোনও রোগ পার্মানেন্টলি সারিয়ে দেওয়া যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "তা যায় না। কিন্তু রুগির মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া

যায় যে, সে একদম সেরে গেছে। সেই বিশ্বাসটাই বড় কথা। দার্জিলিং-এ বীরেন্দ্র সিং নামে একজন লোককে দেখে আমার এই কথা মনে হয়েছিল। মানুষের হাতের মধ্যে বুড়ো আঙুলটাই আসল। অন্য কোনও প্রাণী বুড়ো আঙুলের ব্যবহার জানে না, তাই তারা কোনও জিনিস হাত দিয়ে ধরতে পারে না। একটা বাঁদর কেন হাত দিয়ে লাঠি ধরতে পারে না? কেন লাঠি দিয়ে অন্যকে মারতে পারে না? কারণ ওরা এখনও বুড়ো আঙুলের ব্যবহার শেখেনি। বীরেন্দ্র সিং-এর এক হাতে শুধু বুড়ো আঙুল আছে, অন্য আঙুল নেই। সেই হাতে একটা গ্লাভস পরে নিলে তারপর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে একটা গেলাস কিংবা লাঠি ধরা অসম্ভব কিছু নয়। বজ্র লামা ওই বীরেন্দ্র সিংকে হিপনোটাইজ করে এই বিশ্বাসটাই জন্মে দিয়েছেন। সেটা খারাপ কিছু না?"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "কিন্তু সন্তুর অত জ্বর ছিল, চোখের নিমেষে কমিয়ে দিলেন বজ্র লামা, আমরা ওর কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, সেটাও সম্মোহন?"

কাকাবাবু বললেন, "চোখের নিমেষে কমাননি। কিছুটা সময় লেগেছে। সেইজন্যই অত সব মন্ত্র পড়ছিলেন। বিজ্ঞানের মধ্যেও অনেক ম্যাজিক আছে, তুমি ক্রোসিন বলে একটা ওষুধের নাম শুনেছ? তোমার একশো চার-পাঁচ ডিগ্রি জ্বর হলেও ক্রোসিন ট্যাবলেট দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্বর একেবারে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আজকাল সাধু-সন্ন্যাসীরাও এইসব ওষুধ ব্যবহার করতে শিখে গেছে। অনেক সময় ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করে অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। তবে সন্তুর মাথাব্যথাটা বজ্র লামা সম্মোহনে ভুলিয়ে রেখেছেন।"

দারোগা অ্যালবার্ট অস্থিরভাবে বললেন, "আপনারা তর্ক করছেন, আমার সব ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা কী? আপনাদের সঙ্গে একটি ছেলে ছিল, তাকে আটকে রাখা হয়েছে?"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই ক্যাপটেন নরবু ফস করে বলে দিলেন, "সে নিজেই আসতে চাইছে না। আজ সকালে তাকে কত সাধাসাধি করা হল, সে আসতে চাইল না।"

দারোগা অ্যালবার্ট হেসে বললেন, "সে নিজেই আসতে চাইছে না? তা হলে সেও বোধ হয় লামা হতে চায়? তবে আর তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে কী হবে?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আমার ভাইপোকে সম্মোহিত করা হয়েছে। তার কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়, তার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। এইভাবে তাকে আটকে রাখা বেআইনি। আমি আপনার সাহায্য চাইছি, পুলিশফোর্স নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। সে ওখানে বেশিক্ষণ থাকলে তার ব্রেনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কিন্তু এ-ব্যাপারে তো আপনাকে সাহায্য করা

আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোনও ধর্মস্থানে কি হুট করে পুলিশ পাঠানো যায়? সেটা খুব গোলমেলে ব্যাপার!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি সেইজন্যই সাজেস্ট করছিলাম, ছেলেটি ওখানে দু' তিনদিন থাকুক। তারপর ওর নিজেরই শখ মিটে যাবে। বজ্র লামা ওর কোনও ক্ষতি করবেন না।"

কাকাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি চুপ করো, নরবু। বজ্র লামা তোমাকেও খানিকটা সম্মোহন করেছেন, তাই তুমি ওঁর হয়ে কথা বলছ।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "বজ্র লামা আপনার ভাইপোকে আর ক্যাপটেন নরবুকে হিপনোটাইজ করেছেন, আর আপনাকে করতে পারেননি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে সম্মোহন করা সোজা নয়। কারণ, আমি নিজেও ওই ব্যাপারটা এক সময় আয়ত্ত করেছিলাম। উনি আমার চোখের দিকে তাকিয়েই সেটা বুঝেছিলেন, তাই সরাসরি আমার দিকে বেশি তাকাচ্ছিলেন না। অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক শক লাগিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। তার শোধ আমি একদিন নেবই! আমার ভাইপোকে আজই উদ্ধার করতে হবে। মিঃ অ্যালবার্ট, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না?"

অ্যালবার্ট বললেন, "কী করে সাহায্য করব, বলুন! আপনিই বললেন, তার বয়েস আঠারো বছর। সে নিজে আসতে চাইছে না। এই অবস্থায় আমি একটা মনাস্টারির মধ্যে কি পুলিশ ঢোকাতে পারি? দুঃখিত, আমার কিছু করবার নেই এ ব্যাপারে!"

কাকাবাবু এবার কোটের পকেট থেকে রাষ্ট্রপতির চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা পড়ে দেখুন।"

দারোগা অ্যালবার্ট এবার সোজা হয়ে উঠে বসে সসম্মানে রাষ্ট্রপতির চিঠিখানা পড়লেন। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতি একটা কাজের জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন, সেটা বুঝলাম। আপনি একজন ইম্পর্টান্ট মানুষ। কিন্তু এতে পুলিশ-বাহিনীর প্রতি কোনও নির্দেশ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "রাষ্ট্রপতির হয়ে যে কাজ করছে, তাকে সাহায্য করা পুলিশের কর্তব্য নয়?"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "আর কী কী সাহায্য চান বলুন? শুনুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলছি। তিব্বতিরা অধিকাংশই খুব ভাল লোক। খুবই ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা মনাস্টারি আছে, কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয় না। স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক ভাল। কোনও মনাস্টারিতেই পুলিশ নিয়ে যাবার অর্ডার আমাদের নেই। লামাদের এখানে সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। একমাত্র বজ্র লামাকে সবাই ভয় পায়। শুনেছি, তাঁর নাকি নানা রকম অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। পিণ্ড মনাস্টারিতে বাইরের লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, সেটাও ওঁদের নিজস্ব

ব্যাপার। বজ্র লামা সেখানে নাকি তিনশো বছরের বৃদ্ধ এক লামাকে লুকিয়ে রেখেছেন। কেন লুকিয়ে রেখেছেন, তা তিনি জানেন। মাঝে-মাঝে তিনি দিল্লিতেও যাতায়াত করেন। শুনেছি, এই নভেম্বর মাসে তিনি বড়-বড় লামাদের এক সম্মেলন ডাকছেন এখানে। তখন দলাই লামাকেও নাকি নেমন্তন্ন করে আনবেন। নিশ্চয়ই বিরাট কিছু হবে। তা হলেই বুঝতে পারছেন। এরকম একজন বড়দরের লোকের বিরুদ্ধে হুট করে আপনার কথায় কোনও অ্যাকশন নিতে পারি ?"

ফিলিপ তামাং এতক্ষণ পর বললেন, "বজ্র লামাকে এখানে সবাই ভয় পায়। পুলিশরাও ভয় পায়। এর আগেও শোনা গেছে যে, দু-একটি অল্প বয়েসী ছেলেকে উনি মনাস্টারিতে নিয়ে গেছেন, তারা আর বাইরে আসেনি। এটা গুজবও হতে পারে। তবে এটা ঠিক, উনি ছোট ছেলেদের পছন্দ করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে উনি ছোট ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেন, এরকম অনেকে দেখেছে। উনি নাকি একজন বৌদ্ধ অবতারকে খুঁজছেন !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "হ্যাঁ, সেটা আমরাও জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "বজ্র লামা সবাইকে এরকম ভয় পাইয়ে রেখেছেন কেন ? এটা কি কোনও ধর্মগুরুকে মানায় ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "ওঁর খুব ক্ষমতার লোভ। সবাই ওঁর কথা মানবে, সবাই ওঁকে দেখলেই মাথা নিচু করবে, এটাতেই ওঁর আনন্দ। টাকা-পয়সার নেশার চেয়েও ক্ষমতার নেশা যে অনেক বেশি হয়, তা নিশ্চয়ই জানেন। সারা পৃথিবীতেই তো কিছু-কিছু মানুষ ক্ষমতার নেশায় পাগল হয়ে গিয়ে কত লোকের ওপর অত্যাচার করে, তাই না ? তিন শো বছরের এক বৃদ্ধ লামাকে এই বজ্র লামা কোনও মতলবে লুকিয়ে রেখেছেন, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। এটা সত্যি না গুজব, তা তদন্ত করে দেখা উচিত নয় ? পুলিশ এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। সেইজন্যই আমি দার্জিলিং থেকে দু-একজন বড়-বড় লোককে এদিকটায় আনতে চেয়েছিলাম !"

দারোগা অ্যালবার্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "মাছ ! মাছ !"

একটা ছিপ ধরে তিনি টান মারলেন। অমনি একটা মাঝারি সাইজের মাছ ছটফটিয়ে উঠে এল।

তিনি খুশির সঙ্গে বললেন, "বাঃ, রঙ্গিত নদীতে এখন ট্রাউট মাছ পাওয়া যাচ্ছে। চমৎকার !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমিও তা হলে এখানে ছিপ নিয়ে আসব তো ?"

দারোগা অ্যালবার্ট কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি তা হলে এখন বিশ্রাম নেবেন ? আপনার জন্য বাংলো ঠিক করে দেব ?"

কাকাবাবু কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ অ্যালবার্ট গুরুং, আমি রাষ্ট্রপতির দূত হিসেবে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার ভাইপোকে

উদ্ধার করার জন্য আপনি আমার সঙ্গে পুলিশ-বাহিনী নিয়ে চলুন। যদি আপনি আমার এই অনুরোধ না মানেন, তা হলে আমি সরকারের কাছে আপনার নামে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব। তার ফল ভাল হবে না!"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "কী মুশকিল, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মিঃ রায়চৌধুরী, আমি একটা সামান্য থানার দারোগা। ট্রাউট মাছ নয়, চুনো পুঁটি। আমি কি নিজের দায়িত্বে একটা মনাস্টারিতে জোর করে ঢুকতে পারি? পরে যদি এই নিয়ে গোলমাল হয়? আমার ওপরওয়ালার অর্ডার দরকার। দার্জিলিং-এর ডি আই জি না বললে আমি এ-রকম অ্যাকশান নিতে পারি না। অসম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে ওপরওয়ালার কাছ থেকে এক্ষুনি অর্ডার আনবার ব্যবস্থা করুন। দরকার হলে আমিও টেলিফোনে কথা বলতে পারি। পুলিশের ওপরমহলের কর্তারা সবাই আমাকে চেনে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "তিন দিন ধরে এদিককার সব ফোন খারাপ। দার্জিলিং-এর সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই। একমাত্র কোনও লোক পাঠানো যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "লোক পাঠান। আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দিচ্ছি! তাতে আপনার দায়িত্ব অনেক কমে যাবে।"

দারোগা অ্যালবার্ট বললেন, "দার্জিলিং-এর দিকে ধস নেমে রাস্তা খারাপ। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, ডি আই জি সাহেব আজ সকালেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কালিম্পং থেকে কলকাতায় গেছেন। সুতরাং এখান থেকে লোক পাঠালেও সে কখন অর্ডার নিয়ে ফিরবে, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। যাই হোক, তবু একজনকে পাঠানো যেতে পারে!"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "আমি বলেছিলাম না, রাজা, দু-তিন দিন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই!"

কাকাবাবু অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন।

দু-তিন দিন সমস্ত নষ্ট হবে? ততক্ষণ সন্তু ওই জায়গায় বন্দী হয়ে থাকবে?

ফিলিপ তামাং এবার হাতের জ্বলন্ত সিগারেট নদীর জলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, একটু আড়ালে আসুন তো। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট কথা আছে।"

কাকাবাবু প্রথমে একটু অবাক হলেন। কিন্তু আপত্তি করলেন না। তিনি ফিলিপ তামাং-এর সঙ্গে চলে গেলেন খানিকটা দূরে।

সেখানে একটা বড় পাথরের চাঁই, তাকে ঘিরে উঠেছে কিছু লতানে ফুল গাছ। নদীর জলেও এখানে কয়েকটা বড় বড় পাথর পড়ে আছে, সেইজন্য জলস্রোতে ঝরঝর শব্দ হচ্ছে।

ফিলিপ তামাং বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, পুলিশ আপনাকে সাহায্য করবে

না। আপনার ভাইপোকে দু-তিন দিনের জন্যও ওই জায়গায় আটকে থাকতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একে তার আগেই উদ্ধার করতে হবে। এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।"

কাকাবাবু কয়েক পলক ফিলিপ তামাং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, "আপনি সাহায্য করবেন? কীভাবে?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "পুলিশ সাহায্য করবে না। কিন্তু আমরা গোপনে ওই মনাস্টারিতে ঢুকব। রাত্তিরবেলা। এখানকার নেপালি আর লেপচারা ওই মনাস্টারিতে ঢুকতে ভয় পায়। কিন্তু আমার একজন বিশ্বাসী অনুচর আছে। তার দারুণ সাহস। সেই জগমোহন আর আমি যাব, আপনি সঙ্গে থাকবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বজ্র লামা সহজে সন্তুকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। নিশ্চয়ই পাহারা দিয়ে রাখবে। রাত্তিরবেলা ওখানে ঢুকতে গেলে বিপদের ঝুঁকি আছে। আপনি শুধু শুধু সেই ঝুঁকি নেবেন কেন?"

ফিলিপ তামাং হেসে বললেন, "আমি বিপদ গ্রাহ্য করি না। আপনার সঙ্গে একটা অভিযানে যাব, এটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

কাকাবাবু তবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "শুধু এইজন্য?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "নিশ্চয়ই! এটা কি কম কথা! তা ছাড়া আপনার ওই বুদ্ধিমান ভাইপোটিকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার কোনও ক্ষতি হোক, আমি চাই না। আরও একটা কারণ আছে। ওই বজ্র লামার ওপরে আমার রাগ আছে। ওকে একবার শিক্ষা দিতে চাই। আমার হাঁটুতে একটা ব্যথা আছে জানেন তো? অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তবু সারেনি। শেষ পর্যন্ত ওই বজ্র লামার কাছে গিয়েছিলাম, উনি আমার চিকিৎসা করতে রাজি হননি।"

"কেন?"

"কোনও কারণ না দেখিয়েই উনি ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। তবে আমার ধারণা, আমি ক্রিশ্চান বলে উনি রাজি হননি। আপনি জানেন কি, উনি চিকিৎসার জন্য টাকা পয়সা নেন না বটে, কিন্তু যাদের উনি সারিয়ে দেন, তাদের প্রত্যেককে আট দশ দিন অন্তর অন্তর এসে ওই বজ্র লামাকে প্রণাম করে যেতে হয়!"

"হুঁ! সন্তু তো সেরকম প্রণাম করতে আসত না। সেইজন্যই কি উনি সন্তুকে নিজের কাছে রেখে দিতে চান?"

"আজকাল নতুন করে কেউ লামা হতে চায় না সহজে। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে চায়। তাই উনি ছোট-ছোট ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে যান শুনেছি। সন্তুকে এর পর উনি যদি কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেন, তা হলে আপনি আর তার খোঁজ পাবেন না।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন,

এখানকার পুলিশ সাহায্য করতে চায় না শুনেই আমি ঠিক করেছিলাম, আজ রাতে আমি একাই ওই মনাস্টারিতে আবার যাব। আপনি যদি সঙ্গে যেতে চান তো ভাল কথা!"

ফিলিপ তামাং খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে এক কাজ করা যাক, এখন আপনি আমার চা-বাগানে চলুন। খানিকক্ষণ বাংলোতে বিশ্রাম নেবেন। এর মধ্যে আমি লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি বজ্র লামা এখন কোথায় আছেন। জঙ্গলের মনাস্টারিতে সবাইকে যেতে দেয় না বলে তিনি মাঝে-মাঝেই মানেভঞ্জনের কাছে ছোট মঠটাতে এসে থাকেন, সেখানেই ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন।"

কাকাবাবু বললেন, "জঙ্গলের মনাস্টারি থেকে আজ তাঁরও চলে আসার কথা একবার বলেছিলেন।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "তা হলে তো সুবিধেই হবে। আমরা যাব শেষ রাত্তিরের দিকে। ওই সময় সবাই গাঢ়ভাবে ঘুমোয়।"

ওঁরা দু'জন আবার মাছ ধরার দলটির কাছে আসতেই ক্যাপটেন নরবু বললেন, "রাজা, আমি কী ঠিক করলাম জানো? এখানকার থানার লোক দার্জিলিং যাবে, সেখান থেকে পুলিশের বড়-কর্তার পারমিশন নিয়ে আসবে, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তার চেয়ে তুমি আর আমি বরং দার্জিলিং চলে যাই এক্ষুনি। তুমি বললে কাজটা সোজা হবে। আমরাই দার্জিলিং থেকে পুলিশ-ফোর্স নিয়ে আসতে পারব। কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরতে পারব।"

কাকাবাবু শুনে বললেন, "ঠিক বলেছ। খুব ভাল আইডিয়া। আমরাই যাব। চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

ফিলিপ তামাং হকচকিয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। কাকাবাবু তাঁকে কিছু বললেন না।

তিনি দারোগা অ্যালবার্টকে একটা শুকনো নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরাই দার্জিলিং যাচ্ছি। আপনি মাছ ধরুন।"

দারোগা অ্যালবার্ট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "ও কে!"

কাকাবাবুরা ফিরে এলেন ক্যাপটেন নরবুর জিপের কাছে। কাছেই ফিলিপ তামাং-এরও জিপ রয়েছে একটা।

কাকাবাবু পকেট থেকে নোটবুক ও কলম বার করে বললেন, "ক্যাপটেন নরবু, দার্জিলিং-এ আমি যাব না। তোমাকে একা যেতে হবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি পুলিশের ডি আই জি কিংবা এস পি-র সঙ্গে দেখা করবে। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে পুলিশ-ফোর্স নিয়ে আসবে। সম্ভব হলে আজ শেষ রাত্তিরের মধ্যেই। সোজা চলে আসবে ওই জঙ্গলের মনাস্টারির কাছে।"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "তুমি যাবে না? তুমি এখানে একা থেকে কী

করবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। আমি আজ রাতেই আবার ওই মনাস্টারিতে ফিরে যেতে চাই। ফিলিপ তামাং আমাকে সাহায্য করবেন বলেছেন।"

ক্যাপটেন নরবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, "ওখানে তুমি আবার যাবে ? ওই বাঘের গুহায় ? বজ্র লামার অনুমতি ছাড়া ওখানে কেউ যেতে পারে না। দরজার কাছে মশাল নিয়ে দু'জন লোক পাহারা দেয় দ্যাখোনি ? ঢুকবে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে !"

ক্যাপটেন নরবু বললেন, "ভেতরে ঢুকলেও নিস্তার নেই। একবার একটা চোর ঢুকেছিল, তার চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছিল, সারা গায়ে নখের ফালা ফালা দাগ, একথা বলিনি তোমাকে ? আর একবার আর একটা লোককে পাওয়া গিয়েছিল ঝরনার ধারে, তারও চোখ দুটো ওপড়ানো, গলাটা মুচড়ে ভেঙে দেওয়া। পুলিশ কারুকে ধরতে পারেনি। ওটা কোনও মানুষের কাজ নয়। বজ্র লামা ভূত-প্রেত-দানবদের বশ মানাতে পারেন। এটা অবিশ্বাস কোরো না। কোনও দানব ছাড়া মানুষের গলা মুচড়ে ওইরকমভাবে কেউ ভাঙতে পারবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি কখনও ভূত-প্রেত-দানব দেখিনি। একবার দেখার খুব ইচ্ছে আছে। তারপর মরি তো মরব !"

ক্যাপটেন নরবু ব্যাকুলভাবে বললেন, "যাই বলো রাজা, তোমাকে ফেলে রেখে আমি একা যেতে পারব না। ওই মনাস্টারিতে আমি তোমাকে আর যেতেও দেব না !"

কাকাবাবু খস খস করে নোটবুকের পাতায় একটা চিঠি লিখলেন। তারপর পাতাটা ছিঁড়ে ক্যাপটেন নরবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নরবু, এর আগে দু-একবার আমি তোমার কিছু উপকার করেছি। তুমি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলে। এখন আমি সেটা চাইছি। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এক্ষুনি দার্জিলিং রওনা হয়ে যাও। তোমাকে একাই যেতে হবে। এতেই আমার খুব উপকার হবে। দেরি কোরো না, এগিয়ে পড়ো..."

ক্যাপটেন নরবু তখনও দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবু তাঁর দিকে আঙুল তুলে বললেন, "যাও ! প্লিজ..."

তারপর কাকাবাবু উঠে পড়লেন ফিলিপ তামাং-এর জিপে !

॥ ৮ ॥

মাঝরাতে এমন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল যে, মনে হল যেন আকাশ ভেঙে পড়বে ! প্রচণ্ড বজ্রপাতের আওয়াজ আর হাওয়ার বেগে উপড়ে পড়ল কয়েকটা

বড়-বড় গাছ। ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে গেল বাংলোর কয়েকটা কাচের জানলা।

এর মধ্যে বেরনো যায় না।

পাহাড়ি রাস্তায় রাত্তির বেলা গাড়ি চালানোই বিপজ্জনক। ঝড়-বাদলের মধ্যে যখন-তখন অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

কাকাবাবু শুতে গেলেন না। জানলার ধারে বসে রইলেন আগাগোড়া।

বৃষ্টির তেজ কমে এল প্রায় রাত তিনটের সময়। কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে গিয়ে ফিলিপ তামাং-এর ঘরের দরজায় খট খট করলেন।

ফিলিপ তামাং কোট-প্যান্ট পরে তৈরিই ছিলেন, কিন্তু শেষের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ। দরজা খুলে বললেন, "এখন কী আর যাবেন? নাকি কাল রাত্তিরের জন্য অপেক্ষা করবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আজই যেতে চাই।"

ফিলিপ তামাং ঘড়ি দেখে বললেন, "ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে যদি ভোর হয়ে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "হোক!"

একবার ঠিক হয়েছিল যাওয়া হবে মোটরসাইকেলে। কিন্তু ওতে বড্ড বেশি আওয়াজ হয়। রাত্তিরবেলা সেই আওয়াজ শোনা যায় অনেক দূর থেকে। এই ঝড়-বৃষ্টির পর রাস্তা পেছল হয়ে আছে, এর মধ্যে ঘোড়ায় যাওয়াও ভয়ের ব্যাপার। তখন ঠিক হল জিপেই যেতে হবে। এই চা-বাগানের দিক থেকে একটা রাস্তা আছে। সেটাতে ওই জঙ্গলের মনাস্টারির পেছনের পাহাড়টার একপাশে পৌঁছনো যায়। এই রাস্তায় গেলে ডিংলা ঝরনা পেরোতে হবে না। অবশ্য পাহাড়ের গা থেকে খানিকটা হাঁটতে হবে জঙ্গলের মধ্যে।

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হাঁটতে পারবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড় দিয়ে নীচের দিকে নামতে হবে তো? সেটা আমি ঠিক পারব।"

জিপ চালাচ্ছে জগমোহন। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, কিন্তু সে কথা বলে খুব কম। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কুস্তিগিরের মতন চেহারা।

ফিলিপ তামাং একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমি আরও একজনকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম। তার নাম বাণ্টু। খুব বিশ্বাসী আর বুদ্ধিমান। কিন্তু বজ্র লামার নাম শুনে সে ভয় পেয়ে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি লোকের দরকার নেই। তবে, মনাস্টারির বাইরে দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক পাহারা দেয়, তাদের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা একটু শক্ত হবে।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "তাদের ঘায়েল করার ব্যবস্থা আমি করেছি। আচ্ছা, মিঃ রায়চৌধুরী, কেউ যদি আপনাকে তাড়া করে, তা হলে তো আপনি

দৌড়ে পালাতে পারেন না। অথচ, আপনি এত সব জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারে যান কী করে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমার কখনও পালাবার দরকার হয়নি এ পর্যন্ত। কেউ যদি তাড়া করে আসে, আমি ধরা দিই।"

ফিলিপ তামাং বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "আপনি ধরা দেন? তারপর?"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর কিছু একটা হয়ে যায়। এ পর্যন্ত তো একবারও মরিনি, দেখাই যাচ্ছে।"

গম্ভীর স্বভাবের জগমোহন জিপ চালাতে-চালাতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "বজ্র লামার মনাস্টারিতে ভূত আছে?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "ভূত? ধুর, ভূত আবার কী! একথা কে বলল তোকে?"

জগমোহন বলল, "বাণ্টু বলল! ওখানে কেউ মরলে নাকি পোড়ানো হয় না, কবরও দেওয়া হয় না। তারা ভূত হয়ে রাত্তিরবেলা ঘোরে!"

ফিলিপ তামাং তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, "কী রে, জগমোহন। তুইও ভয় পাচ্ছিস নাকি?"

জগমোহন দু'দিকে মাথা নাড়ল।

ফিলিপ তামাং বললেন, "জ্যান্ত মানুষদের তুই কবজা করবি, তাতেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। এই যে মিঃ রায়চৌধুরী আছেন, ইনি ভূত-টুতদের জব্দ করবেন।"

কাকাবাবু তাঁর ক্রাচ দুটো একবার তুলে দেখলেন। শব্দ যাতে না হয় সেইজন্য আজ বিকেলে ক্রাচ দুটোর তলায় রবার লাগানো হয়েছে। ইলাস্টিক দড়িও লাগানো হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে ও দুটোকে পিঠে বেঁধে নেওয়া যায়। ফিলিপ তামাং বারবার বলছিলেন, "আমি শুধু দেখতে চাই, শত্রুর ঘাঁটির মধ্যে গিয়ে আপনি কীভাবে ঘোরাফেরা করেন!"

এত বৃষ্টির ফলে রাস্তা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। জিপটা স্কিড করছে মাঝে-মাঝে। জগমোহন চালায় ভাল, তবু দু-একবার গাড়িটা প্রায় খাদে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। এক জায়গায় একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, অবশ্য তাতে ক্ষতি হল না বিশেষ।

হেডলাইটের তীব্র আলোয় শুধু রাস্তার সামনেটা দেখা যাচ্ছে, বাকি সব অন্ধকার। একটা কী যেন প্রাণী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, মখমলের মতন তার হলদে শরীর ঝিলিক দিয়ে গেল একবার।"

কাকাবাবু বললেন, "লেপার্ড!"

ফিলিপ তামাং উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "গুড সাইন! লেপার্ড দেখলে কার্যসিদ্ধি হয়। আজ আমরা নিশ্চয়ই জিনিসটা পাব।"

কাকাবাবু বললেন, "জিনিস?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "না, না। সরি, জিনিস কী বলছি! ভুল বলেছি। আপনার ভাইপো সন্তুকে নিয়ে আসতে পারব। সেটাই মিন করেছি!"

জগমোহন বলল, "আর যাওয়া যাবে না!"

সামনে রাস্তার ওপরে দুটো বড়-বড় পাইন গাছ পড়ে আছে। আজকের ঝড়ে ভেঙেছে। এই গাছ সরাতে অনেক লোক লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, "ভালই হয়েছে। আমরা এখানে নেমে পড়ি। আর কত দূর!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "বড় জোর দু' ফার্লং। তাই না জগমোহন?"

জগমোহন বলল, "সিকি মাইল থেকে আধ মাইল, তার বেশি হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "গুড। লেটস স্টার্ট!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "লেপার্ড দেখা খুব গুড সাইন বটে। কিন্তু সে ব্যাটা না পেছন থেকে হঠাৎ ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে!"

কাকাবাবু বললেন, "তিনজন মানুষ একসঙ্গে দেখলে কোনও লেপার্ড অ্যাটাক করবে না। চলুন, চলুন, বেশি দেরি করলে ভোর হয়ে যাবে!"

ক্রাচ নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে কাকাবাবুরই সবচেয়ে অসুবিধে হবার কথা, তবু তিনি অন্যদের চেয়ে আগে-আগে নামতে লাগলেন। তিনজনেরই হাতে জোরালো টর্চ।

নিঃশব্দে তিনজনে এসে পৌঁছলেন জঙ্গলের মনাস্টারির কাছে।

ফিলিপ তামাং ফিসফিস করে বললেন, "কোনও গার্ডই তো দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির পর বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, সবাই নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনের দিকে এদের প্রধান দরজা। পেছন দিকেও একটা ছোট দরজা আছে দেখেছি। কিন্তু কোনও দরজাই নিশ্চয়ই খোলা থাকবে না। পাঁচিল ডিঙোতে হবে!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "দারুণ এক্সসাইটমেন্ট বোধ করছি। আপনার সঙ্গে একটা অভিযানে যাচ্ছি, এটা হিস্ট্রিতে লেখা থাকবে। চলুন, আগে সামনের দরজাটার কাছে গিয়ে দেখি।"

মনাস্টারির সামনের দরজা অবশ্যই বন্ধ। পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে আছে একজন প্রহরী। সে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। বাতাস এখন কনকনে ঠাণ্ডা!

পকেট থেকে কী একটা জিনিস বার করে, এগিয়ে দিয়ে ফিলিপ তামাং বললেন, "নে জগমোহন, লোকটাকে কাত করে দে!"

জগমোহন প্রায় নিঃশব্দ-পায়ে ছুটে গিয়ে লোকটির মুখ চেপে ধরল।

লোকটি লড়াইয়ের কোনও সুযোগই পেল না। খানিকটা ছটফট করেই ঢলে পড়ল একপাশে।

কাকাবাবু শিউরে উঠে বললেন, "লোকটা মরে গেল নাকি!"

ফিলিপ তামাং বলল, "না ! মারবার দরকার হবে না !"

ফিলিপ তামাং সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে বড় দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। তারপর ফিরে এসে বলল, "এই দরজা ভাঙা যাবে না। লোহার মতন শক্ত। আর একটা ছোট দরজা কোথায় আছে বললেন ?"

কাকাবাবু ওদের নিয়ে এলেন মনাস্টারির পেছন দিকে, ডান পাশে। এখানে একটা ছোট দরজা আছে। আজ সকালে এই দরজা দিয়েই তাঁকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন অবশ্য সেই দরজাও বন্ধ।

ফিলিপ তামাং জিজ্ঞেস করলেন, "জগমোহন, এই দরজাটা তেমন ভারী না। ভাঙতে পারবি ?"

জগমোহন বলল, "পারব ! কিন্তু শব্দ হবে !"

ফিলিপ তামাং বলল, "আমি অবশ্য দেওয়াল টপকাবার জন্য দড়ির সিঁড়ি এনেছি। কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী কি সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবেন ?"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দেবার আগেই কাছাকাছি একটা শব্দ হল। এখানেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে একজন প্রহরী। তার হাতে একটা গদা কিংবা মুগুরের মতন অস্ত্র। সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। এদের কথাবার্তা শুনে জেগে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কোন হ্যায় ?"

ফিলিপ তামাং সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, "জগমোহন ওকে ধর !"

জগমোহন ছুটে গিয়ে লোকটিকে জাপটে ধরতেই দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর চলল লড়াই।

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে বললেন, "চিন্তা করবেন না। জগমোহন এক্ষুনি ওকে অজ্ঞান করে দেবে !"

কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

সেই প্রহরীটি লড়াই করতে করতে এক সময়ে হেরে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেল বটে, কিন্তু জগমোহনও উঠে দাঁড়াল না। সেও শুয়ে রইল লোকটির পাশে।

ফিলিপ তামাং দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ব্লাডি ফুল !"

তারপর তিনি ওদের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে জগমোহনের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলেন। আবার ফিরে এলেন হাতে একটা ছোট শিশি নিয়ে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী !"

ফিলিপ তামাং বললেন, "এটা একটা ক্লোরোফর্মের মতন জিনিস। এটা এনেছিলাম, প্রহরীগুলোকে অজ্ঞান করে ফেলার জন্য। কিন্তু জগমোহনটা এমন বোকা, এটা নিজের নাকের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। ও নিজেও অজ্ঞান হয়ে গেল। আর ওর সাহায্য পাওয়া যাবে না। এখন তা হলে..."

কাকাবাবু বললেন, "দরজা ভাঙার চেয়ে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে পাঁচিল টপকানো

অনেক সহজ। আপনি ভাবছিলেন, আমি সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারব কি না ? সিঁড়িটা লাগান, আমিই আগে উঠব !"

পাঁচিলটা পাথরের তৈরি, প্রায় দেড়-মানুষ সমান উঁচু। ওপরটা মসৃণ। ফিলিপ তামাং কয়েকবার চেষ্টা করতেই তাঁর দড়ির সিঁড়ির লোহার হুক পাঁচিলের মাথায় আটকে গেল।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পিঠের সঙ্গে বেঁধে দিব্যি তরতর করে উঠে গেলেন ওপরে। এবার উলটো দিকে নামতে হবে। ফিলিপ তামাং উঠে আসার পর সিঁড়িটাকে এপাশে ফেলে সহজে নামা যেত, কিন্তু কাকাবাবু আর দেরি করলেন না। হাতের ভর দিয়ে ঝুলে পড়লেন, তারপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লেন মাটিতে।

তিনি কুকুরের ভয় করছিলেন। তিব্বতিরা অনেকেই কুকুর পোষে। যদি কুকুর ছাড়া থাকে, তা হলেই মুশকিল। সেরকম কিছু হল না। চতুর্দিকে একেবারে নিস্তব্ধ। পৌনে পাঁচটা বাজে, এই সময়টা সত্যিই ঘুমোবার সময়। আর একটু পরেই ভোর হবে। এইসব পাহাড়ি এলাকায় ভোর হয় তাড়াতাড়ি, সন্ধে হয় আগে-আগে।

কাকাবাবু দেখলেন, একটু দূরেই সেই টালির ছাদ দেওয়া লম্বা ঘরটি। এরই বারান্দায় সকালবেলা সন্তুকে তিনি দেখে গেছেন।

ফিলিপ তামাং নেমে আসার পর কাকাবাবু বললেন, "খুব সম্ভবত ওই ঘরটার মধ্যেই সন্তু থাকবে। ওটা ছাত্রদের ডরমিটরি মনে হচ্ছে।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "চলুন, আগে ওখানেই দেখা যাক।"

নিঃশব্দে দু'জনে এগিয়ে গেলেন ঘরটার দিকে। বারান্দা পেরোবার পর একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। মেঝেতে সারি-সারি বিছানা পাতা। এটা ছাত্রদের ঘর ঠিকই।

ফিলিপ তামাং বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এক-একজনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলুন। আমি ওদের অজ্ঞান করে দিই। কারণ, ওরা জেগে উঠলে গণ্ডগোল করবে। শুধু সন্তুকে আমরা ডেকে নেব।"

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে ধরলেন। ফিলিপ তামাং এক-একজন ছাত্রের নাকের কাছে রুমাল ঠেসে ধরতে লাগলেন, তারা দু-একবার ছটফট করেই ঢলে পড়ল। একটি ছাত্র শুধু আগেই জেগে উঠে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, ফিলিপ তামাং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা চেপে রইলেন খানিকক্ষণ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের কোনও ক্ষতি হবে না তো ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "না, না, শুধু পাঁচ ঘণ্টা কি ছ' ঘণ্টা অঘোরে ঘুমোবে। আজ সকালে ওদের প্রেয়ার হবে না, মর্নিং ক্লাসও ছুটি দিতে হবে। তাতে আর কী এমন ক্ষতি হবে বলুন ?"

একে-একে সাতটি ছাত্রকেই অজ্ঞান করা হয়ে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে সন্তু

নেই।

কাকাবাবু খানিকটা নিরাশভাবে বললেন, "সন্তুকে তা হলে অন্য জায়গায় রেখেছে। এখন অনেক খুঁজতে হবে। আমরা যে-ঘরটায় ছিলাম, চলুন, সেখানে এবার দেখা যাক।"

এই মনাস্টারিতে আরও কত লোক আছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। কাকাবাবু ফিলিপ তামাংকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। সকালবেলার সেই ঘরটির দরজাও ভেজানো, ঠেলতেই খুলে গেল। সকালেই কাকাবাবু লক্ষ করেছিলেন, এখানকার কোনও ঘরেই তালা দেবার ব্যবস্থা নেই। কোনও দরজার কড়া নেই।

কাকাবাবুর হাতের জোরালো টর্চের আলোয় দেখা গেল দুটো বিছানাই খালি। কেউ নেই সে ঘরে।

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, সন্তু কোথায় গেল?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "বজ্র লামা তাকে অন্য মনাস্টারিতে নিয়ে যায়নি তো? সে নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছে, আপনি পুলিশ নিয়ে কিংবা অন্য যে-কোনও উপায়ে আবার ফিরে আসতে পারেন। তাই সে সন্তুকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে।"

কাকাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "সে সন্তুকে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই লুকিয়ে রাখুক, আমি ঠিক খুঁজে বার করব। আগে এই মনাস্টারির সব ঘর খুঁজে দেখে নিই, তারপর আমি বজ্র লামার কাছে যাব।"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আগে একবার তিনশো বছরের বৃদ্ধ প্রাচীন লামার ঘরটায় গেলে হয় না? তাকে আমার দেখবার ইচ্ছে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চলুন সেখানে। ওই ঘরের কাছাকাছি আরও দু' তিনটে ঘর আছে মাটির নীচে। সন্তু ওখানে কোনও ঘরে থাকতেও পারে।"

বুদ্ধমূর্তির বড় ঘরটা পার হয়ে কোণের দরজাটা খুলে কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললেন, "এখানেও একটা লোক পাহারায় বসে থাকে। সাবধান!"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পর একটা সরু গলি। প্রাচীন লামার ঘরের সামনে প্রহরীটি আজ আর বসে-বসে ঘুমোচ্ছে না। সে দরজা আড়াআড়ি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। তার নাক ডাকছে।

ফিলিপ তামাং তার বুকের ওপর ঝুঁকে ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমাল চেপে ধরলেন নাকে। লোকটা একটু ছটফটও করল না। ঘুমের মধ্যে আরও ঘুমিয়ে পড়ল।

কাকাবাবু তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে টর্চের আলো ফেললেন।

এই ঘরটাও শূন্য। উঁচু বেদীটার ওপর বিছানা পাতা আছে, কিন্তু কোনও

মানুষ নেই।

ফিলিপ তামাং খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এইখানে ছিল ? আপনার ঘর ভুল হয়নি তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, এই ঘর ! কী ব্যাপার, সবাই কি এই মনাস্টারি থেকে চলে গেল নাকি ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আমি যতদূর শুনেছি, প্রাচীন লামা তো কোনওদিন এখান থেকে বাইরে যান না।"

কাকাবাবু বললেন, "কী জানি, বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু টর্চ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখতে লাগলেন। দেওয়ালে কোনও ইলেকট্রিকের তার কিংবা বাল্‌ব নেই। কাল রাতের বিদ্যুৎচমকের ব্যাপারটা তা হলে কী ছিল ? এর মধ্যে তার-টার সব খুলে নিয়েছে।

কাকাবাবু বেদীটার পেছন দিকে চলে এলেন।

প্রাচীন লামা শুয়ে ছিলেন ওপরে। আর বজ্র লামা পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধূপের ধোঁয়া আর তারাবাজির ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি ছিল, কীসব গন্ধও এখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে একটা মড়ার মাথার খুলির চোখের মধ্যে আঙুল ভরে দিয়ে কাকাবাবু টের পেলেন, ভেতরে বাল্‌ব লাগানো আছে। এবার তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

দেওয়ালের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে তিনি একটা পুশ বাট্‌ন সুইচও পেয়ে গেলেন। সেটা টিপলেও অবশ্য কোনও আলো জ্বলল না।

কাকাবাবুর গায়ে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে।

এবার তিনি দেখলেন, বেদীর পেছনের দেওয়ালের দিকে একটা বেশ বড় গোল গর্ত। মানুষ গলে যেতে পারে। একটা গুহার মতন। সেই গুহার মুখে অন্য সময় পাথর চাপা দেওয়া থাকে, একটা বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে একটু দূরে।

গুহাটা ভাল করে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন না কাকাবাবু। ফিলিপ তামাং বললেন, "শেকড়গুলো কোথায় ?"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "শেকড় ?"

ফিলিপ তামাং বললেন, "এরা মারাংবু গাছের শেকড় রাখে, আপনি জানেন না ? সেই শেকড় একটু-একটু খেলে মানুষ অনেকদিন বাঁচে।"

কাকাবাবু বললেন, "মারাংবু গাছ ? কোনওদিন নাম শুনিনি !"

ফিলিপ তামাং বললেন, "মারাংবু গাছের আর-এক নাম ট্রি অফ গুড হোপ। একশো বছর আগে সেই গাছ পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গেছে। একসময় তিব্বত আর চিনদেশের অন্য দু-একটা জায়গায় পাওয়া যেত। কনফুসিয়াস এই গাছের শেকড়ের গুণের কথা লিখে গেছেন। এই শেকড় খেলে মানুষের সব

রোগ-ভোগ সেরে যায়। আয়ু অনেক বেশি হয়।”

কাকাবাবু বললেন, “আহা, এরকম একটা অদ্ভুত গাছ পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গেল?”

ফিলিপ তামাং বললেন, “গাছটা শেষ হয়ে গেলেও তার কিছু-কিছু শেকড় এইসব লামাদের কাছে আছে। সেই শেকড় নষ্ট হয় না। সেই শেকড় আমাদের পেতেই হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “কোনও গাছের শেকড় খেয়ে মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচবে, তা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। তবে সেরকম কিছু শেকড় পেলে লেবরেটারিতে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে!”

ফিলিপ তামাং বললেন, “এই ঘরে প্রাচীন লামা ছিল, এখানেই সেই শেকড় থাকবে।”

বেশি খুঁজতে হল না। উঁচু বেদীটার গায়ে দুটি দেরাজ। তার মধ্যে যেটা উপরের দিকে সেটা খুলতেই পাওয়া গেল একটা কাচের ছোট বাক্স। সেই বাক্সের মধ্যে কিছু-একটা শেকড় রয়েছে ঠিকই, যদিও তার অনেকটাই ঝুরঝুরে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেকটা চা-পাতার মতন দেখতে।

কাকাবাবু বাক্সটা তুলে নিয়ে বললেন, “আমরা এখানকার কোনও জিনিস চুরি করছি না। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এটা গ্রহণ করছি। যথাসময়ে বজ্র লামাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।”

ফিলিপ তামাং বললেন, “ওটা আমার কাছে দিন, আমি রাখছি!”

কাকাবাবু বললেন, “আমার কাছেই থাক। আমার কোটের পকেটে বাক্সটা ধরে যাবে। এবার অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখা যাক।”

দরজার সামনের লোকটা অজ্ঞান হয়েই আছে। তাকে ডিঙিয়ে বাইরে আসতেই কিসের যেন শব্দ শোনা গেল। খানিকটা দূরে।

কাকাবাবু আর ফিলিপ তামাং চুপ করে দাঁড়িয়ে শব্দটা শুনলেন।

ঘোড়ার খুরের মতন খটাখট খটাখট আওয়াজ। বেশ কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চেপে এই মনাস্টারির দিকে আসছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

কাকাবাবু বললেন, “পুলিশ? ক্যাপ্টেন নরবু এর মধ্যেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেছে?”

ফিলিপ তামাং বললেন, “আর যদি বজ্র লামা হয়? হঠাৎ কোনও কারণে বজ্র লামা ফিরে আসতে পারে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওপরে উঠে আড়াল থেকে একবার দেখে নেওয়া দরকার।”

ফিলিপ তামাং বললেন, “পুলিশ তো ঘোড়ায় আসবে না। দার্জিলিং-এর পুলিশ এত রাত্রে ঘোড়া পাবে কোথায়? এ নিশ্চয়ই বজ্র লামার দল। আমি আর রিস্ক নিতে চাই না।”

তারপর ফিলিপ তামাং আদেশের সুরে বললেন, "কাচের বাক্সটা আমাকে দিন। ওইটার জন্যই আমি এসেছি। ওইটা নিয়ে আমি পালাব!"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি!"

ফিলিপ তামাং বললেন, "আপনি ক্রাচ নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন না। দড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আপনার সময় লাগবে। তারপর অনেকটা দৌড়ে যেতে হবে জিপের কাছে। আপনার সঙ্গে যেতে গেলে আমিও ধরা পড়ে যাব। দিন, বাক্সটা দিন আমাকে!"

কাকাবাবু বললেন, "উহুঁ! এটা সরকারি সম্পত্তি। তুমি আমাকে ফেলে পালাতে চাইছ, আর তোমাকে আমি এটা দেব?"

ফিলিপ তামাং ফস করে একটা রিভলভার বার করে কাকাবাবুর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি পালাতে না পারলে ধরা দেন, কিন্তু আমি ওই বজ্র লামার কাছে কিছুতেই ধরা পড়তে চাই না। আপনার ওইসব অভিযান-টভিযান বানানো গল্প, এবার বুঝেছি। একটা খোঁড়া লোক, গুড ফর নাথিং!"

কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "রিভলভারটা নামাও! আমার দিকে কেউ অস্ত্র তুললে তাকে কোনও-না-কোনও সময়ে আমি শাস্তি দেবই!"

ফিলিপ তামাং কাকাবাবুকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে বললেন, "হাঃ! এখনও তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ! একটা গুলিতে এখন তোমার কপাল ফুটো করে দিলে কে বাঁচাবে? পকেটে হাত দেবে না! ক্রাচ তুলবে না। কোনওরকম চালাকি করলেই গুলি চালাব। এবার আর তোমার সঙ্গে আমি খেলা করছি না! মারাংবু গাছের শেকড়গুলো নিয়ে আমি বিদেশে চলে যাব। এই জিনিসটার দাম হবে কয়েক কোটি টাকা! দাও বাক্সটা!"

ফিলিপ তামাং হঠাৎ একেবারে বদলে গেছে। তার কথার মধ্যে এমন নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠছে যে, মনে হয় সত্যিই সে গুলি চালিয়ে কাকাবাবুকে খুন করতে পারে।

কাকাবাবু কাচের বাক্সটা নিজে দিলেন না, ফিলিপ তামাংই তাঁর পকেটে হাত ভরে সেটা তুলে নিল। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটোও ছিনিয়ে নিল সে।

তারপরই এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার আগে নড়বে না। একটু নড়লে কিংবা পকেটে হাত দিলেই আমি গুলি চালাব।"

কাকাবাবু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিলিপ তামাং রিভলভারটা উঁচিয়ে রেখে এক পা, এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগল। বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ এখন অনেক কাছে এসে গেছে। কাকাবাবু রাগে ফুঁসতে লাগলেন। ফিলিপ তামাং নিজে পালিয়ে গিয়ে কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিতেই চাইছে।

সরু গলিটার শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফিলিপ তামাং সিঁড়িতে পা দিতে গিয়েই কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল !

হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠল সে। তার হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল মাটিতে। তারই মধ্যে একটা গুলির শব্দ হল দড়াম করে। গুলিটা কাকাবাবুর দিকেই এসে একটা দেওয়ালে লাগল, পাথরের কয়েকটা চল্‌টা এসে পড়ল কাকাবাবুর গায়ে।

ফিলিপ তামাং আর্ত চিৎকার করতে-করতে কার সঙ্গে যেন যুঝবার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু মাটিতে বসে পড়ে টর্চ জ্বেলে দেখলেন। তাঁর বুকটা কেঁপে উঠল।

ফিলিপ তামাংকে জড়িয়ে ধরেছে একটা বিশাল মূর্তি। টর্চের আলোতেও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে কালো ধোঁয়া দিয়ে গড়া একটা কিছু।

কাকাবাবু ভাবলেন, এই কি তা হলে দানব ? ফিলিপ তামাং শক্তিশালী পুরুষ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না, তার শরীরটা দলা-মোচা হয়ে যাচ্ছে। একবার সে বলে উঠল, "মিঃ রায়চৌধুরী বাঁচান ! বাঁচান ! আপনার পায়ে পড়ি।"

কাকাবাবু রিভলভারটা বার করেও গুলি চালাতে পারলেন না। ফিলিপ তামাং-এর গায়েও গুলি লেগে যেতে পারে। ওকে সাহায্য করবার জন্য কাকাবাবু দু-এক পা এগোতে যেতেই ফিলিপ তামাং-এর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল। সেই দানবটা তাকে উঁচুতে তুলে একটা প্রবল আছাড় মারল।

তারপর একটা হুঙ্কার দিয়ে দানবটা এগিয়ে এল কাকাবাবুর দিকে।

এবার কাকাবাবু টর্চের আলোয় ভাল করে দেখলেন। অন্ধকার ধোঁয়া-ধোঁয়া বিশাল শরীরের ওপর দিকে দুটো জ্বলজ্বলে ছোট-ছোট চোখ। সরু মুখ। দানব নয়, একটা ভাল্লুক !

বজ্র লামা রাত্তিরবেলা পাহারা দেবার জন্য একটা পোষা ভাল্লুক রেখেছে এখানে। এটা এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, কিংবা অন্য কোথাও ছিল ? সাধারণ পাহাড়ি ভাল্লুকের চেয়েও এটার আকার দ্বিগুণ। বোঝাই যাচ্ছে অসম্ভব হিংস্র।

রাইফেল ছাড়া শুধু রিভলভারের গুলি দিয়ে এত বড় একটা লোমশ ভাল্লুককে ঘায়েল করা যায় না।

কাকাবাবু অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন। তাঁর পেছনে গলিটা শেষ হয়ে গেছে, নিরেট পাথরের দেওয়াল। পালাবার কোনও উপায় নেই। ফিলিপ তামাং তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে এখানে নিয়ে এসেছিল, এখান থেকে প্রাচীন লামার ঘরের দরজাটাও কিছুটা দূরে। ভাল্লুকটা গর্জন করতে-করতে সেই পর্যন্ত এসে গেছে। এপাশে আর কোনও দরজা নেই।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলেছিলেন বলে ভাল্লুকটা তাঁর উপস্থিতিও টের পেয়ে গেছে। দু' হাত তুলে সে এগিয়ে আসছে এদিকে।

কাকাবাবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভাল্লুকটা থপ-থপ করে এসে কাকাবাবুর সামনে দাঁড়াল। কাকাবাবু একটুও নড়লেন না। ভাল্লুকটা প্রথমে একটা থাবা মেরে ধারালো নখে কাকাবাবুর গাল চিরে দিল। তবু একটুও শব্দ করলেন না কাকাবাবু।

এবার ভাল্লুকটা হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে টের পেলেন, ওর সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টাতেও কোনও লাভ নেই। ওর গায়ে অসীম শক্তি। ও কাকাবাবুকে পিষে ফেলে দেবে।

কাকাবাবু একটুও ছটফট না করে ডান হাতটা তুললেন খুব আস্তে। ভাল্লুকটার পেটের নরম জায়গায় রিভলভারটা ঠেকিয়ে গুলি করলেন।

একটা গুলি খেয়েই ভাল্লুকটা ছিটকে সরে গেল।

তারপর কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে একটা হাড়-হিম করা চিৎকার করল। কাকাবাবু জানেন, আহত ভাল্লুক অতি সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। এরা এমনই গোঁয়ার যে কোনও অস্ত্রকেই ভয় পায় না।

ভাল্লুকটা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপরে। কাকাবাবু তবু একটুও নড়লেন না। ভাল্লুকটার নোখ বিঁধে গেছে তাঁর কাঁধে, সে কাকাবাবুর মুখটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু মাথাটা যথাসম্ভব ঝুঁকিয়ে রিভলভারটা আবার ভাল্লুকটার পেটে ঠেকালেন, এবার পর-পর পাঁচটা গুলি চালিয়ে দিলেন একসঙ্গে।

ভাল্লুকটার আলিঙ্গন আস্তে-আস্তে আলগা হয়ে গেল। সে এবার মাটিতে পড়ে গেল ধপ করে।

কাকাবাবু হাঁপাতে লাগলেন। আর আধ মিনিট দেরি হলে তাঁর প্রাণ বাঁচত না।

কিন্তু সময় নষ্ট করার উপায় নেই। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তিনি এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ক্রাচ দুটো তুলে নেবার আগে তিনি একবার দেখতে গেলেন ফিলিপ তামাং-এর কী অবস্থা।

ঠিক তক্ষুনি সিঁড়িতে পড়ল একটা আলো। খুব দ্রুত একটা জ্বলন্ত মোম নিয়ে নেমে এলেন বজ্র লামা।

মেঘের মতন গম্ভীর গলায় বজ্র লামা বললেন, "আবার তুমি এখানে এসেছ? তুমি মরতে চাও!"

কাকাবাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটুও ভয় না পেয়ে বললেন, "আমার ভাইপো সন্তু কোথায়?"

বজ্র লামা শেষ সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে বললেন, "সে আর কোনওদিন তোমার কাছে যাবে না! তুমি আমার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেবে ভেবেছ? তুমি

আর এখান থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না !”

কাকাবাবু বললেন, “আমি এরকম ভয় দেখানো পছন্দ করি না।”

বজ্র লামা বললেন, “তুমি আমার প্রিয় ভাল্লুকটাকে মেরে ফেলেছ। আজ তোমার শেষ দিন ! তাকাও আমার দিকে।”

একহাতে মোমবাতিটা তুলে অন্য হাতে বজ্র লামা কাকাবাবুর চোখের সামনে সম্মোহনের ভঙ্গি করলেন।

কাকাবাবু খপ করে চেপে ধরলেন সেই হাতটা। তারপর এক ঝটকা টানে বজ্র লামার ওরকম বিশাল শরীরটাকে শূন্যে তুলে দিলেন এক আছাড় ! পাথরে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। তিনি আঁক শব্দ করে উঠলেন।

তবু বজ্র লামা জ্ঞান হারালেন না।

কাকাবাবু তার দিকে রিভলভার তুলে বললেন, “আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়নি। তুমি আমাকে ইলেকট্রিক শক খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিলে, আমি তার বদলা নিলাম। নড়া চড়া করলে তোমার পা খোঁড়া করে দেব। লামারা অতি শান্ত ও ভালমানুষ হয়। তুমি লামাদের মধ্যে একটা কলঙ্ক ! এখনও বলো, সন্তু কোথায় ?”

বজ্র লামা হঠাৎ দুর্বোধ ভাষায় কী একটা চিৎকার করে উঠলেন।

তক্ষুনি সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ হল, দু'জন লোক দুপ-দাপিয়ে নেমে এল, তাদের হাতে চকচকে ভোজালি।

কাকাবাবু রিভলভারটা তাদের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, “সাবধান !”

বজ্র লামা ওঠার চেষ্টা করেও পারলেন না। তবু তেজের সঙ্গে বললেন, “আমি পর-পর ছ'টা গুলির শব্দ শুনেছি। ওটার মধ্যে আর গুলি নেই। মারো ওকে !”

লোক দুটো ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই কাকাবাবু এক লাফে ঢুকে পড়লেন প্রাচীন লামার ঘরের মধ্যে। দরজাটা বন্ধ করেও দেখলেন, ভেতর দিকে ছিটকিনি বা খিল কিচ্ছু নেই। এদের দরজা বন্ধ রাখা যায় না।

কাকাবাবু পিঠ দিয়ে চেপে থাকার চেষ্টা করেও বুঝলেন কোনও লাভ হবে না। ওদের দু'জনের সঙ্গে গায়ের জোরে তিনি পারবেন না।

দরজাটা ছেড়ে দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন বেদীটার পেছনে। ওরা হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। সেই দু'জনের সঙ্গে আরও দু'জন। কিন্তু বজ্র লামা বোধ হয় উঠতে পারেননি। এক্ষুনি তো ওরা তাঁকে ধরে ফেলবে। আর কোনও উপায় নেই দেখে কাকাবাবু নিচু হয়ে ঢুকে পড়লেন গুহাটার মধ্যে।

কিন্তু যেটাকে তিনি গুহা ভেবেছিলেন, সেটা আসলে একটা সুড়ঙ্গ। সিঁড়ি-টিড়ি কিছু নেই। সেটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। কাকাবাবু ব্যালেন্স সামলাতে পারলেন না, থামতে পারলেন না, গড়াতে লাগলেন নীচের দিকে।

দু'দিকের দেওয়ালে ধরার কিছুই নেই। কাকাবাবুর মাথা ঠুকে যেতে লাগল। তাঁর কাঁধ ও গাল থেকে রক্ত ঝরছে, আরও কেটে যেতে লাগল অন্যান্য জায়গায়। ওই অবস্থাতেও তিনি বুঝতে পারলেন, এই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে তিনি ভুল করেছেন। এটা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে কোথাও, সেখান থেকে অনেক নীচে তিনি পড়ে যাবেন। এই সুড়ঙ্গটা ওরা রেখেছে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার জন্য। হয়তো মৃতদেহ ফেলে দেয় এখান দিয়ে।

আততায়ীরা আর কেউ সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁকে ধরতে এল না।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়াতে গড়াতেও কাকাবাবু চিন্তা করতে লাগলেন, যে-করে হোক, জ্ঞানটা রাখতেই হবে। কিছুতেই অজ্ঞান হলে চলবে না। সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হবে, সেখানে গাছ-টাছ কিছু একটা ধরে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেল, কাকাবাবু ঝপাস করে পড়ে গেলেন জলের মধ্যে। সেই জলে খুব স্রোত। কিছু বুঝবার আগেই কাকাবাবু ভেসে যেতে লাগলেন স্রোতের টানে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, আকাশে ফুটেছে নীল আলো। ঘুম ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করেছে পাখিরা।

জলটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। তবু কাকাবাবুর আহত শরীরটায় সেই জলের ছোঁয়ায় খানিকটা আরাম লাগল। তিনি বুঝলেন, তিনি এখনও মরেননি। এবার বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ দুটো হাত তাঁকে চেপে ধরল। তারপরেই চেনা গলার ডাক শোনা গেল, "কাকাবাবু!"

সন্তু আর অন্য একটি ছেলে মিলে কাকাবাবুকে টেনে তুলল জল থেকে।

কাকাবাবুর এক মুহূর্তের জন্য মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ! তারপরেই ভাল করে চোখ মেলে তিনি বললেন, "সন্তু? তুই এখানে কী করে এলি?"

সন্তু বলল, "ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে! এই তো খানিকক্ষণ আগে!"

ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কাকাবাবু বড়-বড় নিঃশ্বাস নিলেন কয়েকবার। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছেলেটি কে?"

সন্তু হেসে বলল, "এই তো প্রাচীন লামা। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। আগের রাত্তিরে তুমি আর ক্যাপটেন নরবু অজ্ঞান হয়ে গেলে, আমাকেও নিয়ে গেল। তারপর আমি চুপিচুপি আবার ফিরে গিয়েছিলাম ওই ঘরে। তখন আলো-টালো আর জ্বলছিল না। প্রাচীন লামা বিছানার ওপর বসে ছিলেন। একটু একটু হিন্দি জানেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা হল।"

কাকাবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "তুই সকালবেলা আমার সঙ্গে আসতে চাসনি!"

সন্তু বলল, "বজ্র লামা আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানে থেকে যাও ? তুমি অনেক-কিছু পাবে। তোমার আয়ু অনেক বেড়ে যাবে। তারপর তিনি আমায় হিপনোটাইজ করলেন। ইস। তোমার মুখে এ কী হয়েছে ? কাঁধ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোকে হিপনোটাইজ করা হয়েছে, সেটা তুই বুঝেছিলি ?"

সন্তু বলল, "প্রথমটায় বুঝিনি। তুমি জোরে চড় মারলে ? তারপর থেকে একটু-একটু করে কাটতে লাগল। তখন আমার মনে হয়েছিল, থেকে যাই, প্রাচীন লামার রহস্যটা জানব। ইনি কিন্তু বেশ সরল ছেলেমানুষ ! আমাকে বললেন, ওঁকে জোর করে একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে দেয়, ওঁর ভাল লাগে না। বাইরে জঙ্গলের মধ্যে খেলতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু এবার ছেলেটিকে ভাল করে দেখলেন। সারা শরীরের মতন মাথার চুলও ধপধপে সাদা। ভুরু সাদা।

কাকাবাবু অস্ফুটস্বরে বললেন, "অ্যালবিনো ! সেইজন্যই চুল সাদা !"

সন্তু বলল, "এঁর বয়েস কিন্তু তিনশো বছর হতেও পারে। দেখবে ?"

সন্তু সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপকা উমর কিতনা ? বলিয়ে ? কাকাবাবুকে বল দিজিয়ে ?"

ছেলেটি ফিক করে হেসে বলল, "মেরা উমর তিনশো দো বরষ !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবে ? প্রাচীন লামা, আপ কাকাবাবুকে থোড়া টাচ কর দিজিয়ে তো !"

ছেলেটি কাকাবাবুর বুকে একটা আঙুল ছুঁইয়েই হাত সরিয়ে নিল। কাকাবাবু সাঙ্ঘাতিক চমকে গেলেন। তাঁর বুকের মধ্যে ঝনঝন করে উঠল। তাঁর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেল সত্যি-সত্যি।

কাকাবাবু উঠে বসে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইলেকট্রিক ম্যান ? কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এক-একজন এরকম হয়। এদের শরীরে বিদ্যুৎ জমে থাকে। আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! শুধু বইতেই এঁদের কথা পড়েছি !"

সন্তু বলল, "আমি আর প্রাচীন লামা ওঁর ঘরে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ বাইরের সিঁড়িতে কারুর পায়ের শব্দ শুনে মনে হল বজ্র লামা ফিরে আসছেন। আমাকে ওই ঘরে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি দিতেন। তখন প্রাচীন লামাই ওই সুড়ঙ্গটার মুখের পাথর সরিয়ে বললেন, "চলো, আমরা দু'জন পালাই !"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা আমাদের পায়ের শব্দ নিশ্চয়ই। আমরা ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পাইনি।"

সন্তু বলল, "ইস, তা হলে তো আর একটু থাকলেই ভাল হত !"

কাকাবাবু বললেন, "ভালই করেছিস চলে এসে। নইলে বজ্র লামার হাতে ধরা পড়তেই হত। এই ছেলেটি একটি অত্যাশ্চর্য মানুষ। এঁর বয়েস যতই

হোক, এঁর শরীরে এই যে ইলেকট্রিসিটি, এটাও তো বিজ্ঞানের একটা বিস্ময়। এই ছেলেটিকে বজ্র লামা নিজের কুক্ষিগত করে রাখবে কেন ? সারা পৃথিবীকে ওঁর কথা জানানো উচিত। ইনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। ইনি আমাকে বলেছেন, ওই অন্ধকার ঘরে থাকতে ওঁর একটুও ভাল লাগে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বজ্র লামা তো সহজে ছাড়বে না। বোধ হয় বেশ আহত হয়েছে, দাঁড়াতে পারছে না। তবু নিশ্চয়ই দলবল নিয়ে খুঁজতে আসবেই। কোন্ দিক দিয়ে আসবে কে জানে ? আমার ক্রাচ দুটো নেই, হাঁটব কী করে ?"

সন্তু বলল, "আমি একদিক ধরছি। কাকাবাবু, দূরে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ ? ঝরনার এদিকেও জঙ্গলের মধ্যে কারা যেন এসেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ আওয়াজটা শুনলেন। আট-দশজন লোকের হাঁটার মসমস শব্দ হচ্ছে। বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল ক্যাপটেন নরবুকে। মনাস্টারির দিক থেকেও ভেসে এল ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

কাকাবাবু বললেন, "আর চিন্তা নেই, পুলিশ এসে গেছে। ওরা আগে বজ্র লামার সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। মনাস্টারি সার্চ করলেই ফিলিপ তামাং আর জগমোহনকে পেয়ে যাবে। আমরা ততক্ষণে চল একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে বিশ্রাম নিই। বড্ড ধকল গেছে। এই প্রাচীন লামা কিংবা আশ্চর্য ছেলেটিকে নিয়ে এর পর আমরা দিল্লি যাব !"

প্রাচীন লামাকে সামনে নিয়ে কাকাবাবু সন্তুর কাঁধ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন জঙ্গলের দিকে। উষার নীল আলো এখন সোনালি হয়ে ঝলমল করছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভূপাল রহস্য। শিশু সাহিত্য সংবাদ। প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ ১৩৯০। পৃ. ১১১। মূল্য দশ টাকা।
উৎসর্গ ॥ ইমি আর ঝিল/অর্থাৎ/দামিনী আর মানিনীকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ দেবাশিস দেব।

জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯১। পৃ. ১০৪। মূল্য ১৫·০০।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৮৭।
উৎসর্গ ॥ তমালী ও জয়া বসু-কে।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলগড়ের চাবি। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৪, এপ্রিল ১৯৮৭। পৃ. ১৬৪। মূল্য ২০ টাকা।
উৎসর্গ ॥ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে/ স্নেহের উপহার
প্রচ্ছদ ॥ বিজন ভট্টাচার্য

রাজবাড়ির রহস্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৩৯৯। পৃ. ১১৯। মূল্য ২০·০০।
প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৯৫।
উৎসর্গ ॥জ্যোতিস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে/স্নেহের উপহার।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজয়নগরের হীরে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ১৯৯৩। পৃ. ১১৭। মূল্য ২০·০০।
প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৮৯।
উৎসর্গ ॥ নীহার আর তুষার/মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয়কে।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

কাকাবাবু ও বজ্রলামা। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ. ১২০। মূল্য ১৬·০০।
উৎসর্গ ॥ গোপু অর্থাৎ/ শ্রীমান কৃষ্ণ প্রণাম বসুকে।
প্রচ্ছদ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে কাকাবাবুর একটি পা ভাঙা, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, অনমনীয় তাঁর দৃঢ়তা, অদম্য তাঁর সাহস। একইসঙ্গে প্রখর বিশ্লেষণশক্তি, প্রচুর পড়াশোনা। কত ধরনের রহস্যের যে জট খুলেছেন তিনি, মোকাবিলা করেছেন কত রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতির, গিয়েছেন কত যে নতুন জায়গায়—তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গে কিশোর সন্তু ওরফে সুনন্দ, যে কিনা প্রতিটি অভিযানের সাক্ষী। ফেলুদার যেমন তোপসে, অনেকটা সেইরকমই কাকাবাবুর কাহিনীতে সন্তু।

সন্তু আর কাকাবাবর দুর্ধর্ষ অভিযানের নানান কাহিনী নিয়েই দু-মলাটের মধ্যে এবার খণ্ডে-খণ্ডে 'কাকাবাবু সমগ্র'। এই দ্বিতীয় খণ্ডে ছ'-ছটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ভূপাল রহস্য, জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল, জঙ্গলগড়ের চাবি, রাজবাড়ির রহস্য, বিজয়নগরের হিরে, কাকাবাবু ও বজ্রলামা।

9 788172 152581